তাফসীরে আনওয়ারুল কুরআন

১

এতে রয়েছে

- মূল কুরআনুল কারীম
- অনুবাদ : আল্লামা আশরাফ আলী থানভী (র.)-এর তরজমার অনুকরণে
- শব্দে শব্দে অনুবাদ
- শানে নুযূল / কুরআন নাজিলের প্রেক্ষাপট
- তাফসীর : মুফতি শফী (র.)-এর তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআনের অনুকরণে
- আয়াত ও সূরার পূর্বাপর সম্পর্ক : আল্লামা ইদরীস কান্ধলভী (র.)-এর অনুকরণে
- আয়াত সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলি
- প্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসায়েল
- শব্দ ও বাক্য বিশ্লেষণ
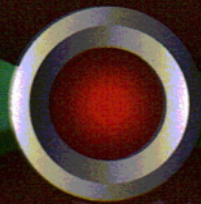
ইসলামিয়া কুতুবখানা ঢাকা

المكتبة الإسلامية

তাফসীরে

আনওয়ারুল কুরআন

[২৬তম পারা থেকে ৩০তম পারা পর্যন্ত]

রচনা ও সংকলনে

মাওলানা মোহাম্মদ আবুল কালাম মাসূম

ফাযেলে দারুল উলূম দেওবন্দ, ভারত
তাফসীরে জালালাইন শরীফের অনুবাদক
লেখক, গবেষক ও বহুগ্রন্থ প্রণেতা

সম্পাদনায়

মাওলানা মোহাম্মদ মোস্তফা

প্রকাশনায়

ইসলামিয়া কুতুবখানা

৩০/৩২ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

তাফসীরে

আনওয়ারুল কুরআন

৬

[২৬তম পারা থেকে ৩০তম পারা পর্যন্ত]

রচনা ও সংকলনে

মাওলানা মোহাম্মদ আবুল কালাম মাসূম

ফাযেলে দারুল উলূম দেওবন্দ, ভারত
তাফসীরে জালালাইন শরীফের অনুবাদক
লেখক, গবেষক ও বহুগ্রন্থ প্রণেতা

সম্পাদনায়

মাওলানা মোহাম্মদ মোস্তফা

প্রকাশনায়

ইসলামিয়া কুতুবখানা

৩০/৩২ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

তাফসীরে আনওয়ারুল কুরআন (৬ষ্ঠ খণ্ড)

রচনা ও সংকলনে ◈ মাওলানা মোহাম্মদ আবুল কালাম মাসূম

প্রকাশক ◈ মাওলানা মোহাম্মদ মোস্তফা
ইসলামিয়া কুতুবখানা, ঢাকা।

শব্দবিন্যাস ◈ ইসলামিয়া কম্পিউটার হোম
২৮/এ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা।

মুদ্রণে ◈ ইসলামিয়া অফসেট প্রেস
২৮/ এ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

হাদিয়া ◈ ৬০০.০০ টাকা মাত্র

الحمد لله رب العلمين والعاقبة للمتقين. والصلوة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين امابعد! : فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم "وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس مانزل إليهم ولعلهم يتفكرون" وقال رسول الله ﷺ: تركت فيكم امرين ماتمسكتم بهما لن تضلوا بعدى أبدا: كتاب الله وسنتى.

প্রথমে আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, যিনি রহমান ও রহীম। যার দয়া অফুরন্ত ও অসীম। যিনি আমাদের উপর আপন অনুগ্রহে বেহিসাব নায-নিয়ামত দান করেছেন। বিশেষ করে অধম কে স্বীয় কালামে পাকের ব্যখ্যাগ্রন্থ 'তাফসীরে আনওয়ারুল কুরআন' রচনার তৌফিক দিয়েছেন।

আম্মা বাদ :

দুনিয়াবি ও উখরবি জিন্দেগিতে মানবতার শাশ্বত মুক্তির জন্য মহান আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন যুগে যুগে বহু নিদর্শনাবলি পাঠিয়েছেন। হযরত আদম (আ.) থেকে নিয়ে শুরু করে হযরত মুহাম্মদ ﷺ পর্যন্ত লক্ষাধিক নবী রাসূল প্রেরণ করেছেন। কখনো বা পৃথিবীবাসীকে অপার দয়া-রহমত আবার কখনো বেদনাদায়ক আজাব-শাস্তির স্বাদ চাখিয়েছেন। কখনো বা নিজ কুদরতের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে অতিপ্রাকৃত ঘটনাবলির অবলোকন করিয়েছেন। সময়ে সময়ে আদেশ-নিষেধ সম্বলিত সহীফা ও কিতাব অবতারণ করেছেন। এতসব কিছুর লক্ষ্য একটাই, মানুষের বিকার মস্তিষ্কে যেন বোধের উদয় ঘটে। দুনিয়া, নফস ও শয়তানের ফাঁদ এড়িয়ে এক ইলাহে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে। মহিয়ান গরিয়ান রাব্বুল আ'লামীনের মানশা অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করে দুনিয়া ও আখেরাতে সিদ্ধকাম হতে পারে। কিন্তু কোনটি যে তামাম জাহানের প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার আদেশ ও নিষেধ– তা তো এই নগণ্য জিন ও ইনসান সম্প্রদায়ের পক্ষে অনুধাবন করা সম্ভব নয়! তাহলে এখন উপায় কী হবে? এরই ধারাবাহিকতায় আখেরি উম্মতের জন্য রাব্বানার পক্ষ থেকে উপঢৌকন স্বরূপ অবতীর্ণ করা হয় খোলাচিঠি 'আল-কুরআন'।

এই আল-কুরআনকে বলা হয় আদর্শ জীবন বিধান। এর মাঝে রয়েছে বৈচিত্র্যময় ও শতবাকধারী জীবনের পূর্ণাঙ্গ দিক-নির্দেশনা। বিশ্বাসগত, আধ্যাত্মিক, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, আন্তর্জাতিক– সকল বিষয়ে রয়েছে সর্বযুগের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য মৌলিক নীতিমালা। এখানেই শেষ নয়, প্রতিটি যুগের সমসাময়িক সমস্যার সমাধানও তো কুরআনের মূলনীতি থেকেই উদ্ভাবিত হয়। তাছাড়া নামাজের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতও কুরআন তেলাওয়াত ছাড়া শুদ্ধ হয় না। শুধু তাই না কুরআনের অনুকরণ ছাড়া জিন্দেগির সফলতাও সম্ভব নয়। এ সম্পর্কে সারওয়ারে কায়েনাত হযরত মুহাম্মদ ﷺ বলেন– 'তোমাদের মাঝে আমি এমন দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি, যা ধরে থাকলে আমার পরে কখনো তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। আর তা হলো আল্লাহর কিতাব ও আমার সুন্নত।' (মুসনাদে আহমাদ : ৪/৫০)

✧ বলা বাহুল্য, আমল, আখলাক, কথাবার্তা, চাল-চলন তথা বৈষয়িক জীবনে অনুপম আদর্শে সাহাবায়ে কেরামের উত্তরোত্তর উৎকর্ষ সাধনের মূল হেতু কিন্তু এই আল কুরআনের অনুধাবন ও অনুকরণ। এ সম্পর্কে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন–

كَانَ الرَّجُلُ مِنَّا اِذَا تَعَلَّمَ عَشَرَ اٰيَاتٍ لَمْ يُجَاوِزْهُنَّ حَتّٰى يَعْرِفَ مَعَانِيْهِنَّ وَالْعَمَلَ بِهِنَّ

“আমাদের মাঝে কেউ যখন দশটি আয়াত শিখতেন, তখন তিনি সেগুলোর অর্থ অনুধাবন ও নিজের জীবনে বাস্তবায়ন ব্যতীত সেগুলোকে অতিক্রম করতেন না। (তাফসীরে তাবারী : ১/ ২৭; বৈরুত : দারুল মা'আরিফ, ১৪০৬ হিজরি)। সাহাবায়ে কেরাম তো আখেরি নবীর সোহবত পেয়ে ধন্য হয়েছেন। সময়ে সময়ে কুরআনের আয়াত অবতারণের প্রেক্ষাপট ও দৃশ্যপট আলোকন করেছেন। তার উপর আবার অবোধগম্য বিষয়াবলি নিয়ে হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর সাথে আলোচনা করে সমাধান করে নিতে পেরেছেন। কিন্তু আমরা কীভাবে কুরআনের মর্মবাণী অনুধাবন করব? সংকীর্ণ মেধাতে ইলাহী কালাম অনুধাবন করার সাধ্য কার? এর প্রেক্ষিতেই তাফসীর শাস্ত্রের বিকাশ। এর সূচনাটাও হয়েছে হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর মাধ্যমে। প্রথমত হযরত মুহাম্মদ ﷺ তো ছিলেন কুরআনেরই জীবন্ত ব্যাখ্যাপুরুষ। তাঁর পবিত্র জীবনে এই কুরআনই তো নিখুঁতভাবে চিত্রায়িত হয়েছিল। তাই তো উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.) সাহাবাদের প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন– 'তিনি তো সাক্ষাৎ কুরআন।' দ্বিতীয়ত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে কুরআনকে মানুষের সামনে তুলে ধরা তো ছিল রাসূল ﷺ-এর গুরুদায়িত্বসমূহের অন্যতম। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে–

وَاَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ -

“আমি তোমার প্রতি এক স্মরণিকা (কিতাব) অবতীর্ণ করেছি, যেন তা তুমি মানুষের জন্য বয়ান তথা ব্যাখ্যা করে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দাও, যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। (সূরা : নাহল; আয়াত : ৪৪; পারা : ১৪)

সারকথা, তাফসীর শাস্ত্রের উদ্ভব ও বিকাশ হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর মাধ্যমেই সূচিত হয়েছে এবং এটাও উপলব্ধ যে, তাফসীর হলো আল-কুরআনেরই বিশ্লেষিত রূপ। এই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ছাড়া কুরআনের মর্ম মর্মে অনুধাবন করা অতঃপর তদনুযায়ী অনুকরণ, অনুসরণ সম্ভব নয়। তাই তো আল্লামা যারকাশী (র.) আল-বুরহান ফী উলূমিল কুরআন (১/৩৩) গ্রন্থে তাফসীরের সংজ্ঞায় বলেন–

هُوَ عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهٖ فَهْمُ كِتَابِ اللّٰهِ الْمُنَزَّلِ عَلٰي نَبِيِّهٖ مُحَمَّدٍ ﷺ وَبَيَانُ مَعَانِيْهِ وَاسْتِخْرَاجُ اَحْكَامِهٖ وَحِكَمِهٖ -

অর্থাৎ এটা এমন এক বিজ্ঞানের নাম, যার দ্বারা মুহাম্মদ ﷺ-এর উপর অবতীর্ণ আল্লাহর কিতাব অনুধাবন, তার অর্থের ব্যাখ্যা ও আয়াতের বিধি-বিধান এবং এর রহস্য জানা যাবে।

আর ড. মুহাম্মদ হুসাইন যাহাবী (র.) আত-তাফসীর ওয়াল মুফাসিসরূন (১/১৫-১৬; কায়রো : মাকতাবা ওয়াহাবা; ১৪১৬ হি.) গ্রন্থে তাফসীরের সংজ্ঞায় বলেন– بَيَانُ كَلَامِ اللّٰهِ اَوْ اَنَّهُ الْمُبَيِّنُ لِاَلْفَاظِ الْقُرْاٰنِ وَمَفْهُوْمَاتِهَا অর্থাৎ, (এটা) আল্লাহর কালামের ব্যাখ্যা অথবা এটা কুরআনের শব্দমালা ও ভাবসমূহের সুস্পষ্টকারী।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, মানব জীবনে দু'জাহানের শান্তি-সুখ ও সফলতা লাভের জন্য যতটুকু প্রয়োজন আল-কুরআনের, ঠিক তেমনি কুরআন অনুধাবনের জন্য তাফসীর শাস্ত্রে প্রয়োজন।

✧ ইসলামিয়া কুতুবখানা -এর উদ্যোগে ইতঃপূর্বে আনওয়ারুল কুরআন নামক পবিত্র কুরআনের একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। সূরা বাকারা, নিসা, মায়িদা, আন'আম, আ'রাফ, আনফাল ও তাওবা -এর ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ বেশকিছু সূরার সরল অনুবাদ, শাব্দিক অনুবাদ, ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ এবং শানে নুযূলসহ প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ এর আঙ্গিকে গ্রন্থটি সাজানো হয়েছিল। সহজ ও সরল পাঠে প্রয়োজনীয় তবে নির্ভুল তত্ত্বে উপস্থাপিত ব্যাখ্যাগ্রন্থ আনওয়ারুল কুরআন পাঠক মহলে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়। তাদের আকুলিত হৃদয়ের অনুভূতি ও অভিব্যক্তিকে কেন্দ্র করে কুরআনের একটি যুগোপযোগী তাফসীর গ্রন্থ রচনার বিষয়টি সামনে আসে। এরই প্রেক্ষিতে ইসলামিয়া কুতুবখানার সত্ত্বাধিকারী আলহাজ মাওলানা মোস্তফা সাহেব (দা. বা.) কুরআনের খেদমত করার মনস্থ করত আমাকে

আনওয়ারুল কুরআনের আদলে একটি তাফসীর গ্রন্থ রচনার অনুরোধ জানান। কিন্তু কুরআনের এত বড় খেদমত করতে গিয়ে না জানি কলঙ্কের ছোঁয়া লাগে– এই ভয়ে আমি অনুরোধে সাড়া দিচ্ছিলাম না। কিন্তু মাওলানা সাহেবও খেদমত করার সুযোগ হাতছাড়া করার ব্যক্তি নন। অবশেষে তাঁর অনুরোধকে আমি শ্রদ্ধার সাথে স্বাগত জানালাম। মূলত তাঁর দিলের তড়পেই আমি এ খেদমতে হাত লাগালাম। তাফসীর গ্রন্থটি রচনার ক্ষেত্রে আনওয়ারুল কুরআনের রচনা কাঠামোর আলোকে রচনার প্রয়াস চালানো হয়েছে। অনুবাদের ক্ষেত্রে আশরাফ আলী থানবী (র.) -এর তরজমার অনুকরণ করা হয়েছে। এক আয়াতের সাথে অন্য আয়াতের পূর্বাপর সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে ইদ্রিস কান্ধলভী (র.) এর মা'আরিফুল কুরআন কে অনুসরণ করা হয়েছে। আর তাফসীরের ক্ষেত্রে মুফতী মুহাম্মদ শফী (র.) -এর মা'আরিফুল কুরআনকে সামনে রাখা হয়েছে। এছাড়াও তাফসীরে নূরুল কুরআন, তাফসীরে বায়যাভী, তাফসীরে জালালাইন, তাফসীরে বয়ানুল কুরআন, তাফসীরে কুরতুবী, তাফসীরে মাজেদী, ইবনে কাছীর ও তাফসীরে মাজহারীর গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক আলোচনাও সমভাবে উপাত্ত হয়েছে। দীর্ঘদিনের মেহনতের বদৌলতে তাফসীরে আনওয়ারুল কুরআন আজ প্রকাশের পথে, তাই এ আনন্দঘন মুহূর্তে আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের দরবারে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। পাশাপাশি পাবলিকেশনের জগতে অনুকরণীয় আদর্শ আলেমে দীন আলহাজ মাওলানা মোস্তাফা সাহেব (দা. বা.) -এর জন্য দোয়া করি– 'আল্লাহ! হযরতকে সিহহাত ও আফিয়াতের সাথে দীর্ঘায়ু দান করুন। তাঁর সমস্ত দীনি খেদমত ও প্রকাশনী প্রতিষ্ঠানকে কবুল করুন।' এবং যারা আমাকে বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা, মূল্যবান পরামর্শ, উৎসাহ-উদ্দীপনা ও আন্তরিকতা দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাদের জন্যও দোয়া করি– 'হে আল্লাহ! তাদেরকে উত্তম জাযা ও খায়ের দান করুন এবং এই তাফসীর গ্রন্থের ভুল-ভ্রান্তি ও ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দিয়ে সর্বস্তরের পাঠক মহলে ব্যাপকভাবে কবুল করে নিন।' পরিশেষে কবিতার চরণে ইতি টানছি–

ওফাতের পরে আমি, জাহানের একক স্বামী,
তোমারি আদালতে, হাজির হব যবে।
হিসেবের খাতায় লিখে, রেখো গো যতন করে,
অধমের গ্রন্থখানি, হে দয়াময়! তবে।

মোহাম্মাদ আবুল কালাম মাসূম
সেভভিউ– ১
হাসনাবাদ, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা
০৭/০৭/২০১৪ ইং
৮ রমাজানুল মুবারক

যাদের নিরলস প্রচেষ্টায় এ আনওয়ারুল কুরআনটি আলোর মুখ দেখেছে

- **মাওলানা মোহাম্মদ মোস্তফা এম. এম**
  ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ইসলামিয়া কুতুবখানা, ঢাকা।
- **মাওলানা মোহাম্মদ আনওয়ারুল হক**
  সিনিয়র সম্পাদক, ইসলামিয়া কুতুবখানা, ঢাকা।
- **মাওলানা আব্দুল আলীম**
  উস্তাদ, আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া ইদারাতুল উলূম, আফতাব নগর, ঢাকা।
- **মাওলানা মোহাম্মদ আকবর হোসাইন**
  ফাযেল দারুল উলূম হাটহাজারী চট্টগ্রাম।
- **মাওলানা রফিকুল ইসলাম সিরাজী**
  ফাযেলে দারুল উলূম দেওবন্দ, ভারত।
  সাবেক উস্তাদ, জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলূম মাদানিয়া
  ৩১২ দক্ষিণ যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।
- **মাওলানা মোহাম্মদ মাহমূদ হাসান**
  উস্তাদ, মাদরাসা উলূমে শরী'আহ, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।
- **মাওলানা মোহাম্মদ এনামুল হাসান**
  উস্তাদ, মাদরাসা নূরুল কুরআন, ভিক্টোরিয়া পার্ক, ঢাকা।
- **মাওলানা মোহাম্মদ সালাউদ্দিন**
  মুহাদ্দিস, জামিয়া ইসলামিয়া মোহাম্মাদিয়া মোহাম্মদনগর, ঢাকা।
- **মাওলানা মোহাম্মদ কামরুল হাসান**
  ফাযেলে দারুল কুরআন শামসুল উলূম চৌধুরী পাড়া, ঢাকা।
- **মাওলানা মোহাম্মদ মাহবুবুল হাসান**
  ফাযেলে জামেয়া আরাবিয়া ফরিদাবাদ, ঢাকা।
- **মাওলানা হাফেজ ইমাম উদ্দীন**
  ফাযেলে জামেয়া আরাবিয়া ফরিদাবাদ, ঢাকা।
- **মাওলানা মোহাম্মদ মোবারক হোসাইন**
  সাবেক শিক্ষক, আল ফারুক ইসলামিয়া একাডেমি চাটখিল, নোয়াখালী।

সূচিপত্র

তাফসীরে আনওয়ারুল কুরআন

পারা : ৩০

سُوْرَةُ النَّبَاِ مَكِّيَّةٌ

সূরা নাবা

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত– ৪০, রুকূ‘– ২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

বাংলা	আরবি
১. তারা একে অপরের নিকট কিসের অবস্থা জিজ্ঞাসা করছে?	عَمَّ يَتَسَآءَلُوْنَ ﴿١﴾
২. সে বড় ঘটনার অবস্থা জিজ্ঞাসা করছে?	عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيْمِ ﴿٢﴾
৩. যে সম্বন্ধে তারা [সত্যপন্থিদের সাথে] মতভেদ করছে।	الَّذِىْ هُمْ فِيْهِ مُخْتَلِفُوْنَ ﴿٣﴾
৪. কখনো এরূপ নয়, [বরং কিয়ামত আসবে এবং] তারা সত্বরই জানতে পারবে।	كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ ﴿٤﴾
৫. অনন্তর কখনো এরূপ নয়, তারা অচিরেই জানতে পারবে।	ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ ﴿٥﴾
৬. আমি কি জমিনকে বিছানা করিনি?	اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهٰدًا ﴿٦﴾
৭. এবং পর্বতসমূহকে ও [জমিনের জন্য] পেরেক স্বরূপ নির্মাণ করিনি।	وَّالْجِبَالَ اَوْتَادًا ﴿٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. عَمَّ কিসের অবস্থা يَتَسَآءَلُوْنَ তারা একে অপরের নিকট জিজ্ঞাসা করছে?

২. عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيْمِ সে বড় ঘটনার অবস্থা জিজ্ঞাসা করছে?

৩. الَّذِىْ هُمْ فِيْهِ যে সম্বন্ধে তারা مُخْتَلِفُوْنَ মতভেদ করছে।

৪. كَلَّا কখনো এরূপ নয় سَيَعْلَمُوْنَ তারা সত্বরই জানতে পারবে।

৫. ثُمَّ كَلَّا অনন্তর কখনো এরূপ নয় سَيَعْلَمُوْنَ তারা অচিরেই জানতে পারবে।

৬. اَلَمْ نَجْعَلِ আমি কি করিনি الْاَرْضَ مِهٰدًا জমিনকে বিছানা?

৭. وَّالْجِبَالَ এবং পর্বতসমূহকে اَوْتَادًا [জমিনের জন্য] পেরেক স্বরূপ নির্মাণ করিনি।

৮. এবং আমিই তোমাদেরকে জোড়া [নর ও নারী] বানিয়েছি।	وَّخَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًا ۝٨
৯. আর আমিই তোমাদের নিদ্রাকে আরামের উপকরণ করেছি।	وَّجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ۝٩
১০. আর আমিই রাত্রিকে আবরণের বস্তু বানিয়েছি।	وَّجَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاسًا ۝١٠
১১. আর আমিই দিনকে জীবিকা অর্জনের সময় করেছি।	وَّجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ۝١١
১২. আর আমিই তোমাদের উপর সাতটি মজবুত আসমান নির্মাণ করেছি।	وَّبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ۝١٢
১৩. আর আমিই এক উজ্জ্বল প্রদীপ [অর্থাৎ সূর্যকে] প্রস্তুত করেছি।	وَّجَعَلْنَا سِرَاجًا وَّهَّاجًا ۝١٣
১৪. আর আমিই পানিপূর্ণ মেঘমালা হতে প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করেছি।	وَّاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرٰتِ مَآءً ثَجَّاجًا ۝١٤
১৫. যেন আমি সে পানি দ্বারা উৎপন্ন করি শস্য ও সবজি [উদ্ভিদ]।	لِّنُخْرِجَ بِهٖ حَبًّا وَّنَبَاتًا ۝١٥
১৬. এবং নিবিড় উদ্যানসমূহ। [সমস্ত কাজে কি আমার পূর্ণ ক্ষমতা প্রকাশ পাচ্ছে না? তবে কেন কিয়ামত সম্বন্ধে আমার ক্ষমতায় সন্দেহ করা হচ্ছে?]	وَّجَنّٰتٍ اَلْفَافًا ۝١٦
১৭. নিশ্চয় বিচারের দিন [একটি] নির্ধারিত [সময়] রয়েছে।	اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيْقَاتًا ۝١٧
১৮. অর্থাৎ যেদিন সিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে, অতঃপর তোমরা দলে দলে এসে উপস্থিত হবে।	يَّوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ فَتَأْتُوْنَ اَفْوَاجًا ۝١٨

শাব্দিক অনুবাদ :

৮. وَخَلَقْنٰكُمْ এবং আমিই তোমাদেরকে বানিয়েছি اَزْوَاجًا জোড়া [নর ও নারী]।

৯. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ আর আমিই তোমাদের নিদ্রাকে করেছি سُبَاتًا আরামের উপকরণ।

১০. وَجَعَلْنَا الَّيْلَ আর আমিই রাত্রিকে বানিয়েছি لِبَاسًا আবরণের বস্তু।

১১. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ আর আমিই দিনকে করেছি مَعَاشًا জীবিকা অর্জনের সময়।

১২. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ আর আমিই তোমাদের উপর নির্মাণ করেছি سَبْعًا شِدَادًا সাতটি মজবুত আসমান।

১৩. وَجَعَلْنَا আর আমিই প্রস্তুত করেছি سِرَاجًا وَّهَّاجًا এক উজ্জ্বল প্রদীপ [অর্থাৎ সূর্যকে]।

১৪. وَاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرٰتِ আর আমিই পানিপূর্ণ মেঘমালা হতে বর্ষণ করেছি مَآءً ثَجَّاجًا প্রচুর বৃষ্টি।

১৫. لِنُخْرِجَ بِهٖ যেন আমি সে পানি দ্বারা উৎপন্ন করি حَبًّا وَّنَبَاتًا শস্য ও সবজি [উদ্ভিদ]।

১৬. وَجَنّٰتٍ اَلْفَافًا এবং নিবিড় উদ্যানসমূহ।

১৭. اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ নিশ্চয় বিচারের দিন كَانَ مِيْقَاتًا নির্ধারিত রয়েছে।

১৮. يَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ অর্থাৎ যেদিন সিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে فَتَأْتُوْنَ اَفْوَاجًا অতঃপর তোমরা দলে দলে এসে উপস্থিত হবে।

১৯. আর আসমান খুলে দেওয়া হবে, অনন্তর তাতে বহু দরজা হয়ে যাবে।	وَّفُتِحَتِ السَّمَآءُ فَكَانَتْ اَبْوَابًا ﴿١٩﴾
২০. আর পাহাড়সমূহকে স্থানচ্যুত করা হবে, অতঃপর তা বালুকারাশির ন্যায় হয়ে যাবে।	وَّسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ﴿٢٠﴾
২১. নিশ্চয় দোজখ ওঁৎপাতার স্থল।	اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ﴿٢١﴾
২২. এটা সীমালজ্ঘনকারীদের আবাসস্থল।	لِّلطَّاغِيْنَ مَاٰبًا ﴿٢٢﴾
২৩. যাতে তারা অনন্তকাল [পড়ে] থাকবে।	لّٰبِثِيْنَ فِيْهَآ اَحْقَابًا ﴿٢٣﴾
২৪. সেখানে তারা না কোনো প্রকার স্নিগ্ধতার স্বাদ গ্রহণ করবে আর না পানীয় বস্তুর স্বাদ গ্রহণ করবে।	لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا بَرْدًا وَّلَا شَرَابًا ﴿٢٤﴾
২৫. উত্তপ্ত পানি ও পুঁজ ব্যতীত।	اِلَّا حَمِيْمًا وَّغَسَّاقًا ﴿٢٥﴾
২৬. এটাই [স্বীয় কৃতকর্মের] পূর্ণ প্রতিদান।	جَزَآءً وِّفَاقًا ﴿٢٦﴾
২৭. তারা হিসাব-নিকাশের ভয় করত না।	اِنَّهُمْ كَانُوْا لَا يَرْجُوْنَ حِسَابًا ﴿٢٧﴾
২৮. এবং তারা আমার আয়াতসমূহকে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করত।	وَّكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا كِذَّابًا ﴿٢٨﴾
২৯. আর আমি প্রত্যেক বিষয়ই লিখিতভাবে সংরক্ষিত রেখেছি।	وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنٰهُ كِتٰبًا ﴿٢٩﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৯. وَّفُتِحَتِ السَّمَآءُ আর আসমান খুলে দেওয়া হবে فَكَانَتْ اَبْوَابًا অনন্তর তাতে বহু দরজা হয়ে যাবে।

২০. وَّسُيِّرَتِ الْجِبَالُ আর পাহাড়সমূহকে স্থানচ্যুত করা হবে فَكَانَتْ سَرَابًا অতঃপর তা বালুকারাশির ন্যায় হয়ে যাবে।

২১. اِنَّ جَهَنَّمَ নিশ্চয় দোজখ كَانَتْ مِرْصَادًا ওঁৎপাতার স্থল।

২২. لِّلطَّاغِيْنَ এটা সীমালজ্ঘনকারীদের مَاٰبًا আবাসস্থল।

২৩. لّٰبِثِيْنَ فِيْهَآ যাতে তারা থাকবে اَحْقَابًا অনন্তকাল।

২৪. لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا بَرْدًا সেখানে তারা না কোনো প্রকার স্নিগ্ধতার স্বাদ গ্রহণ করবে وَّلَا شَرَابًا আর না পানীয় বস্তুর স্বাদ গ্রহণ করবে।

২৫. اِلَّا حَمِيْمًا উত্তপ্ত পানি ব্যতীত وَّغَسَّاقًا ও পুঁজ।

২৬. جَزَآءً وِّفَاقًا এটাই স্বীয় কৃতকর্মের পূর্ণ প্রতিদান।

২৭. اِنَّهُمْ كَانُوْا لَا يَرْجُوْنَ তারা ভয় করত না حِسَابًا হিসাব-নিকাশের।

২৮. وَّكَذَّبُوْا এবং তারা অবিশ্বাস করত بِاٰيٰتِنَا كِذَّابًا আমার আয়াতসমূহকে সম্পূর্ণ।

২৯. وَكُلَّ شَيْءٍ আর প্রত্যেক বিষয়ই اَحْصَيْنٰهُ كِتٰبًا আমি লিখিতভাবে সংরক্ষিত রেখেছি।

অনুবাদ	আয়াত
৩০. সুতরাং [এখন তোমরা তোমাদের সে কৃতকর্মের] স্বাদ গ্রহণ কর, আমি তোমাদের শাস্তিই বৃদ্ধি করতে থাকব।	فَذُوْقُوْا فَلَنْ نَّزِيْدَكُمْ اِلَّا عَذَابًا ﴿٣٠﴾
৩১. নিশ্চয় মুত্তাকীদের জন্য সফলতা রয়েছে।	اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ مَفَازًا ﴿٣١﴾
৩২. অর্থাৎ [বিভিন্ন মেওয়াপূর্ণ] উদ্যানসমূহ ও আঙ্গুরপুঞ্জ।	حَدَآئِقَ وَاَعْنَابًا ﴿٣٢﴾
৩৩. আর সমবয়স্কা নবযুবতীগণ রয়েছে।	وَّكَوَاعِبَ اَتْرَابًا ﴿٣٣﴾
৩৪. এবং পরিপূর্ণ পানপাত্রসমূহ।	وَّكَاْسًا دِهَاقًا ﴿٣٤﴾
৩৫. তারা সেখানে না কোনো নিরর্থক কথা শুনতে পাবে আর না কোনো মিথ্যা কথা।	لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّلَا كِذّٰبًا ﴿٣٥﴾
৩৬. এটা প্রতিদান, আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হতে যথাযোগ্য পুরস্কার ।	جَزَآءً مِّنْ رَّبِّكَ عَطَآءً حِسَابًا ﴿٣٦﴾
৩৭. যিনি আসমানসমূহ ও জমিন এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থিত সমস্ত বস্তুর মালিক, পরম দয়ালু, তার পক্ষ হতে অধিকার কারো হবে না যে, আবেদন-নিবেদন করে।	رَّبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمٰنِ لَا يَمْلِكُوْنَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿٣٧﴾
৩৮. যেদিন সমস্ত প্রাণী ও ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হবে, কেউই কথা বলতে পারবে না সে ব্যক্তি ব্যতীত, যাকে দয়াময় [আল্লাহ] অনুমতি দিবেন এবং সে কথাও ঠিক ঠিক বলবে।	يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَالْمَلٰٓئِكَةُ صَفًّا ۙ لَّا يَتَكَلَّمُوْنَ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿٣٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩০. فَذُوْقُوْا সুতরাং এখন তোমরা তোমাদের সে কৃতকর্মের স্বাদ গ্রহণ কর فَلَنْ نَّزِيْدَكُمْ اِلَّا عَذَابًا আমি তোমাদের শাস্তিই বৃদ্ধি করতে থাকব।

৩১. اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ নিশ্চয় মুত্তাকীদের জন্য রয়েছে مَفَازًا সফলতা ।

৩২. حَدَآئِقَ অর্থাৎ উদ্যানসমূহ وَاَعْنَابًا ও আঙ্গুরপুঞ্জ।

৩৩. وَّكَوَاعِبَ اَتْرَابًا আর সমবয়স্কা নবযুবতীগণ রয়েছে।

৩৪. وَّكَاْسًا এবং পানপাত্রসমূহ دِهَاقًا পরিপূর্ণ ।

৩৫. لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا তারা সেখানে না কোনো নিরর্থক কথা শুনতে পাবে وَّلَا كِذّٰبًا আর না কোনো মিথ্যা কথা।

৩৬. جَزَآءً এটা প্রতিদান مِّنْ رَّبِّكَ عَطَآءً حِسَابًا আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হতে যথাযোগ্য পুরস্কার ।

৩৭. رَّبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا যিনি আসমানসমূহ ও জমিন এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থিত সমস্ত বস্তুর মালিক الرَّحْمٰنِ পরম দয়ালু لَا يَمْلِكُوْنَ مِنْهُ خِطَابًا তার পক্ষ হতে অধিকার কারো হবে না যে, আবেদন-নিবেদন করে।

৩৮. يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَالْمَلٰٓئِكَةُ صَفًّا যেদিন সমস্ত প্রাণী ও ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হবে لَا يَتَكَلَّمُوْنَ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ কেউই কথা বলতে পারবে না সে ব্যক্তি ব্যতীত, যাকে দয়াময় [আল্লাহ] অনুমতি দিবেন وَقَالَ صَوَابًا এবং সে কথাও ঠিক ঠিক বলবে।

৩৯. এটা সুনিশ্চিত দিন, অতএব যার ইচ্ছা সে তার প্রতিপালকের নিকট আশ্রয়স্থল গ্রহণ করুক।

৪০. আমি তোমাদেরকে এক আসন্ন আজাবের ভয় প্রদর্শন করলাম, যেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের ঐ কৃতকর্মসমূহ প্রত্যক্ষ করবে, যা সে স্বহস্তে করেছে, আর কাফের বলবে, হায়! আমি যদি মৃত্তিকা হয়ে যেতাম।

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৯. ذٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ এটা সুনিশ্চিত দিন فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ مَاٰبًا অতএব যার ইচ্ছা সে তার প্রতিপালকের নিকট আশ্রয়স্থল গ্রহণ করুক।

৪০. اِنَّآ اَنْذَرْنٰكُمْ عَذَابًا قَرِيْبًا আমি তোমাদেরকে এক আসন্ন আজাবের ভয় প্রদর্শন করলাম يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدٰهُ যেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের ঐ কৃতকর্মসমূহ প্রত্যক্ষ করবে, যা সে স্বহস্তে করেছে وَيَقُوْلُ الْكٰفِرُ আর কাফের বলবে يٰلَيْتَنِيْ كُنْتُ تُرٰبًا হায়! আমি যদি মৃত্তিকা হয়ে যেতাম।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : অত্র সূরার নাম 'আন-নাবা'। সূরার দ্বিতীয় আয়াতের عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيْمِ-এর মধ্য হতে اَلنَّبَاُ শব্দকে কেন্দ্র করেই اَلنَّبَاُ নামকরণ করা হয়েছে। 'নাবা' শব্দটির অর্থ সংবাদ বা খবর। এ সূরায় কিয়ামত ও পরকাল সম্পর্কিত বিভিন্ন সংবাদ দেওয়া হয়েছে, তাই এ কারণে اَلنَّبَاُ নামকরণ যথার্থ হয়েছে। এ সূরাকে عَمَّ ও عَمَّ يَتَسَآءَلُوْنَ এবং 'তাসাওল' ও বলা হয়। এতে ২টি রুকু', ৪০টি আয়াত, ১৩৭টি শব্দ এবং ৬৯০টি অক্ষর রয়েছে। –[খাযেন, কাবীর, নূরুল কুরআন]

সূরাটির মূলকথা ও আলোচ্য বিষয় : আলোচ্য সূরাটিতে প্রধানত কিয়ামতের কথা উল্লিখিত হয়েছে। এর পূর্ববর্তী সূরা আল-মুরসালাতে'ও অনুরূপভাবে পরকাল ও কিয়ামতের কথা আলোচিত হয়েছে। এ সূরার প্রথম অংশে নাবায়ে আজীম বা কিয়ামতের ভয়াবহতা বর্ণনা করা হয়েছে। এর সমর্থনে পরবর্তী ৬ হতে ১৩ আয়াত পর্যন্ত আল্লাহর সৃষ্টি-নৈপুণ্যের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। অতঃপর নাবায়ে আজীম-এর বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে ১৭ হতে ২০ আয়াতে। কিয়ামতের পরে দোজখবাসী ও বেহেশতবাসীদের পর্যায়ক্রমে শাস্তি ও পুরস্কারের কথা বর্ণনা করে উপসংহারে হাশরের ময়দানে অবিশ্বাসীদের অনুশোচনার কথা উল্লিখিত হয়েছে।

এ সূরায় বলা হয়েছে– পরকালের কথা শুনেত পেয়ে মক্কাবাসীরা শহরের প্রতিটি অলিতে-গলিতে আলোচনা সমালোচনা শুরু করেছে। তাই সূরার প্রথম বাক্যেই সেদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অতঃপর পরকালে অবিশ্বাসীদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে। তোমরা কি এ পৃথিবী ও এ জমিনকে দেখতে পাও না? একে তো আমিই তোমাদের শয্যারূপে বানিয়ে দিয়েছি। এ সুউচ্চ পর্বতমালা কি তোমাদের দৃষ্টিতে পড়ে না? একে আমিই খুঁটির মতো মাটিতে পুঁতে রেখেছি। তোমরা কি নিজেদের ব্যাপারে ভেবে দেখ না? আমিই তোমাদেরকে জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছি। তোমাদের নিদ্রাকে শান্তির বাহন হিসেবে সৃষ্টি করেছি। রাতকে আচ্ছাদনকারী এবং দিনকে জীবিকা অর্জনের উপায় বানিয়ে দিয়েছি। সুদৃঢ় সপ্ত আকাশ এবং আলো ও তাপ প্রদানকারী উজ্জ্বল সূর্য সৃষ্টি করেছি। আকাশে ভাসমান মেঘ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করেছি এবং ঐ বৃষ্টির পানির দ্বারা তোমাদের জন্য শস্য, শাক-সবজি ও ঘন বাগ-বাগিচা সৃষ্টি করেছি। এটা কি তোমাদের বোধগম্য হয় না? আমি যদি এ সমস্ত কর্মকাণ্ড করতে পারি তবে এ সৃষ্টিকে ধ্বংস করে আবার পুনঃ সৃষ্টি করতে পারবো না– এটা তোমরা কিভাবে ধারণা কর? এ বিশ্বজগতের যাবতীয় সৃষ্টি লক্ষ্যহীন নয়। সৃষ্টিলোকের এ বিরাট কারখানা মূলত মানবজাতির কল্যাণের জন্যই পরিপূর্ণ বুদ্ধিমাত্তা ও সূক্ষ্ম জ্ঞানশীলতা দ্বারা তৈরি করা হয়েছে। তাই মানবজাতিকে এর উৎকৃষ্ট ব্যবহারের প্রচুর ক্ষমতাও দেওয়া হয়েছে। অথচ মানুষ যথেচ্ছভাবে এসব কিছুর ভোগ-ব্যবহার করবে, আর সৃষ্টিকর্তার আদেশ নিষেধ মানবে না, ভালো কাজের জন্য পুরস্কার এবং মন্দ কাজের জন্য শাস্তি দেওয়া হবে না, তা কেমন করে বোধগম্য হতে পারে?

এ সমস্ত যুক্তি-প্রমাণের পরে বলিষ্ঠ ভাষায় বলা হয়েছে যে, শেষ বিচারের দিন নিঃসন্দেহে যথাসময়ে তোমাদেরকে উপস্থিত করা হবে। তোমরা যে যেখানে বা যখনই মৃত্যুবরণ করে থাক না কেন, সেদিন শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়ার সাথে সাথে দলে দলে পুনরুত্থান করে তোমাদেরকে মহান আল্লাহর দরবারে হাজির করা হবে। সে দিন আকাশসমূহের দ্বার খুলে দেওয়া হবে এবং পাহাড়-পর্বতগুলো স্থানচ্যুত হয়ে ছিন্নভিন্ন বালুকণায় পরিণত হবে। পুনরুত্থানের পরে অবিশ্বাসী ও বিশ্বাসীদের পরিণাম সম্পর্কে বলা হয়েছে– যারা আল্লাহদ্রোহী তাদের জন্য জাহান্নাম হবে ঘাঁটি বিশেষ। অনন্তকাল তারা জাহান্নামে অবস্থান করবে। তৃষ্ণায় তারা ঠাণ্ডা পানীয়ের স্বাদ আস্বাদন করতে পারবে না। শাস্তিস্বরূপ অসহনীয় গরম পানীয় ও পুঁজ পরিবেশন করা হবে। যেহেতু তারা হিসাব-নিকাশের ভবিষ্যদ্বাণীকে তোয়াক্কা করেনি; বরং মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিয়েছিল। পক্ষান্তরে ঈমানদারদের পুরস্কার সম্পর্কে পরবর্তী আয়াতসমূহে বলা হয়েছে যে, নিঃসন্দেহে মুত্তাকীগণ সফলকাম হবে। তাদেরকে বাগ-বাগিচা, আঙ্গুর সমবয়স্কা যুবতী নারী এবং উপচে পড়া পানপাত্র প্রদান করা হবে। অনুরূপভাবে আরো বিচিত্র রকমের আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা করা হবে।

শেষ দিকের আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলার আদালতের চিত্র পেশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, ঐ দিন জীবাত্মাসমূহ ও ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকেবে। আল্লাহর হুকুম ব্যতীত কেউ কোনো কথা বলতে পারবে না। যা বলবে তাও যথার্থ বলবে। উপসংহারে বলা হয়েছে যে, কিয়ামতের আগমন সম্পর্কে আগাম যে খবর দেওয়া হয়েছে তা সন্দেহাতীতভাবে সত্য। যার ইচ্ছা সে দিনটির সত্যতা স্বীকার করে আল্লাহর পথ অবলম্বন করতে পারে। এ সর্তকবাণী শুনেও যারা কিয়ামতকে অস্বীকার করবে, তাদের যাবতীয় কৃতকর্ম তাদের চোখের সামনে উপস্থাপন করা হবে। তখন অনুতাপ করা ছাড়া আর তাদের কোনো উপায় থাকবে না। তখন তারা অনুতাপ করে বলবে, হায়! আমরা যদি দুনিয়াতে সৃষ্টি না হতাম, অথবা পশু-পাখি ও বৃক্ষ-লতার মতো মাটির সাথে মিশে একাকার হয়ে যেতাম তবে কতইনা ভালো হতো। –[খাযেন, কাবীর]

عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ .... الاية

শানে নুযূল : হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুয়ত প্রাপ্ত হওয়ার পর লোকদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করেন, এবং কেয়ামতের বিষয়ে আলোচনা করেন। ফলে কাফেরেরা একে অপরকে কেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করত যে, কেয়ামত কবে সংঘটিত হবে? তাদের এই প্রশ্নাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াতসমূহ নাজিল হয়। –[সূত্র- লুবাব উর্দু কানযুন নুকূল : ১০৬]

عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ –অর্থাৎ তারা কি বিষয়ে পরস্পরে জিজ্ঞাসাবাদ করছে? অতঃপর আল্লাহ নিজেই উত্তর দিয়েছেন : نَبَأٌ- عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ শব্দের অর্থ মহাখবর। এখানে মহাখবর বলে কেয়ামত বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, মক্কাবাসী কাফেররা কিয়ামত সম্পর্কে সওয়াল-জবাব করছে, যে সম্পর্কে তাদের মধ্যে মতভেদ আছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, কুরআনের অবতরণ শুরু হলে মক্কার কাফেররা তাদের বৈঠকে বসে এ সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করত। কুরআনে কিয়ামতের আলোচনাকে অত্যাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে অথচ এটা তাদের মতে একেবারেই অসম্ভব ছিল। তাই এ সম্পর্কে অধিক পরিমাণে আলোচনা চলত। কেউ একে সত্য মনে করত এবং কেউ অস্বীকার করত। তাই আলোচ্য সূরার শুরুতে কাফেরদের অবস্থা উল্লেখ করে কিয়ামতের সম্ভাব্যতা আলোচনা করা হয়েছে। কেয়ামত সম্পর্কে কাফেররা যেসব খটকা ও আপত্তি উত্থাপন করত, সেগুলোর জবাব দেওয়া হয়েছে?। কোনো কোনো তাফসীরকারক বলেন যে, কাফেরদের এই সওয়াল ও জবাব তথ্যানুসন্ধানের উদ্দেশ্য নয় বরং ঠাট্টা-বিদ্রুপ করার উদ্দেশ্যে ছিল। কুরআন পাক এর জবাবে একই বাক্যকে তাকীদের জন্য দুবার উল্লেখ করেছে– كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ –অর্থাৎ কিয়ামতের বিষয়টি সওয়াল-জবাব, আলোচনা ও গবেষণার মাধ্যমে হৃদয়ঙ্গম হবে না বরং এটা যখন সামনে উপস্থিত হবে, তখনই এর স্বরূপ জানা যাবে। এর নিশ্চিত বিষয়ে বিতর্ক, প্রশ্ন ও অস্বীকারের অবকাশ নেই। অতিসত্বর অর্থাৎ মৃত্যুর পর পরজগতের বস্তুসমূহ দৃষ্টিতে ভেসে উঠবে এবং সেখানকার ভয়াবহ দৃশ্যাবলী দৃষ্টিগোচর হয়ে যাবে। তখন কিয়ামতের স্বরূপ খুলে যাবে। এরপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অপার শক্তি, প্রজ্ঞা ও কারিগরির কয়েকটি দৃশ্য উল্লেখ করেছেন, যদ্দারা প্রমাণিত হয় যে, তিনি সমগ্র বিশ্বকে একবার ধ্বংস করে পুনরায় তদ্রুপই সৃষ্টি করতে সক্ষম। এ সম্পর্কে ভূমি ও পর্বতমালা সৃষ্টি এবং নর ও নারীর যুগলের আকারে মানব সৃষ্টির কথা বর্ণনা করেছেন। এরপর মানুষের সুখ, স্বাস্থ্য ও কাজ-কারবারের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির কথা উল্লেখ করেছেন। এ ব্যাপারে একটি বাক্য এই যে, – وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا – سُبَاتٌ শব্দটি سَبْتٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ কমানো, কর্তন করা। নিদ্রা মানুষের চিন্তাভাবনাকে কর্তন করে তার অন্তর ও মস্তিষ্ককে এমন স্বস্তি ও শান্তি দান করে, যার বিকল্প দুনিয়ার কোনো শান্তি হতে পারে না। একারণেই কেউ কেউ سُبَاتٌ-এর অর্থ করেছেন সুখ, আরাম।

নিদ্রা খুব বড় নিয়ামত : এখানে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে যুগলাকারে সৃষ্টি করার কথা উল্লেখ করার পর তার আরামের সব উপকরণের মধ্যে থেকে বিশেষভাবে নিদ্রার কথা উল্লেখ করেছেন। চিন্তা করলে বোঝা যায় এটি এক বিরাট নিয়ামত।

নিদ্রাই মানুষের সব সুখের ভিত্তি। এই নিয়ামতটি আল্লাহ তা'আলা সমগ্র সৃষ্টির জন্য ব্যাপক করে দিয়েছেন। ফলে ধনী-দরিদ্র, পণ্ডিত-মুর্খ, রাজা-প্রজা সবাই এই ধন সমহারে একই সময়ে প্রাপ্ত হয় বরং বিশ্বের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, গরীব ও শ্রমজীবী মানুষ এ নিয়ামত যে পরিমাণে লাভ করে, ধনাঢ্য ও ঐশ্বর্যশালীদের ভাগ্যে তা ঘটে না। তাদের কাছে সুখের সামগ্রী, সুখের বাসগৃহ, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষ, নরম তোশক, নরম বালিশ ইত্যাদি সবই থাকে, যা দরিদ্ররা কদাচ চোখেও দেখে না কিন্তু নিদ্রা এসব তোশক, বালিশ অথবা প্রাসাদবাংলোর অনুগামী নয়। এটা তো আল্লাহ তা'আলার এমন এক নিয়ামত, যা সরাসরি তাঁর কাছ থেকেই আসে। মাঝে মাঝে নিঃস্ব সম্বলহীন ব্যক্তিকে কোনো শয্যা-বালিশ ছাড়াই উন্মুক্ত আকাশের নিচে এ নিয়ামত প্রচুর পরিমাণে দান করা হয় এবং মাঝে মাঝে সম্পদশালীদেরকে দান করা হয় না। তারা নিদ্রার বটিকা সেবন করে এ নিয়ামত লাভ করে এবং প্রায় সময়ে এই বটিকাও নিদ্রা আনয়নে ব্যর্থ হয়। চিন্তা করুন, এর চেয়ে বড় নিয়ামত এই যে, এই নিদ্রা কেবল বিনা মূল্যে ও বিনা পরিশ্রমেই মানুষ, জন্তু নির্বিশেষে সবাইকে দান করা হয়নি বরং আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অপার অনুগ্রহে এই নিয়ামতটি বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন। মানুষ মাঝে মাঝে কাজের আধিক্যের দরুন সারারাত্রি জেগে কাজ করতে চায় কিন্তু আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ তার উপর জোরেজবরে নিদ্রা চাপিয়ে দেন, যাতে সারা দিনের ক্লান্তি দূর হয়ে যায় এবং সে আরও অধিক কাজের শক্তি অর্জন করে। অতঃপর এই নিদ্রারূপী মহা অবদানের পরিশিষ্ট বর্ণনা করা হয়েছে যে, وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا –অর্থাৎ আমি রাত্রিকে করেছি আবরণ। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, স্বভাবত মানুষের নিদ্রা তখন আসে, যখন আলো অধিক না থাকে, চতুর্দিকে নীরবতা বিরাজ করে এবং হট্টগোল না থাকে। আল্লাহ তা'আলা রাত্রিকে আবরণ বলে ইশারা করেছেন যে, তিনি তোমাদেরকে কেবল নিদ্রাই দেননি বরং সারা বিশ্বে নিদ্রার উপযুক্ত পরিবেশও সৃষ্টি করেছেন। প্রথমে রাত্রির অন্ধকার সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর সমস্ত মানুষ ও জন্তু-জানোয়ারকে একই সময়ে নিদ্রা দিয়েছেন। বলা বাহুল্য, সবাই একযোগে নিদ্রা গেলেই চারদিকে পূর্ণ নিস্তব্ধতা বিরাজ করবে। নতুবা অনান্য কাজের ন্যায় নিদ্রার সময়ও যদি বিভিন্ন মানুষের জন্য বিভিন্নরূপ হতো; তবে কেউ পূর্ণ শান্তিতে নিদ্রা যেতে পারত না।

এরপর বলা হয়েছে وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا –মানুষের সুখ ও শান্তির জন্য প্রয়োজনীয় আহার্য দ্রব্যদির সরবরাহও নিতান্ত জরুরি। নতুবা নিদ্রা সাক্ষাৎ মৃত্যু হয়ে যাবে। যদি সারাক্ষণ রাত্রিই থাকত এবং মানুষ কেবল নিদ্রাই যেত, তবে এসব দ্রব্য কিরূপে অর্জিত হতো। এর জন্য চেষ্টা, পরিশ্রম ও দৌড়াদৌড়ি জরুরি, যা আলোকোজ্জ্বল পরিবেশে সম্ভবপর। তাই বলা হয়েছে : তোমাদের সুখকে পূর্ণতা দান করার জন্য আমি কেবল রাত্রি ও তার অন্ধকার সৃষ্টি করিনি বরং একটি আলোকোজ্জ্বল দিনও দিয়েছি, যাতে তোমরা কাজ-কারবার করে জীবিকা নির্বাহ করতে পার। অতঃপর মানুষের সুখের সেই উপকরণ উল্লেখ করা হয়েছে, যা আকাশের সাথে সম্পর্কযুক্ত। তন্মধ্যে সর্ববৃহৎ উপকারি বস্তু হচ্ছে সূর্যের আলো। বলা হয়েছে : وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا –অর্থাৎ আমি একটি প্রোজ্জ্বল প্রদীপ সৃষ্টি করেছি। এরপর মানুষের সুখের প্রয়োজনে আকাশের নিচে সৃজিত বস্তুসমূহের মধ্যে সর্বাধিক প্রয়োজনীয় বস্তু মেঘমালার কথা উল্লেখ হয়েছে।

وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا – مُعْصِرَاتٌ শব্দটি مُعْصِرَةٌ-এর বহুবচন। এর অর্থ জলে পরিপূর্ণ মেঘমালা। এ থেকে জানা গেল যে, মেঘমালা থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হয়। কোনো কোনো আয়াতে আকাশ থেকে বর্ষিত হওয়ার কথা আছে। তাতে আকাশের অর্থ আকাশের শূন্যমণ্ডল। এই অর্থে سَمَاءٌ শব্দের ব্যবহার কুরআনে প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। এছাড়া একথাও বলা যায় যে, কোনো সময় সরাসরি আকাশ থেকেও বৃষ্টি বর্ষিত হতে পারে। এটা অস্বীকার করার কোনো কারণ নেই। এসব কারিগরি ও নিয়ামত উল্লেখ করার পর আবার আসল বিষয়বস্তু কিয়ামতের প্রসঙ্গ আনা হয়েছে।

إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا –অর্থাৎ বিচারের দিন মানে কিয়ামত নির্দিষ্ট সময়ে আসবে। তখন এই বিশ্ব বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেওয়া হবে অন্যান্য আয়াত থেকে জানা যায় যে, দুইবার শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেওয়া হবে। প্রথম ফুঁৎকারের সাথে সাথে সমগ্র বিশ্ব ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে এবং দ্বিতীয় ফুঁৎকারের সাথে সাথে পুনরায় জীবিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। এসময় বিশ্বের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সব মানুষ দলে দলে আল্লাহর সকাশে উপস্থিত হবে। হযরত আবূ যর গিফারী (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : কিয়ামতের দিন মানুষ তিন দলে বিভক্ত হবে। একদল উদরপূর্তি ও পোশাক পরিহিত অবস্থায় সওয়ারীতে সওয়ার হয়ে হাশরের ময়দানে আসবে। দ্বিতীয় দল পায়ে হেঁটে আগমন করবে এবং তৃতীয় দলকে উপুড় অবস্থায় পায়ে ধরে টেনে হাশরের ময়দানে আনা হবে। –(মাজহারী) কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আয়াতের তাফসীরে দশ দল হবে বলা হয়েছে। কেউ কেউ বলেন : নিজ নিজ কর্ম ও চরিত্রের দিক দিয়ে তাদের দল হবে অসংখ্য। এসব উক্তির মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই।

وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا –অর্থাৎ যে পাহাড়কে আজ অটল ও অনড় হওয়ার ব্যাপারে দৃষ্টান্তস্বরূপ পেশ করা হয় সেই পাহাড় স্ব-স্থান থেকে বিচ্যুত হয়ে তুলার ন্যায় উড়তে থাকবে। سَرَابٌ-এর শাব্দিক অর্থ চলে যাওয়া। মরুভূমির যে

বালুকাস্তূপ দূর থেকে পানির ন্যায় ঝলময় করতে থাকে তাকেও سَرَابٌ-এ কারণে বলা হয় যে, কাছে গেলেই তা অদৃশ্য হয়ে যায়। –[সেহাহ, রাগেব]

اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا –যে স্থানে বসে কারো দেখাশোনা অথবা অপেক্ষা করা হয়, তাকে مِرْصَادًا বলা হয়। এখানে জাহান্নামের অর্থ জাহান্নামের পুল তথা পুলসিরাত। সওয়াবদাতা ও শাস্তিদাতা উভয় প্রকার ফেরেশতা এখানে অপেক্ষা করবে। জাহান্নামীদেরকে শাস্তিদাতা ফেরেশতারা পাকড়াও করবে এবং জান্নাতীদেরকে ছওয়াবতাদা ফেরেশতারা তাদের গন্তব্য স্থানে নিয়ে যাবে। –[মাজহারী]

হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন : জাহান্নামের পুলের উপর পরিদর্শক ফেরেশতাগণের চৌকি থাকবে। যার কাছে জান্নাতের ছাড়পত্র থাকবে, তাকে অগ্রে যেতে দেওয়া হবে এবং যার কাছে এই ছাড়পত্র থাকবে না তাকে আটকিয়ে রাখা হবে। –[কুরতুবী]

لِلطَّاغِيْنَ مَاٰبًا –এটা اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا-এর দ্বিতীয় خَبَرٌ উভয় বাক্যের অর্থ এই যে, প্রত্যেক সৎ ও অসৎকে জাহান্নামের পুলের উপর দিয়ে যেতে হবে এবং জাহান্নাম সীমালঙ্ঘনকারীদের আবাসস্থল। طَاغِيْنَ শব্দটি طَاغِىْ-এর বহুবচন এবং طُغْيَانٌ থেকে উদ্ভূত। অর্থাৎ অবাধ্যতা করা। طَاغِىْ এমন লোককে বলা হয়। যে অবাধ্যতায় সীমা ছাড়িয়ে যায়। ঈমান না থাকলেও এটা হতে পারে। তাই এখানে طَاغِىْ অর্থ কাফের। কু-বিশ্বাসী, প্রথভ্রষ্ট মুসলমানদের সেই দলও অর্থ হতে পারে, যারা কুরআন ও সুন্নাহ্‌র সীমা ডিঙ্গিয়ে যায়। যদিও প্রকাশ্যভাবে কুফর অবলম্বন করে না, যেমন রাফেজী, খারেজী ও মুতাজিলা সম্প্রদায়! –[মাজহারী]

لَا بِثِيْنَ فِيْهَاۤ اَحْقَابًا – لَا بِثِيْنَ শব্দটি لَا بِثٌ-এর বহুবচন। অর্থ অবস্থানকারী। اَحْقَابٌ শব্দটি حَقْبَةٌ-এর বহুবচন। অর্থ সুদীর্ঘ সময়। ইবনে জারীর হযরত আলী (রা.) থেকে এর পরিমাণ আশি বছর বর্ণনা করেছেন, যার প্রত্যেক বছর বার মাসের, প্রত্যেক মাস ত্রিশ দিনের এবং প্রত্যেক দিন এক হাজার বছরের। এভাবে প্রায় দুই কোটি আটাশি বছরে এক حُقْبَةٌ হয়। অপর কয়েকজন সাহাবী এর পরিমান আশির পরিবর্তে সত্তর বছর বলেছেন। অবশিষ্ট হিসাব পূর্বের ন্যায়। –(ইবনে কাছীর) কিন্তু মুসনাদে বাজযারে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বর্ণিত রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :

لَا يَخْرُجُ اَحَدُكُمْ مِنَ النَّارِ حَتّٰى يَمْكُثَ فِيْهِ اَحْقَابًا وَالْحَقْبُ بِضْعٌ وَثَمَانُوْنَ سَنَةً كُلُّ سَنَةٍ ثَلٰثُ مِاَةٍ وَّسِتُّوْنَ يَوْمًا مِمَّا تَعُدُّوْنَ.

তোমাদের যাকে গোনাহের সাজায় জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, তাকে কয়েক হুকবা জাহান্নামে অবস্থান না করা পর্যন্ত বের করা হবে না। এক হুকবা আশি বছরের কিছু বেশী এবং একবছর তোমাদের বর্তমান হিসাব অনুযায়ী ৩৬০ দিনের হবে। –[মাযহারী]

এ হাদীসটি আলোচ্য আয়াতের তাফসীর না হলেও এতে اَحْقَابٌ শব্দের অর্থ বর্ণিত আছে। অপরদিকে কয়েকজন সাহাবী থেকে এ সম্পর্কে প্রত্যেক দিন এক হাজার বছরের বর্ণিত আছে। যদি এটাও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উক্তি হয়, তবে এর অর্থ এই যে, হাদীসের মধ্যে বিরোধ আছে। এই বিরোধ আসা অবস্থায় কোনো এক অর্থ নিশ্চিতভাবে নেওয়া যায় না। তবে উভয় হাদীসের অভিন্ন বিষয়বস্তু এই যে, হুকবা অত্যন্ত দীর্ঘ সময়কে বলা হয়। একারণেই ইমাম বায়যাভী اَحْقَابٌ-এর অর্থ করেছেন دُهُوْرًا مُتَتَابِعَةً অর্থাৎ উপর্যুপরি বহুবছর।

জাহান্নামে চিরকাল বসবাস সম্পর্কে আপত্তি ও জবাব : হুক্‌বার পরিমাণ যত দীর্ঘই হোক, তা সীমিত, অনন্ত নয়। এ থেকে বোঝা যায় যে, এই সুদীর্ঘ সময়ের পর কাফের জাহান্নামীরাও জাহান্নাম থেকে বের হয়ে আসবে। অথচ এটা কুরআনের অন্যান্য সুস্পষ্ট আয়াতের পরিপন্থি। যে সব আয়াতে خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًا বলা হয়েছে। এর ভিত্তিতেই উম্মতের ইজ্‌মা হয়েছে যে, জাহান্নাম কখনও ধ্বংস হবে না এবং কাফেররা কখনো জাহান্নাম থেকে বের হবে না।

সুদ্দী হযরত মুররা ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন : যদি জাহান্নামীদেরকে সংবাদ দেওয়া হয় যে, জাহান্নামে তাদের অবস্থান সারা বিশ্বের কংকরের সমান হবে, তবে এতেও তারা আনন্দিত হবে। কারণ, কংকরের সংখ্যা অগণিত হলেও সীমিত। ফলে একদিন না একদিন আজাব থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে। যদি একই সংবাদ জান্নাতীদেরকে দেওয়া হয়, তবে তারা দুঃখিত হবে। কেননা, কংকরের সমান মেয়াদ যত দীর্ঘই হোক না কেন, সেই মেয়াদের পর তারা জান্নাত থেকে বহিষ্কৃতি হবে। –[মাজহারী]

সারকথা, আলোচ্য আয়াতের اَحْقَابًا শব্দ থেকে বোঝা যায় যে, কয়েক হুক্‌বা অতিবাহিত হলে পরে জাহান্নামীরা জাহান্নাম থেকে বের হয়ে আসবে। এই অর্থ অন্য সব আয়াত, হাদীস ও ইজমার পরিপন্থি হওয়ার কারণে ধর্তব্য নয়। কেননা, এই আয়াতে কয়েক হুক্‌বার পরে কি হবে, তার বর্ণনা নেই। এতে শধু উল্লেখ আছে যে, তারা কয়েক হুক্‌বা জাহান্নামে থাকবে। এ থেকে জরুরি হয় না যে, কয়েক হুক্‌বার পর জাহান্নাম থাকবে না অথবা তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনা হবে। এ কারণেই হযরত হাসান (রা.) এ আয়াতের তাফসীরে বলেন : আয়াতে আল্লাহ তা'আলা

জাহান্নামীদের জন্য কোনো সময় ও মেয়াদ নির্দিষ্ট করেননি, যদ্বারা তাদের জাহান্নাম থেকে বের হওয়া বোঝা যেতে পারে বরং উদ্দেশ্য এই যে, যখন সময়ের এক অংশ অতিবাহিত হয়ে যাবে, তখন অন্য অংশ শুরু হয়ে যাবে। এমনিভাবে তৃতীয় চতুর্থ অংশ করে অনন্তকাল পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকবে। সাঈদ ইবনে জুবায়ের (র.) কাতাদাহ্ থেকেও এই তাফসীরই বর্ণনা করেছেন যে, أَحْقَابُ -এর অর্থ অনন্তকাল অর্থাৎ এক হুক্‌বা শেষ হলে দ্বিতীয় হুক্‌বা শুরু হবে এবং এই ধারা অনন্তকাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। –[ইবনে কাছীর]

ইবনে কাছীর এখানে وَيَحْتَمِلُ বলে আরও একটি সম্ভাবনা বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, طَاغِيْنَ -এর অর্থ কাফের না নেওয়া বরং মুসলমানদের এমন দল বোঝানো, যারা বাতিল আকীদার কারণে পথভ্রষ্ট দল বলে গণ্য হয়। হাদীসবিদগণের পরিভাষায় তাদেরকে প্রবৃত্তিবাদী বলা হয়। এমতাবস্থায় আয়াতের সারমর্ম হবে এই যে, যে সব কালেমা উচ্চারণকারী তাওহীদ পন্থি লোক বাতিল আকীদা রাখার কারণে কুফরের সীমা পর্যন্ত পৌছে গিয়েছে কিন্তু প্রকাশ্য কাফের নয়, তারা কয়েক হুক্‌বা পর্যন্ত জাহান্নামে থাকার পর অবশেষে কালেমার বরকতে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে। কুরতুবী এই ব্যাখ্যাকে সম্ভবপর আখ্যা দিয়েছেন এবং মাজহারী এই ব্যাখ্যাই পছন্দ করেছেন। তিনি এর সমর্থনে মুসনাদে বাজযার বর্ণিত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর পূর্বোল্লেখিত হাদীসও পেশ করেছেন, যাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, কয়েক হুক্‌বা অতিবাহিত হওয়ার পর তারা জাহান্নাত থেকে নিষ্কৃত পাবে।

কিন্তু আবূ হাইয়ান বলেন যে, পরবর্তী আয়াত إِنَّهُمْ كَانُوْا لَا يَرْجُوْنَ حِسَابًا وَّكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا كِذَّابًا -এই সম্ভাবনাকে নাকচ করে দেয় যে, طَاغِيْنَ -এর অর্থ এখানে তাওহীদ পন্থি ভ্রান্তদল হবে। কেননা, এই আয়াতে কিয়ামত অস্বীকার এবং আয়াতসমূহকে মিথ্যারোপ করার কথা। পরিষ্কার বর্ণিত আছে। এমনিভাবে আবূ হাইয়ান মুকাতিলের এই উক্তিই প্রত্যাখ্যান করেছেন যে, এই আয়াতটি মানসূখ বা রহিত।

একদল তাফসীরকারক আলোচ্য আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে তৃতীয় একটি সম্ভাবনা বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, এই আয়াতের পরবর্তী لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا بَرْدًا وَّلَا شَرَابًا اِلَّا حَمِيْمًا وَّغَسَّاقًا আয়াতটি أَحْقَابًا থেকে جُمْلَةٌ حَالِيَةٌ হবে। আয়াতের অর্থ এই হবে যে, সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত তারা কোনো শীতলদ্রব্য ও পানীয় আস্বাদন করবে না ফুটন্ত পানি ও পুঁজ ব্যতীত। এরপর সুদীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার পর তাদের এই দুরবস্থার পরিবর্তন হতে পারে এবং অন্য প্রকার আজাব হতে পারে। حَمِيْمٌ এমন ফুটন্ত পানি, যা মুখের কাছে আনা হলে গোশ্ত জ্বলে যাবে এবং পেটে গেলে ভিতরের নাড়িভূঁড়ি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। غَسَّاقٌ –জাহান্নামীদের ক্ষতস্থান থেকে নির্গত রক্ত, পুঁজ ইত্যাদি। جَزَاءً وِّفَاقًا –অর্থাৎ জাহান্নামে তাদেরকে যে শাস্তি দেওয়া হবে, তা ন্যায় ও ইনসাফের দৃষ্টিতে তাদের বাতিল বিশ্বাস ও কু-কর্মের অনুরূপ হবে। এতে কোন বাড়াবাড়ি হবে না।

فَذُوْقُوْا فَلَنْ نَّزِيْدَكُمْ اِلَّا عَذَابًا –অর্থাৎ তোমরা দুনিয়াতে যেমন কুফর ও অস্বীকারে কেবল বেড়েই চলেছ– বাধ্যতামূলক মৃত্যুর সম্মুখীন না হলে আরও বেড়েই চলতে, তেমনিভাবে আজ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের আজাব কেবল বৃদ্ধিই করবেন। অতঃপর কাফেরদের বিপরীতে মু'মিন মুত্তাকীদের ছওয়াব ও জান্নাতের নিয়ামত বর্ণনা করা হয়েছে। এসব নিয়ামত বর্ণনা করে বলা হয়েছে :

جَزَاءً مِّنْ رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا –অর্থাৎ জান্নাতের এসব নেয়ামত মু'মিনদের প্রতিদান এবং আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে পর্যাপ্ত দান। এখানে জান্নাতের নিয়ামতসমূহকে প্রথমে কর্মের প্রতিদান ও পরে আল্লাহর দান বলা হয়েছে। বাহ্যত উভয়ের মধ্যে বৈপরীত্য আছে। কেননা, কোনো কিছুর বিনিময়ে যা দেওয়া হয়, তাকে প্রতিদান এবং বিনিময় ছাড়াই পুরস্কারস্বরূপ যা দেওয়া হয়, তাকে দান বলা হয়। কুরআন পাক উভয় শব্দকে একত্র করে ইঙ্গিত করেছে যে, জান্নাতে প্রবেশাধিকার এবং জান্নাতের নিয়ামতসমূহ কেবল আকার ও বাহ্যিক দিক দিয়েই জান্নাতীদের কর্মের প্রতিদান–প্রকৃত প্রস্তাবে এগুলো খাঁটি আল্লাহর দান। কেননা, মানুষের কাজকর্ম তো সেসব নিয়ামতেরই প্রতিদান হতে পারে না, যেগুলো তাকে দুনিয়াতে দান করা হয়। পরকালীন নিয়ামত অর্জন তো শুধু আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ, কৃপা ও দান বৈ নয়। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : কোনো ব্যক্তি শুধু তার কর্মের জোরে জান্নাতে যেতে পারে না যে পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ না হয়। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন : আপনিও কি? উত্তর হলো : হ্যাঁ, আমিও আমার কর্মের জোরে জান্নাতে যেতে পারি না। حِسَابًا শব্দে অর্থ দ্বিবিধ হতে পারে– এক. এমন দান যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সমস্ত প্রয়োজনের জন্য যথেষ্ট ও পর্যাপ্ত হয়। এই অর্থ নিম্নোক্ত ব্যবহার থেকে নেওয়া হয়েছে– اَحْسَبْتُ فُلَانًا اَىْ اَعْطَيْتُهُ مَا يَكْفِيْهِ حَتّٰى قَالَ حَسْبِىْ অর্থাৎ আমি তাকে এতটুকু দিলাম, যা তার প্রয়োজনের জন্য যথেষ্ট; এমনকি, সে বলে উঠল, ব্যস, এতটুকু আমার জন্য যথেষ্ট। দ্বিতীয় অর্থ মোকাবিলা করণ। তাফসীরবিদগণের কেউ কেউ প্রথম অর্থ এবং

কেউ কেউ দ্বিতীয় অর্থ নিয়েছেন। হযরত মুজাহিদ (র.) দ্বিতীয় অর্থ নিয়ে আয়াতের অর্থ করেছেন– এই দান জান্নাতীদেরকে তাদের আমলের হিসেবে দেওয়া হবে। আন্তরিকতা ও কর্ম সৌন্দর্যের হিসেবে এই দানের স্তর নির্ধারিত হবে। উদাহরণত সহীহ্ হাদীসসমূহে উম্মতের কর্মের মোকাবিলায় সাহাবায়ে কেরামের কর্মের এই মর্যাদা নিরূপিত হয়েছে যে, সাহাবী আল্লাহর পথে একমুদ (প্রায় এক সের) ব্যয় করলে তা অন্যের ওহুদ পর্বত সমান ব্যয়েরও অধিক মর্যাদাশীল হবে।

لَا يَمْلِكُوْنَ مِنْهُ خِطَابًا –এই বাক্য পূর্বের جَزَآءً مِّنْ رَّبِّكَ বাক্যের সাথেও সম্পর্কযুক্ত হতে পারে। অর্থ এই হবে যে, আল্লাহ তা'আলা যাকে যেরূপ ছওয়াব দান করবেন, তাতে কারও কথা বলার সাধ্য হবে না যে, অমুককে কম এবং অমুককে বেশি কেন দেওয়া হলো? যদি একে আলাদা বাক্য সাব্যস্ত করা হয়; তবে উদ্দেশ্য এই যে, হাশরের ময়দানে আল্লাহর অনুমতি ব্যতিরেকে কারও ভাষণ দেওয়ার ক্ষমতা হবে না। এই অনুমতি কোনো কোনো স্থানে হবে এবং কোনো কোনো স্থানে হবে না।

يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَالْمَلٰٓئِكَةُ صَفًّا –কোনো কোনো তাফসীরকারের মতে 'রূহ্' বলে এখানে হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে বুঝানো হয়েছে। তাঁর মাহাত্ম্য প্রকাশ করার সাধারণ উদ্দেশ্যে ফেরেশতাগণের পূর্বে তাঁর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, রূহ আল্লাহ তা'আলার এক বিরাট বাহিনী, যারা ফেরেশতা নয় তাদের মাথা ও হস্তপদ আছে। এই তাফসীর অনুযায়ী দুটি সারি হবে– একটি রূহের ও অপরটি ফেরেশতাগণের।

يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ –বাহ্যত এই দিন হচ্ছে কিয়ামতের দিন। হাশরে প্রত্যেকেই তার কাজকর্ম স্বচক্ষে দেখতে পাবে হয় আমলনামা হাতে আসার ফলে দেখবে, না হয় কাজকর্ম সব সশরীরী হয়ে সামনে এসে যাবে। কোনো কোনো হাদীস দ্বারা এ কথা প্রমাণিত আছে। এ দিন মৃত্যুর দিনও হতে পারে। এমতাবস্থায় স্বীয় কাজকর্ম দেখা কবরে ও বরযখে হতে পারে। –[মাযহারী]

وَيَقُوْلُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِىْ كُنْتُ تُرَابًا –হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, কিয়ামতের দিন সমগ্র ভূপৃষ্ঠ এক সমতল ভূমি হয়ে যাবে। এতে মানব, জিন, গৃহপালিত জন্তু ও বন্য জন্তু সবাইকে একত্র করা হবে। জন্তুদের মধ্যে কেউ দুনিয়াতে অন্য জন্তুর উপর জুলুম করে থাকলে তার কাছ থেকে প্রতিশোধ নেওয়া হবে। এমনকি কোনো শিংবিশিষ্ট ছাগল কোনো শিংবিহীন ছাগলকে মেরে থাকলে সেদিন তারও প্রতিশোধ নেওয়া হবে। এই কর্ম সমাপ্ত হলে সব জন্তুকে আদেশ করা হবে : মাটি হয়ে যাও। তখন সব মাটি হয়ে যাবে। এই দৃশ্য দেখে কাফেররা আকাঙ্ক্ষা করবে- হায়! আমরাও যদি মাটি হয়ে যেতাম। এরূপ হলে আমরা হিসাব-নিকাশ ও জাহান্নামের আজাব থেকে বেঁচে যেতাম।

শব্দ বিশ্লেষণ :

مَهْدًا : ইসম, একবচন; বহুবচনে مُهُدٌ অর্থ : বিছানা। উদ্দেশ্য ঠিকানা,

اَوْتَادًا : বহুবচন; একবচনে وَتَدٌ অর্থ : কীলক, পেরেক।

مَعَاشًا : ইসম ও মাসদার। জীবন-জীবিকা। عَيْشٌ কোনো প্রাণী বা মানুষের জীবন। حَيَاتٌ শব্দটি ব্যাপক। আল্লাহ, ফেরেশতা, মানুষ ও প্রাণীজগত সকলের জন্যই এটি ব্যবহৃত হয়। অন্য مَعَاشٌ ও عَيْشٌ -এর ব্যবহার শুধু প্রাণী ও মানুষের জন্য হয়। مَعِيْشَةٌ জীবনোপকরণ। বহুবচন مَعَايِشُ আসে। বাব ضَرَبَ।

وَهَّاجًا : মুবালাগার সীগাহ। মাসদার وَهْجٌ মূলবর্ণ (و - ه - ج) জিনস مثال واوى অর্থ– উজ্জ্বল প্রদীপ, অনেক আলো, বিরাট উজ্জ্বল। মুফাসসিরগণের বড় এক জামাত লিখেছেন, سِرَاجًا وَّهَّاجًا -এর দ্বারা সূর্য উদ্দেশ্য।

اَلْمُعْصِرَاتِ : সীগাহ جمع مؤنث اسم فاعل বহছ اسم فاعل বাব إِفْعَال মাসদার اَلْإِعْصَارُ মূলবর্ণ (ع - ص - ر) জিনস صحيح অর্থ– পানিপূর্ণ মেঘমালা নিংড়ানো।

ثَجَّاجًا : মুবালাগার সীগাহ। মাসদার ثَجٌّ বাব نَصَرَ মূলবর্ণ (ث - ج - ج) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– প্রচুর বারি, প্রবলভাবে বৃষ্টি হওয়া।

اَلْفَافًا : অর্থ– মিশ্রিত। মিলিত। ঘন গাছপালা। اَخْيَافٌ ও اَوْزَاعٌ -এর মতো এরও কোনো একবচন হয় না।

سَرَابًا : চকচকে বালি, মরীচিকা। গ্রীষ্মের উত্তপ্ত দুপুরে সূর্যের তীব্র তাপদাহে মরুভূমিতে যে বালুকারাশিকে পানির মত প্রবাহিত হচ্ছে মনে হয়, তাকে মরীচিকা বলা হয়। অনেকেই পানি মনে করে দৌড়ে সেখানে গিয়ে ধোঁকা খায়, এজন্য سَرَابٌ শব্দটি ধোঁকা ও প্রতারণার ক্ষেত্রে প্রবাদ হয়ে গেছে।

اَحْقَابًا : حُقُبٌ-এর বহুবচন। অর্থ– যুগ যুগ ধরে, অখণ্ডকাল حُقُبٌ (কাফে পেশ) সময়কে বলা হয় আর حُقْبٌ (কাফ সাকিন) এক নির্ধারিত সময়ের নাম। তবে এর সময় নির্ধারণের ব্যাপারে ভাষাবিদগণ মতানৈক্য করেছেন। কারো মতে আশিবছর আবার কারো মতে সত্তর বছর। কারো মতে তিনশ বছর। কারো মতে চল্লিশ বছর আবার কেউ ত্রিশ হাজার বছরের কথাও বলেছেন। মুফাসসিরগণের মধ্যে ইমাম কাতাদাহ্ (র.) স্পষ্ট ব্যাখ্যা করেছেন, حُقْبٌ-এর দ্বারা অনির্ধারিত সময় উদ্দেশ্য। তবে আল্লাহ ছাড়া কেউ তা বলতে পারবে না।

غَسَّاقًا : জাহান্নামীদের শরীর থেকে প্রবাহিত পুঁজ বা রক্ত। (জালালাইন) হিম বা প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পানি। (মু'জামুল কুরআন) এক হাদীসে এসেছে, غَسَّاقٌ এর এক অংশ যদি দুনিয়ায় ঢেলে দেওয়া হয়, তাহলে দুনিয়াবাসীদের মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে যাবে; সবাই পাগলামী করতে থাকবে।

مَفَازًا : ইসমে মাসদার। অর্থ– সফল হওয়া। অথবা যরফে মাকান। সফলতার স্থান, সফলতা।

كَوَاعِبَ : كَاعِبٌ-এর বহুবচন, অর্থ– অভিজ্ঞতাহীন, যুবতী কুমারী মেয়ে, যার স্তনগুলো খুব স্ফীত كَعَبَتِ الْجَارِيَةُ মেয়েটির স্তন স্ফীত হয়ে উঠেছে। মাসদার : كَعَابَةٌ، كُعُوْبًا، كُعُوْبَةٌ : نَصَرَ বাবে (লাজেম) كَعَبَ الْاِنَاءَ كَعْبًا ضَرَبَ মুতা'আদ্দী। বাব : فتح প্লেটকে ভরে দিয়েছে। (কামূস)

اَتْرَابًا : শব্দটি تِرْبٌ-এর বহুবচন অর্থ– সমবয়স্কা নারী, নবযুবতীগণ।

دِهَاقًا : ইসম, সিফাত। পরিপূর্ণ, দীপ্তিমান। কানায় কানায় পূর্ণ পেয়ালা। মাসদার : دَهْقٌ বাব : فَتَحَ মূলবর্ণ (د-ه-ق) জিনস صحيح অর্থ– কানায় কানায় পূর্ণ করা, ঢেলে দেওয়া, কেটে ফেলা, আঘাত করা।

صَوَابًا : সত্য, সঠিক কথা, সঠিক, সরল, অকপট, ন্যায়। ভুলের বিপরীত।

مَاٰبًا : ইসমে যরফ, শরণাপন্ন হওয়ার স্থান। মাসদার– مَاٰبٌ এটি ইসমে যরফে জামান ও মাকান উভয়টিই হয়। অর্থাৎ শরণাপন্ন বা প্রত্যাবর্তিত হওয়া। প্রত্যাবর্তিত হওয়ার স্থান/কাল। মাসদার– اِيَابًا ও اَوْبٌ আসে। বাব– نَصَرَ

اَلْكَافِرُ : সীগাহ بحث اسم فاعل واحد مذكر বাব نَصَرَ মাসদার كُفْرٌ মূলবর্ণ (ك - ف - ر) জিনস صحيح অর্থ– অস্বীকারকারী। ইসলাম ও শরিয়ত অস্বীকারকারী।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاۤءً ثَجَّاجًا : এখানে واو টি আতেফা, আর اَنْزَلْنَا ফে'ল ও ফায়েল আর مِنَ الْمُعْصِرَاتِ টা اَنْزَلْنَا-এর সাথে متعلق হয়েছে; আর مَاۤءً হলো مفعول به এবং ثَجَّاجًا হলো مَاۤءً-এর সিফত। [ই'রাবুল কুরআন ৮ম খণ্ড: পৃ. ১৯৬]

اِنَّاۤ اَنْذَرْنٰكُمْ عَذَابًا قَرِيْبًا : এখানে اِنَّ হরফে মুশাববাহ বিল ফে'ল نَا হলো اسم ان আর اَنْذَرْنٰكُمْ বাক্যটি خبر ان আর اَنْذَرْنَا হলো ফে'ল ও ফায়েল এবং كُمْ হলো مفعول به اول আর عَذَابًا হলো দ্বিতীয় مفعول به আর قَرِيْبًا হলো عَذَابًا-এর সিফত। [ই'রাবুল কুরআন ৮ম খণ্ড: পৃ. ২০৩]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

অনুবাদ	আয়াত
১. কসম সে ফেরেশতাগণের যারা কঠোরভাবে [কাফেরদের] প্রাণ বের করে।	وَالنّٰزِعٰتِ غَرْقًا ﴿١﴾
২. এবং যারা [মুমিনদের] মৃদুভাবে বন্ধন খুলে দেয়।	وَّالنّٰشِطٰتِ نَشْطًا ﴿٢﴾
৩. এবং যারা তীব্রগতিতে সাঁতরিয়ে চলে।	وَّالسّٰبِحٰتِ سَبْحًا ﴿٣﴾
৪. অনন্তর যারা দ্রুতবেগে দৌড়ায়।	فَالسّٰبِقٰتِ سَبْقًا ﴿٤﴾
৫. অতঃপর প্রত্যেক কাজ নিয়ন্ত্রণ করে।	فَالْمُدَبِّرٰتِ اَمْرًا ﴿٥﴾
৬. কেয়ামত নিশ্চয় আসবে, যেদিন কম্পনকারী বস্তু প্রকম্পিত করবে।	يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ﴿٦﴾
৭. যার পর আর এক পশ্চাৎগামী বস্তু এসে পড়বে।	تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ﴿٧﴾
৮. সেদিন অনেক অন্তর ধড়ফড় করতে থাকবে।	قُلُوْبٌ يَّوْمَئِذٍ وَّاجِفَةٌ ﴿٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. وَالنّٰزِعٰتِ غَرْقًا কসম সে ফেরেশতাগণের যারা কঠোরভাবে [কাফেরদের] প্রাণ বের করে।

২. وَّالنّٰشِطٰتِ এবং শপথ তাদের যারা বন্ধন খুলে দেয় نَشْطًا মৃদুভাবে।

৩. وَّالسّٰبِحٰتِ এবং যারা সাঁতরিয়ে চলে سَبْحًا তীব্রগতিতে।

৪. فَالسّٰبِقٰتِ অনন্তর যারা দৌড়ায় سَبْقًا দ্রুতবেগে।

৫. فَالْمُدَبِّرٰتِ অতঃপর নিয়ন্ত্রণ করে اَمْرًا প্রত্যেক কাজ

৬. يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ কেয়ামত নিশ্চয় আসবে যেদিন কম্পনকারী বস্তু প্রকম্পিত করবে।

৭. تَتْبَعُهَا যার পর এসে পড়বে الرَّادِفَةُ আর এক পশ্চাৎগামী বস্তু।

৮. قُلُوْبٌ يَّوْمَئِذٍ সেদিন অনেক অন্তর وَّاجِفَةٌ ধড়ফড় করতে থাকবে।

অনুবাদ	আয়াত
৯. তাদের নয়নসমূহ ভয়ে অবনত হবে।	أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ﴿٩﴾
১০. তারা বলে, আমরা কি আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে আসব?	يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ ﴿١٠﴾
১১. তবে কি আমরা যখন চূর্ণ-বিচূর্ণ হাড়ে পরিণত হয়ে যাব, তখনো [পুনর্জীবনে] প্রত্যাবর্তিত হব।	أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً ﴿١١﴾
১২. তারা বলতে লাগল যে, এমতাবস্থায় এ প্রত্যাবর্তন [আমাদের জন্য] বড়ই ক্ষতিকর হবে।	قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ﴿١٢﴾
১৩. এটা তো কেবল একটি ভীষণ ধ্বনি হবে।	فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ﴿١٣﴾
১৪. যার ফলে সকলেই তৎক্ষণাৎ মাঠে এসে উপস্থিত হবে।	فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ﴿١٤﴾
১৫. আপনার নিকট কি মূসার কাহিনী পৌঁছেছে?	هَلْ أَتٰىكَ حَدِيثُ مُوسٰى ﴿١٥﴾
১৬. যখন তাকে তার প্রতিপালক এক পবিত্র প্রান্তরে অর্থাৎ তুয়ায় ডেকে বললেন।	إِذْ نَادٰهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴿١٦﴾
১৭. তুমি ফেরাউনের নিকট যাও, সে অত্যন্ত দুরন্তপনা করছে।	اِذْهَبْ إِلٰى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغٰى ﴿١٧﴾
১৮. অতঃপর তুমি (তাকে) বল, তুমি কি এটা চাও যে, সংশোধিত হয়ে যাবে।	فَقُلْ هَلْ لَّكَ إِلٰى أَنْ تَزَكّٰى ﴿١٨﴾
১৯. এবং আমি তোমাকে তোমার প্রভুর দিকে পথ প্রদর্শন করি যাতে তুমি ভয় করতে থাক।	وَأَهْدِيَكَ إِلٰى رَبِّكَ فَتَخْشٰى ﴿١٩﴾

وقف لازم

وقف لازم

وقف لازم

শাব্দিক অনুবাদ :

৯. أَبْصَارُهَا তাদের নয়নসমূহ خَاشِعَةٌ ভয়ে অবনত হবে।
১০. يَقُولُونَ তারা বলে أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ আমরা কি আবার ফিরে আসব فِي الْحَافِرَةِ পূর্বাবস্থায়।
১১. أَإِذَا তখনো কি যখন كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً আমরা চূর্ণ-বিচূর্ণ হাড়ে পরিণত হয়ে যাব তখনো (পুনর্জীবনে) প্রত্যাবর্তিত হব।
১২. قَالُوا তারা বলতে লাগল যে تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ এমতাবস্থায় এ প্রত্যাবর্তন خَاسِرَةٌ (আমাদের জন্য) বড়ই ক্ষতিকর হবে।
১৩. فَإِنَّمَا هِيَ এটা তো কেবল زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ একটি ভীষণ ধ্বনি হবে।
১৪. فَإِذَا هُمْ যার ফলে সকলেই তৎক্ষণাৎ بِالسَّاهِرَةِ মাঠে এসে উপস্থিত হবে।
১৫. هَلْ أَتٰىكَ আপনার নিকট কি পৌঁছেছে حَدِيثُ مُوسٰى মূসার কাহিনী
১৬. إِذْ نَادٰهُ رَبُّهُ যখন তাকে তার প্রতিপালক ডেকে বললেন بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى এক পবিত্র প্রান্তরে অর্থাৎ তুয়ায়।
১৭. اِذْهَبْ إِلٰى فِرْعَوْنَ তুমি ফেরাউনের নিকট যাও إِنَّهُ طَغٰى সে অত্যন্ত দুরন্তপনা করছে।
১৮. فَقُلْ অতঃপর তুমি (তাকে) বল هَلْ لَّكَ إِلٰى তুমি কি এটা চাও যে أَنْ تَزَكّٰى সংশোধিত হয়ে যাবে।
১৯. وَأَهْدِيَكَ إِلٰى رَبِّكَ এবং আমি তোমাকে তোমার প্রভুর দিকে পথ প্রদর্শন করি فَتَخْشٰى যাতে তুমি ভয় করতে থাক।

২০. অনন্তর তিনি তাকে মহা নিদর্শন দেখালেন।	فَأَرٰىهُ الْاٰيَةَ الْكُبْرٰى ﴿٢٠﴾
২১. কিন্তু সে [এটা] অবিশ্বাস করল এবং কথা মানল না।	فَكَذَّبَ وَعَصٰى ﴿٢١﴾
২২. অনন্তর সে পৃথক হয়ে [তার বিরুদ্ধে] প্রচেষ্টা করতে লাগল।	ثُمَّ اَدْبَرَ يَسْعٰى ﴿٢٢﴾
২৩. অতঃপর সে [লোকদেরকে] সমবেত করল, তৎপর সে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করল।	فَحَشَرَ فَنَادٰى ﴿٢٣﴾
২৪. এবং বলল, "আমিই তোমাদের শ্রেষ্ঠ প্রতিপালক"।	فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى ﴿٢٤﴾
২৫. অনন্তর আল্লাহ তাকে আখেরাতের ও দুনিয়ার আজাবে পাকড়াও করলেন।	فَاَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْاٰخِرَةِ وَالْاُوْلٰى ﴿٢٥﴾
২৬. নিশ্চয় তাতে সে ব্যক্তির জন্য বড় শিক্ষণীয় রয়েছে, যে [আল্লাহকে] ভয় করে।	اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى ﴿٢٦﴾
২৭. আচ্ছা! তোমাদেরকে সৃষ্টি করাই কি অধিক কঠিন কাজ, নাকি আসমান? আল্লাহই এটা নির্মাণ করেছেন।	ءَاَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَآءُ ۚ بَنٰهَا ﴿٢٧﴾
২৮. [এরূপে যে,] তার ছাদ উচ্চ করেছেন এবং তাকে সুবিন্যস্তও করেছেন।	رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوّٰىهَا ﴿٢٨﴾
২৯. আর তার রাত্রকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করেছেন এবং তার দিনকে প্রকাশ করেছেন।	وَاَغْطَشَ لَيْلَهَا وَاَخْرَجَ ضُحٰىهَا ﴿٢٩﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২০. فَأَرٰىهُ অনন্তর তিনি তাকে দেখালেন الْاٰيَةَ الْكُبْرٰى মহানিদর্শন।

২১. فَكَذَّبَ কিন্তু সে [এটা] অবিশ্বাস করল وَعَصٰى এবং কথা মানল না।

২২. ثُمَّ অনন্তর اَدْبَرَ পৃথক হয়ে (তার বিরুদ্ধে) يَسْعٰى প্রচেষ্টা করতে লাগল

২৩. فَحَشَرَ অতঃপর সে সমবেত করল فَنَادٰى তৎপর সে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করল।

২৪. فَقَالَ এবং বলল اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى আমিই তোমাদের শ্রেষ্ঠ প্রতিপালক।

২৫. فَاَخَذَهُ اللّٰهُ অনন্তর আল্লাহ তাকে পাকড়াও করলেন نَكَالَ الْاٰخِرَةِ وَالْاُوْلٰى আখেরাতের ও দুনিয়ার আজাবে।

২৬. اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ নিশ্চয় তাতে রয়েছে لَعِبْرَةً বড় শিক্ষণীয় لِّمَنْ يَّخْشٰى সে ব্যক্তির জন্য, যে ভয় করে।

২৭. ءَاَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا আচ্ছা! তোমাদেরকে সৃষ্টি করাই কি অধিক কঠিন কাজ اَمِ السَّمَآءُ ۚ بَنٰهَا নাকি আসমান? আল্লাহই এটা নির্মাণ করেছেন।

২৮. رَفَعَ سَمْكَهَا তার ছাদ উচ্চ করেছেন فَسَوّٰىهَا এবং তাকে সুবিন্যস্তও করেছেন।

২৯. وَاَغْطَشَ لَيْلَهَا আর তার রাত্রকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করেছেন وَاَخْرَجَ ضُحٰىهَا এবং তার দিনকে প্রকাশ করেছেন।

৩০. আর তারপর জমিনকে বিছিয়ে দিয়েছেন।	وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰىهَا ﴿٣٠﴾
৩১. তা হতে তার পানি ও তৃণ বের করেছেন।	اَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعٰىهَا ﴿٣١﴾
৩২. এবং পর্বতসমূহকে দৃঢ়ভাবে স্থাপন করেছেন।	وَالْجِبَالَ اَرْسٰىهَا ﴿٣٢﴾
৩৩. তোমাদের এবং তোমাদের পশুগুলোর জন্য উপকারস্বরূপ।	مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ ﴿٣٣﴾
৩৪. অনন্তর যখন সে মহাসংকট উপস্থিত হবে।	فَاِذَا جَآءَتِ الطَّآمَّةُ الْكُبْرٰى ﴿٣٤﴾
৩৫. অর্থাৎ যেদিন মানুষ নিজেদের কৃতকর্ম স্মরণ করবে।	يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ مَا سَعٰى ﴿٣٥﴾
৩৬. আর দর্শনকারীদের সম্মুখে দোজখ প্রকাশ করা হবে।	وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِمَنْ يَّرٰى ﴿٣٦﴾
৩৭. অনন্তর সেদিন এ অবস্থা হবে যে, যে ব্যক্তি অবাধ্যতাচরণ করে থাকবে।	فَاَمَّا مَنْ طَغٰى ﴿٣٧﴾
৩৮. এবং পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার প্রদান করে থাকবে।	وَاٰثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ﴿٣٨﴾
৩৯. সুতরাং দোজখই হবে তার বাসস্থান।	فَاِنَّ الْجَحِيْمَ هِيَ الْمَاْوٰى ﴿٣٩﴾
৪০. আর যে নিজের প্রভুর সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করেছে [অর্থাৎ পরলোকে বিশ্বাস থাকার দরুন বিচার-দিবস হতে ভীত রয়েছে] এবং আত্মাকে প্রবৃত্তি হতে নিবৃত্ত রেখেছে।	وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ﴿٤٠﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩০. وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ আর তারপর জমিনকে دَحٰىهَا বিছিয়ে দিয়েছেন।

৩১. اَخْرَجَ مِنْهَا তা হতে বের করেছেন مَآءَهَا وَمَرْعٰىهَا তার পানি ও তৃণ।

৩২. وَالْجِبَالَ এবং পর্বতসমূহকে اَرْسٰىهَا দৃঢ়ভাবে স্থাপন করেছেন।

৩৩. مَتَاعًا উপকারস্বরূপ لَّكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ তোমাদের এবং তোমাদের পশুগুলোর জন্য।

৩৪. فَاِذَا جَآءَتِ অনন্তর যখন উপস্থিত হবে الطَّآمَّةُ الْكُبْرٰى সে মহাসংকট।

৩৫. يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ যেদিন মানুষ স্মরণ করবে مَا سَعٰى নিজেদের কৃতকর্ম।

৩৬. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ আর দোজখ প্রকাশ করা হবে لِمَنْ يَّرٰى দর্শনকারীদের সম্মুখে।

৩৭. فَاَمَّا مَنْ অনন্তর সেদিন এ অবস্থা হবে যে ব্যক্তি طَغٰى অবাধ্যতাচরণ করে থাকবে।

৩৮. وَاٰثَرَ এবং অগ্রাধিকার প্রদান করে থাকবে الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا পার্থিব জীবনকে।

৩৯. فَاِنَّ الْجَحِيْمَ هِيَ সুতরাং দোজখই হবে الْمَاْوٰى তার বাসস্থান।

৪০. وَاَمَّا مَنْ خَافَ আর যে ব্যক্তি ভয় করেছে مَقَامَ رَبِّهٖ নিজের প্রভুর সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়াকে وَنَهَى النَّفْسَ এবং আত্মাকে নিবৃত্ত রেখেছে عَنِ الْهَوٰى প্রবৃত্তি হতে।

৪১. তবে নিশ্চয় বেহেশতই তার বাসস্থান।	فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاْوٰى ﴿٤١﴾
৪২. তারা আপনাকে কেয়ামত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে যে, তা কখন সংঘটিত হবে।	يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰىهَا ﴿٤٢﴾
৪৩. তা বর্ণনা করার সাথে আপনার কী সম্পর্ক?	فِيْمَ اَنْتَ مِنْ ذِكْرٰىهَا ﴿٤٣﴾
৪৪. তা আপনার প্রতিপালকের উপরই নির্ভর করে।	اِلٰى رَبِّكَ مُنْتَهٰىهَا ﴿٤٤﴾
৪৫. আপনি তো কেবল ঐ ব্যক্তিরই ভয় প্রদর্শনকারী, যে তাকে ভয় করে।	اِنَّمَاۤ اَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَّخْشٰىهَا ﴿٤٥﴾
৪৬. [কাফেরদের হাবভাবে বুঝা যায়, তারা যেন কিয়ামতের আগমন দ্রুত কামনা করছে, কিন্তু] যেদিন তারা তা দেখতে পাবে, তখন এরূপ মনে করবে, যেন তারা পৃথিবীতে মাত্র একসন্ধ্যা অথবা একপ্রভাত অবস্থান করেছে।	كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوْۤا اِلَّا عَشِيَّةً اَوْ ضُحٰىهَا ﴿٤٦﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৪১. فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ তবে নিশ্চয় বেহেশতই الْمَاْوٰى তার বাসস্থান।

৪২. يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ তারা আপনাকে কিয়ামত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে যে اَيَّانَ مُرْسٰىهَا তা কখন সংঘটিত হবে।

৪৩. فِيْمَ اَنْتَ আপনার কী সম্পর্ক مِنْ ذِكْرٰىهَا তা বর্ণনা করার সাথে

৪৪. اِلٰى رَبِّكَ আপনার প্রতিপালকের উপরই مُنْتَهٰىهَا তা নির্ভর করে।

৪৫. اِنَّمَاۤ اَنْتَ مُنْذِرُ আপনি তো কেবল ভয় প্রদর্শনকারী مَنْ يَّخْشٰىهَا ঐ ব্যক্তিরই, যে তাকে ভয় করে।

৪৬. كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا যেদিন তারা তা দেখতে পাবে (তখন এরূপ মনে করবে,) যেন لَمْ يَلْبَثُوْۤا اِلَّا তারা (পৃথিবীতে) অবস্থান করেছে কেবলমাত্র عَشِيَّةً اَوْ ضُحٰىهَا একসন্ধ্যা অথবা একপ্রভাত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : اَلنّٰزِعٰت শব্দ نَزْعٌ হতে নিষ্পন্ন। نَازِعٌ-এর বহুবচন نازعات-এর আভিধানিক অর্থ : আকর্ষণকারীগণ, সজোরে কোনো বস্তুকে টেনে আনয়নকারীগণ। সূরাটি نازعات শব্দ যোগে শুরু করা হেতু এর নামকরণ হয়েছে اَلنّٰزِعٰت। এর ছাড়া এ সূরার আরো কয়েকটি নাম রয়েছে। যেমন– تَامَّة ও سَاهِرَة এ সূরায় ২টি রুকূ', ৪৬ টি আয়াত, ১৭৩টি বাক্য এবং ৯৫৩টি অক্ষর রয়েছে।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে যোগসূত্র : পূর্ববর্তী সূরায় কিয়ামত দিবসের আজাব সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে, আর এ সূরায় আল্লাহ তা'আলা শপথ করে বলেছেন যে, কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী।

পূর্ববর্তী সূরায় কিয়ামতকে যারা অস্বীকার করে তাদের শাস্তির ঘোষণা এসেছে, আর অত্র সূরায় শপথ করে বলা হয়েছে যে, কিয়ামত অত্যাসন্ন, এর পাশাপাশি এ কথাও ইরশাদ হয়েছে যে, কিভাবে আল্লাহ তা'আলা হককে বাতিলের উপর বিজয়ী করেন। এ মর্মে হযরত মূসা (আ.)-এর ঘটনার বর্ণনা রয়েছে যে, কিভাবে হযরত মূসা (আ.) অহংকারী ফেরাউনকে সত্য গ্রহণের দাওয়াত দিয়েছেন এবং কিভাবে আল্লাহ তা'আলা ফেরাউনকে ধ্বংস করেছেন। –[বাহ্‌রুল মুহীত]

শানে নুযূল : হিজরতের পূর্বে যেসব অকাট্য প্রমাণসহ আয়াত নাজিল হয়েছিল মক্কার হঠকারী কাফেররা নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধির ফলে ঐ সকল আয়াত বিশ্বাস করত না এবং এর প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপও করত না। অথচ কিয়ামতের ধ্বংস-প্রলয়

সম্পর্কে বারবার তাদেরকে বলা হচ্ছিল। আল্লাহর অসীম কুদরতের কথাও তাদের নিকট বারবার বিবৃত হচ্ছিল। তবু তারা বলত কিয়ামত হবেই এ কথাটা আমাদের বোধগম্য হচ্ছে না। তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ সূরা নাজিল করে কিয়ামতের সম্ভাবনাকে পূর্ণ নিশ্চয়তার সাথে প্রমাণ করেন। –[মা'আলিম]

সূরাটির ফজিলত : সূরা আন-নাযি'আত দুশমনের সামনে পাঠ করলে তার শত্রুতা এবং অনিষ্টতা থেকে রেহাই পাওয়া যায়। আর যে ব্যক্তি ঘুমের ঘোরে উক্ত সূরাটি তেলাওয়াত করতে দেখে অথবা এমনিতেই দেখে, তার অন্তর হতে সমস্ত চিন্তা-ভাবনা দূরীভূত হয়ে যায়। –[নূরুল কুলূব]

একটি দুর্বল বর্ণনায় এসেছে যে, যে ব্যক্তি সূরা আন-নাযিয়াত সর্বদা পাঠ করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করার পূর্বে কবর ও হাশরে এত আরামে রাখবেন যে, তার মনে হবে, সে যেন এই মাত্র এক ওয়াক্ত ফরজ নামাজের সময় পরিমাণ তথায় অবস্থান করেছে।

সূরাটির বিষয়বস্তু : আলোচ্য সূরায় কিয়ামত, মৃত্যুর পরবর্তী জীবন এবং এর সংশ্লিষ্ট কতিপয় অবস্থার বিবরণ পেশ করা হয়েছে। তা ছাড়া আল্লাহ তা'আলা ও তদীয় রাসূল ﷺ-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার পরিণতি সম্পর্কেও আলোকপাত করা হয়েছে। সুতরাং জান কবজকারী, আল্লাহর হুকুম অবিলম্বে পালনকারী ও আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী সমগ্র সৃষ্টিলোকের ব্যবস্থা পরিচালনাকারী ফেরেশতাদের নামে শপথ করা হয়েছে। এরূপ কথা দ্বারা নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে যে, কিয়ামত অবশ্যই হবে। মৃত্যুর পর অন্য এক জীবন অবশ্যই যাপন করতে হবে। উক্ত দু'টি বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। কেননা যেসব ফেরেশতার হাতে এখানে জান কবজ করানো হচ্ছে, তাদের হাতেই পুনরায় তাদের দেহে প্রাণের সঞ্চার করানো কঠিন কিছু নয়। সে ফেরেশতারাই সেদিন সে আল্লাহর হুকুম মোতাবেকই সমস্ত সৃষ্টি লোকের বর্তমান শৃঙ্খলা ব্যবস্থা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে নতুনভাবে অপর একটি ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারবেন। আল্লাহ তা'আলার পক্ষে তা মোটেই কঠিন নয় যে, একটি ধাক্কায় বিশ্বলোকের বর্তমান ব্যবস্থাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিবে। আর তার পুনরুজ্জীবনের জন্যও একটি ধাক্কারই প্রয়োজন মাত্র। আজ যারা এর অস্বীকার করছে তাদের চোখের সামনেই তা সংঘটিত হবে, তখন তারা ভীত-বিহ্বল ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়বে।

অতঃপর হযরত মূসা (আ.) ও ফেরাউনের ঘটনা সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে রাসূলকে অবিশ্বাসকারী, হেদায়েতকে অস্বীকারকারী এবং রাসূলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদেরকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। যদি তারা তাদের উক্ত অপকর্মসমূহ বর্জন করত হেদায়েতের পথে না আসে তাহলে তাদেরকে ফেরাউনের ন্যায় মর্মান্তিক পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে।

পুনরায় জীবিত হওয়ার দলিল পেশ করা হয়েছে। অবিশ্বাসীদের সম্বোধন করে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে– তোমাদেরকে পুনরায় জীবিত করা কঠিন কাজ; কিংবা মহাশূন্যে অসংখ্য কোটি গ্রহ-নক্ষত্রসহ বিস্তীর্ণ এ বিরাট-অসীম বিশ্বলোক সৃষ্টি করা কঠিন কাজ? যে আল্লাহর পক্ষে এ কাজটি করা কঠিন ছিল না– তাঁর পক্ষে তোমাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করা কঠিন হবে কেন? পরকাল হওয়ার সম্ভাব্যতা প্রমাণের জন্য এ অকাট্য যুক্তি একটি কার্যে সমাপ্ত করা হয়েছে। তারপর পৃথিবী এবং তাতে মানুষ ও জীব-জন্তুর জীবন যাত্রা নির্বাহের জন্য প্রদত্ত সাজ-সরঞ্জাম ও দ্রব্য-সামগ্রীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, এখানে প্রতিটি জিনিসই উদাত্ত কণ্ঠে সাক্ষ্য প্রদান করছে, এটা অতি উচ্চ কর্মকুশলতা সহকারে কোনো না কোনো উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য তৈরি করা হয়েছে। এ দৃষ্টিকোণ হতে মানুষের বিবেকের নিকট একটি অতি বড় প্রশ্ন রাখা হয়েছে। তা এই যে, এ সুবিশাল সৃষ্টিলোকে মানুষকে ক্ষমতা ইখতিয়ার দেওয়ার পর তার হিসাব-নিকাশ গ্রহণ করা অধিক যুক্তিসঙ্গত ও বিজ্ঞান সম্মত মনে হয় না। পৃথিবীতে যথেচ্ছা বিচরণ করা ও স্বেচ্ছাচারিতা করে মৃত্যুবরণ করা ও মাটির সাথে চিরতরে মিলেমিশে সম্পূর্ণ নিশ্চহ্ন হয়ে যাওয়া এবং অর্পিত ক্ষমতা ও দায়িত্ব কিভাবে প্রয়োগ করেছে, কিভাবে পালন করেছে সে বিষয়ে কোনো জিজ্ঞাসাবাদ না হওয়া অধিক বিজ্ঞানসম্মত ও যুক্তিযুক্ত মনে হয়?

উপরিউক্ত প্রশ্নের উপর কোনোরূপ আলোচনা ব্যতীতই পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে যে, আখেরাতে মানুষের স্থায়ী ফয়সালা হয়ে যাবে। আর তা এ ভিত্তিতে হবে যে, কে দুনিয়ায় আল্লাহর ইবাদতের পরিবর্তে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে এবং দুনিয়ার সুখ-শান্তি ও আরাম-বিলাসকেই মুখ্য উদ্দেশ্য হিসেবে গণ্য করেছে? পক্ষান্তরে কে স্বীয় প্রভুর সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয়ে নাফরমানদের কামনা-বাসনা ও লোভ-লালসাকে সামলিয়েছে? সুতরাং যে ব্যক্তি হঠকারিতা পরিহার করে বিশ্বাসী অন্তর নিয়ে নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ হতে চিন্তা করবে সে আপনা হতেই উপরিউক্ত প্রশ্নের জবাব পাবে। কেননা বিবেক, যুক্তি ও নৈতিকতার দৃষ্টিতে মানুষের উপর কোনো দায়িত্ব অর্পণের অর্থ এই যে, পরিশেষে তাতে এ ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে, এর হিসাব-নিকাশ দিতে হবে। এ ব্যাপারে তার সফলতার কারণে তাতে পুরস্কৃত করা হবে। পক্ষান্তরে ব্যর্থতার কারণে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে।

পরিশেষে কাফেরদের এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে যে, কিয়ামত কবে সংঘটিত হবে? জবাবের সারমর্ম এই যে, পয়গম্বরের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। পয়গম্বরের দায়িত্ব তো শুধু সতর্ক করে দেওয়া যে, সেদিন অবশ্যই আসবে।

কখন আসবে তা জানা তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। গুরুত্বের বিষয় হলো, তোমরা এর জন্য কি প্রস্তুতি গ্রহণ করেছ? সুতরাং যার মনে চায় সে একে ভয় করে নিজের চরিত্রকে সংশোধন করে নিক। আর যার ইচ্ছা সে যথেচ্ছভাবে সময় কাটিয়ে দিক। যখন বিচারের দিন সমাগত হবে, তখন যারা এ পৃথিবীর জীবনকেই একমাত্র জীবন মনে করে বসেছিল, তারা অনুভব করবে যে, দুনিয়াতে তারা মাত্র কিছুক্ষণ অবস্থান করেছিল। তখন তারা হাড়ে-হাড়ে টের পাবে যে, দুনিয়ার অল্প কয় দিনের জীবনের সুখ-শান্তির মোহে পড়ে কিভাবে ভবিষ্যতের স্থায়ী শান্তিকে খুইয়ে বসেছিল।

قَالُوْا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ (١٢)

শানে নুযূল : যখন সূরা নাযিআতের দশম আয়াত অর্থাৎ তারা বলে আমরা কি উল্টো পায়ে প্রত্যাবর্তিত হব। তখন কুরাইশরা বলতে লাগল সত্যিই যদি আমরা মৃত্যুর পর আবার জীবিত হই তাহলে আমাদের সর্বনাশ হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত নাজিল হয়। –[সূত্র- লুবাব, কানযুন নুকূল : ১০৬]

فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ (٣٧) وَاٰثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا (٣٨) فَإِنَّ الْجَحِيْمَ هِيَ الْمَأْوٰى (٣٩)

শানে নুযূল : আলোচ্য আয়াত নযর বিন হারেছ এবং তার পুত্র হারেছ বিন নযর এর সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। এবং দুনিয়া লোভী সকল কাফের সম্প্রদায়ই এ শানে নুযূলের আওতাধীন রয়েছে। –[কুরতুবী : ১৮০/১৯]

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى (٤٠) فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوٰى (٤١)

শানে নুযূল– ১ : আলোচ্য আয়াতদ্বয় হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.) ও তদ্বীয় ভাই আমের বিন উমায়ের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ (যে সীমালঙ্ঘন করে) সে হচ্ছে মুসআব বিন উমায়েরের বদর দিন স্ব-স্বীকৃত ভাই। আনসারগণ তাকে গ্রেফতার করে জিজ্ঞেস করলেন যে, তুমি কে? সে বলল, আমি মুসআব বিন উমায়েরের ভাই। সে জন্যে দড়িতে না বেঁধে তাকে সম্মান প্রদর্শন করে, তাদের সাথেই তাকে রাত্রিতে রাখেন। সকাল হলো তারা মুসআব বিন উমায়েরের নিকট এ ঘটনার বিবরণ দিলেন। তিনি বলেন, সে আমার ভাই নয়, সে তোমাদের বন্দী, তাকে বেঁধে রাখ। তার মাতা হচ্ছে মক্কানগরীর সর্বাধিক স্বর্ণ-রৌপ্য ও মাল-দৌলতের অধিকারিণী। সুতরাং তারা তাকে বেঁধে ফেলেন, অতঃপর মাতা মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়িয়ে নেয় وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ দ্বারা মুস্আব বিন উমায়েরকে বোঝানো হয়েছে। ওহুদ অভিযানের দিনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সকলেই যখন বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন, তখন তিনি নিজেকে ঢাল বানিয়ে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে হেফাজত করেছিলেন। অবশেষে তাঁর মুখে এসে তীর বেঁধে যায়। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাকে রক্তে রঞ্জিত দেখতে পান তিনি বলেন, আমি তোমাকে আল্লাহর হেফাজতে অর্পণ করলাম। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল– ২ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে অপর এক বর্ণনা রয়েছে যে, আলোচ্য আয়াতদ্বয় আবূ জাহল বিন হিশাম ও মুস্আব বিন উমায়ের (রা.) সম্পর্কে নাজিল হয়েছে।

সুদ্দী বলেন, আলোচ্য আয়াতদ্বয় হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর একটি গোলাম ছিল। সে তাঁর খাবারের আয়োজন করত। তাঁর নিকট খানা নিয়ে আসলেই জিজ্ঞেস করতেন, কোথা হতে তা সংগ্রহ করেছ? অতঃপর তিনি আহার করতেন। একদিন যখন তার নিকট খানা নিয়ে আসল, কোনো কিছু জিজ্ঞেস না করেই তিনি খানা খেয়ে ফেলেন। ফলে গোলাম তাঁকে জিজ্ঞেস করল অন্যান্য দিনের ন্যায় আজ আমাকে খাদ্যের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেননি কেন? তিনি বলেন, আমি তো ভুলে গিয়ে ছিলাম। যা হোক বলত কোথা হতে তা সংগ্রহ করলে? সে বলল, জাহেলিয়্যা যুগে আমি এক সম্প্রদায়ের জন্যে জ্যোতিষী করেছিলাম। তারা তা আমাকে দিয়েছে। তখন তিনি তৎক্ষণাৎ বমি করে তা ফেলে দিলেন। আর বললেন, হে আমার রব! আমার রক্তে তার অংশ যা রয়েছে তা আপনার ইচ্ছাধীন। তখন সেই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[কুরতুবী : ১৮১/১৯]

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسٰهَا (٤٢)

শানে নুযূল : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন যে, আলোচ্য আয়াত মক্কার মুশরিকদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে যে, মক্কার মুশরিক সম্প্রদায়ের লোকেরা বিদ্রূপাত্মকভাবে হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করেছিল যে, কিয়ামত বা মহাপ্রলয় কখন হবে? মুশরিকদের জিজ্ঞেস করার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেছেন। –[কুরতুবী : ১৮২/১৯]

فِيْمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرٰىهَا (٤٣)

শানে নুযূল : ইবনে মারদুবীয়া হযরত আলী ইবনে আবী তালেব (রা.) হতে বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়েছিলেন। সে জিজ্ঞাসার জবাবের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। নাসায়ী, ইবনে জারীর প্রমুখ হযরত ত্বারিক বিন শিহাব (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, হযরত

রাসূলুল্লাহ ﷺ কিয়ামত সম্পর্কীয় আলোচনা বেশি বেশি করতেন। সে জন্যে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[কুরতুবী ১৮২/১৯, ফতহুল কাদীর ৩৮১/৫, তাবারী ৪৪১/১২ দূররে মানছুর [১৩১৪/৬]

وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا – نَازِعَاتٌ শব্দটি نَزْعٌ -থেকে উদ্ভূত। অর্থ কোনো কিছুকে উৎপাটন করা। اِغْرَاقٌ ও غَرْقٌ -এর অর্থ কোনো কাজ নির্মমভাবে করা। বাকপদ্ধতিতে বলা হয় : اَغْرَقَ النَّازِعُ فِى الْقَوْسِ –অর্থাৎ তীর নিক্ষেপকারী ধনুকে পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করেছে। সূরার শুরুতে ফেরেশতাগণের কতিপয় গুণ ও অবস্থা বর্ণনা করে তাদের শপথ করা হয়েছে। শপথের জবাব উহ্য রাখা হয়েছে। অর্থাৎ কিয়ামত ও হাশর-নাশর অবশ্যই হবে। ফেরেশতাগণ এখনও সারা বিশ্বের কাজকর্ম ও শৃঙ্খলা বিধানে নিয়োজিত রয়েছে কিন্তু কিয়ামতের দিন যখন বস্তুনিষ্ঠ কারণাদি নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে এবং অসাধারণ পরিস্থিতির উদ্ভব হবে, তখন ফেরেশতাগণই যাবতীয় কর্ম নির্বাহ করবে। এই সম্পর্কের কারণে সূরায় তাদের শপথ করা হয়েছে।

এস্থলে ফেরেশতাগণের পাঁচটি বিশেষণ বর্ণিত হয়েছে। এগুলো মানুষের মৃত্যু ও আত্মা বের করার সাথে সম্পর্কযুক্ত। উদ্দেশ্য, কিয়ামতের সত্যতা বর্ণনা করা। মানুষের মৃত্যু দ্বারা এই বর্ণনা শুরু করা হয়েছে। কেননা প্রত্যেক মানুষের মৃত্যু তার জন্য আংশিক কিয়ামত হয়ে থাকে। কিয়ামতের বিশ্বাসে এর প্রভাব অসাধারণ। প্রথম বিশেষণ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا অর্থাৎ নির্মমভাবে টেনে আত্মা নির্গতকারী। এখানে আজাবের সে সব ফেরেশতা বোঝানো হয়েছে, যারা কাফেরের আত্মা নির্মমভাবে বের করে। যেহেতু এই নির্মমতা আত্মিক হয়ে থাকে, তাই দর্শকদেরও এটা অনুভব করা জরুরি নয়। এ কারণেই কাফেরদের আত্মা প্রায়ই সহজে বের হতে দেখা যায় কিন্তু এটা কেবল আমাদের দেখার মধ্যেই। তার আত্মার উপর যে নির্মম কাণ্ড সংঘটিত হয়, তাকে দেখতে পারে। এটা তো আল্লাহর উক্তি থেকেই জানা যায়। তাই আলোচ্য আয়াতে খবর দেওয়া হয়েছে যে, কাফেরদের আত্মা টেনে টেনে নির্মমভাবে বের করা হয়।

দ্বিতীয় বিশেষণ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا – نَاشِطَاتٌ –শব্দটি نَشْطٌ থেকে উদ্ভূত। অর্থ বাঁধন খুলে দেওয়া। কোনো কিছুতে পানি অথবা বাতাস ভর্তি থাকলে যদি তার বাঁধন খুলে দেওয়া হয়, তবে সেই পানি বা বাতাস সহজে বের হয়ে যায়। এতে মু'মিনের আত্মা বের করাকে এর সাথে তুলনা করে বলা হয়েছে যে, যে ফেরেশতা মু'মিনের রূহ কবজ করার কাজে নিয়োজিত আছে, সে অনায়াসে রূহ কবজ করে– কঠোরতা করে না। এখানেও বিষয়টি আত্মিক বিধান কোনো মুসলমান বরং সৎ কর্মপরায়ণ ব্যক্তির মৃত্যুর সময় আত্মা বের হতে বিলম্ব হলে একথা বলা যায় না যে, তার প্রতি নির্মমতা করা হচ্ছে– যদিও শারীরিকভাবে নির্মমতা পরিদৃষ্ট হয়। প্রকৃত কারণ এই যে, কাফেরের আত্মা বের করার সময় থেকেই বরজখের আজাব সামনে এসে যায়। এতে তার আত্মা অস্থির হয়ে দেহে আত্মগোপন করতে চায়। ফেরেশতা জোরে-জবরে টানা-হেঁচড়া করে তাকে বের করে। পক্ষান্তরে মু'মিনের রূহের সামনে বরজখের ছওয়াব নিয়ামত ও সুসংবাদ ভেসে উঠে। ফলে সে দ্রুতবেগে সে দিকে যেতে চায়।

তৃতীয় বিশেষণ وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا – سَبْحٌ -এর আভিধানিক অর্থ সন্তরণ করা। এখানে উদ্দেশ্য দ্রুতবেগে চলা। নদীপথে কোনো বাধা-বিঘ্ন থাকে না। সন্তরণকারী ব্যক্তি অথবা নৌকারোহী সোজা গন্তব্য স্থানের দিকে ধাবিত হয়। এই সন্তরণকারী বিশেষণটিও মৃত্যুর ফেরেশতাগণের সাথে সম্পর্কযুক্ত। মানুষের রূহ্ কবজ করার পর তারা দ্রুত গতিতে আকাশের দিকে নিয়ে যায়।

চতুর্থ বিশেষণ فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا –উদ্দেশ্য এই যে, যে আত্মা ফেরেশতাগণের হস্তগত হয়, তাকে ভালো অথবা মন্দ ঠিকানায় পৌছানোর কাজে তারা দ্রুততায় একে অপরকে ডিঙ্গিয়ে যায়। তারা মু'মিনের আত্মাকে জান্নাতের আবহাওয়ায় ও নিয়ামতের জায়গায় এবং কাফেরের আত্মাকে জাহান্নামের আবহাওয়ায় ও আজাবের জায়গায় পৌছিয়ে দেয়।

পঞ্চম বিশেষণ فَالْمُدَبِّرَاتِ اَمْرًا মৃত্যুর ফেরেশতাদের সর্বশেষ কাজ এই যে, যে আত্মাকে ছওয়াব ও আরাম দেওয়ার আদেশ হয়, তারা তার জন্য ছওয়াব ও আরামের ব্যবস্থা করে এবং যাকে আজাব ও কষ্টে রাখার আদেশ হয়, তারা তার জন্য আজাব ও কষ্টের ব্যবস্থা করে।

কবরে ছওয়াব ও আজাব : উল্লিখিত আয়াতসমূহ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, ফেরেশতাগণ মানুষের মৃত্যুর সময় আগমন করে রূহ কবজ করে আকাশের দিকে নিয়ে যায়, ভালো অথবা মন্দ ঠিকানায় দ্রুতবেগে পৌছিয়ে দেয় ও সেখানে ছওয়াব অথবা আজাব এবং কষ্ট অথবা সুখের ব্যবস্থা করে। এই আজাব ও ছওয়াব কবরে অর্থাৎ বরজখে হবে। হাশরের আজাব ও ছওয়াব এর পরে হবে। সহীহ হাদীসসমূহে এর বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। মুসনাদে আহমদের বরাত দিয়ে মেশকাতে এতদসম্পর্কিত হযরত বারা ইবনে আজেব (রা.)-এর একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণিত আছে।

নফ্স ও রূহ্ সম্পর্কে কাযী সানাউল্লাহ (র.)-এর উপাদেয় বক্তব্য : তাফসীরে মাযহারীর বরাত দিয়ে নফ্স ও রূহের স্বরূপ সম্পর্কে কিছু আলোচনা সূরা হিজরের আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। এ সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য কাজী সানাউল্লাহ্ পানিপথী (র.) এ স্থলে লিপিবদ্ধ করেছেন। এসব তথ্যের মধ্যে অনেক প্রশ্নের সমাধান পাওয়া যায়। নিম্নে তা উদ্ধৃত করা হলো।

হযরত বারা ইবনে আজেব (রা.)-এর হাদীস থেকে জানা যায় যে, মানুষের নফ্স উপাদান চতুষ্টয় দ্বারা গঠিত একটি সূক্ষ্ম দেহ, যা তার জড় দেহে নিহিত আছে। দার্শনিক ও চিকিৎসাবিদগণ একেই রূহ্ বলে থাকেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মানুষের

রূহ্ একটি অশরীরী আল্লাহর নৈপুণ্য, যা নফসের সাথে বিশেষ সম্পর্ক রাখে এবং নফসের জীবন এর উপরই নির্ভরশীল। ফলে এটা যেন রূহের রূহ। কারণ দেহের জীবন নফ্সের উপর এবং নফ্সের জীবন এর উপর নির্ভরশীল। নফ্সের সাথে এই রূহের যে সম্পর্ক, তার স্বরূপ স্রষ্টা ব্যতীত কেউ জানে না। নফ্সকে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কুদরত দ্বারা এমন একটি আয়না সদৃশ করেছেন, যাকে সূর্যের বিপরীতে রেখে দেওয়া হয়েছে। সূর্যে আলো তাতে প্রতিফলিত হওয়ার ফলে সে নিজেও সূর্যের ন্যায় আলো বিকিরণ করে। মানুষের নফ্স যদি ওহীর শিক্ষা অনুযায়ী সাধানা ও পরিশ্রম করে তবে সে নিজেও আলোকিত হয়ে যায়। নতুবা সে জড় দেহের বিরূপ প্রভাব দ্বারা প্রভান্বিত হয়ে পড়ে। এই সূক্ষ্ম দেহ তথা নফসকেই ফেরেশতাগণ উপরে নিয়ে যায়। অতঃপর সম্মান সহকারে নিচে আনে যদি সে আলোকিত হয়ে থাকে। নতুবা তার জন্য আকাশের দ্বার খুলে না এবং উপর থেকেই নিচে সজোরে নিক্ষেপ করা হয়। এই সূক্ষ্ম দেহ সম্পর্কেই উপরিউক্ত হাদীসে আছে যে, আমি একে পৃথিবীর মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছি, এতেই ফিরিয়ে আনব এবং পুনরায় এই মাটি দ্বারাই সৃষ্টি করব। এই সূক্ষ্ম দেহই সৎকর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে আলোকিত ও সুগন্ধযুক্ত হয়ে যায় এবং কুফর ও শিরকের মাধ্যমে দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে যায়। জড় দেহের সাথে অশরীরী রূহের সম্পর্ক সূক্ষ্ম দেহ অর্থাৎ নফ্সের মাধ্যমে স্থাপিত হয়। অশরীরী রূহ্ মৃত্যুর আওতায় পড়ে না। কবরের আজাব এবং ছওয়াবও নফ্সের সাথে জড়িত থাকে। কবরের সাথে এ নফ্সেরই সম্পর্ক থাকে এবং অশরীরী রূহ্ ইল্লিয়্যীনে অবস্থান করে পরোক্ষভাবে নফ্সের ছওয়াব এবং আজাব দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। এভাবে রূহ্ কবরে থাকে কথাটি নফ্স কবরে থাকে অর্থে বিশুদ্ধ এবং নফ্স রূহ্ জগতের অথবা ইল্লিয়্যীনে থাকে কথাটি রূহ্ থাকে অর্থে নির্ভুল। এর ফলে বিভিন্ন রেওয়ায়েতের অসামঞ্জস্য দূর হয়ে যায়। অতঃপর কিয়ামতের বাস্তবতা, এতে প্রথম ফুঁৎকার দ্বারা সমগ্র বিশ্বের ধ্বংসপ্রাপ্তি, দ্বিতীয় ফুঁৎকার দ্বারা সমগ্র বিশ্বের পুনঃসৃষ্টি এবং এ সম্পর্কে কাফেরদের আপত্তি ও তার জবাব উল্লেখ করা হয়েছে। অবশেষে বলা হয়েছে : فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ - سَاهِرَةٌ অর্থ সমতল ময়দান। কিয়ামতে পুনরায় যে ভূপৃষ্ঠ সৃষ্টি করা হবে, তা সমতল হবে, এতে উঁচু-নিচু, পাহাড়-পর্বত, টিলা ইত্যাদি কিছুই থাকবে না। একেই سَاهِرَةٌ বলা হয়েছে। অতঃপর কিয়ামত অবিশ্বাসীদের হঠকারিতা ও শত্রুতার ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে মর্মপীড়া অনুভব করতেন, তা দূর করার উদ্দেশ্যে হযরত মূসা (আ.) ও ফেরাউনের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে এবং ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, শত্রুরা কেবল আপনাকেই কষ্ট দেয়নি, পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণও শত্রুদের পক্ষ থেকে দারুণ মর্মপীড়া অনুভব করেছেন। তাঁরা সবর করেছেন। অতএব, আপনারও সবর করা উচিত।

فَأَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْاٰخِرَةِ وَالْاُوْلٰى - نَكَالٌ শব্দের অর্থ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, যা দেখে অন্যরাও আতঙ্কিত হয়ে যায়। نَكَالَ الْاٰخِرَةِ হলো ফেরাউনের পরকালীন আজাব এবং نَكَالَ الْاُوْلٰى -দরিয়ায় নিমজ্জিত হওয়ার আজাব। অতঃপর মরে মাটিতে পরিণত হয়ে যাওয়ার পর পুনরুজ্জীবন কিরূপে হবে! কাফেরদের এই বিস্ময়ের জবাব দেওয়া হয়েছে। এতে নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সৃজিত বস্তুসমূহের উল্লেখ করে অনবধান মানুষকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, যে মহান সত্তা কোনোরূপ উপকরণ ও হাতিয়ার ব্যতিরেকেই এসব মহাসৃষ্টিকে প্রথমবার অস্তিত্ব দান করেছেন, তিনি যদি এগুলোর ধ্বংসপ্রাপ্তির পর পুনরায় সৃষ্টি করে দেন, তবে এতে বিস্ময়ের কি আছে? এরপর আবার কিয়ামত দিবসের কঠোরতা, প্রত্যেকের আমলনামা সামনে আসা এবং জান্নাতী ও জাহান্নামীদের ঠিকানা বর্ণনা করা হয়েছে। অবশেষে জাহান্নামী ও জান্নাতীদের বিশেষ বিশেষ আলামত উল্লিখিত হয়েছে, যা দ্বারা একজন মানুষ দুনিয়াতেই ফয়সালা করতে পারে যে, 'আইনের দৃষ্টিতে' তার ঠিকানা জান্নাত, না জাহান্নাম। আইনের দৃষ্টিতে বলার কারণ এই যে, অনেক আয়াত ও হাদীস থেকে জানা যায় যে, কারও সুপারিশে অথবা সরাসরি আল্লাহর রহমতে কোনো কোনো জাহান্নামীকে জান্নাতে পৌছানো হবে। কারও বেলায় এরূপ হলে সেটা হবে ব্যতিক্রমধর্মী আদেশ। জান্নাতে অথবা জাহান্নামে যাওয়ার আসল বিধি তাই, যা এসব আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

প্রথমে জাহান্নামীদের দুটি বিশেষ আলামত বর্ণিত হয়েছে। فَأَمَّا مَنْ طَغٰى وَاٰثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا **এক.** আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করা। **দুই.** পার্থিব জীবনকে পরকালের উপর অগ্রাধিকার দেওয়া অর্থাৎ যে কাজ অবলম্বন করলে দুনিয়াতে সুখ ও আনন্দ পাওয়া যায় কিন্তু পরকালে তার জন্য আজাব নির্দিষ্ট আছে, সে ক্ষেত্রে পরকালের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করে দুনিয়ার সুখ ও আনন্দকেই অগ্রাধিকার দেওয়া। দুনিয়াতে যে ব্যক্তির মধ্যে এই দুটি আলামত পাওয়া যায়, তার সম্পর্কে বলা হয়েছে : فَإِنَّ الْجَحِيْمَ هِيَ الْمَأْوٰى –অর্থাৎ জাহান্নামই তার ঠিকানা। এরপর জান্নাতীদেরও দুটি বিশেষ আলামত বর্ণনা করা হয়েছে : وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى **এক.** দুনিয়াতে প্রত্যেক কাজের সময় এরূপ ভয় করা যে, একদিন আল্লাহ তা'আলার সামনে উপস্থিত হয়ে এ কাজের হিসাব দিতে হবে। **দুই.** অবৈধ খেয়ালখুশি চরিতার্থ করা থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রাখা। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে এই দুটি গুণ অর্জন করতে সক্ষম হয়, কুরআন পাক তাকে সুসংবাদ দেয় : فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوٰى অর্থাৎ জান্নাতই তার ঠিকানা।

খেয়াল-খুশির বিরোধিতার তিন স্তর : আলোচ্য আয়াতে জান্নাত ঠিকানা হওয়ার দুটি শর্ত ব্যক্ত করা হয়েছে। চিন্তা করলে দেখা যায় যে, ফলাফলের দিক দিয়ে এগুলো একই শর্ত। কারণ প্রথম শর্ত হচ্ছে আল্লাহর সামনে জবাবদিহির ভয় এবং দ্বিতীয় শর্ত নিজেকে খেয়াল-খুশি থেকে বিরত রাখা। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর ভয়ই মানুষকে খেয়াল-খুশির অনুসরণ থেকে বিরত রাখে। কাযী সানাউল্লাহ পনিপথী (র.) তাফসীরে মাযহারীতে খেয়ালা-খুশির বিরোধিতার তিনটি স্তর উল্লেখ করেছেন। প্রথম স্তর এই যে, যেসব ভ্রান্ত আকীদা ও বিশ্বাস কুরআন, হাদীস এবং ইজমার বিপরীত, সেগুলো থেকে আত্মরক্ষা করা। কেউ এই স্তরে পৌঁছলেই সে সুন্নী মুসলমান কথিত হওয়ার যোগ্য হয়।

মধ্যম স্তর এই যে, কোনো গোনাহ্ করার সময় আল্লাহর সামনে জবাবদিহির কথা চিন্তা করে গোনাহ্ থেকে বিরত থাকা। সন্দেহজনক কাজ থেকেও বিরত থাকা এবং কোনো জায়েজ কাজে লিপ্ত হওয়ার ফলে কোনো নাজায়েজ কাজে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিলে সেই জায়েজ কাজ থেকে বিরত থাকাও এই মধ্যম স্তরের পরিশিষ্ট। হযরত নোমান ইবনে বশীর (রা.)-এর হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি সন্দেহজনক কাজ থেকে বিরত থাকে, সে তার আবরু ও ধর্মকে রক্ষা করে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি সন্দেহজনক কাজে লিপ্ত হয়, সে পরিশেষে হারাম কাজে লিপ্ত হয়ে যাবে। যে কাজে জায়েজ ও নাজায়েয়ের উভয়বিধ সম্ভাবনা থাকে তাকেই সন্দেহজনক কাজ বলা হয়। অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মনে সন্দেহ দেখা দেয় যে, কাজটি তার জন্য জায়েজ না নাজায়েজ। উদাহরণত জনৈক রুগ্ণ ব্যক্তি অজু করতে সক্ষম কিন্তু অজু করা তার জন্য ক্ষতিকরই হবে এ বিষয়ে পূর্ণ বিশ্বাস নেই। এমতাবস্থায় তায়াম্মুম করা জায়েজ কিনা, তা সন্দেহযুক্ত হয়ে গেল। এমনিভাবে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে পারে কিন্তু খুব বেশি কষ্ট হয়। এমতাবস্থায় বসে নামাজ পড়া জায়েজ কিনা তা সন্দিগ্ধ হয়ে গেল। এরূপ ক্ষেত্রে সন্দিগ্ধ কাজ পরিত্যাগ করে নিশ্চিত জায়েজ কাজ করা তাকওয়া এবং খেয়াল-খুশির বিরোধিতার মধ্যম স্তর।

নফসের চক্রান্ত : যেসব বিষয় প্রকাশ্য গোনাহ্, সেসব বিষয়ে খেয়াল-খুশির বিরোধিতা করার চেষ্টা করলে যে কেউ নিজে নিজেই সাফল্য অর্জন করতে পারে। কিন্তু কিছু কিছু খেয়াল–খুশি এমনও রয়েছে, যেগুলো ইবাদত ও সৎ কর্মে শামিল হয়ে যায়। রিয়া, নাম-যশ, আত্মপ্রীতি এমন সূক্ষ্ম গোনাহ্ ও খেয়ালা-খুশি, যাতে মানুষ প্রায়শই ধোঁকা খেয়ে নিজের কর্মকে সঠিক ও বিশুদ্ধ মনে করতে থাকে। বলা বাহুল্য, এই খেয়াল-খুশির বিরোধিতা করাই সর্বপ্রথম ও সর্বাধিক জরুরি। কিন্তু এ থেকে আত্মরক্ষা করার একটি মাত্র অব্যর্থ ও অমোঘ ব্যবস্থাপত্র আছে। তা এই যে, এমন শায়খে-কামেল তালাশ করে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করে তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করতে হবে, জিনি কোনো সুদক্ষ শায়খের সংসর্গে থেকে সাধনা করেছেন এবং নফসের দোষত্রুটি ও তার প্রতিকার সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করেছেন।

শায়খ-ইমাম ইয়াকূব কারখী (র.) বলেন : আমি প্রথম বয়সে কাঠমিস্ত্রী ছিলাম। আমি নিজের মধ্যে এক প্রকার শৈথিল্য ও অন্ধকার অনুভব করে কয়েকদিন রোজা রাখার ইচ্ছা করলাম, যাতে এই অন্ধকার ও শৈথিল্য দূর হয়ে যায়। ঘটনাক্রমে এই রোজা রাখা অবস্থায় আমি একদিন শায়খে-কামেল ইমাম বাহাউদ্দীন নকশবন্দী (র.)-এর খেদমতে উপস্থিত হলাম। তিনি মেহ্মানদের জন্য গৃহ থেকে আহার্য আনালেন এবং আমাকেও খাওয়ার আদেশ দিলেন। অতঃপর বললেন : যে ব্যক্তি নিজের খেয়াল-খুশির বান্দা, সে অত্যন্ত মন্দ বান্দা। এই খেয়াল-খুশি তাকে পথভ্রষ্ট করে ছাড়ে। তিনি আরও বললেন : খেয়াল-খুশির অনুগামী হয়ে যে রোজা রাখা হয়, তার চেয়ে খানা খেয়ে নেওয়াই উত্তম। এসব কথাবার্তা শুনে আমি উপলব্ধি করতে পারলাম যে, আমি আত্মপ্রীতির শিকার হচ্ছিলাম এবং শায়খ তা ধরে ফেলেছেন। তখন আমার বুঝতে বাকি রইল না যে, জিকর-আযকার ও নফল ইবাদতে কোনো শায়খে-কামেলের অনুমতি ও নির্দেশ দরকার। কেননা শায়খে-কামেল নফসের চক্রান্ত জানেন, বুঝেন। যে নফল ইবাদতে নফসের চক্রান্ত থাকবে, তিনি তা করতে নিষেধ করবেন। আমি শায়খের নিকট আরজ করলাম, হযরত, পরিভাষায় যাকে ফানাফিল্লাহ্ ও বাকাবিল্লাহ্ বলা হয়, এরূপ শায়খ পাওয়া না গেলে কি করতে হবে? শায়খ বললেন : এরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে প্রত্যেক ওয়াক্তের নামাজের পর বিশবার করে দৈনিক একশ বার ইস্তেগফার করা উচিত। কেননা রাসূলে কারীম ﷺ বলেন : আমি মাঝে মাঝে অন্তরে মলিনতা অনুভব করি। তখন আমি প্রত্যহ একশ বার এস্তেগফার অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি।

খেয়াল-খুশির বিরোধিতার তৃতীয় স্তর এই যে, অধিক জিক্রি, অধ্যবসায় ও সাধনার মাধ্যমে নফসকে এমন পবিত্র করা, যাতে খেয়াল-খুশির চিহ্নটুকুও অবশিষ্ট না থাকে। এটা বিশেষ ওলীত্বের স্তর এবং তা সেই ব্যক্তিরই হাসিল হয়, যাকে সূফী বুযুর্গগণের পরিভাষায় ফানাফিল্লাহ্ ও বাকাবিল্লাহ্ বলা হয়। এই শ্রেণির ওলীগণের সম্পর্কেই কুরআনে শয়তানকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে : اِنَّ عِبَادِىْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ –অর্থাৎ আমার বিশেষ বান্দাদের উপর তোর কোনো ক্ষমতা চলবে না। এক হাদীসেও তাঁদের সম্পর্কে বলা হয়েছে : لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهٖ –অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি ততক্ষণ কামেল মু'মিন হতে পারে না, যতক্ষণ তার খেয়াল-খুশী আমার শিক্ষার অনুসারী না হয়ে যায়। কাফেররা রাসূলুল্লাহ ﷺ

-কে কিয়ামতের নির্দিষ্ট দিন-তারিখ ও সময় বলে দেওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করত। সূরার উপসংহারে তাদের এই হঠকারিতার জবাব দেওয়া হয়েছে। জবাবের সারমর্ম এই যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অপার রহস্য বলে এ বিষয়ের জ্ঞান নিজের জন্যই নির্দিষ্ট রেখেছেন। এবং এই সংবাদ কোনো ফেরেশতা অথবা রাসূল ﷺ-কে তিনি দেন নি। কাজেই এ দাবি অসার।

শব্দ বিশ্লেষণ :

نَازِعَاتِ : সীগাহ جمع مؤنث বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ মাসদার نَزْعٌ মূলবর্ণ (ن - ز - ع) জিনস صحيح অর্থ– যে ফেরেশতাগণ প্রাণ বের করে, উৎপাটনকারী, অপসারণকারী

اَلنَّاشِطَاتِ : সীগাহ جمع مؤنث বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ মাসদার نَشْطٌ মূলবর্ণ (ن - ش - ط) জিনস صحيح অর্থ– বন্ধন মুক্তকারী

اَلسَّابِحَاتِ : সীগাহ جمع مؤنث বহছ اسم فاعل বাব فَتَحَ মাসদার سَبْحٌ মূলবর্ণ (س - ب - ح) জিনস صحيح অর্থ– তীব্র গতিতে সঞ্চরণকারী

اَلسَّابِقَاتِ : সীগাহ جمع مؤنث বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার سَبْقٌ মূলবর্ণ (س - ب - ق) জিনস صحيح অর্থ– যারা দ্রুত বেগে দৌড়ায়, অগ্রগামী, অগ্রবর্তী।

اَلْمُدَبِّرَاتِ : সীগাহ جمع مؤنث বহছ اسم فاعل বাব تَفْعِيْل মাসদার تَدْبِيْرٌ মূলবর্ণ (د - ب - ر) জিনস صحيح অর্থ– নিয়ন্ত্রণকারী, পরিণাম চিন্তাকারী, অপেক্ষা কারী।

تَرْجُفُ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার رَجْفٌ মূলবর্ণ (ر - ج - ف) জিনস صحيح অর্থ– প্রকম্পিত করবে।

اَلرَّادِفَةُ : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার رَدْفٌ মূলবর্ণ (ر - د - ف) জিনস صحيح অর্থ– পশ্চাতগামি বস্তু।

وَاجِفَةٌ : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ মাসদার وَجْفٌ মূলবর্ণ (و - ج - ف) জিনস مثال واوى অর্থ– ধড়ফড়কারী, কম্পমান।

مَرْدُوْدُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم مفعول বাব نَصَرَ মাসদার رَدٌّ মূলবর্ণ (ر - د - د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– পূর্বাবস্থায় গমনকারী।

حَافِرَةٌ : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ মাসদার حَفْرٌ মূলবর্ণ (ح - ف - ر) জিনস صحيح অর্থ– পূর্বাবস্থা, প্রারম্ভ।

سَاهِرَةٌ : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم فاعل বাব سَمِعَ মাসদার سَهْرٌ মূলবর্ণ (س - ه - ر) জিনস صحيح অর্থ– মাঠে এসে উপস্থিত হবে, জমিন, ময়দানের নরম ভূমি।

طَامَّةٌ : অর্থ– মহাসঙ্কট, মহাবিপদ, বিরাট বিশৃঙ্খলা, طَمٌّ থেকে নির্গত। যার অর্থ– গিলে ফেলা, আচ্ছন্ন করা। কোনো জিনিস এত বেড়ে যাওয়া যে, তা সর্বত্র ছেয়ে যায় কিংবা প্রবল হয়ে যায়। তাই طَامَّةٌ -এর অর্থ করা হয়, মহাবিপদ।

بُرِّزَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى مجهول বাব تَفْعِيْل মাসদার تَبْرِيْزٌ মূলবর্ণ (ب - ر - ز) জিনস صحيح অর্থ– প্রকাশ করা হবে।

نَهَى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব فَتَحَ মাসদার نَهْى মূলবর্ণ (ن - ه - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– নিবৃত্ত রেখেছে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

يَقُوْلُوْنَ اَئِنَّا لَمَرْدُوْدُوْنَ فِى الْحَافِرَةِ : এখানে يَقُوْلُوْنَ বাক্যটি উহ্য মুবতাদার খবর। يَقُوْلُوْنَ হলো ফে'ল তার যমীর হলো ফায়েল। اَئِنَّا -এর হামযাটি استفهام انكارى -এর জন্য। আর ان হলো হরফে মুশাববাহ বিল ফে'ল, আর نَا হলো اسم ان আর لَمَرْدُوْدُوْنَ হলো خبر ان আর فِى الْحَافِرَةِ টা مَرْدُوْدُوْنَ -এর সাথে متعلق হয়েছে। আবার এটা حال হওয়ার ভিত্তিতে উহ্য ফে'লের সাথে متعلق হওয়া ও জায়েজ। [ই'রাবুল কুরআন ৮ম খণ্ড: পৃ. ২০৭]

سُوْرَةُ عَبَسَ مَكِّيَّةٌ

সূরা 'আবাসা

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত– ৪২, রুকূ'– ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

অনুবাদ	আয়াত
১. রাসূল ভ্রুকুঞ্চিত করলেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন।	عَبَسَ وَتَوَلّٰٓى ①
২. এ কারণে যে, তার নিকট এক অন্ধ এসেছে।	اَنْ جَآءَهُ الْاَعْمٰى ②
৩. আপনি কি জানেন হয়তো সে [উপদেশে] সংশোধিত হতো।	وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهٗ يَزَّكّٰٓى ③
৪. অথবা নসিহত গ্রহণ করত, অনন্তর নসিহত তাকে সুফল প্রদান করত।	اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰى ④
৫. আর যে বেপরোয়া ভাব দেখায়।	اَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰى ⑤
৬. বস্তুত আপনি তার ভাবনায় পড়েছেন।	فَاَنْتَ لَهٗ تَصَدّٰى ⑥
৭. অথচ সে সংশোধিত না হলে আপনার উপর কোনো দোষারোপ নেই।	وَمَا عَلَيْكَ اَلَّا يَزَّكّٰى ⑦
৮. আর যে আপনার নিকট দৌড়ে আসে।	وَاَمَّا مَنْ جَآءَكَ يَسْعٰى ⑧

শাব্দিক অনুবাদ :

১. عَبَسَ রাসূল ভ্রুকুঞ্চিত করলেন وَتَوَلّٰٓى এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

২. اَنْ جَآءَهُ এ কারণে যে, তার নিকট এসেছে الْاَعْمٰى এক অন্ধ।

৩. وَمَا يُدْرِيْكَ আপনি কি জানেন لَعَلَّهٗ يَزَّكّٰٓى হয়তো সে [উপদেশে] সংশোধিত হতো।

৪. اَوْ يَذَّكَّرُ অথবা নসিহত গ্রহণ করত فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰى অনন্তর নসিহত তাকে সুফল প্রদান করত।

৫. اَمَّا مَنِ আর যে ব্যক্তি اسْتَغْنٰى বেপরোয়া ভাব দেখায়।

৬. فَاَنْتَ বস্তুত আপনি لَهٗ تَصَدّٰى তার ভাবনায় পড়েছেন।

৭. وَمَا عَلَيْكَ অথচ আপনার উপর কোনো দোষারোপ নেই اَلَّا يَزَّكّٰى সে সংশোধিত না হলে

৮. وَاَمَّا مَنْ আর যে ব্যক্তি جَآءَكَ আপনার নিকট আসে يَسْعٰى দৌড়ে।

অনুবাদ	আয়াত
৯. এবং সে [আল্লাহকে] ভয়ও করে।	وَهُوَ يَخْشٰى ﴿٩﴾
১০. আপনি তাকে উপেক্ষা করেন।	فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهّٰى ﴿١٠﴾
১১. কখনোই এরূপ করবেন না, কুরআন নসিহতের বাণী।	كَلَّآ اِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ﴿١١﴾
১২. সুতরাং যার ইচ্ছা সে তা গ্রহণ করুক [ইচ্ছা না হয়, না করুক]।	فَمَنْ شَآءَ ذَكَرَهٗ ﴿١٢﴾ وقف لازم
১৩. তা এমন পুস্তিকাসমূহের মধ্যে রয়েছে, যা সম্মানিত।	فِيْ صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ﴿١٣﴾
১৪. যা সমুন্নত পবিত্র।	مَّرْفُوْعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ﴿١٤﴾
১৫. যা এমন লিখকদের হস্তে রয়েছে,	بِاَيْدِيْ سَفَرَةٍ ﴿١٥﴾
১৬. যারা সম্মানিত [ও] নেককার।	كِرَامٍۭ بَرَرَةٍ ﴿١٦﴾
১৭. মানুষের উপর লা'নত, সে কত অকৃতজ্ঞ।	قُتِلَ الْاِنْسَانُ مَآ اَكْفَرَهٗ ﴿١٧﴾
১৮. আল্লাহ তাকে কোন বস্তু হতে সৃষ্টি করেছেন।	مِنْ اَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهٗ ﴿١٨﴾
১৯. শুক্র হতে, তিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন, অনন্তর তাকে পরিমিতভাবে বানিয়েছেন।	مِنْ نُّطْفَةٍ ؕ خَلَقَهٗ فَقَدَّرَهٗ ﴿١٩﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৯. وَهُوَ এবং সে يَخْشٰى [আল্লাহকে] ভয় করে।
১০. فَاَنْتَ আপনি عَنْهُ تَلَهّٰى তাকে উপেক্ষা করেন।
১১. كَلَّآ কখনোই এরূপ করবেন না, اِنَّهَا تَذْكِرَةٌ কুরআন নসিহতের বাণী।
১২. فَمَنْ شَآءَ সুতরাং যার ইচ্ছা ذَكَرَهٗ সে তা গ্রহণ করুক।
১৩. فِيْ صُحُفٍ তা এমন পুস্তিকাসমূহের মধ্যে রয়েছে مُّكَرَّمَةٍ যা সম্মানিত।
১৪. مَّرْفُوْعَةٍ যা সমুন্নত مُّطَهَّرَةٍ পবিত্র।
১৫. بِاَيْدِيْ سَفَرَةٍ যা এমন লিখকদের হস্তে রয়েছে,
১৬. كِرَامٍ যারা সম্মানিত بَرَرَةٍ [ও] নেককার।
১৭. قُتِلَ الْاِنْسَانُ মানুষের উপর লা'নত مَآ اَكْفَرَهٗ সে কত অকৃতজ্ঞ।
১৮. مِنْ اَيِّ شَيْءٍ আল্লাহ কোন বস্তু হতে خَلَقَهٗ তাকে সৃষ্টি করেছেন।
১৯. مِنْ نُّطْفَةٍ শুক্র হতে خَلَقَهٗ তিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন فَقَدَّرَهٗ অনন্তর তাকে পরিমিতভাবে বানিয়েছেন।

২০. অতঃপর তার [বহির্গমনের] পথ সহজ করে দিয়েছেন।	ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ﴿٢٠﴾
২১. অতঃপর তাকে মৃত্যু দিয়েছেন, পরে কবরে স্থাপন করেছেন।	ثُمَّ اَمَاتَهُ فَاَقْبَرَهُ ﴿٢١﴾
২২. অতঃপর যখন আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করবেন তাকে পুনরায় জীবিত করবেন।	ثُمَّ اِذَا شَآءَ اَنْشَرَهُ ﴿٢٢﴾
২৩. না, কখনো না, তাকে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল সে তা পালন করেনি।	كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَآ اَمَرَهُ ﴿٢٣﴾
২৪. সুতরাং মানুষ যেন স্বীয় খাদ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করে দেখে।	فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ اِلٰى طَعَامِهٖٓ ﴿٢٤﴾
২৫. আমিই প্রচুর পানি বর্ষণ করেছি।	اَنَّا صَبَبْنَا الْمَآءَ صَبًّا ﴿٢٥﴾
২৬. অনন্তর জমিনকে সুন্দররূপে বিদীর্ণ করেছি।	ثُمَّ شَقَقْنَا الْاَرْضَ شَقًّا ﴿٢٦﴾
২৭. অনন্তর তাতে শস্য উৎপাদন করেছি।	فَاَنْبَتْنَا فِيْهَا حَبًّا ﴿٢٧﴾
২৮. এবং আঙ্গুর ও শাক-সবজি।	وَّعِنَبًا وَّقَضْبًا ﴿٢٨﴾
২৯. এবং যায়তুন ও খেজুর।	وَّزَيْتُوْنًا وَّنَخْلًا ﴿٢٩﴾
৩০. এবং নিবিড় উদ্যানসমূহ।	وَّحَدَآئِقَ غُلْبًا ﴿٣٠﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২০. ثُمَّ السَّبِيلَ অতঃপর তার [বহির্গমন] পথ يَسَّرَهُ সহজ করে দিয়েছেন।

২১. ثُمَّ اَمَاتَهُ অতঃপর তাকে মৃত্যু দিয়েছেন فَاَقْبَرَهُ পরে কবরে স্থাপন করেছেন।

২২. ثُمَّ اِذَا شَآءَ অতঃপর যখন আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করবেন اَنْشَرَهُ তাকে পুনরায় জীবিত করবেন।

২৩. كَلَّا না কখনো না لَمَّا يَقْضِ সে পালন করেনি مَآ اَمَرَهُ তাকে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল তা।

২৪. فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ সুতরাং মানুষ যেন দৃষ্টিপাত করে দেখে اِلٰى طَعَامِهٖٓ স্বীয় খাদ্যের প্রতি।

২৫. اَنَّا صَبَبْنَا আমিই বর্ষণ করেছি الْمَآءَ صَبًّا প্রচুর পানি।

২৬. ثُمَّ شَقَقْنَا অনন্তর বিদীর্ণ করেছি الْاَرْضَ شَقًّا জমিনকে সুন্দররূপে।

২৭. فَاَنْبَتْنَا অনন্তর উৎপাদন করেছি فِيْهَا حَبًّا তাতে শস্য।

২৮. وَّعِنَبًا এবং আঙ্গুর وَّقَضْبًا ও শাক-সবজি।

২৯. وَّزَيْتُوْنًا এবং যায়তুন وَّنَخْلًا ও খেজুর।

৩০. وَّحَدَآئِقَ এবং উদ্যানসমূহ غُلْبًا নিবিড়।

অনুবাদ	আয়াত
৩১. এবং ফল-ফলাদি ও তৃণলতা।	وَّفَاكِهَةً وَّاَبًّا ﴿٣١﴾
৩২. এটা তোমাদের এবং তোমাদের গৃহপালিত পশুর উপকারস্বরূপ	مَّتَاعًا لَّكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ ﴿٣٢﴾
৩৩. অনন্তর যখন কর্ণবিদারক নাদ [অর্থাৎ কিয়ামত] উপস্থিত হবে [তখন পথভ্রষ্টতার পরিণাম বুঝতে পারবে।]	فَاِذَا جَآءَتِ الصَّآخَّةُ ﴿٣٣﴾
৩৪. যেদিন মানুষ নিজের ভাই হতে পলায়ন করবে।	يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ ﴿٣٤﴾
৩৫. এবং নিজের মাতা ও পিতা হতে।	وَاُمِّهٖ وَاَبِيْهِ ﴿٣٥﴾
৩৬. এবং স্বীয় পত্নী ও সন্তান-সন্ততি হতেও [অর্থাৎ কেউ কারো প্রতি সহানুভূতি দেখাবে না]।	وَصَاحِبَتِهٖ وَبَنِيْهِ ﴿٣٦﴾
৩৭. তাদের প্রত্যেকেরই সেদিন এমন ব্যস্ততা হবে যে, তা তাকে অন্য দিকে মনোযোগী হতে দিবে না।	لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَاْنٌ يُّغْنِيْهِ ﴿٣٧﴾
৩৮. অনেক মুখমণ্ডল সেদিন [ঈমানের বরকতে] দীপ্তিমান হবে।	وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ﴿٣٨﴾
৩৯. [আনন্দে] হাস্যোজ্জ্বল, হর্ষোৎফুল্ল হবে।	ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ﴿٣٩﴾
৪০. আর অনেক মুখমণ্ডল সেদিন [কুফরের কারণে] অন্ধকার হবে।	وَوُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ﴿٤٠﴾
৪১. [এবং অন্ধকারের সাথে সাথে] তাদের উপর [বিষাদের] মলিনতা সমাচ্ছন্ন হবে।	تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ﴿٤١﴾
৪২. তারাই কাফের, দুষ্কার্যকারী লোক।	اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ﴿٤٢﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩১. وَّفَاكِهَةً এবং ফল-ফলাদি وَّاَبًّا ও তৃণলতা।

৩২. مَّتَاعًا উপকারস্বরূপ لَّكُمْ তোমাদের জন্য وَلِاَنْعَامِكُمْ এবং তোমাদের গৃহপালিত পশুর জন্য।

৩৩. فَاِذَا جَآءَتِ অনন্তর যখন উপস্থিত হবে الصَّآخَّةُ কর্ণবিদারক নাদ।

৩৪. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ যেদিন মানুষ পলায়ন করবে مِنْ اَخِيْهِ নিজের ভাই হতে ।

৩৫. وَاُمِّهٖ এবং নিজের মাতা وَاَبِيْهِ ও পিতা (হতে)।

৩৬. وَصَاحِبَتِهٖ এবং স্বীয় পত্নী وَبَنِيْهِ ও সন্তান-সন্ততি হতেও।

৩৭. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ তাদের প্রত্যেকেরই يَوْمَئِذٍ সেদিন شَاْنٌ يُّغْنِيْهِ এমন ব্যস্ততা হবে যে, তা তাকে অন্য দিকে মনোযোগী হতে দিবে না।

৩৮. وُجُوْهٌ অনেক মুখমণ্ডল يَّوْمَئِذٍ সেদিন [ঈমানের বরকতে] مُّسْفِرَةٌ দীপ্তিমান হবে।

৩৯. ضَاحِكَةٌ হাস্যোজ্জ্বল مُّسْتَبْشِرَةٌ হর্ষোৎফুল্ল হবে।

৪০. وَوُجُوْهٌ আর অনেক মুখমণ্ডল يَّوْمَئِذٍ সেদিন عَلَيْهَا غَبَرَةٌ অন্ধকার হবে।

৪১. تَرْهَقُهَا তাদের উপর সমাচ্ছন্ন হবে قَتَرَةٌ মলিনতা

৪২. اُولٰٓئِكَ هُمْ তারাই الْكَفَرَةُ কাফের الْفَجَرَةُ দুষ্কার্যকারী লোক।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : আলোচ্য সূরাটির প্রথম শব্দ عَبَسَ দ্বারা এর নামকরণ করা হয়েছে 'আবাসা' -কুরআন মাজীদের অন্যান্য সূরার ন্যায় এতেও تَسْمِيَةُ الْكُلِّ بِاسْمِ الْجُزْءِ-এর রীতি অনুসরণ করা হয়েছে। সূরাটির আরো কয়েকটি নাম রয়েছে। যেমন– اَلْاَعْمٰى ও اَلسَّفَرَةُ وَالصَّاخَّةُ ইত্যাদি।

সূরাটি নাজিল হওয়ার সময়কাল : মুফাসসির মুহাদ্দিসগণের ঐকমত্য অনুযায়ী আলোচ্য সূরাটি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রা.)-এর সাথে নবী করীম ﷺ-এর একটি আচরণকে কেন্দ্র করে নাজিল হয়েছে। ঘটনাটি এই যে, একবার নবী করীম ﷺ-এর দরবারে মক্কার কতিপয় বড় বড় সরদার ও সমাজপতি বসেছিল। নবী করীম ﷺ তাদেরকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিচ্ছিলেন। ইত্যবসরে ইবনে উম্মে মাকতূম নামে একজন অন্ধ সাহাবী নবী করীম ﷺ-এর সম্মুখে উপস্থিত হলেন। তিনি নবী করীম ﷺ-এর নিকট ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে চাইলেন। এ সময়ে নবী করীম ﷺ-এর বাক্যালাপে ব্যাঘাত সৃষ্টি হওয়ায় তিনি এতে কিছুটা অসন্তুষ্ট হলেন এবং তার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করলেন না। এ সময় আলোচ্য সূরাটি অবতীর্ণ হয়। ঐতিহাসিক ঘটনা হতে আলোচ্য সূরাটি নবী করীম ﷺ-এর মক্কায় অবস্থানকালে ইসলামের প্রথম দিকেই নাজিল হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

প্রথমত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রা.) ইসলামের প্রাথমিক যুগেই ইসলাম গ্রহণ করেছেন। সুতরাং হাফেজ ইবনে হাজার ও ইবনে কাছীর (র.) প্রমুখগণ লিখেছেন– اِنَّهٗ اَسْلَمَ بِمَكَّةَ قَدِيْمًا

দ্বিতীয়ত হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনা হতে দেখা যায় যে, উপরিউক্ত ঘটনার সময় তিনি হয়ত পূর্ব হতেই মুসলমান ছিলেন, না হয় তখন ইসলাম গ্রহণের জন্যই প্রস্তুত হয়ে এসেছিলেন। যেমন হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে এক বর্ণনায় আছে, তিনি এসে বললেন يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلِّمْنِىْ مِمَّا عَلَّمَكَ اللّٰهُ অন্য দিকে অত্র সূরার ৩নং আয়াত لَعَلَّهٗ يَزَّكّٰى-এর তাফসীরে ইবনে জারীর (র.) লিখেছেন– لَعَلَّهٗ يُسْلِمُ

তৃতীয়ত নবী করীম ﷺ-এর দরবারে তখন যারা বসা ছিল হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনা অনুযায়ী তারা হলো উতবাহ, শাইবাহ, আবূ জাহল ও উমাইয়া ইবনে খালফ প্রমুখগণ। এটা হতে প্রমাণিত হয় যে, তখনো তাদের সাথে মহানবী ﷺ-এর মেলামেশা ও উঠাবসা চালু ছিল এবং সংঘাত চরম আকার ধারণ করেনি। উপরিউক্ত বিষয়সমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে সহজেই বুঝা যায় যে, উক্ত সূরাটি ইসলামের প্রাথমিক যুগে মক্কায় নাজিল হয়েছে।

আয়াতের সংখ্যা : অত্র সূরাটি পবিত্র মক্কা নগরীতে অবতীর্ণ হয়। এতে ৪২টি আয়াত, ১৩০টি বাক্য এবং ৫৩৫টি অক্ষর রয়েছে।

ঐতিহাসিক পটভূমি ও সূরাটির বিষয়বস্তু : এ সূরায় দানের পদ্ধতি, উপদেশ গ্রহণ না করার প্রতি তিরস্কার, উপদেশ গ্রহণে বিমুখ ব্যক্তিদের পারলৌকিক শাস্তি এবং উপদেশ গ্রহণকারীদের পারলৌকিক পুরস্কারের বর্ণনা করা হয়েছে।

সূরাটিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সূরার প্রথমাংশ মধ্যমাংশের ভূমিকা এবং মধ্যমাংশ শেষাংশের ভূমিকা, আর শেষাংশ হলো মূলবক্তব্য বিষয়।

প্রথমাংশে শুরু করার ভঙ্গি দেখলে মনে হয়, অন্ধ ব্যক্তির প্রতি অমনোযোগিতা ও বড় বড় নেতৃস্থানীয় লোকদের প্রতি সাগ্রহ মনোযোগিতা প্রদর্শন করায় নবী করীম ﷺ-এর প্রতি শাসন ও তিরস্কারমূলক বাণী অবতীর্ণ হয়েছে; কিন্তু সম্পূর্ণ সূরাটির প্রতি সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করলে জানা যায়, এ সূরায় মূলত কাফের কুরাইশ সর্দারদের প্রতিই চরম অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছে। কেননা তারা সত্যবিমুখতার কারণে দীনের দাওয়াতকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে। আর সে সঙ্গে নবী করীম ﷺ-কে দীন প্রচারের সঠিক পন্থা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। তিনি প্রাথমিকভাবে নবুয়তের কাজ সম্পাদনের যেসব পন্থা অবলম্বন করেছিলেন সেগুলোর ভ্রান্তি বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। নবী করীম ﷺ কুরাইশ সরদারদের প্রতি বেশি আগ্রহ দেখিয়েছেন এবং অন্ধকে অবজ্ঞা করেছেন। আপত দৃষ্টিতে এরূপ মনে হলেও মূল ব্যাপারটি ছিল ভিন্নতর। মূলত কোনো মতাদর্শ প্রচারকের প্রাথমিক লক্ষ্যই থাকে সামনে প্রভাবশালী লোকদের প্রতি। অন্ধ ব্যক্তি কর্তৃত্বহীন ও দুর্বল বলে তার প্রতি উপেক্ষা করা উদ্দেশ্য ছিল না। আর এর মূলে দীনি দাওয়াতের উৎকর্ষের প্রতি গভীর আন্তরিকতাই ছিল একমাত্র কারণ, কিন্তু তা সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা নবী করীম ﷺ-কে বুঝিয়ে দিলেন যে, ইসলামি আদর্শ প্রচারের এটা সঠিক পন্থা নয়। প্রকৃতপক্ষে সত্যানুসন্ধিৎসু প্রত্যেক ব্যক্তিই গুরুত্বের অধিকারী, সে যত দুর্বল ও প্রভাবহীনই হোক না কেন। পক্ষান্তরে যাদের সত্যানুরাগ নেই তারা সামাজিকভাবে যত প্রভাব, প্রতিপত্তিশালীই হোক না কেন, তারা গুরুত্বহীন।

প্রথম হতে ১৬ আয়াত পর্যন্ত এ কথাগুলো বলার পর ১৭ আয়াত হতে ঐ সমস্ত কাফেরদের প্রতি সরাসরি রোষ প্রকাশ করা হয়েছে যারা নবী করীম ﷺ-এর দীনি দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। এ পর্যায়ে তারা নিজেদের স্রষ্টা ও

প্রতিপালক আল্লাহর প্রতি যে আচরণ অবলম্বন করেছিল এর প্রতি প্রথমে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছে এবং শেষে পরকালে তাদেরকে এজন্য চরম সংকটের সম্মুখীন হতে হবে বলে সতর্ক করা হয়েছে।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে যোগসূত্র : এ সূরার পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে কিয়ামতের কথাই বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ সূরার শেষেও কিয়ামাতের বিষয় বিবৃত হয়েছে। এ জন্য অনুমিত হয় যে, কিয়ামতের বর্ণনাই এ সূরার উদ্দেশ্যগত অঙ্গ। শেষাংশে কিয়ামত বিষয়ক বর্ণনায় বিশেষভাবে কাফেরদের কঠোর শাস্তির উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব, সূরার মধ্যমাংশের قُتِلَ الْإِنْسَانُ এ আয়াতগুলোতে আল্লাহ প্রদত্ত বস্তুসমূহের উল্লেখ করত একথা ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আল্লাহর নিয়ামতগুলোর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কোনো কিছুই প্রতিবন্ধকতা ছিল না; এতদসত্ত্বেও তারা যে অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছে, এটা চরম ধর্মদ্রোহিতা বৈ কিছু নয়। সুতরাং কিয়ামতের দিন তাদের প্রতি কঠোর আজাব হওয়াটা আশ্চর্যের কিছু নয়।

ধর্মদ্রোহীদের এ চরম অকৃতজ্ঞতা সংশোধনের জন্য নবী করীম ﷺ সর্বদা সচেষ্ট ও চিন্তান্বিত থাকতেন। এ কারণে কাফেরদেরকে উপদেশ দেওয়ার সময় অন্ধ সাহাবী কর্তৃক মাঝখানে তার কথায় ব্যাঘাত ঘটানোটা তাঁর নিকট কিছুটা বিরক্তিকরই ঠেকেছিল, কিন্তু কাফেরদের প্রতি হযরতের এ মনোযোগ এবং একজন ঈমানদারের প্রতি এ সামান্যতম উদাসীনতাকেও আল্লাহ পছন্দ করেননি। এ ক্ষেত্রে পরোক্ষ ঈমানের চেয়ে কাফেরদের প্রতি অধিক মর্যাদা প্রদর্শিত হয়ে যেত দেখে মার্জিত ভাষায় আল্লাহ হযরতকে কাফেরদের হেদায়েতের প্রশ্নে এত বেশি ব্যস্ত হতে নিষেধ করেছেন এবং সত্যিকার প্রেমিক ও ধর্মান্বেষীদের প্রতি সবিশেষে দৃষ্টি রাখতে উপদেশ দিয়েছেন।

সূরাটির শানে নুযূল : মুফাসসির ও মুহাদ্দিসগণ সর্বসম্মতভাবে এ সূরার শানে নুযূল সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন যে, একবার নবী করীম ﷺ-এর দরবারে কুরাইশ কাফেরদের কতিপয় নেতা উপস্থিত ছিলেন। কোনো কোনো বর্ণনাতে তারা হলেন আবূ জাহল ইবনে হিশাম, উকবাহ ইবনে রাবীয়াহ, উবাই ইবনে খাল্‌ফ, উমাইয়া ইবনে খাল্‌ফ এবং শাইবাহ। রাসূলে কারীম ﷺ তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের জন্য অনুপ্রাণিত করছিলেন। এ সময় আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম নামে এক অন্ধ সাহাবী রাসূলে কারীম ﷺ-এর খেদমতে উপস্থিত হলেন। তিনি নবী করীম ﷺ-কে কিছু জিজ্ঞাসা করতে চেয়েছিলেন। নবী করীম ﷺ তার এরূপ আচরণে রুষ্ট হলেন। কাজেই তার কথায় কর্ণপাত করলেন না। তখন আলোচ্য সূরাটি অবতীর্ণ হয়।

কোনো কোনো বর্ণনা হতে জানা যায় যে, উক্ত সূরাটি নাজিল হওয়ার পর নবী করীম ﷺ তাঁর নিকট গমন করে কৈফিয়ত দিয়েছিলেন। এরপর যখন ইবনে উম্মে মাকতূম (রা.) মহানবী ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হতেন তখন নবী করীম ﷺ তার জন্য স্বীয় চাদর বিছিয়ে দিতেন এবং বলতেন যে, مَرْحَبًا بِمَنْ عَاتَبَنِي رَبِّي অর্থাৎ যার কারণে আমার প্রভু আমাকে তিরস্কার করেছেন তাকে সুস্বাগতম। মাঝে মাঝে সফরে যাওয়ার সময় নবী করীম ﷺ হযরত ইবনে উম্মে মাকতূম (রা.)-কে মদিনায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে যেতেন। তিনি তাকে মসজিদে নববীর মুয়াজ্জিনও নিয়োগ করেছিলেন। –[নূরুল কুরআন]

সূরাটির মর্যাদা : একটি হাদীসে বর্ণিত আছে "مَنْ قَرَءَ سُوْرَةَ عَبَسَ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ وَجْهُهُ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ" অর্থাৎ যে ব্যক্তি সূরা আবাসা পাঠ করবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাকে উজ্জ্বল চেহারায় উত্তোলন করবেন। অবশ্য কেউ কেউ বলেছেন যে, উক্ত হাদীসখানা মাওযূ'।

عَبَسَ وَتَوَلّٰى [١] أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمٰى [٢]

শানে নুযূল : তিরমিযী ও ইবনুল মুনজির প্রমুখ হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আলোচ্য আয়াত অন্ধ সাহাবী হযরত ইবনে উম্মে মাকতূম (র.) সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। তিনি একদা রাসূল ﷺ-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বলতে লাগলেন যে, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আপনি আমাকে উপদেশ করুন। সে সময়ে হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট মুশরিকদের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গদের বৈঠক ছিল। সুতরাং রাসূলুল্লাহ ﷺ তার প্রতি লক্ষ্য করা থেকে বিরত থেকে অন্যদের প্রতি মনোযোগী হয়ে বললেন, আমি যা বলছি তাতে তুমি কি মন্দ কিছু বুঝেছ? সে বলল, না। সে সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতদ্বয় নাজিল হয়েছে। –[কুরতুবী ১৮৪/১৯, ফতহুল কাদীর ৩৮৬/৫, তাবারী ৪৪৩/১২, দুররে মানছূর ৩১৪,৬, ইবনে কাছীর ৪৮০/৪, রূহুল মা'আনী ৪৯/৩০/১৫]

قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ [١٧]

শানে নুযূল : যাহ্‌হাক হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আলোচ্য আয়াত উতবা বিন আবী লাহাব সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। সে প্রথম দিকে ঈমান গ্রহণ করেছিল। অতঃপর যখন وَالنَّجْمِ সূরা অবতীর্ণ হয়, তখন মুর্তাদ বা ধর্মত্যাগী হয়ে বলল, সূরা اَلنَّجْمُ ব্যতীত পূর্ণ কুরআনের প্রতি আমি ঈমান এনেছি। তখন

আল্লাহ তা'আলা তার ধ্বংস অনিবার্যতার ঘোষণা দিয়ে আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[কুরতুবী ১৮৯/১৯, রূহুল মা'আনী ৫৫/৩০/১৫ বহরে মুহীত্ব ৪২০/৮, দুররে মানছুর ৩১৫/৩]

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ [٣٤] وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ [٣٥] وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ [٣٦]

শানে নুযূল–১ : যাহ্হাক হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, কিয়ামতের দিনে কাবিল তদ্বীয় ভাই হাবিল হতে পালিয়ে থাকবে। হযরত নবী করীম ﷺ পালিয়ে থাকবেন নিজ মাতা হতে। নিজ পুত্র হতে পালিয়ে থাকবেন হযরত নূহ (আ.)। স্ত্রী থেকে বিচ্ছিন্ন থাকবেন হযরত লূত (আ.)। হযরত আদম (আ.) পৃথক থাকবেন নিজ পুত্রের দুষ্কর্ম হতে। কিয়ামতের দিনের সেই ভয়াবহ অবস্থায় যে অস্থিরতা বিরাজ করবে, তার বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল–২ : হাসান বলেন কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম পিতা হতে পালিয়ে থাকবেন যিনি তিনি হলেন হযরত ইবরাহীম (আ.)। মাতা হতে যিনি সর্ব প্রথম পালিয়ে থাকবেন তিনি হলেন মহানবী ﷺ সর্বপ্রথম পুত্র হতে যিনি পালিয়ে থাকবেন, তিনি হলেন হযরত নূহ (আ.)। ভাই হতে সর্বপ্রথম যিনি পালিয়ে থাকবেন তিনি হলেন হাবিল, আর স্ত্রী হতে সর্ব প্রথম যিনি পালিয়ে থাকবেন তিনি হলেন হযরত নূহ (আ.) ও হযরত লূত (আ.)। তাঁদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[কুরতুবী ১৯৫/১৯, দুররে মানছুর ৩১৭/৬, রূহুল মা'আনী ৬২/৩০/১৫, কাশ্শাফ ৭০৬]

وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ [٤٠]

শনে নুযূল : ইবনে আবী হাতেম জাফর বিন মুহাম্মদ তাঁর পিতা দাদার মধ্যস্থ্যতার বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, কিয়ামতের দিনে কাফেরদের মুখ পর্যন্ত পানি পৌছে যাবে। অতঃপর তাদের চেহারার উপর ধূলো-বালি ছুড়ে দেওয়া হবে। কিয়ামতের সেই ভয়াবহতা সম্পর্কে বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[দুররে মানছুর ৩১৭/৬]

শানে নুযূলে বর্ণিত অন্ধ সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে-মাকতূম (র.)-এর ঘটনায় ইমাম বগভী (র.) আরও রেওয়ায়েত করেন যে, হযরত আব্দুল্লাহ (রা.) অন্ধ হওয়ার কারণে একথা জানতে পারেন নি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ অন্যের সাথে আলোচনারত আছেন। তিনি মজলিসে প্রবেশ করেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আওয়াজ দিতে শুরু করেন এবং বারবার আওয়াজ দেন। –(মাযহারী) ইবনে কাসীরের এক রেওয়ায়েতে আরও আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কুরআনের একটি আয়াতের পাঠ জিজ্ঞেস করেন এবং সাথে সাথে জবাব দিতে পীড়াপীড়ি করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন মক্কার কাফের নেতৃবর্গকে উপদেশ দানে মশগুল ছিলেন। এই নেতৃবর্গ ছিলেন ওতবা ইবনে রাবীয়া, আবূ জাহল ইবনে হিশাম এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিতৃব্য আব্বাস। তিনি তখনও মুসলমান হন নি। এরূপ ক্ষেত্রে আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রা.)-এর এভাবে কথা বলা এবং আয়াতের ভাষায় ঠিক করা মামুলী প্রশ্ন রেখে তাৎক্ষণিক জবাবের জন্য পীড়াপীড়ি করা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে বিরক্তিকর ঠেকে। এই বিরক্তির প্রধান কারণ ছিল এই যে, হযরত আব্দুল্লাহ (রা.) পাক্কা মুসলমান ছিলেন এবং সদাসর্বদা মজলিসে উপস্থিত থাকতেন। তিনি এই প্রশ্ন অন্য সময়ও রাখতে পারতেন। তার এই জবাব বিলম্বিত করার মধ্যে কোনো ধর্মীয় ক্ষতির আশঙ্কা ছিল না। এর বিপরীত কুরাইশ নেতৃবর্গ সব সময় মজলিসে আগমন করতো না এবং যে কোনো সময় তাদের কাছে তাবলীগও করা যেত না। এ সময়ে তারা মনোনিবেশ সহকারে উপদেশ শ্রবণ করছিল। ফলে তাদের ঈমান আনা আশাতীত ছিল না। তাদের কথাবার্তা কেটে দিলে ঈমানের আশাই সুদূরপরাহত ছিল। এ ধরনের পরিস্থিতির কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রা.)-কে আমল দেন নি এবং মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করেন। তিনি কাফের নেতৃবর্গের সাথে কথাবার্তা অব্যাহত রাখেন। অতঃপর মজলিস সমাপ্ত হলে আলোচ্য আয়াতসমূহ নাজিল হয় এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কর্মপদ্ধতির বিরূপ সমালোচনা করে তাঁকে নির্দেশ প্রদান করা হয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই কর্মপদ্ধতি নিজস্ব ইজতিহাদের উপর ভিত্তিশীল ছিল। তিনি ভেবেছিলেন, যে মুসলমান কথাবার্তায় মজলিসের রীতিনীতির বিরুদ্ধ পন্থা অবলম্বন করে, তাকে কিছু হুঁশিয়ার করা দরকার, যাতে সে ভবিষ্যতে মজলিসের রীতিনীতির প্রতি লক্ষ্য রাখে। এ কারণে তিনি আব্দুল্লাহর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। এছাড়া কুফর ও শিরক বাহ্যত সর্ববৃহৎ গোনাহ্। এর অবসানের চিন্তা আগে হওয়া উচিত। আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রা.) তো ধর্মের একটি শাখাগত বিষয়ের শিক্ষালাভ করতে চেয়েছিলেন মাত্র কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁর এই ইজতিহাদকে সঠিক আখ্যা দেন নি এবং হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন। এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, যে ব্যক্তি ধর্মীয় শিক্ষার প্রত্যাশী হয়ে প্রশ্ন করেছিল, তার জবাবের উপকারিতা নিশ্চিত, আর যে বিরুদ্ধবাদি, কথা শুনতেও নারাজ, তার সাথে কথা বলার উপকারিতা অনিশ্চিত।

অতএব অনিশ্চিতকে নিশ্চিতের উপর কিরূপে অগ্রাধিকার দেওয়া যায়? এটা সত্যি যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রা.) মজলিসের রীতিনীতির বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন কিন্তু কুরআনে اَعْمٰى –শব্দ ব্যবহার করে তাঁর ওজর বর্ণনা করে দিয়েছে যে, তিনি অন্ধ ছিলেন। তাই দেখতে সক্ষম ছিলেন না যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখন কি কাজে মশগুল আছেন এবং কাদের সাথে কথাবার্তা হচ্ছে। সুতরাং তিনি ক্ষমার্হ ছিলেন এবং বিমুখতা প্রদর্শনের পাত্র ছিলেন না। এ থেকে জানা যায় যে, কোনো অপারগ ব্যক্তির দ্বারা অজ্ঞাতসারে মজলিসের রীতিনীতির বিরুদ্ধাচরণ হয়ে গেলে তা নিন্দার্হ হবে না।

عَبَسَ وَتَوَلّٰى : প্রথম শব্দের অর্থ রুষ্টতা অবলম্বন করা এবং চোখে-মুখে বিরক্তি প্রকাশ করা। দ্বিতীয় শব্দের অর্থ মুখ ফিরিয়ে নেওয়া। এটা মুখোমুখি সম্বোধন করে উপস্থিত পদবাচ্য দ্বারা এসব কথা বলার স্থান ছিল। কিন্তু তা না করে কুরআন পাক অনুপস্থিত পদবাচ্য অবলম্বন করেছে। এতে ভর্ৎসনার স্থলেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে এবং ধারণা দেওয়া হয়েছে যে, কাজটি যেন অন্য কেউ করেছে। এতে ইঙ্গিত আছে যে, এরূপ করা আপনার পক্ষে সমীচীন হয়নি। পরবর্তী وَمَا يُدْرِيْكَ –(আপনি কি জানেন?) বাক্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওজরের দিকে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে যে, আপনার মনোযোগ এদিকে নিবদ্ধ হয়নি যে, সাহাবীর জিজ্ঞাসিত বিষয়ের উপকারিতা নিশ্চিত এবং কাফেরদের সাথে আলোচনার উপকারিতা অনিশ্চিত। এ বাক্যে অনুপস্থিত পদবাচ্যের পরিবর্তে উপস্থিত পদবাচ্য অবলম্বন করার মধ্যেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সম্মান ও মনোরঞ্জন রয়েছে। কেননা যদি কোথাও উপস্থিত পদবাচ্য ব্যবহার করা না হতো, তবে সন্দেহ হতে পারত যে, এই কর্মপদ্ধতি অপছন্দ করার কারণেই মুখোমুখি সম্বোধন বর্জন করা হয়েছে। এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য অসহনীয় কষ্টের কারণ হতো। সুতরাং প্রথম বাক্যে অনুপস্থিত পদবাচ্য ব্যবহার করা এবং দ্বিতীয় বাক্যে উপস্থিত পদবাচ্য ব্যবহার করা– উভয়টির মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সম্মান ও মনোরঞ্জন রয়েছে।

لَعَلَّهٗ يَزَّكّٰى اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰى : অর্থাৎ আপনি কি জানেন, এই সাহাবী যা জিজ্ঞাসা করছিল, তা তাকে শিক্ষা দিলে সে তা দ্বারা পরিশুদ্ধ হতে পারত কিংবা কমপক্ষে আল্লাহকে স্মরণ করে প্রাথমিক উপকার লাভ করতে পারত। ذِكْرٰى শব্দের অর্থ আল্লাহকে বহুল পরিমাণে স্মরণ করা। –[সিহাহ]

এখানে দু'টি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে– يَذَّكَّرُ ও يَزَّكّٰى –প্রথমটির অর্থ পাক-পবিত্র হওয়া এবং দ্বিতীয়টির অর্থ উপদেশ লাভ করা। প্রথমটি সৎকর্মপরায়ণ আল্লাহ্ভীরুদের স্তর। যারা নফ্সকে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সর্বপ্রকার নোংরামি থেকে পাক-সাফ করে নেয় এবং দ্বিতীয়টি ধর্মের পথে চলার প্রথম স্তর। কারণ যে আল্লাহর পথে চলা শুরু করে, তাকে আল্লাহর স্মরণে নিয়োজিত করা হয় -যাতে আল্লাহ্র মাহাত্ম্য ও ভয় তার মনে উপস্থিত থাকে। উদ্দেশ্য এই যে, এই সাহাবীকে শিক্ষা দিলে তাতে এক না এক উপকার হতোই–প্রথমটি, না হয় দ্বিতীয়টি। উভয় প্রকার হওয়ারও সম্ভাবনা আছে। –[মাযহারী]

প্রচার ও শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ কুরআনী মূলনীতি : এক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে একই সময়ে দু'টি কাজ উপস্থিত হয়– ১. একজন মুসলমানকে শিক্ষা দান ও তার মনস্তুষ্টি বিধান এবং ২. অমুসলমানদের হেদায়তের দিকে মনোযোগ। কুরআন পাকের ইরশাদ একথা ফুটিয়ে তুলেছে যে, প্রথম কাজটি দ্বিতীয় কাজের অগ্রে সম্পাদন করতে হবে এবং দ্বিতীয় কাজের কারণে প্রথম কাজে বিলম্ব করা অথবা ত্রুটি করা বৈধ নয়। এ থেকে জানা গেল যে, মুসলমানদের শিক্ষা ও সংশোধনের চিন্তা অমুসলমানকে ইসলামে অন্তর্ভুক্ত করার চিন্তা থেকে অধিক গুরুত্ববহ ও অগ্রণী।

এতে সেসব আলিমের জন্য গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশ রয়েছে, যারা অমুসলমানদের সন্দেহ দূরীকরণ এবং তাদেরকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করার খাতিরে এমন সব কাণ্ড করে বসেন, যা দ্বারা সাধারণ মুসলমানদের মনে সন্দেহ-সংশয় অথবা অভিযোগ সৃষ্টি হয়ে যায়। তাদের উচিত এই কুরআনী দিক নির্দেশ অনুযায়ী মুসলমানদের সংরক্ষণ ও অবস্থা সংশোধনকে অগ্রাধিকার দেওয়া। আকবর এলাহাবাদী মরহুম চমৎকার বলেছেন :

بے وفا سمجھیں تمہیں اہل حرم اس سے بچو ☆ دیر والے کج ادا کہہ دیں یہ بدنامی بھلی

পরবর্তী আয়াতসমূহে কুরআন পাক এ বিষয়টিই পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছে। اَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰى فَاَنْتَ لَهٗ تَصَدّٰى অর্থাৎ যে ব্যক্তি আপনার ও আপনার ধর্মের প্রতি বেপরোয়া ভাব প্রদর্শন করছে, আপনি তার চিন্তায় মশগুল আছেন যে, সে কোনোরূপে মুসলমান হোক। অথচ এটা আপনার দায়িত্ব নয়। সে মুসলমান না হলে আপনাকে অভিযুক্ত করা হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ধর্মের জ্ঞান অন্বেষণে দৌড়ে আপনার কাছে আসে এবং সে আল্লাহকে ভয়ও করে, আপনি তার দিকে মনোযোগ দেন না। এতে সুস্পষ্টভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, শিক্ষা সংশোধন ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে পাকাপোক্ত মুসলমান করা অমুসলমানকে ইসলামে অন্তর্ভুক্ত করার চিন্তা করা থেকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও অগ্রণী। এর চিন্তা অধিক করা উচিত। অতঃপর কুরআন যে উপদেশবাণী এবং উচ্চামর্যাদাসম্পন্ন, তা বর্ণনা করা হয়েছে।

فِىْ صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ مَّرْفُوْعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ – صُحُفٌ বলে লওহে মাহ্‌ফুজ বোঝানো হয়েছে। এটা যদিও এক বস্তু কিন্তু সমস্ত ঐশী সহীফা এতে লিখিত আছে বলে একে বহুবচনে প্রকাশ করা হয়েছে। مرفوعة বলে এর উচ্চমর্যাদা বোঝানো হয়েছে এবং مُّطَهَّرَةٌ বলে বোঝানো হয়েছে যে, নাপাক মানুষ, হায়েজ ও নেফাসওয়ালী নারী এবং অজুহীন ব্যক্তি একে স্পর্শ করতে পারে না।

بِاَيْدِىْ سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ – سَفَرَةٌ শব্দটি سَافِرٌ-এর বহুবচন হতে পারে। অর্থ হবে লিপিকার। এমতাবস্থায় এই শব্দ দ্বারা ফেরেশতা কেরামুন-কাতেবীন অথবা পয়গম্বরগণ এবং তাঁদের ওহী লেখকগণকে বোঝানো হবে। এটা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও মুজাহিদ (র.)-এর তাফসীর।

سَفَرَةٌ -শব্দটি سَفِيْرٌ -এর বহুবচনও হতে পারে। অর্থ দূত। এমতাবস্থায় এর দ্বারা দূত ফেরেশতা, পয়গম্বরগণ এবং ওহী লেখক সাহাবায়ে কেরামকে বোঝানো হয়েছে। আলিমগণও এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। কেননা তাঁরাও রাসূলুল্লাহ ﷺ ও উম্মতের মধ্যবর্তী দূত। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : কেরাতে বিশেষজ্ঞ কুরআন পাঠকও এই আয়াতে বর্ণিত ব্যক্তিবর্গের অন্যতম। আর যে ব্যক্তি বিশেষজ্ঞ নয় কিন্তু কষ্টে-সৃষ্ট কেরাত শুদ্ধ করে নেয়, সে দ্বিগুণ ছওয়াব পাবে, কেরাতের ছওয়াবও কষ্ট করার ছওয়াব। এ থেকে জানা গেল যে, বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি অনেক ছওয়াব পাবে। –[মাযহারী]

অতঃপর মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যেসব নিয়ামত ভোগ করে, সেসব নিয়ামতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো বস্তুনিষ্ঠ ও অনুভূত বিষয়। সামান্য চেতনাশীল ব্যক্তিও এগুলো বুঝতে সক্ষম। এ প্রসঙ্গে মানব সৃষ্টির কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং প্রথমে مِنْ اَىِّ شَىْءٍ خَلَقَهٗ বলে প্রশ্ন রাখা হয়েছে যে, হে মানুষ, চিন্তা কর, আল্লাহ তোমাকে কি বস্তু থেকে সৃষ্টি করেছেন? এই প্রশ্নের জবাব নির্দিষ্ট– অন্য কোনো জবাব হতেই পারে না। তাই নিজেই জবাব দিয়েছেন: مِنْ نُّطْفَةٍ –অর্থাৎ মানুষকে বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছেন। خَلَقَهٗ فَقَدَّرَهٗ –অর্থাৎ কেবল বীর্য থেকে মানুষকে সৃষ্টিই করেন নি; বরং তাকে সুপরিমিতও করেছেন। তার গঠনপ্রকৃতি, আকার-আকৃতি, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দৈর্ঘ্যপ্রস্থ, গ্রন্থি, চক্ষু, নাক, কান ইত্যাদি এমন সুপরিমিতভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, একটু এদিক সেদিক হলে মানুষের আকৃতিই বিগড়ে যেত এবং কাজকর্ম দুরূহ হয়ে যেত।

قَدَّرَهٗ -শব্দের এরূপ অর্থও হতে পারে যে, মানুষ যখন মাতৃগর্ভে সৃষ্টি হতে থাকে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর চারটি বিষয়ের পরিমাণ লিখে দেন। (১) সে কি কি কাজ করবে এবং কিরূপে করবে, (২) তার বয়স কত হবে, (৩) কি পরিমাণ রিজিক পাবে এবং (৪) পরিণামে ভাগ্যবান হবে, না হতভাগ্য হবে। –[বুখারী, মুসলিম]

ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهٗ –অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রহস্য বলে মাতৃগর্ভের তিন অন্ধকার প্রকোষ্ঠে এবং সংরক্ষিত জায়গায় মানুষকে সৃষ্টি করেন। যার গর্ভে এই সৃষ্টিকর্ম চলে, সে নিজেও এ সম্পর্কে বিস্তারিত কিছুই জানে না। এরপর আল্লাহ তা'আলার অপার শক্তিই জীবিত ও পূর্ণাঙ্গ মানুষের মাতৃগর্ভ থেকে বাইরে আসার পথ সহজ করে দেয়। চারপাঁচ পাউণ্ড ওজনের দেহটি সহীহ্ সালামতে বাইরে চলে আসে এবং মায়েরও এতে তেমন কোনো দৈহিক ক্ষতি হয় না।

ثُمَّ اَمَاتَهٗ فَاَقْبَرَهٗ –নিয়ামত বর্ণনা প্রসঙ্গে মানব সৃষ্টির সূচনা বর্ণনা করার পর পরিণতি অর্থাৎ মৃত্যু ও কবরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে জানা গেল যে, মানুষের মৃত্যু প্রকৃতপক্ষে কোনো বিপদ নয়-নিয়ামত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : تُحْفَةُ الْمُؤْمِنِ الْمَوْتُ "মৃত্যু মু'মিনের জন্য উপঢৌকনস্বরূপ"। এর মধ্যে অনেক রহস্য নিহিত রয়েছে। فَاَقْبَرَهٗ অর্থাৎ অতঃপর তাকে কবরস্থ করেছেন। বলা বাহুল্য, এটাও এক নিয়ামত। কেননা, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সাধারণ জন্তু-জানোয়ারের ন্যায় যেখানে মরে সেখানেই পচে গলে যেতে দেন নি; বরং তাকে গোসল দিয়ে পাক-সাফ কাপড় পরিয়ে সম্মান সহকারে কবরে দাফন করে দেওয়া হয়। এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, মৃত মানুষকে দাফন করা ওয়াজিব।

كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا اَمَرَهٗ –এতে অবিশ্বাসী মানুষকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে, যে, আল্লাহর উপরিউক্ত নিদর্শনাবলি ও নিয়ামতরাজির পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের উচিত ছিল এগুলো সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তাঁর বিধানাবলি পালন করা। কিন্তু হতভাগ্য মানুষ তা করেনি। অতঃপর মানবসৃষ্টির সূচনা ও পরিসমাপ্তির মাঝখানে যেসব নিয়ামত মানুষ ভোগ করে সেগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ মানুষের রিজিক কিভাবে সৃষ্টি করা হয়? কিভাবে আকাশ থেকে পানি বর্ষিত হয়ে মাটির নিচে চাপাপড়া বীজকে সজীব ও সতেজ করে তোলে। ফলে একটি সরু ও ক্ষীণকায় অংকুর মাটি ভেদ করে উপরে উঠে। অতঃপর তা থেকে হরেক রকমের শস্য, ফল-মূল ও বাগ-বাগিচা সৃষ্টি হয়। এসব নিয়ামত সম্পর্কে মানুষের বারবার অবহিত করার পর পরিশেষে আবার কিয়ামতের প্রসঙ্গ আনা হয়েছে।

فَاِذَا جَآءَتِ الصَّآخَّةُ – صَآخَّةٌ এমন কঠোর নাদ; যার ফলে মানুষ শ্রবণ শক্তি হারিয়ে ফেলে। এখানে কিয়ামতের হট্টগোল তথা শিঙ্গার ফুঁক বোঝানো হয়েছে।

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ –এখানে হাশরের ময়দানে সকলের সমাবেশের দিন বোঝানো হয়েছে। সেদিন প্রত্যেক মানুষ আপন চিন্তায় বিভোর হবে। দুনিয়াতে যেসব আত্মীয়তা ও সম্পর্কের কারণে মানুষ একে অপরের জন্য জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত হয় না, হাশরে তারাই নিজ নিজ চিন্তায় এমন নিমগ্ন হবে যে, কেউ কারও খবর নিতে পারবে না; বরং সামনে দেখলেও মুখ লুকাবে। প্রত্যেক মানুষ তার ভ্রাতার কাছ থেকে-পিতা, মাতা, স্ত্রী ও সন্তানদের কাছে থেকে মুখ লুকিয়ে ফিরবে। দুনিয়াতে পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতা ভ্রাতাদের মধ্যে হয়। এর চেয়ে বেশি পিতামাতাকে সাহায্য করার চিন্তা করা হয় এবং স্বভাবগত কারণে এর চেয়েও বেশি স্ত্রী এবং সন্তানদের সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হয়। আয়াতে নীচ থেকে উপরের সম্পর্ক যথাক্রমে উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর হাশরের ময়দানে মু'মিন ও কাফেরের পরিণতি বর্ণনা করে সূরার ইতি টানা হয়েছে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

عَبَسَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার عُبُوْسًا وَعَبْسًا মূলবর্ণ (ع - ب - س) জিনস صحيح অর্থ– ভ্রুকুঞ্চিত করলেন।

يُدْرِيْكَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব إِفْعَالٌ মাসদার إِدْرَاءٌ মূলবর্ণ (د - ر - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– আপনি কি জানেন, তোমাকে জানাবে

إِسْتَغْنٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব إِسْتِفْعَالٌ মাসদার إِسْتِغْنَاءٌ মূলবর্ণ (غ - ن - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– বেপরোয়া ভাব দেখায়।

تَصَدّٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার تَصَدِّى মূলবর্ণ (ص - د - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– আপনি ভাবনায় পড়েছেন।

تَلَهّٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার تَلَهِّى মূলবর্ণ (ل - ه - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– আপনি উপেক্ষা করেন।

مُطَهَّرَةٌ : সব ধরনের শারীরিক ও আত্মিক কলুষতা ও পঙ্কিলতা থেকে পবিত্র। مُطَهَّرَةٌ অর্থাৎ مُتَنَزِّهَةٌ عَنْ مَسِّ الشَّيْطَانِ তথা শয়তানের স্পর্শ থেকে পবিত্র। (জালালাইন) মাসদার تَطْهِيْرٌ বাব تَفْعِيْل

لَمَّا يَقْضِ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضرب মাসদার قضاء মূলবর্ণ (ق - ض - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– সে পালন এখনও করেনি।

صَبَبْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার صَبًّا মূলবর্ণ (ص - ب - ب) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– আমি বর্ষণ করেছি, প্রবাহিত করলাম।

شَقَقْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার شَقٌّ মূলবর্ণ (ش - ق - ق) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– বিদীর্ণ করেছি, ভেঙ্গে ফেলেছি।

صَاخَّةٌ : এটি ইসমে ফায়েল বা মাসদার হবে। অর্থ, কর্ণবিদারী আওয়াজ। চিৎকার, হট্টগোল। সাইয়্যিদ মুরতাজা যুবায়দী বলেন, صَاخَّةٌ ঐ চিৎকারকে বলা হয়, যা কানকে ফাটিয়ে দেয় অর্থাৎ চিৎকারের প্রচণ্ডতার কারণে বয়রা করে দেয়। অথবা صَاخَّةٌ শব্দটি صَخَّ – يَصِخُّ -এর ইসমে ফায়েলের সীগাহ বা মাসদার। অর্থ, শোরগোল করে কান ফাটিয়ে দেওয়া।

مُسْفِرَةٌ : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم فاعل বাব إِفْعَالٌ মাসদার إِسْفَارٌ মূলবর্ণ (س - ف - ر) জিনস صحيح অর্থ– দীপ্তিমান, উজ্জ্বল, আলোকিত।

تَرْهَقُهَا : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার رَهَقٌ মূলবর্ণ (ر - ه - ق) জিনস صحيح অর্থ– তাদের উপর সমাচ্ছন্ন হবে।

اَلْفَجَرَةُ : বহুবচন, একবচন فَاجِرٌ। অর্থ– পাপী, নাফরমান। প্রকাশ্য পাপ কর্মকারী, সত্য ত্যাগকারী।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. সূর্যকে যখন নিস্প্রভ করা হবে।	اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۝١
২. আর যখন নক্ষত্রসমূহ খসে খসে পড়বে।	وَاِذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْ ۝٢
৩. আর যখন পর্বতসমূহকে চলমান করা হবে।	وَاِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ۝٣
৪. আর যখন দশ মাসের পূর্ণ-গর্ভা উষ্ট্রী উপেক্ষিত হবে।	وَاِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ۝٤
৫. আর যখন বন্য পশু সকল একত্র হবে।	وَاِذَا الْوُحُوْشُ حُشِرَتْ ۝٥
৬. আর যখন সাগরসমূহকে স্ফীত করা হবে।	وَاِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ۝٦
৭. আর যখন এক এক রকমের লোকদেরকে [ভিন্ন ভিন্ন দলে] সমবেত করা হবে।	وَاِذَا النُّفُوْسُ زُوِّجَتْ ۝٧
৮. আর যখন জীবন্ত প্রোথিত [শিশু] কন্যাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে–	وَاِذَا الْمَوْءُدَةُ سُئِلَتْ ۝٨

শাব্দিক অনুবাদ :

১. اِذَا الشَّمْسُ সূর্যকে যখন كُوِّرَتْ নিস্প্রভ করা হবে।

২. وَاِذَا النُّجُوْمُ আর যখন নক্ষত্রসমূহ انْكَدَرَتْ খসে খসে পড়বে।

৩. وَاِذَا الْجِبَالُ আর যখন পর্বতসমূহকে سُيِّرَتْ চলমান করা হবে।

৪. وَاِذَا الْعِشَارُ আর যখন দশ মাসের পূর্ণ-গর্ভা উষ্ট্রী عُطِّلَتْ উপেক্ষিত হবে।

৫. وَاِذَا الْوُحُوْشُ আর যখন বন্য পশুগুলোকে حُشِرَتْ একত্র করা হবে।

৬. وَاِذَا الْبِحَارُ আর যখন সাগরসমূহকে سُجِّرَتْ স্ফীত করা হবে।

৭. وَاِذَا النُّفُوْسُ আর যখন এক এক রকমের লোকদেরকে زُوِّجَتْ জোড়ায় জোড়ায় সমবেত করা হবে।

৮. وَاِذَا الْمَوْءُدَةُ আর যখন জীবন্ত প্রোথিত [শিশু] কন্যাদেরকে سُئِلَتْ জিজ্ঞাসা করা হবে।

অনুবাদ	আয়াত
৯. তাকে কী অপরাধে হত্যা করা হয়েছিল?	بِاَيِّ ذَنۢبٍ قُتِلَتْ ﴿٩﴾
১০. আর যখন আমলনামাসমূহ উন্মোচিত হবে।	وَاِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ﴿١٠﴾
১১. আর যখন আসমান খুলে দেওয়া হবে।	وَاِذَا السَّمَآءُ كُشِطَتْ ﴿١١﴾
১২. আর যখন দোজখকে প্রজ্বলিত করা হবে।	وَاِذَا الْجَحِيْمُ سُعِّرَتْ ﴿١٢﴾
১৩. আর যখন বেহেশতকে নিকটবর্তী করে দেওয়া হবে।	وَاِذَا الْجَنَّةُ اُزْلِفَتْ ﴿١٣﴾
১৪. [সিঙ্গায় দ্বিতীয়বার ফুৎকারের ফলে যখন এই ঘটনাগুলো ঘটবে, তখন] প্রত্যেক ব্যক্তি সেই আমলসমূহ জানতে পারবে। যা নিয়ে সে এসেছে।	عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّآ اَحْضَرَتْ ﴿١٤﴾
১৫. অতএব, আমি সে নক্ষত্রপুঞ্জের কসম করছি, যারা পিছনে হটতে থাকে।	فَلَآ اُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ ﴿١٥﴾
১৬. [অতঃপর পিছনের দিকেই] চলতে থাকে [এবং স্ব স্ব উদয়স্থলে] আত্মগোপন করে।	الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ﴿١٦﴾
১৭. আর রাতের কসম! যখন তা গমনোদ্যত হয়।	وَالَّيْلِ اِذَا عَسْعَسَ ﴿١٧﴾
১৮. আর প্রাতঃকালের কসম! যখন তা আগমন করতে থাকে।	وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ ﴿١٨﴾
১৯. নিশ্চয় এই কুরআন এক সম্মানিত ফেরেশতা [হযরত জিবরাঈল (আ.)] কর্তৃক আনীত [আল্লাহর] বাণী।	اِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ ﴿١٩﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৯. بِاَيِّ ذَنۢبٍ কী অপরাধে قُتِلَتْ তাকে হত্যা করা হয়েছিল?

১০. وَاِذَا الصُّحُفُ আর যখন আমলনামাসমূহ نُشِرَتْ উন্মোচিত হবে।

১১. وَاِذَا السَّمَآءُ আর যখন আসমান كُشِطَتْ খুলে দেওয়া হবে।

১২. وَاِذَا الْجَحِيْمُ আর যখন দোজখকে سُعِّرَتْ প্রজ্বলিত করা হবে।

১৩. وَاِذَا الْجَنَّةُ আর যখন বেহেশতকে اُزْلِفَتْ নিকটবর্তী করে দেওয়া হবে।

১৪. عَلِمَتْ نَفْسٌ প্রত্যেক ব্যক্তি জানতে পারবে مَّآ اَحْضَرَتْ (সেই আমলসমূহ) যা নিয়ে সে এসেছে।

১৫. فَلَآ اُقْسِمُ অতএব আমি কসম করছি بِالْخُنَّسِ সে নক্ষত্রপুঞ্জের যারা পিছনে হটতে থাকে।

১৬. الْجَوَارِ চলতে থাকে الْكُنَّسِ আত্মগোপন করে।

১৭. وَالَّيْلِ আর রাতের কসম اِذَا عَسْعَسَ যখন তা গমনোদ্যত হয়।

১৮. وَالصُّبْحِ আর প্রাতঃকালের কসম اِذَا تَنَفَّسَ যখন তা আগমন করতে থাকে।

১৯. اِنَّهٗ لَقَوْلُ নিশ্চয় তা (এই কুরআন) আনীত বাণী رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ এক সম্মানিত ফেরেশতার।

অনুবাদ	আয়াত
২০. যিনি শক্তিশালী [এবং] আরশের মালিকের নিকট মর্যাদাবান।	ذِيْ قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِيْنٍ ﴿٢٠﴾
২১. [আর] সেখানে [অর্থাৎ আসমানসমূহে] তার কথা প্রতিপালিত হয়, [এবং] তিনি বিশ্বাসভাজন।	مُّطَاعٍ ثَمَّ اَمِيْنٍ ﴿٢١﴾
২২. আর তোমাদের এই সঙ্গী [মুহাম্মদ (সা.)] উন্মাদ নন।	وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُوْنٍ ﴿٢٢﴾
২৩. আর তিনি সেই ফেরেশতাকে পরিষ্কার আকাশ প্রান্তে দর্শন করেছেন।	وَلَقَدْ رَاٰهُ بِالْاُفُقِ الْمُبِيْنِ ﴿٢٣﴾
২৪. আর তিনি [ওহী দ্বারা জ্ঞাত] গুপ্ত কথাগুলোর ব্যাপারে কৃপণও নন।	وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ ﴿٢٤﴾
২৫. আর এই কুরআন কোনো বিতাড়িত শয়তানের কথাও নয়।	وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطٰنٍ رَّجِيْمٍ ﴿٢٥﴾
২৬. তোমরা কোন দিকে চলে যাচ্ছ?	فَاَيْنَ تَذْهَبُوْنَ ﴿٢٦﴾
২৭. এটা তো বিশ্ববাসীদের জন্য এক বিরাট নসিহতনামা।	اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿٢٧﴾
২৮. এমন লোকদের জন্য, যে তোমাদের মধ্যে সরল পথে চলতে ইচ্ছুক।	لِمَنْ شَآءَ مِنْكُمْ اَنْ يَّسْتَقِيْمَ ﴿٢٨﴾
২৯. আর তোমরা সারা বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত কোনো কিছুর ইচ্ছা করতে পার না।	وَمَا تَشَآءُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢٩﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২০. ذِيْ قُوَّةٍ যিনি শক্তিশালী عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ (এবং) আরশের মালিকের নিকট مَكِيْنٍ মর্যাদাবান।

২১. مُطَاعٍ ثَمَّ সেখানে তার কথা প্রতিপালিত হয় اَمِيْنٍ (এবং) তিনি বিশ্বাসভাজন।

২২. وَمَا صَاحِبُكُمْ আর তোমাদের এই সঙ্গী নন بِمَجْنُوْنٍ উন্মাদ।

২৩. وَلَقَدْ رَاٰهُ আর তিনি সেই ফেরেশতাকে দর্শন করেছেন بِالْاُفُقِ الْمُبِيْنِ পরিষ্কার আকাশ প্রান্তে।

২৪. وَمَا هُوَ আর তিনি নন عَلَى الْغَيْبِ গুপ্ত কথাগুলোর ব্যাপারে بِضَنِيْنٍ কৃপণও।

২৫. وَمَا هُوَ আর এটা (কুরআন) নয় بِقَوْلِ কথা شَيْطٰنٍ رَّجِيْمٍ কোনো বিতাড়িত শয়তানের।

২৬. فَاَيْنَ কোন দিকে تَذْهَبُوْنَ তোমরা চলে যাচ্ছ?

২৭. اِنْ هُوَ اِلَّا এটা তো কেবল ذِكْرٌ এক বিরাট নসিহতনামা لِّلْعٰلَمِيْنَ বিশ্ববাসীদের জন্য।

২৮. لِمَنْ এমন লোকদের জন্য شَآءَ مِنْكُمْ যে তোমাদের মধ্যে ইচ্ছুক اَنْ يَّسْتَقِيْمَ সরল পথে চলতে।

২৯. وَمَا تَشَآءُوْنَ আর তোমরা ইচ্ছা করতে পার না اِلَّآ তবে পার اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ আল্লাহ ইচ্ছা করলে رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ সারা বিশ্বের প্রতিপালক।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : تَكْوِيْر অর্থ : সংকোচন। আলোচ্য সূরার প্রথম আয়াতের كورت শব্দের মাসদার 'তাকভীর' হতে এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে। এর অর্থ সংকুচিত করা বা গুটিয়ে নেওয়া। এর এ নামকরণের বিশেষত্ব হলো, সূরাটিতে সূর্যরশ্মিকে সংকুচিত করা বা নিষ্প্রভ করার কথা উল্লিখিত হয়েছে। এতে ২৯টি আয়াত, ১০৪টি বাক্য এবং ৫৩৩টি অক্ষর রয়েছে। [নূরুল কুরআন]

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরা আবাসায় কিয়ামতের দিনের মহাবিপদের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, সে বিপদ সংকুল সময় একান্ত আপনজনও একে অন্যের খবর নিবে না; বরং একে অপরের নিকট হতে পলায়নপর হবে। আর অত্র সূরায় কিয়ামত দিবসের ভয়াবহ দৃশ্যের বিবরণ স্থান পেয়েছে। –[নূরুল কুরআন]

সূরাটি অবতীর্ণ হওয়ার সময়কাল : অত্র সূরার আলোচিত বিষয়াদি এবং কথার ভঙ্গি দেখে স্পষ্ট মনে হয়- এটা মাক্কী জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে অবতীর্ণ সূরাসমূহের মধ্যে একটি। এর বিষয়বস্তু জানার জন্য তাফসীরে খাযেনে উল্লিখিত সহীহ তিরমিযী শরীফের একটি হাদীসই যথেষ্ট। হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেন, রাসূলে কারীম ﷺ বলেছেন, যদি তোমাদের মধ্যে কারো কিয়ামতের দিনকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার আকাঙ্ক্ষা জাগে, সে যেন সূরা আত-তাকভীর ও সূরা আল-ইনশিক্বাক্ব পাঠ করে।

এ সূরায় দু'টি বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। একটি পরকাল অপরটি রেসালত। প্রথম তেরটি আয়াতে 'কিয়ামত' অর্থাৎ মহাপ্রলয় ও পুনরুত্থানের দশটি ঘটনা বিবৃত হয়েছে। তন্মধ্যে প্রথম ছয়টি আয়াতে মহাপ্রলয়ের ভয়াবহ বিভীষিকার বর্ণনা করা হয়েছে। এ পর্যায়ে সূর্য নিষ্প্রভ হয়ে যাবে, নক্ষত্রমালা কক্ষচ্যুত হয়ে খসে পড়বে, পর্বতসমূহ উৎপাটিত হয়ে মেঘের মতো শূন্যে উড়তে থাকবে, ভয়-বিহ্বল মানুষের একান্ত প্রিয় বস্তুর প্রতিও লক্ষ্য থাকবে না। বন-জঙ্গলের জীব-জন্তু দিকবিদিক জ্ঞানহারা হয়ে একস্থানে সমবেত হবে, সমুদ্রের পানি উদ্বেলিত হয়ে আগুন জ্বলে উঠবে। এর পরবর্তী সাতটি আয়াতে কিয়ামতের দ্বিতীয় পর্যায়ের কথা বলা হয়েছে। এ সময় আত্মাসমূহ নতুন করে দেহের মধ্যে সংযোজিত হবে, আমলনামা দেখানো হবে, অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হবে, আকাশসমূহের সমস্ত আবরণ দূর হবে এবং বেহেশত ও দোজখ তখন চোখের সামনে ভেসে উঠবে। পরকালের এ বর্ণনা প্রদানের পর মানুষকে চিন্তা করার জন্য আহ্বান করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, সেদিন প্রত্যেকেই জানতে পারবে, সে ইহকাল হতে কি সম্বল নিয়ে পরকালে এসেছে। অতঃপর কুরআন ও রেসালত সম্পর্কে বলা হয়েছে। এ পর্যায়ে মক্কাবাসী কাফেরদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে যে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ তোমাদের কাছে যা পেশ করছে, তা পাগলের প্রলাপ বা শয়তানের কুমন্ত্রণা নয়; বরং তা আল্লাহ তা'আলার এক সম্মানিত বার্তাবাহক ফেরেশতা তথা হযরত জিবরাঈল (আ.) কর্তৃক আল্লাহর পক্ষ হতে আনীত বাণী। হযরত মুহাম্মদ ﷺ উজ্জ্বল আকাশ প্রান্তে দিবালোকে নিজ চোখে তাঁকে দেখেছেন। এ মহান আদর্শ হতে বিচ্যুত হয়ে তোমরা কেন বিপথগামী হচ্ছ?

সূরার শেষ তিনটি আয়াত এ সূরার উপসংহার। পবিত্র কুরআন রাব্বুল আলামীনের পক্ষ হতে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য উপদেশ বাণী। অতএব যে কেউ ইচ্ছা করলে এ কুরআনকে বরণ করে ইহকাল ও পরকালকে সার্থক করতে পারে। আর এটা আল্লাহর কালাম হলেও এর প্রভাব-প্রতিক্রিয়া আল্লাহর ইচ্ছার উপরই নির্ভর করে। তিনি ইচ্ছে করলে মানব মনে এর প্রভাব বিস্তার করতে পারেন।

সূরাটির ফজিলত : বর্ণিত আছে যে, "مَنْ قَرَءَ سُوْرَةَ التَّكْوِيْرِ اَعَاذَهُ اللّٰهُ اَنْ يَفْضَحَهُ حِيْنَ نَقْرِ مَخِيْفَتِهِ" অর্থাৎ যে ব্যক্তি সূরা আত-তাকভীর পাঠ করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে আমলনামা খোলার সময় লাঞ্ছনা হতে রক্ষা করবেন। –[অবশ্য বলা হয়েছে যে, উক্ত হাদীসখানা জাল।]

সূরাটির শিক্ষণীয় বিষয় : অত্র সূরায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানুষদেরকে (কিয়ামতের দিন) জুড়ে দেওয়া হবে। এ সম্পর্কে হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেছেন,

"يُقْرَنُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ مَعَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ فِى الْجَنَّةِ وَيُقْرَنُ الرَّجُلُ السُّوْءُ مَعَ الرَّجُلِ السُّوْءِ فِى النَّارِ فَذٰلِكَ تَزْوِيْجُ النُّفُوْسِ"

অর্থাৎ লোকদেরকে জুড়ে দেওয়ার অর্থ হলো, নেককার নেককারের সাথে জান্নাতী হবে এবং পাপী পাপীর সাথে জাহান্নামী হবে। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন–"اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ" অর্থাৎ লোক যাকে ভালোবাসবে তার সঙ্গ লাভ করবে। এটা হতে বোধগম্য হয় যে, দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতে লোকদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক দেখা যায়- শায়খ ও মুরিদের সম্পর্কের তাৎপর্য এখানেই।

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ [١٩]

শানে নুযূল : মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে পাগল বলত সুতরাং তাদের মতে কুরআন হলো পাগলের প্রলাপ মাত্র। মুশরিকদের এহেন কুৎসিত মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[কুরতুবী ২০৮/১৯]

وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ [٢٩]

শানে নুযূল : আবদ বিন হুমাইদ প্রমুখ হযরত সুলাইমান বিন মূসা -এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ (তোমাদের মধ্য হতে এমন লোকদের জন্যে যারা সরল পথে চলতে ইচ্ছুক) আয়াত যখন নাজিল হয়, তখন আবূ জাহল বলত তা-তো আমাদের ব্যাপার। আমরা ইচ্ছা করলেই সরল পথে চলতে পারি। সেই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে যে لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ আয়াত যখন নাজিল হয়, তখন আবূ জাহল বলেছিল যে, এ বিষয়টি আমাদের ইচ্ছাধীন আমরা ইচ্ছা করলেই সরল পথে চলতে পারি আবার নাও চলতে পারি। তখন সেই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেছেন।

–[তবারী ৪৭৫/১২, ইবনে কাছীর ৪৮০/৪, কুরতুবী ২১১/১৯, দুররে মানছুর ২২২/৬]

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ – تَكْوِيْر -এর এক অর্থ জ্যোতিহীন হওয়া। হাসান বসরী (র.) এই তাফসীরই করেছেন। এর অপর অর্থ নিক্ষেপ করাও হয়ে থাকে। রবী ইবনে খাইসাম (র.) এই তাফসীর করেছেন। উদ্দেশ্য এই যে, সূর্যকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হবে এবং সূর্যের উত্তাপে সারা সমুদ্র অগ্নিতে পরিণত হবে। এই দুই তাফসীরের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। কেননা, এটা সম্ভবপর যে, প্রথমে সূর্যকে জ্যোতিহীন করে দেওয়া হবে, অতঃপর সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হবে। সহীহ বুখারীতে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতক্রমে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : কিয়ামতের দিন চন্দ্র-সূর্য সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হবে। মুসনাদে আহমদে আছে জাহান্নামে নিক্ষেপ্ত হবে। এই আয়াত প্রসঙ্গে আরও কয়েকজন তাফসীরবিদ বর্ণনা করেন যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা সূর্য, চন্দ্র ও সমস্ত নক্ষত্রকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করবেন, অতঃপর এর উপর প্রবল বাতাস প্রবাহিত হবে। ফলে সারা সমুদ্র অগ্নি হয়ে যাবে। এভাবে চন্দ্র, সূর্য সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হবে এবং জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে–এই উভয় কথাই ঠিক হয়ে যায়। কেননা সারা সমুদ্র তখন জাহান্নাম হয়ে যাবে। –[মাযহারী, কুরতুবী]

وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ – اِنْكِدَار –এর অর্থ পতিত হওয়া। পূর্ববর্তীগণ থেকে এই তাফসীরই বর্ণিত হয়েছে। আকাশের সব নক্ষত্র সমুদ্রে পতিত হবে। পূর্বোক্ত রেওয়ায়েতসমূহে এর বিবরণ রয়েছে।

وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ আরবের রীতি অনুযায়ী দৃষ্টান্তস্বরূপ একথা বলা হয়েছে। কেননা কুরআনে আরবদেরকেই প্রথমে সম্বোধন করা হয়েছে। তাদের কাছে দশ মাসের গর্ভবতী উষ্ট্রী বিরাট ধনরূপে গণ্য হতো। তারা এর দুগ্ধ ও বাচ্চার অপেক্ষা করত। ফলে একে দৃষ্টির আড়াল হতে দিত না এবং কখনও স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিত না।

وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ – تَسْجِيْر -এর অর্থ অগ্নিসংযোগ করা ও প্রজ্বলিত করা। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এই অর্থই নিয়েছেন। কোনো কোনো তাফসীরবিদ এর অর্থ নিয়েছেন মিশ্রিত করা। এতদুভয়ের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। প্রথমে লোনা সমুদ্র ও মিঠা সমুদ্র একাকার করা হবে। মাঝখানের অন্তরায় শেষ করে দেওয়া হবে। ফলে উভয় প্রকার সমুদ্রের পানি মিশ্রিত হয়ে যাবে। অতঃপর সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রসমূহকে এতে নিক্ষেপ করে সমস্ত পানিকে অগ্নি তথা জাহান্নামে পরিণত করা হবে। –[মাযহারী]

وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ অর্থাৎ যখন হাশরে সমবেত লোকদেরকে বিভিন্ন দলে দলবদ্ধ করে দেওয়া হবে। এই দলবদ্ধকরণ ঈমান ও কর্মের দিক দিয়ে করা হবে। কাফের এক জায়গায় ও মু'মিন এক জায়গায়। কাফের এবং মু'মিনের মধ্যেও কর্ম এবং অভ্যাসের পার্থক্য থাকে। এদিক দিয়ে কাফেরদেরও বিভিন্ন প্রকার দল হবে আর মু'মিনদেরও বিশ্বাস এবং কর্মের ভিত্তিতে দল হবে। বায়হাকী রেওয়ায়েত করেন, যারা ভালো হোক মন্দ হোক একই প্রকার কর্ম করবে, তাদেরকে এক জায়গায় জড়ো করা হবে। উদাহরণত আলিমগণ এক জায়গায়, ইবাদতকারী সংসারবিমুখগণ এক জায়গায়, জিহাদকারী গাজীগণ এক জায়গায় এবং সদ্‌কা-খায়রাতে বৈশিষ্ট্যের অধিকারীগণ এক জায়গায় সমবেত হবে। এমনিভাবে মন্দ লোকদের মধ্যে চোর-ডাকাতকে এক জায়গায়, ব্যভিচারীকে এক জায়গায় এবং অন্যান্য বিশেষ গোনাহে অংশগ্রহণকারীদেকে এক জায়গায় জড়ো করা হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : হাশরে প্রত্যেক ব্যক্তি স্বজাতির সাথে থাকবে (কিন্তু এই জাতীয়তা বংশ অথবা দেশভিত্তিক হবে না বরং কর্ম ও বিশ্বাসভিত্তিক হবে)। তিনি এর প্রমাণস্বরূপ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً –আয়াতখানি পেশ করেন। অর্থাৎ হাশরে লোকদের তিনটি প্রধান দল হবে–১. পূর্ববর্তী সৎকর্মী লোকদের, ২. আসহাবুল ইয়ামীনের এবং ৩. আসহাবুশ শিমালের দল। প্রথমোক্ত দুই দল মুক্তি পাবে এবং তৃতীয় দলটি হবে কাফের পাপাচারীদের। তারা মুক্তি পাবে না।

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ – مَوْءُودَةٌ-এর অর্থ জীবন্ত প্রোথিত কন্যা। মূর্খ আরবরা কন্যাসন্তানকে লজ্জাকর মনে করত এবং জীবন্তই মাটিতে প্রোথিত করে দিত। ইসলাম এই কু-প্রথার মূলোৎপাটন করে। আয়াতে বলা হয়েছে যে, হাশরে জীবন্ত প্রোথিত কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে। ভাষাদৃষ্টে জানা যায় যে, স্বয়ং কন্যাকেই জিজ্ঞেস করা হবে কি অপরাধে তাতে হত্যা করা হলো? উদ্দেশ্য এই যে, সে নিজের নির্দোষ ও মজলুম হওয়ার বিষয় আল্লাহর কাছে পেশ করুক, যাতে এর প্রতিশোধ নেওয়া যায়। এটাও সম্ভবপর যে, জীবন্ত প্রোথিত কন্যা সম্পর্কে তার হত্যাকারীদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে যে, তোমরা একে কি অপরাধে হত্যা করলে?

এখানে একটি প্রশ্ন থেকে যায় যে, কিয়ামতের নামই তো يَوْمُ الْحِسَابِ (হিসাব দিবস), يَوْمُ الْجَزَاءِ (প্রতিদান দিবস) ও يَوْمُ الدِّينِ (বিচার দিবস)। এতে প্রত্যেক ব্যক্তি তার সব কাজকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। এ স্থলে বিশেষভাবে জীবন্ত প্রোথিত কন্যা সম্পর্কিত প্রশ্নকে এতো গুরুত্ব দেওয়ার রহস্য কি? চিন্তা করলে জানা যায় যে, এই মজলুম শিশু কন্যাকে স্বয়ং তার পিতামাতা হত্যা করেছে। তার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তার পক্ষ থেকে কোনো বাদী নেই; বিশেষত গোপনে হত্যা করার কারণে কেউ জানতেই পারেনি যে সাক্ষ্য দেবে। হাশরের ময়দানে যে ন্যায়বিচারের আদালত কায়েম হবে, তাতে এমন অত্যাচার ও নিপীড়নকেও সর্বসমক্ষে আনা হবে, যার কোনো সাক্ষ্য নেই এবং কোনো দাবিদারও নেই।

চার মাস পর গর্ভপাত করা হত্যার শামিল : শিশুদেরকে জীবন্ত প্রোথিত করা অথবা হত্যা করা মহাপাপ ও গুরুতর জুলুম এবং চার মাসের পর গর্ভপাত করাও এই জুলুমের শামিল। কেননা চতুর্থ মাসে গর্ভস্থ ভ্রূণে প্রাণ সঞ্চারিত হয় এবং সে জীবিত মানুষের মধ্যে গণ্য হয়। এমনিভাবে যে ব্যক্তি গর্ভবতী নারীর পেটে আঘাত করে, ফলে গর্ভপাত হয়ে যায়, উম্মতের ঐকমত্যে তার উপর 'গুররা' ওয়াজিব হবে। অর্থাৎ একটি গোলাম অথবা তার মূল্য দিতে হবে। যদি জীবিতাবস্থায় গর্ভপাত হয়, এরপর মারা যায়, তবে বয়স্ক লোকের সমান রক্তপণ দিতে হবে। একান্ত অপারগতা না হলে চার মাসের পূর্বেও গর্ভপাত করা হারাম, অবশ্য প্রথমোক্ত হারামের চেয়ে কিছুটা কম। কারণ এটা কোনো জীবিত মানুষের প্রকাশ্য হত্যা নয়। –[মাযহারী]

আজকাল দুনিয়াতে জন্মশাসনের নামে এমন পন্থা অবলম্বন করা হয়, যাতে গর্ভ সঞ্চারই হয় না। এর শত শত পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ একেও وَأْدٌ خَفِيٌّ –অর্থাৎ 'গোপনভাবে শিশুকে জীবন্ত প্রোথিত করা' আখ্যা দিয়েছেন। –(মুসলিম) অন্য কতক রেওয়ায়েতে 'আযল' তথা প্রত্যাহার পদ্ধতির কথা আছে। এতে এমন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়, যাতে বীর্য গর্ভাশয়ে না যায়। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে নীরবতা ও নিষেধ না করা বর্ণিত আছে। এটা প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সীমিত। তাও এভাবে করতে হবে, যাতে স্থায়ী বংশবিস্তার রোধের পদ্ধতি না হয়ে যায়। আজকাল জন্ম নিয়ন্ত্রণের নামে প্রচলিত ঔষধপত্র ও ব্যবস্থাপত্রের মধ্যে কতগুলো এমন, যাদ্বারা সন্তান জন্মদান স্থায়ীভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়। শরিয়তে কোনোক্রমেই এর অনুমতি নেই।

وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ – كَشْط-এর আভিধানিক অর্থ জন্তুর চামড়া খসানো। বাহ্যত এটা প্রথম ফুঁকের সময়কার অবস্থা, যা এই দুনিয়াতেই ঘটবে। আকাশের সৌন্দর্য সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রসমূহ জ্যোতিহীন হয়ে সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হবে। আকাশের বর্তমান আকার-আকৃতি বদলে যাবে। এই অবস্থাকে كَشْط -শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। কোনো কোনো তাফসীরবিদ এর অর্থ লিখেছেন গুছিয়ে নেওয়া। আয়াতের অর্থ এই যে, মাথার উপর ছাদের ন্যায় বিস্তৃত এই আকাশকে গুছিয়ে নেওয়া হবে।

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ –অর্থাৎ কিয়ামতের উপরিউক্ত পরিস্থিতিতে প্রত্যেকেই জেনে নেবে সে কি নিয়ে এসেছে। অর্থাৎ সৎ কর্ম কিংবা অসৎ কর্ম– সব তার দৃষ্টির সামনে এসে যাবে– আমলনামায় লিখিত অবস্থায় অথবা অন্য কোনো বিশেষ পন্থায়। হাদীস থেকে এরূপই জানা যায়। কিয়ামতের এসব অবস্থা ও ভয়াবহ দৃশ্যত্য বর্ণনা করার পর আল্লাহ তা'আলা কয়েকটি নক্ষত্রের শপথ করে বলেছেন যে, এই কুরআন সত্য এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে খুব হেফাজত সহকারে প্রেরিত। যার প্রতি এই কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, তিনি একজন মহাপুরুষ। তিনি ওহী নিয়ে আগমনকারী ফেরেশতাকে পূর্ব থেকে চিনতেন, জানতেন। তাই এর সত্যতায় কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। এখানে পাঁচটি নক্ষত্রের শপথ করা হয়েছে। সৌরবিজ্ঞানীদের ভাষায় এগুলোকে خَمْسَةٌ مُتَحَيِّرَةٌ (অদ্ভুত পঞ্চ নক্ষত্র) বলা হয়। এরূপ বলার কারণ এগুলোর অদ্ভুত গতিবিধি। কখনো পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে চলে, অতঃপর পশ্চাৎগামী হয়ে পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে চলে। এই বিভিন্নমুখী গতির কারণ সম্পর্কে প্রাচীন গ্রীক দর্শনিকদের বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। আধুনিক দার্শনিকদের গবেষণা সেসব উক্তির কোনোটিকে সমর্থন করে এবং কোনেটিকে প্রত্যাখ্যান করে। এর প্রকৃত স্বরূপ স্রষ্টা ব্যতীত আর কেউই জানেন না। সবাই অনুমানভিত্তিক কথা বলে যা ভুলও হতে পারে, শুদ্ধও হতে পারে। কুরআন মুসলমানদেরকে এই অনর্থক আলোচনায় জড়িত করেনি। দরকারী কথাটুকু বলে দিয়েছে যে, আল্লাহ অপার মহিমা ও কুদরতের এসব নিদর্শন দেখে তোমরা তাঁর প্রতি ঈমান আন।

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ ذِيْ قُوَّةٍ –অর্থাৎ এই কুরআন একজন সম্মানিত দূতের আনীত কালাম। তিনি শক্তিশালী, আরশের অধিপতির কাছে মর্যাদাশীল, ফেরেশতাগণের মান্যবর এবং আল্লাহর বিশ্বাসভাজন। পয়গাম আনা-নেওয়ার কাজে তার তরফ থেকে বিশ্বাসভঙ্গ ও কম-বেশি করার আশঙ্কা নেই। এখানে رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ বলে বাহ্যত হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে বোঝানো হয়েছে। পয়গম্বরগণের ন্যায় ফেরেশতাগণের বেলায়ও 'রাসূল' শব্দ ব্যবহৃত হয়। উল্লিখিত সবগুলো বিশেষণ হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর জন্য বিনাদ্বিধায় প্রযোজ্য। তিনি যে শক্তিশালী, সূরা নজমে তার পরিষ্কার উল্লেখ আছে : عَلَّمَهُ شَدِيْدُ الْقُوٰى তিনি যে আরশ ও আকাশবাসী ফেরেশতাগণের মান্যবর, তা মি'রাজের হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সাথে নিয়ে আকাশে পৌঁছলে তাঁর আদেশে ফেরেশতারা আকাশের দরজাসমূহ খুলে দেয়। তিনি যে اَمِيْنٍ -তথা বিশ্বাসভাজন, তা বর্ণনাসাপেক্ষ নয়। কোনো কোনো তাফসীরবিদ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ -এর অর্থ নিয়েছেন মুহাম্মদ ﷺ। তাঁরা উল্লিখিত বিশেষণগুলোকে কিছু কিছু সদর্থ করে তাঁর জন্য প্রযোজ্য করেছেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাহাত্ম্য এবং কাফেরদের অলীক অভিযোগের জবাব দেওয়া হয়েছে। وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُوْنٍ -যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে উন্মাদ বলত, এতে তাদেরকে জবাব দেওয়া হয়েছে। وَلَقَدْ رَاٰهُ بِالْاُفُقِ الْمُبِيْنِ –অর্থাৎ তিনি জিবরাঈল (আ.)-কে প্রকাশ্য দিগন্তে দেখেছেন। সূরা নজমে আছে : فَاسْتَوٰى وَهُوَ بِالْاُفُقِ الْاَعْلٰى– এই দেখার কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, তিনি ওহী নিয়ে আগমনকারী জিবরাঈল (আ.)-এর সাথে পরিচিত ছিলেন, তাঁকে আসল আকার-আকৃতিতেও দেখেছিলেন। তাই এই ওহীতে কোনোরূপ সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই।

শব্দ বিশ্লেষণ :

كُوِّرَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى مجهول বাব تَفْعِيْل মাসদার تَكْوِيْرٌ মূলবর্ণ (ك – و – ر) জিনস اجوف واوى অর্থ– নিস্প্রভ করা হবে।

اِنْكَدَرَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব اِنْفِعَالٌ মাসদার اِنْكِدَارٌ মূলবর্ণ (ك – د – ر) জিনস صحيح অর্থ– খসে খসে পড়বে।

عُطِّلَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى مجهول বাব تَفْعِيْل মাসদার تَعْطِيْلٌ মূলবর্ণ (ع – ط – ل) জিনস صحيح অর্থ– উপেক্ষিত হবে।

سُجِّرَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى مجهول বাব تَفْعِيْل মাসদার تَسْجِيْر মূলবর্ণ (س – ج – ر) জিনস صحيح অর্থ– স্ফীত করা হবে।

الْمَوْؤُدَةُ : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم مفعول বাব ضَرَبَ মাসদার وَاْدٌ মূলবর্ণ (و – ا – د) জিনস মুরাক্কাব مهموز عين এবং مثال واوى অর্থ– জীবন্ত প্রোথিত কন্যা।

كُشِطَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى مجهول বাব نَصَرَ মাসদার كَشْطٌ মূলবর্ণ (ك – ش – ط) জিনস صحيح অর্থ– খুলে দেওয়া হবে।

سُعِّرَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى مجهول বাব تَفْعِيْل মাসদার تَسْعِيْرٌ মূলবর্ণ (س – ع – ر) জিনস صحيح অর্থ– প্রজ্বলিত করা হবে।

اُزْلِفَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى مجهول বাব اِفْعَالٌ মসদার اِزْلَافٌ মূলবর্ণ (ز – ل – ف) জিনস صحيح অর্থ– নিকটবর্তী করে দেওয়া হবে।

الْخُنَّسِ : ইসমে ফায়েল, ওয়াহেদ মুয়ান্নাছ, বাব ضَرَبَ ও نَصَرَ মাসদার خُنُوْسٌ ও خُنَّاسٌ মূলবর্ণ (خ – ن – س) জিনস صحيح অর্থ– পশ্চাদগামী, প্রত্যাবর্তনকারী। মাসদার : خَنَسٌ কোনো কোনো মুফাসসিরের মতে এর দ্বারা উদ্দেশ্য নক্ষত্র।

اَلْكُنَّسِ : اَلْكُنَّاسُ -এর বহুবচন। বাব ضَرَبَ ; كُنَّاسٌ অর্থ– হরিণ থাকার ঝোপ-ঝাড়। জঙ্গলে হরিণের আত্মগোপন। আয়াতে كُنَّسٌ দ্বারা উদ্দেশ্য অপ্রকাশ্য নক্ষত্র।

عَسْعَسَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى مطلق معروف বাব بَعْثَرَ মাসদার عَسْعَسَةً মূলবর্ণ (ع - س - ع - س) জিনস مضاعف رباعى অর্থ– রাতের অন্ধকার দূর হয়, রাতের অবসান হয়।

تَنَفَّسَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفَعُّلْ মাসদার تَنَفُّس মূলবর্ণ (ن - ف - س) জিনস صحيح অর্থ– শ্বাস নিয়েছে। শ্বাস গ্রহণ করা, হাঁফ ছাড়া। এখানে উদ্দেশ্য যখন উষায় তার আর্বিভাব হয়।

اَمِيْنٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالْ মাসদার اَمْنٌ ও اِمَانَةً; মূলবর্ণ (ا – م – ن) জিনস مهموز فاء অর্থ– বিশ্বস্ত, বিশ্বাস ভাজন।

اَلْاُفُقْ : খোলা দিগন্তে। খোলা আকাশের এক প্রান্তে। বহুবচন– اِفَاقٌ আসে।

تَذْهَبُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার ذِهَابٌ মূলবর্ণ (د - ه - ب) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা যাবে।

يَسْتَقِيْمَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব إِسْتِفْعَالْ মাসদার اِسْتِقَامَةً অর্থ– সোজা চলা।

مَكِيْنٌ : সিফাতে মুশাব্বাহ (যের বিশিষ্ট)। অর্থ– সম্মানিত, মর্যাদাবান। মাসদার كَوْنَ অর্থ, হওয়া।

مُطَاعٍ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব إِفْعَالْ মাসদার إِطَاعَةً মূলবর্ণ (ط – و – ع) জিনস اجوف واوى অর্থ– অনুসৃত। যাকে মান্য করা হয়। তার কথা প্রতিপালিত হয়।

ضَنِيْنٍ : সিফাতে মুশাব্বাহ। অর্থ : কৃপণ, লোভী, অপ্রফুল্ল। ضَنٌ থেকে মুশতাক। যার অর্থ, কার্পণ্য করা, দিতে না চাওয়া, আবার কখনো ضَنٌ-এর ব্যবহার হয় উৎকৃষ্ট জিনিসের ক্ষেত্রে কৃপণতা করা সম্পর্কে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَمَا تَشَاءُوْنَ اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ : এখানে واو টি আতেফা, আর مَا টি নাফিয়া تَشَاءُوْنَ ফে'ল, তার যমীর ফায়েল, اِلَّا হলো اداة حصر আর اَنْ ও তার পরে যা রয়েছে তা نصب بنزع الخافض-এর স্থলে হয়েছে। এখন جار এবং মাজরূর মিলে تَشَاءُوْنَ-এর সাথে متعلق হয়েছে। আর اَللّٰهُ শব্দটি ফায়েল এবং رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ লো اَللّٰهُ শব্দ হতে بدل অথবা اَللّٰهُ শব্দ হতে সিফাত হয়েছে। –[ই'রাবুল কুরআন ৮ম খণ্ড, পৃ. ২৩৮]

سُوْرَةُ الْاِنْفِطَارِ مَكِّيَّةٌ

সূরা ইনফিত্বার

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত– ১৯, রুকূ'– ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

অনুবাদ	আয়াত
১. যখন আসমান বিদীর্ণ হয়ে যাবে।	اِذَا السَّمَآءُ انْفَطَرَتْ ﴿١﴾
২. আর যখন নক্ষত্রগুলো খসে পড়বে।	وَاِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ﴿٢﴾
৩. আর যখন সাগরসমূহ প্রবাহিত হয়ে পড়বে।	وَاِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ﴿٣﴾
৪. আর যখন কবরসমূহ উৎখাত করা হবে।	وَاِذَا الْقُبُوْرُ بُعْثِرَتْ ﴿٤﴾
৫. তখন প্রত্যেকে জানবে, সে কি অগ্রে পাঠিয়েছে ও কী পশ্চাতে রেখে গেছে।	عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَاَخَّرَتْ ﴿٥﴾
৬. হে মানব! কোন বস্তু তোমাকে তোমার এমন দয়ালু প্রতিপালক সম্বন্ধে ভ্রমে ফেলে রেখেছে।	يٰۤاَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ ﴿٦﴾
৭. যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অনন্তর তোমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো যথাযথভাবে গঠন করেছেন, তৎপর তোমাকে সুসামঞ্জস্যভাবে তৈরি করেছেন।	الَّذِىْ خَلَقَكَ فَسَوّٰىكَ فَعَدَلَكَ ﴿٧﴾
৮. যে আকৃতিতে তিনি ইচ্ছা করেছেন তোমাকে গঠন করেছেন।	فِىْۤ اَىِّ صُوْرَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ ﴿٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. اِذَا السَّمَآءُ যখন অসমান اَنْفَطَرَتْ বিদীর্ণ হয়ে যাবে।

২. وَاِذَا الْكَوَاكِبُ আর যখন নক্ষত্রগুলো انْتَثَرَتْ খসে পড়বে।

৩. وَاِذَا الْبِحَارُ আর যখন সাগরসমূহ فُجِّرَتْ প্রবাহিত করা হবে।

৪. وَاِذَا الْقُبُوْرُ আর যখন কবরসমূহ بُعْثِرَتْ উৎখাত করা হবে।

৫. عَلِمَتْ نَفْسٌ তখন প্রত্যেকে জানবে مَا قَدَّمَتْ সে কি অগ্রে পাঠিয়েছে وَاَخَّرَتْ ও কী পশ্চাতে রেখে গেছে।

৬. يٰۤاَيُّهَا الْاِنْسَانُ হে মানব! مَا غَرَّكَ কোন বস্তু তোমাকে ভ্রমে ফেলে রেখেছে بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ তোমার এমন দয়ালু প্রতিপালক সম্বন্ধে।

৭. الَّذِىْ خَلَقَكَ যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন فَسَوّٰىكَ অনন্তর তোমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো যথাযথভাবে গঠন করেছেন فَعَدَلَكَ অতঃপর তোমাকে সুসামঞ্জস্যভাবে তৈরি করেছেন।

৮. فِىْۤ اَىِّ صُوْرَةٍ যে আকৃতিতে مَا شَآءَ তিনি ইচ্ছা করেছেন رَكَّبَكَ তোমাকে গঠন করেছেন।

কَلَّا بَلْ تُكَذِّبُوْنَ بِالدِّيْنِ ﴿٩﴾	৯. না, কখনো নয়, বরং তোমরা প্রতিফলকেই অবিশ্বাস করেছ।
وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَ ﴿١٠﴾	১০. আর তোমাদের উপর নিযুক্ত রয়েছে সংরক্ষক ফেরেশতাগণ।
كِرَامًا كَاتِبِيْنَ ﴿١١﴾	১১. সম্মানিত লিখকগণ,
يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ ﴿١٢﴾	১২. যারা তোমাদের সমস্ত কার্যকলাপ সম্পর্কে অবগত আছে।
اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِيْ نَعِيْمٍ ﴿١٣﴾	১৩. নেককার লোকগণ নিশ্চয় সুখে থাকবে।
وَّاِنَّ الْفُجَّارَ لَفِيْ جَحِيْمٍ ﴿١٤﴾	১৪. আর বদকার লোক নিশ্চয় দোজখে থাকবে।
يَّصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّيْنِ ﴿١٥﴾	১৫. তারা প্রতিফল দিবসে তাতে প্রবেশ করবে।
وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَآئِبِيْنَ ﴿١٦﴾	১৬. এবং তা হতে বহির্গত হবে না।
وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ ﴿١٧﴾	১৭. আর আপনার কী জানা আছে যে, সেই প্রতিফল দিবস কিরূপ?
ثُمَّ مَآ اَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ ﴿١٨﴾	১৮. পুনরায় [বলছি] আপনার কি জানা আছে, সেই প্রতিফল দিবস কিরূপ?
يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْـًٔا ؕ وَالْاَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ ﴿١٩﴾	১৯. তা এমন দিন, যেদিন কোনো ব্যক্তির পক্ষে কোনো ব্যক্তির উপকার করার কিছুমাত্র অধিকার চলবে না, আর সেদিন সমস্ত নির্দেশ একমাত্র আল্লাহরই হবে।

শাব্দিক অনুবাদ :

৯. كَلَّا কখনো নয় بَلْ বরং تُكَذِّبُوْنَ তোমরা অবিশ্বাস কর بِالدِّيْنِ প্রতিফলকেই

১০. وَاِنَّ আর নিশ্চয় عَلَيْكُمْ তোমাদের উপর রয়েছে لَحٰفِظِيْنَ সংরক্ষক ফেরেশতাগণ।

১১. كِرَامًا সম্মানিত كَاتِبِيْنَ লিখকগণ

১২. يَعْلَمُوْنَ তারা অবগত আছে / জানে مَا تَفْعَلُوْنَ তোমাদের কৃতকর্ম / কার্যকলাপ সম্পর্কে / তোমরা যা কর, সে সম্পর্কে

১৩. اِنَّ الْاَبْرَارَ নিশ্চয় নেককার লোকগণ لَفِيْ نَعِيْمٍ সুখে থাকবে

১৪. وَاِنَّ الْفُجَّارَ আর নিশ্চয় বদকার লোকজন لَفِيْ جَحِيْمٍ দোজখে থাকবে

১৫. يَصْلَوْنَهَا তারা তাতে প্রবেশ করবে يَوْمَ الدِّيْنِ প্রতিফল দিবসে

১৬. وَمَا هُمْ এবং তারা হবে না عَنْهَا তা হতে بِغَآئِبِيْنَ বহির্গত / অনুপস্থিত

১৭. وَمَآ اَدْرٰىكَ আর আপনার কী জানা আছে / আপনি কী জানেন مَا يَوْمُ الدِّيْنِ সেই প্রতিফল দিবস কিরূপ

১৮. ثُمَّ অতঃপর مَآ اَدْرٰىكَ আর আপনার কী জানা আছে / আপনি কী জানেন مَا يَوْمُ الدِّيْنِ সেই প্রতিফল দিবস কিরূপ।

১৯. يَوْمَ এমন এক দিন لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ কোনো ব্যক্তি মালিক হবে না لِنَفْسٍ অন্য কোনো ব্যক্তির জন্য شَيْـًٔا কোনো কিছুর وَالْاَمْرُ আর সমস্ত নির্দেশ يَوْمَئِذٍ সেদিন لِلّٰهِ একমাত্র আল্লাহর জন্যই হবে

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : আলোচ্য সূরাটির নাম তার প্রথম আয়াতের শব্দ اِنْفَطَرَتْ হতে চয়ন করা হয়েছে। انفطرت শব্দটি اَلْاِنْفِطَار হতে নির্গত। اَلْاِنْفِطَار -এর অর্থ হলো ফেটে যাওয়া, দীর্ণ-বিদীর্ণ হওয়া। এ সূরায় আসমান বিদীর্ণ হওয়ার উল্লেখ থাকায় এ সূরাকে এরূপ নামকরণ করা হয়েছে। এতে ১৯ আয়াত ৮০ বাক্য এবং ১০৭টি অক্ষর রয়েছে। –[নূরুল কোরআন]

অবতীর্ণ হওয়ার সময়-কাল : এ সূরা এবং তার পূর্ববর্তী সূরা 'আত-তাকভীর' -এর বিষয়বস্তুর মধ্যে মিল রয়েছে। অতএব, উভয় সূরা অবতীর্ণ হওয়ার সময়ও প্রায় কাছাকাছি হবে। অর্থাৎ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর মাক্কী জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে তা নাজিল হয়েছে। তবে এটি সূরা আন-নাযি'আতের পর অবতীর্ণ হয়।

সূরাটির বিষয়বস্তু ও মূলবক্তব্য : আলোচ্য সূরাটির মূলবক্তব্য হলো পরকাল। মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী, ইবনুল মুনযির, তাবারানী, হাকিম ও ইবনে মারদুবিয়া বর্ণনা করেছেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে নিম্নোক্ত হাদীস উল্লেখ করেছেন।

"مَنْ سَرَّهٗ اَنْ يَّنْظُرَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ رَأْىَ عَيْنٍ فَلْيَقْرَأْ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَ اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَ اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ.

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিনকে প্রত্যক্ষভাবে দেখতে চায় সে যেন সূরা তাকভীর, ইনফিতার ও সূরা ইনশিক্বাক্ব পাঠ করে।

এ সূরায় কিয়ামতের চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, এ দিন যখন উপস্থিত হবে তখন প্রত্যেক ব্যক্তির সম্মুখে তার যাবতীয় কৃতকর্ম উপস্থিত হবে। অতঃপর মানুষের মধ্যে আত্মসম্বিত ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হয়েছে। বুঝাতে চেষ্টা করা হয়েছে যে, যে মহান আল্লাহ তোমাকে জীবন দিয়েছেন, যাঁর ঐকান্তিক দয়া এবং অনুগ্রহে আজ তুমি সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে উত্তম দেহ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অধিকারী হয়েছ, তাঁর সম্পর্কে এরূপ ধোঁকায় কেমন করে পড়লে যে, তিনি শুধু দয়া ও অনুগ্রহ-ই করেন, ইনসাফ ও সুবিচার করেন না। তিনি দয়া অনুগ্রহ করেন এটা ঠিক; তবে তার অর্থ এ নয় যে, তার সুবিচারকে তোমরা ভয় করবে না। এরপর মানুষকে কোনোরূপ ভুল ধারণায় নিমজ্জিত হতে নিষেধ করা হয়েছে।

يٰۤاَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ [٦]

শানে নুযূল-১ : আলোচ্য আয়াত আবুল আসাদ বিন কালাদা আল্ জুমাহী এর সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতিতে অনুরূপ এক বর্ণনা রয়েছে। –[কুরতুবী ২১৩/১৯]

শানে নুযূল -২ : আল্লামা বগভী কালবী ও মুকাতিল এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তারা দু'জন বলেছেন, আলোচ্য আয়াত আসওয়াদ-বিন শরীক সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে যে, সে নরাধম হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে প্রহার করেছিল, কিন্তু তার পিছে ধাওয়া করা হয়নি। নরাধম শরীকের এ আচরণের প্রেক্ষাপটে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَاَخَّرَتْ : অর্থাৎ আকাশ বিদীর্ণ হওয়া, নক্ষত্রসমূহ ঝরে মিঠা ও লোনা সমুদ্র একাকার হয়ে যাওয়া, কবর থেকে মৃতদের বের হয়ে আসা ইত্যাকার কিয়ামতের ঘটনা যখন ঘটে যাবে, তখন প্রত্যেকেই জেনে নেবে সে কি অগ্রে প্রেরণ করেছে এবং কি পশ্চাতে ছেড়েছে। অগ্রে প্রেরণ করার এক অর্থ কাজ করা এবং পশ্চাতে ছাড়ার অর্থ কাজ না করা। সুতরাং কিয়ামতের দিন প্রত্যেকেই জেনে নেবে সে সৎ অসৎ কি কর্ম করেছে এবং সৎ অসৎ কি কর্ম করেনি। দ্বিতীয় অর্থ এরূপও হতে পরে যে, অগ্রে প্রেরণ করেছে মানে যে কর্ম সে নিজে করেছে এবং পশ্চাতে ছেড়েছে মানে যে কর্ম সে নিজে তো করেনি কিন্তু তার ভিত্তি ও প্রথা স্থাপন করে এসেছে। কাজটি সৎ হলে তার ছওয়াব সে পেতে থাকবে এবং অসৎ হলে তার গোনাহ্ আমলনামায় লিখিত হতে থাকবে। হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি ইসলামে কোনো উত্তম সুন্নত ও নিয়ম চালু করে, সে তার ছওয়াব সব সময় পেতে থাকবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোনো কু-প্রথা অথবা পাপ কাজ চালু করে, যতদিন মানুষ এই পাপ কাজ করবে, ততদিন তার আমলনামায় এর গোনাহ্ লিখিত হতে থাকবে।

يَٰٓأَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কিয়ামতের ভয়াবহ কাজ-কারবার উল্লিখিত হয়েছে। এই আয়াতে মানুষের সৃষ্টির প্রারম্ভিক পর্যায় উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো নিয়ে সামান্য চিন্তা-ভাবনা করলে মানুষ আল্লাহ্ ও রাসূল ﷺ-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারত এবং তাঁদের নির্দেশাবলির চুল পরিমাণও বিরুদ্ধাচরণ করত না। কিন্তু মানুষ ভুল-ভ্রান্তিতে পড়ে আছে। তাই সাবধান করার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করা হয়েছে : হে মানুষ, তোমরা সূচনা ও পরিণামের এসব অবস্থা সামনে থাকা সত্ত্বেও তোমাকে কিসে বিভ্রান্ত করল যে, আল্লাহ্র নাফরমানি শুরু করেছ?

এখানে মানুষ সৃষ্টির প্রারম্ভিক পর্যায় প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : خَلَقَكَ فَسَوّٰكَ অর্থাৎ আল্লাহ তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, তদুপরি তোমার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সুবিন্যস্ত করেছেন। এরপর বলা হয়েছে فَعَدَلَكَ –অর্থাৎ তোমার অস্তিত্বকে বিশেষ সমতা দান করেছেন যা অন্য প্রাণীর মধ্যে নেই। মানবসৃষ্টিতে যদিও রক্ত, শ্লেষ্মা, অম্ল, পিত্ত ইত্যাদি পারস্পরবিরোধী উপকরণ শামিল রয়েছে কিন্তু আল্লাহর রহস্য, এগুলোর সমন্বয়ে একটি সুষম মেযাজ তৈরি করে দিয়েছে। এরপর তৃতীয় পর্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে :

فِىْٓ اَىِّ صُوْرَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সব মানুষকে একই আকার-আকৃতিতে সৃষ্টি করেননি। এরূপ করলে পারস্পরিক স্বাতন্ত্র্য থাকত না। বরং তিনি কোটি কোটি মানুষের আকার-আকৃতি এমনভাবে গঠন করেছেন যে, পরস্পরের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য ও পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে।

সৃষ্টির এসব প্রারম্ভিক পর্যায় বর্ণনার পর বলা হয়েছে : يَٰٓأَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ- হে অনবধান মানব, যে পালনকর্তা তোমার মধ্যে এতসব গুণ গচ্ছিত রেখেছেন, তাঁর ব্যাপারে তুমি কিরূপে ধোঁকা খেলে যে, তাঁকে ভুলে গেছ এবং তাঁর নির্দেশাবলি অমান্য করছ? তোমার দেহের প্রতিটি গ্রন্থিই তো তোমাকে আল্লাহার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। এমতাবস্থায় এই বিভ্রান্তি কিরূপে হলো? এখানে كَرِيْم –শব্দের মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, মানুষের ধোঁকায় পড়ার কারণ এই যে, আল্লাহ মহানুভব। তিনি দয়া ও কৃপার কারণে মানুষের গোনাহের তাৎক্ষণিক শাস্তি দেন না, এমনকি তার রিজিক, স্বাস্থ্য ও পার্থিব সুখ-শান্তিতেও কোনো বিঘ্ন ঘটান না। এতেই মানুষ ধোঁকা খেয়ে গেছে। অথচ সামান্য বুদ্ধি খাটালে এই দয়া ও কৃপা বিভ্রান্তির কারণ হওয়ার পরিবর্তে পালনকর্তার অনুগ্রহের কাছে ঋণী হয়ে আরও বেশি আনুগত্যের কারণ হওয়া উচিত ছিল।

হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন : كَمْ مِّنْ مَغْرُوْرٍ تَحْتَ السِّتْرِ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ অর্থাৎ অনেক মানুষের দোষত্রুটি ও গোনাহের উপর আল্লাহ তা'আলা পর্দা ফেলে রেখেছেন, তাদেরকে লাঞ্ছিত করেননি। ফলে তারা আরও বেশি ধোঁকায় পড়ে গেছে।

اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِىْ نَعِيْمٍ وَاِنَّ الْفُجَّارَ لَفِىْ جَحِيْمٍ : পূর্ববর্তী عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ –আয়াতে যে কর্ম সামনে আসার কথা বলা হয়েছিল, আলোচ্য আয়াতে তারই শাস্তি ও প্রতিদান উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ যারা সৎ কর্ম করত তারা নিয়ামতে তথা জান্নাতে থাকবে এবং অবাধ্য ও নাফরমানরা জাহান্নামে থাকবে।

وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَآئِبِيْنَ : অর্থাৎ জাহান্নামীরা কোনো সময় জাহান্নাম থেকে পৃথক হবে না। কারণ তাদের জন্য চিরকালীন আজাবের নির্দেশ আছে। لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا –অর্থাৎ হাশরের ময়দানে কোনো ব্যক্তি নিজ ইচ্ছায় অন্যের কোনো উপকার করতে পারবে না এবং কারও কষ্ট লাঘবও করতে পারবে না। এতে সুপারিশ করবে না, এরূপ বোঝা যায় না। কেননা কারও সুপারিশ করা নিজ ইচ্ছায় হবে না, যে পর্যন্ত আল্লাহ্ কাউকে কারও সুপারিশ করার অনুমতি না দেন। তাই আল্লাহ তা'আলাই আসল আদেশের মালিক। তিনি স্বীয় কৃপায় কাউকে সুপারিশের অনুমতি দিলে এবং ত কবুল করলে তাও তাঁরই আদেশ হবে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

اِنْفَطَرَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব اِنْفِعَال মাসদার اِنْفِطَارٌ মূলবর্ণ (ف – ط – ر) জিনস صحيح অর্থ– বিদীর্ণ হয়ে যাবে।

اِنْتَثَرَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَال মাসদার اِنْتِشَار মূলবর্ণ (ن – ث – ر) জিনস صحيح অর্থ– খসে পড়বে।

فُجِّرَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى مجهول বাব تَفْعِيْل মাসদার تَفْجِيْرٌ মূলবর্ণ (ف – ج – ر) জিনস صحيح অর্থ– বেগে প্রবাহিত করা হবে।

بُعْثِرَتْ : সীগাহ واحدمونث غائب বহছ ماضى مجهول বাব رباعى مجرد মাসদার بَعْثَرَةٌ মূলবর্ণ (ب – ع – ث – ر) জিনস صحيح অর্থ– উঠানো হবে, উৎখাত করা হবে।

رَكَّبَكَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَرْكِيْب মূলবর্ণ (ر – ك – ب) জিনস صحيح অর্থ– তোমাকে গঠন করেছেন।

فُجَّارٌ : فَاجِرٌ-এর বহুবচন। মাসদার فُجُوْرٌ বাব نَصَرَ মূলবর্ণ (ف – ج – ر) জিনস صحيح অর্থ– খারাপ লোক, কাফের। পাপী দীনের পর্দা বিদীর্ণকারী, প্রকাশ্যে গোনাহকারী, হক থেকে দূরে গমনকারী।

جَحِيْمٌ : সীগাহ فَعِيْلٌ এর ওজনে فَاعِلٌ এর অর্থে। জাহান্নাম। দোজখ, প্রজ্জ্বলিত আগুন। মাসদার جَحْمٌ আগুনকে খুব প্রজ্জ্বলিত করা। جَحِيْمٌ শব্দটি এর থেকে নির্গত। ইমাম জুরাইজ বলেন, জাহান্নামের সাতটি স্তর রয়েছে। যথা, ১. জাহান্নাম ২. লাজা ৩. হুতামা ৪. সায়ির ৫. সাক্বার ৬. জাহিম ৭. হাভিয়াহ। (মা'আলিম : ৪/১০০)

يَصْلَوْنَهَا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার صَلًى মূলবর্ণ (ص – ل – ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তাতে প্রবেশ করবে।

أَدْرٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব إِفْعَالٌ মাসদার إِدْرَاءٌ মূলবর্ণ (د – ر – ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– জানিয়েছে, খবর দিয়েছে।

تَمْلِكُ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার مِلْكٌ মূলবর্ণ (م - ل - ك) জিনস صحيح; مِلْكٌ এর অর্থ দুটি। এক. মালিক ও অভিভাবক হওয়া। দুই. ক্ষমতা পাওয়া, চাই নিজে মালিক হোক বা ওলী হোক বা না হোক। এখানে দ্বিতীয় অর্থ উদ্দেশ্য।

বাক্য বিশ্লেষণ :

إِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِىْ نَعِيْمٍ وَاِنَّ الْفُجَّارَ لَفِىْ جَحِيْمٍ يَّصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّيْنِ : এখানে ان হরফে মুশাববাহ বিল ফে'ল الْاَبْرَارَ اسم ان হলো لَفِىْ আর لام টি হলো المزحلقة আর فِىْ نَعِيْمٍ হলো خبر ان আর وَاِنَّ الْفُجَّارَ لَفِىْ বাক্যটি পূরবর্তী বাক্যের উপর আতফ হয়েছে। আর يَصْلَوْنَهَا বাক্যটি لَفِىْ جَحِيْمٍ থেকে حال হয়েছে। يَصْلَوْنَ ফেল, তার যমীর ফায়েল আর هَا হলো مفعول به এবং يَوْمَ الدِّيْنِ টা يَصْلَوْنَهَا-এর সাথে ظرف متعلق হয়েছে। আবার يَصْلَوْنَهَا বাক্যটি جملة مستانفه ও হতে পারে। –[ই'রাবুল কুরআন ৮ম খণ্ড: পৃ. ২৪৪]

سُوْرَةُ الْمُطَفِّفِيْنَ مَكِّيَّةٌ

সূরা মুতাফ্ফিফীন

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত– ৩৬, রুকূ'– ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. দুর্ভোগ তাদের জন্য, যারা মাপে কম দেয়।	وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ ﴿١﴾
২. যখন তারা মানুষের নিকট থেকে মেপে নেয় তখন পুরাপুরি নেয়।	الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ ﴿٢﴾
৩. আর যখন তাদেরকে মেপে কিংবা ওজন করে দেয় তখন কম দেয়।	وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ ﴿٣﴾
৪. তাদের কি এর বিশ্বাস নেই যে, তাদেরকে জীবিত করে উঠানো হবে।	اَلَا يَظُنُّ اُولٰٓئِكَ اَنَّهُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ ﴿٤﴾
৫. এক অত্যন্ত কঠোর দিবসে।	لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿٥﴾
৬. যে দিন সমস্ত মানুষ বিশ্বজগতের প্রতিপালকের সম্মুখে দণ্ডায়মান হবে।	يَّوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٦﴾
৭. না, কখনো নয়, বদকার লোকদের আমলনামা সিজ্জীনের মধ্যে থাকবে।	كَلَّآ اِنَّ كِتٰبَ الْفُجَّارِ لَفِيْ سِجِّيْنٍ ﴿٧﴾
৮. আর আপনার কি জানা আছে যে, সিজ্জীনে রক্ষিত আমলনামা কী বস্তু।	وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا سِجِّيْنٌ ﴿٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. وَيْلٌ দুর্ভোগ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ যারা মাপে কম দেয়।

২. الَّذِيْنَ যারা اِذَا যখন اكْتَالُوْا মেপে নেয় عَلَى النَّاسِ মানুষের নিকট থেকে يَسْتَوْفُوْنَ (তখন) তারা পুরাপুরি নেয়।

৩. وَاِذَا আর যখন كَالُوْهُمْ তারা তাদেরকে মেপে দেয় اَوْ وَّزَنُوْهُمْ কিংবা ওজন করে দেয় يُخْسِرُوْنَ তখন তারা কম দেয়।

৪. اَلَا يَظُنُّ اُولٰٓئِكَ তারা কী এ কথা বিশ্বাস করে না اَنَّهُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ যে, তারা পুনরুত্থিত হবে।

৫. لِيَوْمٍ একটি দিবসে عَظِيْمٍ অত্যন্ত কঠোর।

৬. يَّوْمَ যে দিন يَقُوْمُ النَّاسُ সমস্ত মানুষ দণ্ডায়মান হবে لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ বিশ্বজগতের প্রতিপালকের সম্মুখে।

৭. كَلَّآ কখনো নয় اِنَّ নিশ্চয় كِتٰبَ الْفُجَّارِ বদকার লোকদের আমলনামা لَفِيْ سِجِّيْنٍ সিজ্জীনের মধ্যে থাকবে।

৮. وَمَآ اَدْرٰىكَ আর আপনার কী জানা আছে / আপনি কী জানেন مَا سِجِّيْنٌ সিজ্জীন কী বস্তু।

আরবি	অনুবাদ
كِتٰبٌ مَّرْقُوْمٌ ﴿٩﴾	৯. তা একটি চিহ্নযুক্ত লিখিত কিতাব।
وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿١٠﴾	১০. সেদিন অবিশ্বাসীদের সর্বনাশ হবে।
الَّذِيْنَ يُكَذِّبُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ﴿١١﴾	১১. যারা প্রতিফল দিবসকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে।
وَمَا يُكَذِّبُ بِهٖٓ اِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ ﴿١٢﴾	১২. আর তাকে তো সেই লোকই মিথ্যা প্রতিপাদন করে যে সীমালঙ্ঘনকারী হয়, পাপী হয়।
اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا قَالَ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٣﴾	১৩. যখন তার সম্মুখে আমার আয়াতগুলো পাঠ করা হয় তখন সে বলে এগুলো তো ভিত্তিহীন কথা– পূর্বকালীন লোকদের হতে বর্ণিত হয়ে আসছে।
كَلَّا بَلْ ۜ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿١٤﴾	১৪. কখনো এরূপ নয়, বরং তাদের অন্তরসমূহে তাদের [গর্হিত] কার্যকলাপের মরিচা ধরেছে।
كَلَّآ اِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوْبُوْنَ ﴿١٥﴾	১৫. কখনো এরূপ নয়, এ সমস্ত লোক সেদিন তাদের প্রভু [এর দর্শন লাভ] হতে প্রতিরুদ্ধ থাকবে।
ثُمَّ اِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيْمِ ﴿١٦﴾	১৬. অনন্তর তারা দোজখে প্রবেশ করবে।
ثُمَّ يُقَالُ هٰذَا الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ﴿١٧﴾	১৭. অতঃপর বলা হবে, এটাই [সে দোজখ] যাকে তোমরা অবিশ্বাস করতে।
كَلَّآ اِنَّ كِتٰبَ الْاَبْرَارِ لَفِيْ عِلِّيِّيْنَ ﴿١٨﴾	১৮. [এই কাফেররা যে, মুমিনদের প্রতিদান প্রাপ্ত হওয়াকে অবিশ্বাস করছে,] কখনো এরূপ নয়, নেককারদের আমলনামা ইল্লিয়্যীনের মধ্যে থাকবে।

শাব্দিক অনুবাদ :

৯. كِتٰبٌ একটি কিতাব / আমলনামা مَّرْقُوْمٌ চিহ্নযুক্ত লিখিত।

১০. وَيْلٌ দুর্ভোগ يَّوْمَئِذٍ সেদিন لِّلْمُكَذِّبِيْنَ অবিশ্বাসীদের / অস্বীকারকারীদের জন্য।

১১. الَّذِيْنَ যারা يُكَذِّبُوْنَ মিথ্যা প্রতিপন্ন করে بِيَوْمِ الدِّيْنِ প্রতিফল দিবসকে।

১২. وَمَا يُكَذِّبُ আর মিথ্যা প্রতিপন্ন করে না بِهٖ তাকে اِلَّا তবে করে كُلُّ প্রত্যেক مُعْتَدٍ সীমালঙ্ঘনকারী اَثِيْمٍ পাপী।

১৩. اِذَا تُتْلٰى যখন পাঠ করা হয় عَلَيْهِ তার সম্মুখে اٰيٰتُنَا আমার আয়াতগুলো قَالَ তখন সে বলে اَسَاطِيْرُ (এগুলো তো) ভিত্তিহীন কথা / কল্পকাহিনী الْاَوَّلِيْنَ পূর্বকালীন লোকদের।

১৪. كَلَّا بَلْ কখনো এরূপ নয়, বরং رَانَ মরিচা ধরেছে عَلٰى قُلُوْبِهِمْ তাদের অন্তরসমূহে مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ তাদের অর্জিত বিষয়ের (কৃতকর্মের) / তারা যা অর্জন করে,তার।

১৫. كَلَّآ কখনো নয় اِنَّهُمْ এ সমস্ত লোক / তারা عَنْ رَّبِّهِمْ তাদের প্রতিপালক থেকে يَوْمَئِذٍ সেদিন لَّمَحْجُوْبُوْنَ প্রতিরুদ্ধ থাকবে / তাদেরকে আড়ালে রাখা হবে

১৬. ثُمَّ اِنَّهُمْ অনন্তর তারা لَصَالُوا প্রবেশ করবে الْجَحِيْمِ দোজখে

১৭. ثُمَّ يُقَالُ অতঃপর বলা হবে هٰذَا الَّذِيْ এটাই সে জিনিস كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ যাকে তোমরা অবিশ্বাস করতে।

১৮. كَلَّآ কখনো নয় اِنَّ নিশ্চয় كِتٰبَ আমলনামা الْاَبْرَارِ নেককারদের لَفِيْ عِلِّيِّيْنَ ইল্লিয়্যীনের মধ্যে থাকবে।

বাংলা অনুবাদ	আয়াত
১৯. আপনার কি জানা আছে যে, ইল্লিয়্যীন [রক্ষিত আমলনামা] কি বস্তু?	وَمَآ اَدۡرٰىكَ مَا عِلِّيُّوۡنَ (١٩)
২০. তা একটি চিহ্নিত লিখিত কিতাব।	كِتٰبٌ مَّرۡقُوۡمٌ (٢٠)
২১. যা নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাগণ [আগ্রহের সাথে] দর্শন করে থাকেন।	يَّشۡهَدُهُ الۡمُقَرَّبُوۡنَ (٢١)
২২. নেককারগণ অত্যন্ত আরামে থাকবে।	اِنَّ الۡاَبۡرَارَ لَفِيۡ نَعِيۡمٍ (٢٢)
২৩. তারা পালঙ্কসমূহের উপর [বসে বেহেশতের সুখপ্রদ চমৎকার আসবাবসমূহ] দেখতে থাকবে।	عَلَى الۡاَرَآئِكِ يَنۡظُرُوۡنَ (٢٣)
২৪. [হে শ্রোতা!] তুমি তাদের মুখমণ্ডলে সুখের পরিচয় পাবে।	تَعۡرِفُ فِيۡ وُجُوۡهِهِمۡ نَضۡرَةَ النَّعِيۡمِ (٢٤)
২৫. আর তাদেরকে সীল-মোহরযুক্ত বিশুদ্ধ শরাব হতে পান করানো হবে।	يُسۡقَوۡنَ مِنۡ رَّحِيۡقٍ مَّخۡتُوۡمٍ (٢٥)
২৬. যাতে কস্তুরীর সীল মোহর হবে,আর এরূপ বস্তুর প্রতিই লালসাকারীদের লালসা করা উচিত।	خِتٰمُهٗ مِسۡكٌ ؕ وَفِيۡ ذٰلِكَ فَلۡيَتَنَافَسِ الۡمُتَنَافِسُوۡنَ (٢٦)
২৭. আর তার সংমিশ্রণ 'তাসনীম' [নামক ঝরনার পানি] দ্বারা হবে।	وَمِزَاجُهٗ مِنۡ تَسۡنِيۡمٍ (٢٧)
২৮. অর্থাৎ এমন এক ঝরণা যা হতে নৈকট্যপ্রাপ্তগণ পান করবে।	عَيۡنًا يَّشۡرَبُ بِهَا الۡمُقَرَّبُوۡنَ (٢٨)

শাব্দিক অনুবাদ :

১৯. وَمَآ اَدۡرٰىكَ আর আপনার কী জানা আছে / আপনি কী জানেন مَا عِلِّيُّوۡنَ ইল্লিয়্যুন কী

২০. كِتٰبٌ একটি আমলনামা, কিতাব مَّرۡقُوۡمٌ লিখিত চিহ্নিত

২১. يَّشۡهَدُهُ তা দর্শন করে থাকেন الۡمُقَرَّبُوۡنَ নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাগণ

২২. اِنَّ الۡاَبۡرَارَ নিশ্চয় নেককারগণ لَفِيۡ نَعِيۡمٍ আরামে থাকবে

২৩. عَلَى الۡاَرَآئِكِ পালঙ্কসমূহের উপর (বসে) يَنۡظُرُوۡنَ তারা দেখতে থাকবে

২৪. تَعۡرِفُ তুমি চিনতে পারবে فِيۡ وُجُوۡهِهِمۡ তাদের মুখমণ্ডলে نَضۡرَةَ النَّعِيۡمِ সুখের সজীবতা / দীপ্তি, সুখের পরিচয়।

২৫. يُسۡقَوۡنَ আর তাদেরকে পান করানো হবে مِنۡ رَّحِيۡقٍ বিশুদ্ধ শরাব হতে مَّخۡتُوۡمٍ সীল-মোহরযুক্ত

২৬. خِتٰمُهٗ তার সীল মোহর হবে مِسۡكٌ কস্তুরীর وَفِيۡ ذٰلِكَ আর এর প্রতিই فَلۡيَتَنَافَسِ লালসা করা উচিত الۡمُتَنَافِسُوۡنَ লালসাকারীদের

২৭. وَمِزَاجُهٗ আর তার সংমিশ্রণ হবে مِنۡ تَسۡنِيۡمٍ 'তাসনীম' দ্বারা।

২৮. عَيۡنًا এমন এক ঝরণা يَّشۡرَبُ بِهَا যা হতে পান করবে الۡمُقَرَّبُوۡنَ নৈকট্যপ্রাপ্তগণ ।

২৯. [আর] যারা অপরাধী ছিল, তারা [দুনিয়ায়] মুমিনদের কে নিয়ে উপহাস করত।	إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ ﴿٢٩﴾
৩০. আর যখন তারা [কাফেররা] তাদের সম্মুখ দিয়ে গমন করত, তখন তারা পরস্পর চোখ টেপাটেপি করত [অর্থাৎ অবজ্ঞার ভাব দেখাত]।	وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ﴿٣٠﴾
৩১. আর যখন তারা নিজেদের গৃহে ফিরে যেত, তখন [ও মুমিনদের আলোচনা করে নিজেদের মধ্যে] হাসিঠাট্টা করে ফিরত।	وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ ﴿٣١﴾
৩২. আর যখন তাদেরকে দেখত, তখন এরূপ বলাবলি করত যে, নিশ্চয় তারা ভ্রান্তিতে আছে।	وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ ﴿٣٢﴾
৩৩. অথচ তারা তাদের উপর সংরক্ষকরূপে প্রেরিত হয়নি।	وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ ﴿٣٣﴾
৩৪. সুতরাং আজ মুমিনগণ কাফেরদের প্রতি উপহাস করতে থাকবে।	فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿٣٤﴾
৩৫. পালঙ্কের উপর [বসে তাদের অবস্থা] দেখতে থাকবে।	عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ ﴿٣٥﴾
৩৬. বাস্তবিকই কাফেরদেরকে তাদের কৃতকর্মের যথাযথ প্রতিদান দেওয়া হয়েছে তো?	هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٣٦﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২৯. إِنَّ الَّذِينَ নিশ্চয় যারা أَجْرَمُوا অপরাধ করেছে كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا তারা মুমিনদের নিয়ে করত يَضْحَكُونَ উপহাস/হাসি-তামাশা।

৩০. وَإِذَا مَرُّوا আর যখন তারা গমন করত بِهِمْ তাদের সম্মুখ/পাশ দিয়ে يَتَغَامَزُونَ (তখন) তারা পরস্পর চোখ টেপাটেপি করত।

৩১. وَإِذَا আর যখন انْقَلَبُوا তারা ফিরে আসত/যেত إِلَىٰ أَهْلِهِمُ নিজেদের গৃহে/পরিবারের কাছে, انْقَلَبُوا فَكِهِينَ তখন [ও মুমিনদের আলোচনা করে নিজেদের মধ্যে] হাসিঠাট্টা করে ফিরত।

৩২. وَإِذَا আর যখন رَأَوْهُمْ তারা তাদেরকে দেখত قَالُوا (তখন) তারা বলাবলি করত إِنَّ هَٰؤُلَاءِ নিশ্চয় তারা لَضَالُّونَ মহা ভ্রান্তিতে আছে।

৩৩. وَمَا أُرْسِلُوا অথচ তাদেরকে প্রেরণ করা হয়নি عَلَيْهِمْ তাদের উপর/জন্য حَافِظِينَ সংরক্ষকরূপে/ তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে

৩৪. فَالْيَوْمَ সুতরাং আজ الَّذِينَ آمَنُوا যারা ঈমান এনেছে,তারা مِنَ الْكُفَّارِ কাফেরদেরকে يَضْحَكُونَ উপহাস করতে থাকবে / করবে।

৩৫. عَلَى الْأَرَائِكِ পালঙ্কের উপর (বসে বসে) يَنْظُرُونَ তারা দেখতে থাকবে / দেখবে

৩৬. هَلْ ثُوِّبَ প্রতিদান দেওয়া হয়েছে তো الْكُفَّارُ কাফেরদেরকে مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ তাদের কৃতকর্মের

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : এ সূরার নামটি প্রথম আয়াতের لِّلْمُطَفِّفِينَ শব্দ হতে গ্রহণ করা হয়েছে। কারো মতে ত্বাফিফ অর্থ কম করা, ওজনে কম দেওয়া, অঙ্গীকার ভঙ্গ করা, অবিচার করা, আমানতে খেয়ানত করা প্রভৃতি। যেহেতু অত্র সূরাতে যে সকল লোক ওজনে কমবেশি করে মানুষকে প্রতারিত করে, তাদের পরিণাম সম্পর্কিত বর্ণনা রয়েছে। তাই সূরার নাম মুত্বাফ্‌ফিফীন রাখা হয়েছে। এতে ৩৬টি আয়াত, ১৬৯টি বাক্য এবং ৭৩০টি অক্ষর রয়েছে।

সূরাটি নাজিলের সময়কাল : এ সূরাটি নাজিল হওয়ার সময় ও স্থান সম্পর্কে মতপার্থক্য রয়েছে। একদল তাফসীরকারের মতে এটা মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। আরেক দলের মতে এটা মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। কেউ কেউ এরূপ অভিমত প্রকাশ করেন যে, এটা মদীনায় হিজরতের পথে অবতীর্ণ হয়েছে। এ অভিমতও পাওয়া যায় যে, ২৯ নং আয়াত হতে শেষ পর্যন্ত মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। কতেকের মতে ১৩ নং আয়াত হতে শেষ পর্যন্ত মক্কায় অবতীর্ণ এবং ১-১২ আয়াত মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে।

সারকথা হচ্ছে– কুরআনের কোনো আয়াতকে বিষয় ও ঘটনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ মনে করলেই সাহাবী ও তাবেঈনগণ বলতেন এটা অমুক ব্যাপারে অবতীর্ণ। যদিও একে উপলক্ষ করে অবতীর্ণ না-ও হতো। যারা এ সূরাটি মাদানী বলে অভিমত রেখেছেন, তারা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর একটি বর্ণনা দ্বারা দলিল পেশ করেন। যেমন শানে নুযূলে উল্লিখিত হয়েছে; কিন্তু সে বর্ণনা দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, এ আয়াতের বক্তব্য জানতে পেরে মদীনার লোকগণ পরিমাপে কারচুপি করার বদ অভ্যাসকে বর্জন করেন। এটা দ্বারা এ সূরা মদীনায়ই অবতীর্ণ হয়েছে বলে প্রমাণ হয় না। যে অভ্যাসটির কথা বলা হয়েছে তা যেমন মদীনার লোকদের মধ্যে ছিল অনুরূপ কমবেশি মক্কার লোকদের মধ্যেও পাওয়া যেত। অতএব, সূরার বিষয়বস্তু প্রমাণ দেয় যে, এ সূরা মক্কায় অবতীর্ণ। কোনো কোনো তাফসীরকার একে মক্কায় অবতীর্ণ সর্বশেষ সূরা বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

সূরাটির আলোচ্য বিষয় ও মূলবক্তব্য : সূরাটির মূল আলোচ্য বিষয় পরকাল। প্রথম ছয়টি আয়াতে ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত লোকদের মধ্যে সাধারণ ও ব্যাপকভাবে অবস্থিত বে-ঈমানীর তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে। তারা অন্যদের নিকট হতে গ্রহণ কালে পুরামাত্রায় মেপে ও ওজন করে গ্রহণ করত, কিন্তু অন্যদের দেওয়ার সময় ওজন ও পরিমাপে প্রত্যেককে কিছু কম অবশ্যই দিত। বর্তমান সূরায় প্রাথমিক ছয়টি আয়াতে এর-ই প্রতিবাদ, মন্দতা ও বীভৎসতা বর্ণিত হয়েছে। তদানীন্তন সমাজের অসংখ্য প্রকার দোষ-ত্রুটির মধ্যে এটা ছিল একটি অত্যন্ত মন্দ দোষ। একে দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, পরকাল সম্পর্কে উদাসীনতা ও উপেক্ষা এর মূল কারণ। একদিন অবশ্যই আল্লাহর সম্মুখে হাজির হতে হবে এবং কড়া-ক্রান্তি হিসাব দিতে হবে। এ বিশ্বাস যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের হৃদয় মনে দৃঢ়মূল না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো লোকের পক্ষেই বৈষয়িক কাজকর্মে সততা ও বিশ্বস্ততা রক্ষা করে চলা কিছুতেই সম্ভবপর হতে পারে না। সততা ও বিশ্বস্ততাকে কেউ ভালো পলিসি' মনে করে ছোটখাটো ব্যাপারে এটা পালন করলেও করতে পারে এটা বিচিত্র নয়; সে-ই যখন অন্য কোনো ক্ষেত্রে বেঈমানী ও দুর্নীতিকে ভালো পালিসি মনে করবে, তখন তার পক্ষে সততা রক্ষা করা সম্ভব হতে পারে না। বস্তুত মানুষের চরিত্রে স্থায়ী বিশ্বস্ততা ও সততা কেবলমাত্র আল্লাহর ভয় ও পরকালের প্রত্যয়ের ফলেই আসতে পারে। কেননা এরূপ অবস্থায় সততা ও বিশ্বস্ততা কোনো পলিসি নয়, ঐকান্তিক মানসিক কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। এর উপর স্থায়ী অবিচল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা পৃথিবীতে এ নীতি সুবিধাজনক বা অসুবিধাজনক হওয়ার উপর নির্ভরশীল নয়; বরং পরকালের ভালো ও মন্দের চিন্তাই এ ব্যাপারে তাতে প্রভাবিত করে। মোটকথা, পরকাল বিশ্বাস ও নৈতিক চরিত্র যে পরস্পর ওতপ্রোতভাবে জড়িত তাই এখানে মর্মস্পর্শী ভাষায় ব্যক্ত করা হয়েছে। অতঃপর ৭-১৭ পর্যন্ত আয়াতে বলা হয়েছে যে, পাপী লোকদের আমলনামা প্রথমেই অপরাধ প্রবণ লোকদের খাতায় লিখিত হচ্ছে এবং পরকালে তাদেরকে ভয়াবহ ধ্বংসের সম্মুখীন হতে হবে।

এরপর ১৮-২৮ পর্যন্ত আয়াতে সৎলোকদের অতীত উত্তম পরিণতির কথা বলা হয়েছে। সে সাথে এ কথাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, তাদের আমলনামা উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন লোকদের খাতায় লিপিবদ্ধ হচ্ছে।

পরিশেষে সৎ ও ভালো লোকদের সুখ-শান্তি আলোচনা করা হয়েছে এবং কাফেরদের কটাক্ষ ও ঠাট্টা-বিদ্রূপের জন্য তাদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে কাফেরদেরকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে।

সূরাটির ফজিলত :" হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি সূরা আল-মুত্বাফ্‌ফিফীন তেলাওয়াত করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাকে সংরক্ষিত পানীয় পান করাবেন।

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ [১]

শানে নুযূল-১ : নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ্ প্রমুখ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, হযরত নবী করীম ﷺ যখন হিজরত করে মদীনায় চলে আসেন, তৎকালে মদীনাবাসী মাপের দিক দিয়ে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট শ্রেণির লোক ছিল। তাদের সে চরিত্রের প্রতি ঘৃণা স্বরূপ আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[দুররে মানছুর ২২৩/৬, ইবনে কাছীর ৪৮৩/৪, কুরতুবী ২১৮/১৯]

শানে নুযূল-২ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে অপর এক বর্ণনা রয়েছে যে, তিনি বলেন, মদীনায় এক শ্রেণির লোক ছিল, যারা কোনো বস্তু ক্রয় করতে হলে পুরোপুরিভাবে মেপে নিত, তবে যখন বিক্রি করত, তখন তারা মাপে কম প্রদান করত। মাপে বেশি নেওয়া এবং কম দেওয়ার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল-৩ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত যে, আলোচ্য আয়াত আবূ জুহাইনা নামে পরিচিত এক ব্যক্তি সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। তার নাম হচ্ছে আমর। মাপের জন্যে তার দু'ধরনের সা' (মাপ যন্ত্র) ছিল, একটি দ্বারা মেপে নিত তারা, অতঃপর অপরটি দ্বারা প্রদান করত। মাপে বেশি নেওয়া কম দেওয়ার ভয়াবহতা বর্ণনা করে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[কুরতুবী ২১৮/১৯]

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা.)-এর মতে মক্কায় অবতীর্ণ এবং হযরত ইবনে আব্বাস, কাতাদাহ (রা.) মুকাতিল ও যাহ্হাক (র.)-এর মতে এই সূরাটি মদীনায় অবতীর্ণ কিন্তু মাত্র আটটি আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ। ইমাম নাসায়ী (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মদীনায় তশরিফ আনেন, তখন মদীনাবাসীদের সাধারণ কাজ-কারবার 'কায়ল' তথা মাপের মাধ্যমে সম্পন্ন হতো। তারা এ ব্যাপারে চুরি করা ও কম মাপায় খুবই অভ্যস্ত ছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে সূরা তাত্বফীফ্ অবতীর্ণ হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) আরও বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় পৌছার পর সর্বপ্রথম এই সূরা অবতীর্ণ হয়। কারণ মদীনাবাসীদের মধ্যে তখন এ বিষয়ের ব্যাপক প্রচলন ছিল যে, তারা নিজেরা কারও কাছ থেকে সওদা নেওয়ার সময় পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করত এবং অন্যের কাছে বিক্রি করার সময় মাপে কম দিত। এই সূরা নাজিল হওয়ার পর তারা এই বদ-অভ্যাস থেকে বিরত হয় এবং এমন বিরত হয় যে, আজ পর্যন্ত তাদের এই সুখ্যাতি সর্বজনবিদিত। –[মাযহারী]

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ : تَطْفِيْف -এর অর্থ মাপে কম করা। যে এরূপ করে, তাকে বলা হয় مُطَفِّف -কুরআনের এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, মাপে কম করা হারাম।

تَطْفِيْف -কেবল মাপে কম করার মধ্যেই সীমিত নয় বরং যে কোনো ব্যাপারে প্রাপককে প্রাপ্য থেকে কম দেওয়াও تَطْفِيْف -এর অন্তর্ভুক্ত : কুরআন ও হাদীসে মাপ ও ওজনে কম করাকে হারাম করা হয়েছে। সাধারণভাবে কাজ-কারবারে লেনদেনে এই দুই উপায়েই সম্পন্ন হয় এবং প্রাপকের প্রাপ্য আদায় হলো কি না, তা এই দুই উপায়েই নির্ণীত হয়। প্রত্যেক প্রাপকের প্রাপ্য পূর্ণমাত্রায় দেওয়াই যে এর উদ্দেশ্য, একথা বলাই বাহুল্য। অতএব বোঝা গেল যে, এটা শুধু মাপ ও ওজনের মধ্যেই সীমিত থাকবে না; বরং মাপ ও ওজনের মাধ্যমে হোক, গণনার মাধ্যমে হোক অথবা অন্য যে কোনো পন্থায় প্রাপককে তার প্রাপ্য কম দিলে তা تَطْفِيْف -এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে হারাম হবে।

মুয়াত্তা ইমাম মালেকে আছে, হযরত ওমর (রা.) জনৈক ব্যক্তিকে দেখলেন যে, সে নামাজের রুকূ-সেজদা ইত্যাদি ঠিকমতো করে না এবং দ্রুত নামাজ শেষ করে দেয়। তিনি তাকে বললেন : لَقَدْ طَفَّفْتَ -অর্থাৎ তুমি আল্লাহ্র প্রাপ্য আদায়ে تَطْفِيْف করেছ। এই উক্ত উদ্ধৃত করে হযরত ইমাম মালেক (র.) বলেন : لِكُلِّ شَيْءٍ وَفَاءٌ وَتَطْفِيْفٌ অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে পূর্ণমাত্রায় দেওয়া ও কম করা আছে, এমনকি নামাজ ও অজুর মধ্যেও। এমনিভাবে যে ব্যক্তি আল্লাহর অন্যান্য হক ও ইবাদতে এবং বান্দার নির্দিষ্ট হকে ত্রুটি ও কম করে, সেও تَطْفِيْف -এর অপরাধে অপরাধী। মজুর, কর্মচারী যতটুকু সময় কাজ করার চুক্তি করে, তাতে কম করাও অন্যায় এবং প্রচলিত নিয়মের বরখেলাফ, কাজে অলসতা করাও নাজায়েজ। এসব ব্যাপারে সাধারণ লোক, এমনকি আলিমদের মধ্যেও অমনযোগিতা পরিদৃষ্ট হয়। তারা চাকুরীর কর্তব্যে ত্রুটি করাকে পাপই গণ্য করে না।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : خَمْسٌ بِخَمْسٍ -অর্থাৎ পাঁচটি গোনাহের শাস্তি পাঁচটি–১. যে ব্যক্তি অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, আল্লাহ্ তার উপর শত্রুকে প্রবল ও জয়ী করে দেন। ২. যে জাতি আল্লাহ্র আইন পরিত্যাগ করে অন্যান্য আইন অনুযায়ী ফয়সালা করে, তাদের মধ্যে দারিদ্র্য ও অভাব-অনটন ব্যাপক আকার ধারণ

করে। ৩. যে জাতির মধ্যে অশ্লীলতা ও ব্যভিচারে ব্যাপক হয়ে যায়, আল্লাহ তাদের উপর প্লেগ ও অন্যান্য মহামারী চাপিয়ে দেন। ৪. যারা মাপ ও ওজনে কম করে, আল্লাহ তাদেরকে দুর্ভিক্ষের সাজা দেন। ৫. যারা জাকাত আদায় করে না, আল্লাহ তাদেরকে বৃষ্টি থেকে বঞ্চিত করে দেন। –[কুরতুবী]

তাবারানীর এক রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ আরও বলেন : যে জাতির মধ্যে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ চুরি প্রচলিত হয়ে যায়, আল্লাহ তাদের অন্তরে শত্রুর ভয়ভীতি চাপিয়ে দেন, যে জাতির মধ্যে সুদের প্রচলন হয়ে যায়, তাদের মধ্যে মৃত্যুর প্রাচুর্য দেখা দেয়, যে জাতি মাপ ও ওজনে কম করে, আল্লাহ তাদের রিজিক বন্ধ করে দেন, যে জাতি ন্যায়ের বিপরীতে ফয়সালা করে, তাদের মধ্যে হত্যা ও খুন-খারাবি ব্যাপক হয়ে যায় এবং যারা চুক্তির ব্যাপারে বিশ্বাসঘাতকতা করে, আল্লাহ তাদের উপর শত্রুকে প্রবল করে দেন। –[মাযহারী]

দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ ও রিজিক বন্ধ করার বিভিন্ন উপায় : হাদীসে বর্ণিত রিজিক বন্ধ করা কয়েক উপায়ে হতে পারে–১. রিজিক থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করে, ২. রিজিক মওজুদ আছে কিন্তু তা খেতে পারে না কিংবা ব্যবহার করতে পারে না; যেমন আজকাল অনেক অসুখ-বিসুখে এরূপ হতে দেখা যায় এবং এটা বর্তমান যুগে খুবই ব্যাপক। এমনিভাবে দুর্ভিক্ষ কয়েক প্রকারে হতে পারে–১. প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী দুষ্প্রাপ্য হয়ে গেলে এবং ২. দ্রব্যসামগ্রী প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও দ্রব্যমূল্য ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে গেলে। আজকাল অধিকাংশ জিনিসপত্রে এটাই প্রত্যক্ষ করা হচ্ছে। হাদীসে বর্ণিত দারিদ্র্যের অর্থও কেবল টাকা-পয়সা এবং প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র না থাকা নয়; বরং দারিদ্র্যের আসল অর্থ পরমুখাপেক্ষিতা ও অভাব-অনটন। প্রত্যেক ব্যক্তি তার কাজ-কারবারে অপরের প্রতি যতবেশি মুখাপেক্ষী, সে ততবেশি দরিদ্র। বর্তমান যুগের পরিস্থিতি সম্পর্কে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, মানুষ তার বসবাস, চলাফেরা ও আকাঙ্ক্ষা পূরণের ক্ষেত্রে এমন এমন আইন-কানুনের বেড়াজালে আবদ্ধ যে, তার লোকমা ও কালেমা পর্যন্ত বিধিনিষেধের আওতাধীন। ধন-সম্পদ থাকা সত্ত্বেও যেখান থেকে ইচ্ছা সেখান থেকে ক্রয় করতে পরে না, যখন যেখানে ইচ্ছা, সেখানে সফর করতে পারে না। বিধি-নিষেধের বেড়াজাল এত বেশি যে, প্রত্যেক কাজের জন্য অফিসে যাতায়াত এবং অফিসার থেকে শুরু করে পিয়ন পর্যন্ত খোশামোদ করা ছাড়া জীবন নির্বাহ করা কঠিন। এসব পরমুখাপেক্ষিতারই তো অপর নাম দারিদ্র্য। বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে বাহ্যত যেসব সন্দেহ দেখা দিতে পারে, এই বর্ণনার মাধ্যমে তা দূরীভূত হয়ে গেল।

সিজ্জীন ও ইল্লিয়্যীন : كَلَّآ اِنَّ كِتٰبَ الْفُجَّارِ لَفِىْ سِجِّيْنٍ : سِجِّيْنٌ-এর অর্থ সংকীর্ণ জায়গায় বন্দি করা। কামূসে আছে– سِجِّيْنٌ-এর অর্থ চিরস্থায়ী কয়েদ। হাদীস ও রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, سِجِّيْنٌ একটি বিশেষ স্থানের নাম। এখানে কাফেরদের রূহ্ অবস্থান করে এবং এখানেই তাদের আমলনামা থাকে। এখানে এটাও সম্ভবপর যে, এস্থলে এমন কোনো খাতা আছে, যাতে সারা বিশ্বের কাফেরদের কর্মসমূহ লিপিবদ্ধ করা হয়।

স্থানটি কোথায় অবস্থিত, এ সম্পর্কে হযরত বারা ইবনে আজেব (রা.)-এর এক নাতিদীর্ঘ রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : সিজ্জীন সপ্তম নিম্নস্তরে অবস্থিত এবং ইল্লিয়্যীন সপ্তম আকাশে আরশের নিচে অবস্থিত। –(মাযহারী) কোনো কোনো হাদীসে আরও আছে সিজ্জীন কাফের ও পাপাচারীদের আত্মার আবাসস্থল এবং ইল্লিয়্যীন মু'মিন-মুত্তাকীগণের আত্মার আবাসস্থল।

জান্নাত ও জাহান্নামের অবস্থান স্থল : বায়হাকী রেওয়ায়েত করেন যে, জান্নাত আকাশে এবং জাহান্নাম মর্ত্যে অবস্থিত। ইবনে জারীর (র.) রেওয়ায়েত করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে وَجِاْىْٓءَ يَوْمَئِذٍۭ بِجَهَنَّمَ (সেদিন জাহান্নামকে উপস্থিত করা হবে) আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন : জাহান্নামকে সপ্তম জমিন থেকে উপস্থিত করা হবে। এসব রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, জাহান্নাম সপ্তম জমিনে আছে। সেখান থেকেই প্রজ্বলিত হবে এবং সমুদ্র ও দরিয়া তার অগ্নিতে শামিল হবে, অতঃপর সবার সামনে উপস্থিত হয়ে যাবে। এভাবে সেসব রেওয়ায়েতের মধ্যেও সমন্বয় সাধিত হয়ে যায়, যেগুলোতে বলা হয়েছে যে, সিজ্জীন জাহান্নামের একটি অংশের নাম। –[মাযহারী]

كِتٰبٌ مَّرْقُوْمٌ : এস্থলে مَّرْقُوْمٌ-এর অর্থ مَخْتُوْمٌ-(মোহরকৃত)। ইমাম বগভী ও ইবনে কাছীর (র.) বলেন : এটা সিজ্জীনের তাফসীর নয় বরং পূর্ববর্তী كِتٰبُ الْفُجَّارِ-এর বর্ণনা। অর্থ এই যে, কাফের ও পাপাচারীদের আমলনামা মোহর লাগিয়ে সংরক্ষিত করা হবে। ফলে এতে হ্রাসবৃদ্ধি ও পরিবর্তনের সম্ভাবনা থাকবে না। এই সংরক্ষণের স্থান হবে সিজ্জীন। এখনেই কাফেরদের রূহ্ জমা করা হবে।

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ : رَانَ শব্দটি رَيْنٌ থেকেই উদ্ভূত। অর্থ মরিচা ও ময়লা। উদ্দেশ্য এই যে, তাদের অন্তরে পাপের মরিচা পড়ে গেছে। মরিচা যেমন লোহাকে খেয়ে মাটিতে পরিণত করে দেয়, তেমনি তাদের পাপের মরিচা তাদের অন্তরের যোগ্যতা নিঃশেষ করে দিয়েছে। ফলে তারা ভালো ও মন্দের পার্থক্য বুঝে না। হযরত আবূ

হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণিত রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : মু'মনি ব্যক্তি কোনো গোনাহ করলে তার অন্তরে একটি কাল দাগ পড়ে। যদি সে অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে এবং সংশোধিত হয়ে যায়, তবে এই কাল দাগ মিটে যায় এবং অন্তর পূর্ববৎ উজ্জ্বল হয়ে যায়। পক্ষান্তরে সে যদি তওবা না করে এবং গোনাহ্ করে যায়, তবে এই কালো দাগ তার সমস্ত অন্তরকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। একেই আয়াতে رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ বলা হয়েছে। –(মাযহারী) পূর্বের আয়াতসমূহে বলা হয়েছিল যে, কাফেররা কুরআনকে উপকথা বলে পরিহাস করে। এই আয়াতের শুরুতে كَلَّا -বলে তাদেরকে শাসানো হয়েছে যে, তারা গোনাহ্রের স্তূপে পড়ে অন্তরের সেই ঔজ্জ্বল্য ও যোগ্যতা খতম করে দিয়েছে, যাদ্বারা সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বোঝা যায়। এই যোগ্যতা আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মানুষের মজ্জায় গচ্ছিত রাখেন। উদ্দেশ্য এই যে, তাদের মিথ্যারোপ কোনো প্রমাণ, জ্ঞানবুদ্ধি ও সুবিবেচনা প্রসূত নয় বরং এর কারণ এই যে, তাদের অন্তর অন্ধ হয়ে গেছে। ফলে ভালোমন্দ দৃষ্টিগোচরই হয় না।

كَلَّآ اِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوْبُوْنَ : অর্থাৎ কিয়ামতের দিন এই কাফেররা তাদের পালনকর্তার জিয়ারত থেকে বঞ্চিত থাকবে এবং পর্দার আড়ালে অবস্থান করবে। ইমাম মালেক ও শাফেয়ী (র.) বলেন : এই আয়াত থেকে জানা যায় যে, সেদিন মু'মিন ও ওলীগণ আল্লাহ তা'আলার জিয়ারত লাভ করবে। নতুবা কাফেরদেরকে পর্দার অন্তরালে রাখার কেনো উপকারিতা নেই।

জনৈক শীর্ষস্থানীয় আলিম বলেন ; এই আয়াত এ বিষয়ের প্রমাণ যে, প্রত্যেক মানুষ প্রকৃতিগতভাবে আল্লাহ তা'আলাকে ভালোবাসতে বাধ্য। এ কারণেই সাধারণ কাফের ও মুশরিক যত কুফর ও শিরকেই লিপ্ত থাকুক না কেন এবং আল্লাহ্র সত্তা ও গুণাবলি সম্পর্কে যত ভ্রান্ত বিশ্বাসই পোষণ করুক না কেন, আল্লাহ্র মাহাত্ম্য ও ভালোবাসা সবার অন্তরেই বিরাজমান থাকে। তারা নিজ নিজ বিশ্বাস অনুযায়ী তাঁরই অন্বেষণ ও সন্তুষ্টি লাভের জন্য ইবাদত করে থাকে। ভ্রান্ত পথের কারণে তারা মন্জিলে মকসুদে পৌঁছতে না পারলেও অন্বেষণ সেই মন্জিলেরই করে। আলোচ্য আয়াত থেকে এ বিষয়টি প্রতীয়মান হয়। কেননা কাফেরদের মধ্যে যদি আল্লাহ্র জিয়ারতের আগ্রহ না থাকত, তবে শাস্তি স্বরূপ একথা বলা হতো না যে, তারা আল্লাহর জিয়ারত থেকে বঞ্চিত থাকবে। কারণ যে ব্যক্তি কারও জিয়ারতের প্রত্যাশীই নয় বরং তার প্রতি ভীতশ্রদ্ধ, তার জন্য তার জিয়াতর থেকে বঞ্চিত করা কোনো শাস্তি নয়।

اِنَّ كِتٰبَ الْاَبْرَارِ لَفِیْ عِلِّیِّیْنَ : কারও কারও মতে عِلِّیِّیْنَ শব্দটি عُلُوٌّ -এর বহুবচন। উদ্দেশ্য উচ্চতা। ফাররা (র.)-এর মতে এটা এক জায়গার নাম– বহুবচন নয়। পূর্বোল্লিখিত বারা ইবনে আজেব (র.)-এর হাদীস থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ইল্লিয়্যীন সপ্তম আরশের নিচে এক স্থানের নাম। এতে মু'মিনদের রূহ ও আমলনামা রাখা হয়। পরবর্তী كِتٰبٌ مَّرْقُوْمٌ বাক্যটিও ইল্লিয়্যীনের তাফসীর নয়–সৎলোকদের আমলনামার বর্ণনা। উপরে اِنَّ كِتٰبَ الْاَبْرَارِ বাক্যে এই আমল নামার উল্লেখ আছে।

يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُوْنَ : يَشْهَدُ শব্দটি شُهُوْدٌ থেকে উদ্ভূত। অর্থ উপস্থিত হওয়া, প্রত্যক্ষ করা। কোনো কোনো তাফসীরকারের মতে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, সৎকর্মশীলদের আমলনামা নৈকট্যশীল ফেরেশতাগণ দেখবে অর্থাৎ তত্ত্বাবধান ও হেফাজত করবে। –(কুরতুবী) شُهُوْد -এর অর্থ উপস্থিত হওয়া নেওয়া হলে يَشْهَدُهُ -এর সর্বনাম দ্বারা ইল্লিয়্যীন বোঝানো হবে। আয়াতের অর্থ হবে এই যে, নৈকট্যশীলগণের রূহ এই ইল্লিয়্যীন নামক স্থানে উপস্থিত হবে। কারণ এটাই তাদের আবাসস্থল; যেমন সিজ্জীন কাফেরদের রূহের আবাসস্থল। সহীহ্ মুসলিমে আব্দুল্লাহ ইবনে মসঊদ (রা.)-এর বর্ণিত একটি হাদীস এর প্রমাণ। এই হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : শহীদগণের রূহ্ আল্লাহর সান্নিধ্যে সবুজ পাখীদের মধ্যে থাকবে এবং জান্নাতের বাগবাগিচা ও নহরসমূহে ভ্রমণ করবে। তাদের বাসস্থানে আরশের নিচে ঝুলন্ত প্রদীপ থাকবে। এ থেকে বোঝা গেল যে, শহীদগণের রূহ্ আরশের নিচে থাকবে এবং জান্নাতে ভ্রমণ করতে পারবে। সূরা ইয়াসীনে হাবীব নাজ্জারের ঘটনায় বলা হয়েছে :

قِيْلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يٰلَيْتَ قَوْمِیْ يَعْلَمُوْنَ بِمَا غَفَرَلِیْ رَبِّیْ এ থেকে জানা যায় যে, হাবীব নাজ্জার মৃত্যুর সাথে সাথে জান্নাতে প্রবেশ করেছেন। কোনো কোনো হাদীস দ্বারাও জানা যায় যে, মু'মিনদের রূহ্ জান্নাতে থাকবে। সবগুলো সারমর্ম এই যে, এসব রূহের আবাসস্থল হবে সপ্তম আকাশে আরশের নিচে। জান্নাতের স্থানও এটাই। এসব রূহকে জান্নাতে ভ্রমণের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এখানে নৈকট্যশীলগণের উচ্চ বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্বের কারণে যদিও এ অবস্থাটি শুধু তাদেরই উল্লেখ করা হয়েছে, তবুও প্রকৃতপক্ষে এটাই সব মু'মিনের রূহের আবাসস্থল। হযরত কা'ব ইবনে মালেক (রা.)-এর বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

اِنَّمَا نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ طَائِرٌ يَعْلَقُ فِىْ شَجَرِ الْجَنَّةِ حَتّٰى تَرْجِعَ اِلٰى جَسَدِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ মু'মিনের রূহ্ পাখীর আকারে জান্নাতের বৃক্ষে ঝুলন্ত থাকবে এবং কিয়ামতের দিন আবার আপন দেহে ফিরে যাবে। এই বিষয়বস্তুরই এক রেওয়ায়েত মুসনাদে আহমদ ও তাবারানীতে বর্ণিত হয়েছে। –[মাযহারী]

মৃত্যুর পর মানবাত্মার স্থান কোথায়? এ ব্যাপারে হাদীসসমূহে বাহ্যত বিভিন্নরূপ। সিজ্জীন ও ইল্লিয়্যীনের তাফসীর প্রসঙ্গে উপরে বর্ণিত হাদীসসমূহ থেকে জানা যায় যে, কাফেরদের আত্মা সিজ্জীনে থাকে যা সপ্তম জমিনে অবস্থিত এবং মু'মিনদের আত্মা সপ্তম আকাশে আরশের নিচে ইল্লিয়্যীনে থাকে। উল্লিখিত কতক রেওয়ায়েত থেকে আরও জানা যায় যে, কাফেরদের আত্মা জাহান্নামে এবং মু'মিনদের আত্মা জান্নাতে থাকে। আরও কতক হাদীস থেকে জানা যায় যে, মু'মিন ও কাফের উভয় শ্রেণির আত্মা তাদের কবরে থাকে। বারা ইবনে আজেব (রা.)-এর বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদীসে আছে, যখন মু'মিনের আত্মাকে ফেরেশতাগণ আকাশে নিয়ে যায়, তখন আল্লাহ্ বলেন : আমার এই বান্দার আমলনামা ইল্লিয়্যীনে লিখে দাও এবং তাকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে দাও। কেননা আমি তাকে মাটি দ্বারাই সৃষ্টি করেছি, মৃত্যুর পর তাতেই ফিরিয়ে দিব এবং মাটি থেকে তাকে জীবিতাবস্থায় পুনরুত্থিত করব। এই আদেশ পেয়ে ফেরেশতাগণ তার আত্মা কবরে ফিরিয়ে দেয়। এমনিভাবে কাফেরের আত্মার জন্য আকাশের দরজা খোলা হবে না এবং তাকে কবরে ফিরেয়ে দেওয়ার আদেশ করা হবে। ইমাম ইবনে আবদুল বার (র.) এই হাদীসকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন, যার মর্ম এই যে, মু'মিন ও কাফের সবার আত্মা মৃত্যুর পর কবরেই থাকে। উপরিউক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় রেওয়ায়েতের মধ্যে যে বিরোধ দেখা যায়, চিন্তা করলে বোঝা যায় যে, এটা কোনো বিরোধ নয়। কেননা ইল্লিয়্যীনের স্থান সপ্তম আকাশে আরশের নিচে এবং জান্নাতের স্থানও সেখানেই। কুরআন পাকের অন্য এক আয়াতে আছে :

عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوٰى- এ থেকে পরিষ্কার জানা যায় যে, জান্নাত সিদরাতুল মুনতাহার সন্নিকটে। সিদরাতুল মুনতাহা যে সপ্তম আকাশে একথা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তাই আত্মার স্থান ইল্লিয়্যীন জান্নাতের সংলগ্ন এবং আত্মাসমূহ জান্নাতের বাগিচায় ভ্রমণ করে। অতএব, আত্মার স্থান জান্নাতও বলা যায়।

এমনিভাবে কাফেরদের আত্মার স্থান সিজ্জীন–সপ্তম জমিনে অবস্থিত। হাদীস দ্বারা একথাও প্রমাণিত আছে যে, জাহান্নামও সপ্তম জমিনে অবস্থিত এবং জাহান্নামের উত্তাপ ও কষ্ট সিজ্জীনবাসীরা ভোগ করবে। তাই কাফেরদের আত্মার স্থান জাহান্নাম একথা বলে দেওয়াও নির্ভুল। তবে যে রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, কাফেরদের আত্মা কবরে থাকে, সেই রেওয়ায়েত বাহ্যত উপরিউক্ত দুই রেওয়ায়েতের বিরোধী। প্রখ্যাত তাফসীরবিদ হযরত কাযী সানাউল্লাহ্ পানিপথী (র.) তাফসীরে-মাযহারীতে এই বিরোধের মীমাংসা দিয়ে বলেছেন : এটা মোটেই অবান্তর নয় যে, আত্মাসমূহের আসল স্থান ইল্লিয়্যীন ও সিজ্জীনই। কিন্তু এসব আত্মার একটি বিশেষ যোগসূত্র কবরের সাথেও কায়েম রয়েছে। এই যোগসূত্র কিরূপ, তার স্বরূপ আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ জানতে পারে না। কিন্তু সূর্য ও চন্দ্র যেমন আকাশে থাকে এবং তাদের কিরণ পৃথিবীতে পড়ে পৃথিবীকেও আলোকোজ্জ্বল করে দেয় এবং উত্তপ্তও করে, তেমনিভাবে ইল্লিয়্যীন ও সিজ্জীনস্থ আত্মা-সমূহের কোনো অদৃশ্য যোগসূত্র কবরের সাথে থাকতে পারে। এই মীমাংসার ব্যাপারে কাযী সানাউল্লাহ্ (র.)-এর সুচিন্তিত বক্তব্য সূরা নাযিয়াতের তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, রূহ্ দুই প্রকার–১. মানবদেহে প্রবিষ্ট সূক্ষ্ম দেহ। এটা বস্তুনিষ্ঠ এবং চারি উপাদানে গঠিত দেহ, কিন্তু এমন সূক্ষ্ম যে, দৃষ্টিগোচর হয় না। একেই নফস বলা হয়। ২. অবস্তুনিষ্ঠ অশরীরী রূহ্। এই রূহ্ই নফসের জীবন। কাজেই একে রূহের রূহ্ বলা যায়। মানবদেহের সাথে উভয় প্রকার রূহের সম্পর্ক আছে। কিন্তু প্রথম প্রকার রূহ্ অর্থাৎ নফ্স মানবদেহের অভ্যন্তরে থাকে। এর বের হয়ে যাওয়ারই নাম মৃত্যু। দ্বিতীয় রূহ্ প্রথম রূহের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখে কিন্তু এই সম্পর্কের স্বরূপ আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না। মৃত্যুর পর প্রথম রূহকে আকাশে নিয়ে যাওয়া হয়, অতঃপর কবরে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। কবরই এর স্থান। আজাব ও ছওয়াব এর উপরই চলে এবং দ্বিতীয় প্রকার অশরীরী রূহ্ ইল্লিয়্যীন অথবা সিজ্জীনে থাকে। এভাবে সব রেওয়ায়েতের মধ্যে কোনো বিরোধ অবশিষ্ট থাকে না। অতএব, অশরীরী আত্মাসমূহ জান্নাতে অথবা ইল্লিয়্যীনে, জাহান্নামে অথবা সিজ্জীনে থাকে এবং প্রথম প্রকার রূহ্ তথা সূক্ষ্মা শরীরী নফ্স কবরে থাকে।

وَفِىْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ : تَنَافُسٌ- এর অর্থ কোনো বিশেষ পছন্দনীয় জিনিস অর্জন করার জন্য কয়েকজনের ধাবিত হওয়া ও দৌড়ানো, যাতে অপরের আগে সে তা অর্জন করে। এখানে জান্নাতের নিয়ামতরাজি উল্লেখ করার পর আল্লাহ তা'আলা গাফিল মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন : আজ তোমরা যেসব বস্তুকে প্রিয় ও কাম্য মনে কর, সেগুলো অর্জন করার জন্য অগ্রে চলে যাওয়ার চেষ্টায়রত আছ, সেগুলো অসম্পূর্ণ ও ধ্বংসশীল নিয়ামত। এসব

নিয়ামত প্রতিযোগিতার যোগ্য নয়। এসব ক্ষণস্থায়ী সুখের সামগ্রী হাতছাড়া হয়ে গেলেও তেমন দুঃখের কারণ নয়। হ্যাঁ, জান্নাতের নিয়ামতরাজির জন্যই প্রতিযোগিতা করা উচিত। এগুলো সবদিক দিয়ে সম্পূর্ণ চিরস্থায়ী। আকবর এলাহাবাদী মরহুম চমৎকার বলেছেন :

یہ کہاں کا فسانہ ہے سود و زیاں * جو گیا سو گیا جو ملا سو ملا

کہو ذہن سے فرصت عمر ہے کم * جو دلا تو خدا ہی کی یاد دلا

اِنَّ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا كَانُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَضْحَكُوْنَ এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সত্যপন্থিদের সাথে মিথ্যাপন্থিদের ব্যবহারের পূর্ণ চিত্র অংকন করেছেন। কাফেররা মু'মিনদেরকে উপহাস করে হাসত, তাদেরকে সামনে দেখলে চোখ টিপে ইশারা করত। এরপর তারা যখন নিজেদের বাড়িঘরে ফিরত, তখন মু'মিনদেরকে উপহাস করার বিষয়ে আনন্দভরে আলোচনা করত। কাফেররা মু'মিনদেরকে দেখে বাহ্যত সহানুভূতির সূরে এবং প্রকৃতপক্ষে উপহাসের ছলে বলত : এ বেচারীরা বড় সরলমনা ও বেওকুফ। মুহাম্মদ তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে দিয়েছে।

আজকালকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, যারা নব্যশিক্ষার অশুভ ফলস্বরূপ ধর্ম ও পরকালের ব্যাপারে বেপরোয়া হয়ে গেছে এবং আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি নামেমাত্রই বিশ্বাসী রয়ে গেছে, তারা আলিম ও ধর্মপরায়ণ লোকদের সাথে হুবহু এমনি ধরনের ব্যবহার করে থাকে। আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে এই মর্মন্তুদ আজাব থেকে রক্ষা করুন। এই আয়াতে মু'মিন ও ধার্মিক লোকদের জন্য সান্ত্বনার যথেষ্ট বিষয়বস্তু রয়েছে। তাদের উচিত এই তথাকথিত শিক্ষিতদের উপহাসের পরোয়া না করা। জনৈক কবি বলেন :

ہنسے جانے سے جب تک ہم ڈرینگے * زمانہ ہم پر ہنستا ہی رہیگا

শব্দ বিশ্লেষণ :

اَلْمُطَفِّفِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব تَفْعِيْل মাসদার تَطْفِيْف মূলবর্ণ (ط – ف – ف) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– যারা মাপে কম দেয়।

اِكْتَالُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَال মাসদার اِكْتِيَال মূলবর্ণ (ك – ى – ل) জিনস اجوف يائى অর্থ– তারা মেপে নেয়।

يَسْتَوفُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِسْتِفْعَال মাসদার اِسْتِيْفَاء মূলবর্ণ (و – ف – ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– তারা পুরাপুরি নেয়।

كَالُوْهُم : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার كَيْل মূলবর্ণ (ك – ى – ل) জিনস اجوف يائى অর্থ– তারা মেপে দেয়।

يُخْسِرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَال মাসদার اِخْسَار মূলবর্ণ (خ – س – ر) জিনস صحيح অর্থ– তারা কম দেয়।

سِجِّيْنَ : জেলখানা। আবূ হাতেম কিতাবুল জিনাতে বর্ণনা করে, এই শব্দটি অনারবী। শায়খ ইসমাঈল হক বারুস্‌ভী লিখেন, সিজ্জীন ঐ স্বয়ংসম্পূর্ণ কিতাবের ইলম, যা খারাপের পাণ্ডুলিপি, যাতে শয়াতানসমূহের কুফরিসুলভ আর মানুষ ও জিনের সকল আমল সংরক্ষিত। এই শব্দটিকে মুনসারিফ পড়া হবে। কারণ তার একটি মাত্র সবব। তা হলো মারেফা। হযরত বারা (রা.) হযরত রাসূলে আকরাম ﷺ থেকে রেওয়ায়েত করেন, সিজ্জীন সাত জমিনের মধ্যে সর্বশেষ ও নিচের স্তর।

مَرْقُوْم : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব نَصَرَ মাসদার رَقْمٌ মূলবর্ণ (ر – ق – م) জিনস صحيح অর্থ– লিখিত, সিল মোহরকৃত।

رَانَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার رَيْنٌ মূলবর্ণ (ر – ى – ن) জিনস اجوف يائى অর্থ– মরিচিকা ধরেছে।

مَحْجُوْبُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم مفعول বাব نَصَرَ মাসদার حِجَابًا ও حَجْبًا মূলবর্ণ (ح - ج - ب) জিনস صحيح অর্থ– বাঁধা দেওয়া, আল্লাহ তা'আলার নুরের তাজ্জাল্লীকে যে দেখবে না। সৌন্দর্য দেখা থেকে বাঁধা দেওয়া হবে।

صَالُوْا : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব سَمِعَ মাসদার صَلْيٌ মূলবর্ণ (ص – ل – ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তারা প্রবেশ করবে।

عِلِّيِّيْنَ : উপরওয়ালা, উর্ধ্বে অবস্থানকারী। ইমাম রাগেব ইস্পাহানী বলেন, আয়াতে عِلِّيِّيْنَ কে অনেকে সবচেয়ে উচ্চস্তরের জান্নাতের নাম বলে মনে করেন। যেমন, সবচেয়ে নিম্নস্তরের দোজখকে سِجِّيْن বলে নামকরণ করা হয়েছে।

يَشْهَدُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার شُهُوْدٌ মূলবর্ণ (ش - ه - د) জিনস صحيح অর্থ– সে হাজির হবে, উপস্থিত হবে, সে উপস্থিত থাকবে।

رَحِيْق : ইসমে জামেদ। অর্থ : পানীয়, মদ, পরিষ্কার, অকৃত্রিম, খাঁটি। আল্লামা আবূ মানসুর সায়লাবি (র.) ফিকহুল লুগাতে আবূ ওবায়দা (র.) থেকে নকল করেন, الرَّحِيْق صَفْوَةُ الْخَمْرِ الَّتِى لَيْسَ فِيْهَا غَشٌّ রহীক হলো ঐ স্বচ্ছ পানীয়, যার মধ্যে কোনো মাতলামী নেই।

مِسْكٌ : ইসম, মিশক, মৃগনাভী, কস্তুরি, প্রসিদ্ধ সুগন্ধি, এর মীমে যের ও পেশ উভয়টি দিয়ে পড়া যায়। পারস্যের লোকেরা মীমে যের দিয়ে আর মাওরায়ান্নাহার লোকেরা মীমে পেশ দিয়ে পড়ে। (লোগাতে কিশওয়ারী)

يَتَنَافَسُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفَاعُلٌ মাসদার تَنَافُسٌ মূলবর্ণ (ن – ف – س) জিনস صحيح অর্থ– লালসা করে।

يَتَغَامَزُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفَاعُلٌ মাসদার تَغَامُزٌ মূলবর্ণ (غ - م - ز) জিনস صحيح অর্থ– তারা পরস্পর চোখ টেপাটেপি করত।

اِنْقَلَبُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব إِفْعَالٌ মাসদার إِنْقِلَابٌ মূলবর্ণ (ق – ل – ب) জিনস صحيح অর্থ– তারা ফিরে যেত।

ضَالُّوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ মাসদার ضَلَالٌ মূলবর্ণ (ض – ل – ل) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– ভ্রান্ত গোমরাহ, পথভ্রষ্ট।

ثُوِّبَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব تَفْعِيْل মাসদার تَثْوِيْب মূলবর্ণ (ث - و - ب) জিনস اجوف واوى অর্থ– প্রতিদান দেওয়া হয়েছে, বদলে দেওয়া হয়েছে, বিনিময় দেওয়া হলো। এ শব্দটি কুরআন মাজীদের যেখানে যেখানে ব্যবহৃত হয়েছে, সেখানে বড় বড় আমলের প্রতিদান দেওয়ার অর্থে হয়েছে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيْقٍ مَّخْتُوْمٍ خِتَامُهٗ مِسْكٌ وَفِىْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ : এখানে يُسْقَوْنَ হলো فعل مضارع مجهول আর مِنْ رَّحِيْقٍ হলো يُسْقَوْنَ -এর সাথে متعلق আর مَخْتُوْمٌ হলো رَحِيْقٌ -এর সিফত। আর خِتَامُهٗ হলো মুবতাদা, আর مِسْكٌ হলো খবর। মুবতাদা খবর মিলে رَحِيْق -এর দ্বিতীয় সিফত হয়েছে। আর وَفِىْ -এর واو হলো হরফে আতফ আর فِىْ ذٰلِكَ টা فَلْيَتَنَافَسْ -এর সাথে متعلق আর فَلْيَتَنَافَسِ -এর فاء টি আতেফা لِيَتَنَافَسْ হলো ফে'ল, আর اَلْمُتَنَافِسُوْنَ হলো ফায়েল। –[ই'রাবুল কুরআন ৮ম খণ্ড : পৃ. ২৫৫]

سُوْرَةُ الْاِنْشِقَاقِ مَكِّيَّةٌ

সূরা ইনশিকাক

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত– ২৫, রুকূ'– ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. [দ্বিতীয় ফুৎকারে] যখন আসমান বিদীর্ণ হবে।	اِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ ﴿١﴾
২. এবং স্বীয় প্রভুর নির্দেশ শ্রবণ করবে এবং সে [আসমান] তারই [অর্থাৎ সে আজ্ঞা পালনেরই] যোগ্য।	وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ﴿٢﴾
৩. আর যখন জমিনকে বিস্তৃত করা হবে।	وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ ﴿٣﴾
৪. আর সে স্বীয় গর্ভস্থ বস্তুসমূহ উগরিয়ে বাইরে নিক্ষেপ করবে এবং শূন্যগর্ভ হয়ে যাবে।	وَاَلْقَتْ مَا فِيْهَا وَتَخَلَّتْ ﴿٤﴾
৫. এবং স্বীয় প্রতিপালকের নির্দেশ শ্রবণ করবে আর সে এরই যোগ্য।	وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ﴿٥﴾
৬. হে মানব! তুমি তোমার রবের সম্মুখে উপনীত হওয়া পর্যন্ত কঠোর সাধনা করতে হবে। অতঃপর তারই সাথে সাক্ষাৎ করবে।	يٰۤاَيُّهَا الْاِنْسَانُ اِنَّكَ كَادِحٌ اِلٰى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلٰقِيْهِ ﴿٦﴾
৭. অনন্তর যার আমলনামা তার ডান হাতে প্রদান করা হবে।	فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ ﴿٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. اِذَا السَّمَآءُ যখন আসমান اِنْشَقَّتْ বিদীর্ণ হবে।

২. وَاَذِنَتْ এবং সে শ্রবণ করবে لِرَبِّهَا স্বীয় প্রভুর (নির্দেশ) وَحُقَّتْ এবং সে তারই যোগ্য।

৩. وَاِذَا الْاَرْضُ আর যখন জমিনকে مُدَّتْ বিস্তৃত করা হবে।

৪. وَاَلْقَتْ উগরিয়ে বাইরে নিক্ষেপ করবে / ফেলে দিবে مَا فِيْهَا স্বীয় গর্ভস্থ বস্তুসমূহ / যা তার ভিতরে রয়েছে, তা وَتَخَلَّتْ এবং সে শূন্যগর্ভ হয়ে যাবে / খালি হয়ে যাবে।

৫. وَاَذِنَتْ এবং সে শ্রবণ করবে لِرَبِّهَا স্বীয় প্রভুর (নির্দেশ) وَحُقَّتْ এবং সে এরই যোগ্য।

৬. يٰۤاَيُّهَا الْاِنْسَانُ হে মানব! اِنَّكَ নিশ্চয় তুমি كَادِحٌ সাধনা করতে হবে / পরিশ্রম করছ اِلٰى رَبِّكَ তোমার রবের সম্মুখে উপনীত হওয়া পর্যন্ত كَدْحًا কঠোর সাধনা / পরিশ্রম فَمُلٰقِيْهِ অতঃপর তারই সাথে সাক্ষাৎ করবে।

৭. فَاَمَّا مَنْ অনন্তর যাকে اُوْتِيَ প্রদান করা হবে كِتٰبَهٗ তার আমলনামা بِيَمِيْنِهٖ তার ডান হাতে।

অনুবাদ	আয়াত
৮. তবে তার থেকে সহজ হিসাব নেওয়া হবে।	فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا (٨)
৯. এবং সে তার পরিজনের নিকট সানন্দে ফিরে আসবে।	وَّيَنْقَلِبُ اِلٰۤى اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا (٩)
১০. আর যাকে তার আমলনামা পশ্চাৎ দিক দিয়ে প্রদান করা হবে।	وَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتٰبَهٗ وَرَآءَ ظَهْرِهٖ (١٠)
১১. ফলে সে মৃত্যুকে ডাকতে থাকবে।	فَسَوْفَ يَدْعُوْا ثُبُوْرًا (١١)
১২. এবং দোজখে প্রবেশ করবে।	وَّيَصْلٰى سَعِيْرًا (١٢)
১৩. এই ব্যক্তি [দুনিয়ায়] স্বীয় পরিজনের মধ্যে সানন্দে ছিল।	اِنَّهٗ كَانَ فِىْۤ اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا (١٣)
১৪. সে ভেবেছিল যে, তাকে [আল্লাহর সমীপে] কখনো প্রত্যাবর্তন করতে হবে না।	اِنَّهٗ ظَنَّ اَنْ لَّنْ يَّحُوْرَ (١٤)
১৫. অবশ্যই ফিরে যাবে; নিশ্চয় তার প্রভু তাকে ভালোরূপেই দেখছিলেন।	بَلٰۤى اِنَّ رَبَّهٗ كَانَ بِهٖ بَصِيْرًا (١٥)
১৬. অতএব আমি শফকের [অস্তরাগের লালিমাযুক্ত পশ্চিমাকাশের] শপথ করে বলছি।	فَلَاۤ اُقْسِمُ بِالشَّفَقِ (١٦)
১৭. আর রাত্রির এবং সে সমস্ত বস্তুর যা রাত্রি সমবেত করে।	وَالَّيْلِ وَمَا وَسَقَ (١٧)
১৮. আর চন্দ্রের যখন তা পরিপূর্ণ হয়।	وَالْقَمَرِ اِذَا اتَّسَقَ (١٨)

শাব্দিক অনুবাদ :

৮. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ তার থেকে হিসাব নেওয়া হবে। حِسَابًا يَّسِيْرًا অত্যন্ত সহজ হিসাব।

৯. وَيَنْقَلِبُ এবং সে ফিরে আসবে اِلٰۤى اَهْلِهٖ তার পরিজনের নিকট। مَسْرُوْرًا সানন্দে।

১০. وَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ আর যাকে প্রদান করা হবে كِتٰبَهٗ তার আমলনামা وَرَآءَ ظَهْرِهٖ তার পশ্চাৎ দিক দিয়ে।

১১. فَسَوْفَ يَدْعُوْا ফলে সে ডাকতে থাকবে। ثُبُوْرًا মৃত্যুকে ধ্বংসকে।

১২. وَيَصْلٰى এবং সে প্রবেশ করবে। سَعِيْرًا দোজখে।

১৩. اِنَّهٗ كَانَ নিশ্চয় এই ব্যক্তি ছিল فِىْۤ اَهْلِهٖ স্বীয় পরিজনের মধ্যে। مَسْرُوْرًا সানন্দে।

১৪. اِنَّهٗ ظَنَّ সে ভেবেছিল যে اَنْ لَّنْ يَّحُوْرَ তাকে কখনো প্রত্যাবর্তন করতে হবে না।

১৫. بَلٰى অবশ্যই اِنَّ رَبَّهٗ নিশ্চয় তার প্রভু। كَانَ بِهٖ بَصِيْرًا তাকে ভালোরূপেই দেখছিলেন।

১৬. فَلَاۤ اُقْسِمُ অতএব আমি শপথ করছি بِالشَّفَقِ শফকের / সান্ধ্য লালিমার

১৭. وَالَّيْلِ আর শপথ রাত্রের وَمَا وَسَقَ এবং সে সমস্ত বস্তুর যা রাত্রি সমবেত করে।

১৮. وَالْقَمَرِ আর চন্দ্রের শপথ اِذَا اتَّسَقَ যখন তা পরিপূর্ণ হয়।

১৯. অবশ্যই তোমাদেরকে এক অবস্থা হতে অন্য অবস্থায় উপনীত হতে হবে।	لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ﴿١٩﴾
২০. সুতরাং তাদের কি হলো যে, তারা ঈমান আনছে না?	فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠﴾
২১. আর যখন তাদের সম্মুখে কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তারা নত হয় না।	وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ ﴿٢١﴾ السجدة
২২. বরং কাফেররা তাকে অবিশ্বাস করে।	بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ ﴿٢٢﴾
২৩. আর আল্লাহ তা'আলার সবকিছুই জানা আছে, তারা যা [যে অসৎ কার্যসমূহ] সঞ্চয় করছে।	وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ﴿٢٣﴾
২৪. সুতরাং আপনি তাদেরকে এক যন্ত্রণাময় আজাবের খবর শুনিয়ে দিন।	فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٤﴾
২৫. কিন্তু যারা ঈমান এনেছে এবং নেককাজ করেছে তাদের জন্য [পরকালে] এমন প্রতিদান রয়েছে যা কখনো বিচ্ছিন্ন হবার নয়।	إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿٢٥﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৯. لَتَرْكَبُنَّ অবশ্যই তোমাদেরকে উপনীত হতে হবে طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ এক অবস্থা হতে অন্য অবস্থায়।

২০. فَمَا لَهُمْ সুতরাং তাদের কি হলো যে لَا يُؤْمِنُونَ তারা ঈমান আনছে না?

২১. وَإِذَا قُرِئَ আর যখন পাঠ করা হয় عَلَيْهِمُ তাদের সম্মুখে الْقُرْآنُ কুরআন لَا يَسْجُدُونَ তখন তারা নত হয় না।

২২. بَلِ الَّذِينَ বরং যারা كَفَرُوا কুফরি করেছে يُكَذِّبُونَ তারা (তাকে) অবিশ্বাস করে।

২৩. وَاللَّهُ أَعْلَمُ আর আল্লাহ তা'আলা ভালোভাবেই জানেন بِمَا يُوعُونَ তারা যা সঞ্চয় করছে -সে সম্পর্কে।

২৪. فَبَشِّرْهُمْ সুতরাং আপনি তাদেরকে খবর শুনিয়ে দিন بِعَذَابٍ أَلِيمٍ এক যন্ত্রণাময় আজাবের।

২৫. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا কিন্তু যারা ঈমান এনেছে وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ এবং নেককাজ করেছে لَهُمْ তাদের জন্য রয়েছে أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ এমন প্রতিদান যা কখনো বিচ্ছিন্ন হবার নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরার নামকরণের কারণ : এ সূরার নাম প্রথম আয়াতে উল্লিখিত اِنْشَقَّتْ শব্দ হতে গ্রহণ করা হয়েছে। এর অর্থ : বিদীর্ণ হওয়া। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আল্লাহর হুকুমে আকাশ বিদীর্ণ হয়ে যাবে। আকাশ বিদীর্ণ হওয়ার কথা দ্বারাই সূরার ভাষণটি শুরু করা হয়েছে। এতে ২৫টি আয়াত, ১০৯টি বাক্য এবং ৭৩০ টি অক্ষর রয়েছে।

সূরাটি অবতীর্ণের সময়কাল : এ সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ ইসলামি যুগের প্রথম দিকের সূরা। যদিও অবতীর্ণের সঠিক সময় কখন ছিল, তা জানা যায় না, তবে সূরার আলোচ্য বিষয়াদি হতে প্রমাণ হয় যে, তখনো মক্কায় ইসলামের প্রকাশ্য বিরোধিতা শুরু হয়নি; বরং কুরআনকে মিথ্যা জানা হতো এবং মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত হওয়া, হাশর-নশর, হিসাব-নিকাশ ইত্যাদিকে অস্বীকার করা হতো। সম্ভবত এ সময়ই কিয়ামতের অনিবার্যতা এবং হাশর-নশর ও হিসাব-নিকাশের অবশ্যম্ভাবিতা অবহিত করানোর জন্য এ সূরা অবতীর্ণ হয়।

সূরাটির আলোচ্য বিষয় ও মূলকথা : কিয়ামত ও পরকালই এর মূল আলোচ্য বিষয়। প্রথম পাঁচটি আয়াতে শুধু কিয়ামতের পরিস্থিতির কথাই বলা হয়নি; বরং এটা যে- নিঃসন্দেহে সত্য ও অবধারিত, তার যুক্তিও দেওয়া হয়েছে। কিয়ামতের পরিস্থিতে বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে– সেদিন আকাশ ফেটে যাবে, জমিন সম্প্রসারিত করে সমতল প্রান্তর বানিয়ে দেওয়া হবে। মাটির গর্ভে যা কিছু লুক্কায়িত রয়েছে (মৃত মানুষের দেহাবশেষ এবং তাদের আমলের প্রমাণাদি) তা সবই বাহিরে নিক্ষিপ্ত হবে। শেষ পর্যন্ত সেখানে কিছুই থাকবে না। এর প্রমাণ স্বরূপ বলা হয়েছে যে, আকাশ ও জমিনের প্রতি এটাই হবে আল্লাহর নির্দেশ। আর উভয়ই যেহেতু আল্লাহর সৃষ্ট, এ জন্য তাঁর নির্দেশের বিরোধিতা বা অমান্য করা তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না।

অতঃপর ৬-১৯ পর্যন্ত থেকে আয়াতে বলা হয়েছে যে, মানুষের মধ্যে এর চেতনা থাকুক আর নাই থাকুন- আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার দিকে তারা ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক তীব্র গতিতে গমন করছে। অতঃপর সব মানুষ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়বে।

এক ভাগের লোকদের ডান হাতে তাদের আমলনামা দেওয়া হবে এবং কোনোরূপ সঠিক হিসাব-নিকাশ ছাড়াই তাদেরকে ক্ষমা করা হবে। দ্বিতীয় ভাগের লোকদের আমলনামা তাদের পিছনের দিক হতে সামনে ফেলে দেওয়া হবে। এ অবস্থায় যে কোনোভাবে তাদের মৃত্যু আসুক, তাই হবে তাদের মনের একমাত্র কামনা। কিন্তু মৃত্যু তো নেই, তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তারা যেহেতু দুনিয়াতে এক বড় ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে পড়েছিল। তারা মনে করে বসেছিল যে, জাবাবদিহির জন্য কখনই আল্লাহর সম্মুখে হাজির হতে হবে না। তাদের উক্ত রূপ পরিণাম হবে ঠিক এ কারণেই। কেননা আল্লাহ তো তাদের সব আমলই দেখছিলেন। তাদের আমলের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ হতে তাদেরকে অব্যাহতি দেওয়ার তো কোনোই কারণ নেই। দুনিয়ার জীবন হতে পরকালের শাস্তি ও পুরস্কার পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে ও পর্যায়ে তাদের উপস্থিতি সন্দেহাতীত ব্যাপার। সূর্যাস্তের পর রঙিন উষার উদয়, দিনের অবসানে রাত্রের আগমন, এতে মানুষ ও গৃহপালিত চুতষ্পদ জন্তুগুলোর নিজ নিজ আশ্রয়ে ফিরে আসা এবং চন্দ্রের প্রথম হাঁসুলির আকার হতে ক্রমবৃদ্ধি পেয়ে পূর্ণ চন্দ্রের রূপ লাভ যতটা নির্ভুল ও সন্দেহাতীত, এ ব্যাপারটিও ঠিক তেমনই নিশ্চিত।

যেসব কাফের কুরআন মাজীদ শুনে আল্লাহর নিকট অবনত হওয়ার পরিবর্তে উল্টো তাকেই মিথ্যা মনে করে সে কাফেরদেরকে শেষের আয়াতে মর্মান্তিক দুঃসংবাদ দেওয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে যারা ঈমান আনয়ন করে নেকআমল গ্রহণ করে তাদেরকে অপরিমিত সুফল দানের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে।

وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ مَسْرُورًا [৯]

শানে নুযূল : হযরত কাতাদাহ (র.) বলেন যে, বর্ণিত রয়েছে, আলোচ্য আয়াত মক্কা থেকে মদীনার উদ্দেশে সর্বপ্রথম হিজরতকারী হযরত আবূ সালাম বিন আব্দুল আসাদ (রা.) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। –[কুরতুবী ২৩৮/১৯]

وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُۥ وَرَآءَ ظَهْرِهِۦ [১০]

শানে নুযূল : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন যে, আলোচ্য আয়াত আবূ সালমান ভাই আসওয়াদ বিন আব্দুল আসাদ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তবে তা সকল মু'মিন ও কাফের আলোচ্য আয়াতের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। –[কুরতুবী ২৩৯/১৯]

এ সূরায় কিয়ামতের অবস্থা, হিসাব-নিকাশ এবং সৎ ও অসৎ কর্মের প্রতিদান ও শাস্তির বর্ণনা আছে। অতঃপর গাফিল মানুষকে তার সত্তা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার এবং তাদ্বারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস পর্যন্ত পৌছার নির্দেশ আছে। এ প্রসঙ্গে প্রথমে আকাশ বিদীর্ণ হওয়ার কথা বলা হয়েছে। অতঃপর পৃথিবীর কথা বলা হয়েছে যে, তার গর্ভে যেসব গুপ্ত ভাণ্ডার অথবা মানুষের মৃতদেহ আছে, সব সেদিন বাইরে উদগীরণ করে দেবে এবং হাশরের জন্য এক নতুন পৃথিবী তৈরি হবে। তাতে না থাকবে কোনো পাহাড়-পর্বত এবং না থাকবে কোনো দালান-কোঠা ও বৃক্ষলতা। পরিষ্কার একটি সমতল ভূমি হবে। একে আরও সম্প্রসারিত করা হবে, যাতে করে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সব মানুষ তাতে সমবেত হতে পরে! অন্যান্য সূরায়ও এই বর্ণনা বিভিন্ন ভঙ্গিতে এসেছে। এখানে নতুন সংযোজন এই যে, কিয়ামতের দিক আকাশ ও পৃথিবীর উপর আল্লাহ তা'আলার কর্তৃত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে : وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ - أَذِنَتْ -এর অর্থ শুনেছে অর্থাৎ আদেশ পালন করেছে। حُقَّتْ -এর অর্থ حُقَّ لَهَا الْاِنْقِيَادُ অর্থাৎ আদেশ পালন করাই তার ওয়াজিব কর্তব্য ছিল।

আল্লাহর নির্দেশ দুই প্রকার : এখানে আকাশ ও পৃথিবীর আনুগত্য এবং আদেশ প্রতিপালনের দুই অর্থ হতে পারে। কেননা আল্লাহর নির্দেশ দুই প্রকার–১. শরিয়তগত নির্দেশ; এতে একটি আইন ও বিরুদ্ধাচরণের শাস্তি বলে দেওয়া হয় না কিন্তু প্রতিপক্ষকে করা না করার ব্যাপারে বাধ্য করা হয় না বরং তাকে স্বেচ্ছায় আইন মানা না মানা উভয় বিষয়ের ক্ষমতা

দান করা হয়। এসব নির্দেশ সাধারণত বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন সৃষ্টির প্রতি আরোপিত হয়ে থাকে; যেমন মানব ও জিন। এই শ্রেণির নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতেই মু'মিন ও কাফের এবং বাধ্য ও অবাধ্যের দুইটি প্রকার সৃষ্টি হয়। ২. সৃষ্টিগত ও তাকদীরগত নির্দেশ; এ জাতীয় নির্দেশ বাধ্যতামূলকভাবে আরোপিত হয়। কারও সাধ্য নেই যে, চুল পরিমাণ বিরুদ্ধাচরণ করে। সমগ্র সৃষ্টি এ জাতীয় নির্দেশ বাধ্যতামূলকভাবে পালন করে; জিন এবং মানবও এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। মু'মিন কাফির, সৎ ও পাপাচারী সবাই এই আইন মেনে চলতে বাধ্য।

ذرہ ذرہ دہر کا پابستہ تقدیر ہے * زندگی کے خواب کی جامی یہی تعبیر ہے

এস্থলে এটা সম্ভবপর যে, আল্লাহ তা'আলা আকাশ ও পৃথিবীকে আদিষ্ট মানব ও জিনের ন্যায় চেতনা ও উপলব্ধি দান করবেন। ফলে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কোনো নির্দেশ আসা মাত্রই তারা স্বেচ্ছায় তা পালন করবে ও মেনে নেবে। আর যদি নির্দেশের অর্থ এখানে সৃষ্টিগত নির্দেশ নেওয়া হয়, যাতে ইচ্ছা ও এরাদার কোনো দখলই নেই, তবে এটাও সম্ভবপর। তবে أَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ -এর ভাষা প্রথমোক্ত অর্থের অধিক নিকটবর্তী। দ্বিতীয় অর্থও রূপক হিসাবে হতে পারে।

وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ : مَدَّ –এর অর্থ টেনে লম্বা করা। হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.)-এর বর্ণিত রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : কিয়ামতের দিন পৃথবীকে চামড়ার (অথবা রবারের) ন্যায় টেনে সম্প্রসারিত করা হবে। এতদসত্ত্বেও পৃথিবীর আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সব মানুষ একত্রিত হওয়ার ফলে এক একজনের ভাগে কেবল পা রাখার স্থান পড়বে। –[মাযহারী]

وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ : অর্থাৎ পৃথিবী তার গর্ভস্থিত সবকিছু উদগীরণ করে একেবারে শূন্যগর্ভ হয়ে যাবে। পৃথিবীর গর্ভে গুপ্ত ধনভাণ্ডার, খনি এবং সৃষ্টির আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত মৃত মানুষের দেহকণা ইত্যাদি রয়েছে। প্রবল ভূকম্পনের মাধ্যমে পৃথিবী এসব বস্তু গর্ভ থেকে বাইরে নিক্ষেপ করবে।

يَاأَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ : كَدْحٌ -এর অর্থ কোনো কাজে পূর্ণ চেষ্টা ও শক্তি ব্যয় করা। إِلَىٰ رَبِّكَ –অর্থাৎ মানুষের প্রত্যেক চেষ্টা ও অধ্যবসায় আল্লাহর দিকে চূড়ান্ত হবে।

আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তন : এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সম্বোধন করে চিন্তাভাবনার একটি পথ দেখিয়েছেন। যদি মানুষের মধ্যে সামান্যতম জ্ঞানবুদ্ধি ও চেতনা থাকে এবং এ পথে চিন্তাভাবনা করে, তবে সে তার চেষ্টা চরিত্র ও অধ্যবসায়ের সঠিক গতি নির্ণয় করতে সক্ষম হবে এবং এটা হবে তার ইহকাল ও পরকালের নিরাপত্তার গ্যারান্টি। আল্লাহ তা'আলার প্রথম কথা এই যে, সৎ-অসৎ ও কাফের-মু'মিন নির্বিশেষে মানুষ মাত্রই প্রকৃতিগতভাবে কোনো না কোনো বিষয়কে লক্ষ্য স্থির করে তা অর্জনের জন্য অধ্যবসায় ও শ্রম স্বীকার করতে অভ্যস্ত। একজন সম্ভ্রান্ত ও সৎ লোক যেমন জীবিকা ও জীবনের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সংগ্রহের জন্য প্রাকৃতিক ও বৈধ পন্থাসমূহ অবলম্বন করে এবং তাতে স্বীয় শ্রম ও শক্তি ব্যয় করে, তেমনি দুষ্কর্মী ও অসৎ ব্যক্তিও পরিশ্রম এবং অধ্যবসায় ব্যতিরেকে স্বীয় উদ্দেশ্য হাসিল করতে পারে না। চোর, ডাকাত, বদমায়েশ ও লুটতরাজকারীদেরকে দেখুন, তারা কি পরিমাণ মানসিক ও দৈহিক শ্রম স্বীকার করে। এরপরই তারা লক্ষ্য অর্জনে সফলকাম হয়। দ্বিতীয় কথা এই বলা হয়েছে যে, মানুষের প্রত্যেকটি গতিবিধি বরং নিশ্চলতাও এমন এক সফরের বিভিন্ন মনজিল, যা সে আজ্ঞাতসারেই অব্যাহত রেখেছে। এই সফরে শেষ সীমা আল্লাহর সামনে উপস্থিত অর্থাৎ মৃত্যু। إِلَىٰ رَبِّكَ বাক্যাংশে এরই বর্ণনা রয়েছে। এই শেষ সীমা এমন একটি অকাট্য সত্য, যা অস্বীকার করার শক্তি কারও নেই। প্রত্যেকেই এই অপ্রিয় সত্য স্বীকার করতে বাধ্য যে, মানুষের প্রত্যেক চেষ্টা-চরিত্র ও অধ্যবসায় মৃত্যু পর্যন্ত নিঃশেষে হওয়া নিশ্চিত। তৃতীয় কথা এই বলা হয়েছে যে, মৃত্যুর পর পালনকর্তার সামনে উপস্থিত হওয়ার সময় সমস্ত গতিবিধি, কাজকর্ম ও চেষ্টা চরিত্রের হিসাব-নিকাশ হওয়া বিবেক ও ইনসাফের দৃষ্টিতে অবশ্যম্ভাবী, যাতে সৎ ও অসতের পরিণাম আলাদা আলাদাভাবে জানা যায়। নতুবা ইহকালে এতদুভয়ের মধ্যে কোনো পাথক্য নেই। একজন সৎ লোক একমাস মেহনত-মজুরি করে যে জীবনোপকরণ ও প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র যোগাড় করে, চোর ও ডাকাত তা এক রাত্রিতে অর্জন করে ফেলে। যদি হিসাবে কোনো সময় না আসে এবং প্রতিদান ও শাস্তি না হয়, তবে চোর, ডাকাত ও সৎ লোক এক পর্যায়ে চলে যাবে, যা বিবেক ও ইনসাফের পরিপন্থি। অবশেষে বলা হয়েছে : فَمُلَاقِيهِ -এর সর্বনাম দ্বারা كَدْحٌ ও বোঝানো যেতে পারে। অর্থ হবে এই যে, মানুষ এখানে যে চেষ্টা-চরিত্র করছে, পরিশেষে তার পালনকর্তার কাছে পৌছে এর সাথে তার সাক্ষাৎ ঘটবে এবং এর শুভ অথবা অশুভ পরিণতির সামনে এসে যাবে। এই সর্বনাম দ্বারা رَبّ -ও বোঝানো যেতে পারে। অর্থ এই যে, প্রত্যেক মানুষ পরকালে তার পালনকর্তার সাথে সাক্ষাৎ করবে এবং হিসাবের জন্য তার সামনে উপস্থিত হবে। অতঃপর সৎ ও অসৎ এবং মু'মিন ও কাফের মানুষের আলাদা আলাদা পরিণতি উল্লেখ করা

হয়েছে। ডান হাতে অথবা বাম হাতে আমলনামা আসার মাধ্যমে এর সূচনা হবে। ডান হাতওয়ালারা জান্নাতে চিরস্থায়ী নিয়ামতের সুসংবাদ এবং বাম হাতওয়ালারা জাহান্নামের শাস্তির দুঃসংবাদ পেয়ে যাবে। জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, এমনকি অনেক অনাবশ্যক ভোগ্য বস্তুও সৎ-অসৎ উভয়-প্রকার লোকই অর্জন করে। এভাবে পার্থিব জীবন উভয়ের অতিবাহিত হয়ে যায়। কিন্তু উভয়ের পরিণতিতে আকাশ-পাতাল পার্থক্য রয়েছে। একজনের পরিণতি স্থায়ী ও নিরবচ্ছিন্ন সুখই সুখ এবং অপরজনের পরিণতি অনন্ত আজাব ও বিপদ। মানুষ আজই এই পরিণতির কথা চিন্তা করে কেন চেষ্টা ও কর্মের গতিধারা আল্লাহ্‌র দিকে ফিরিয়ে দেয় না। যাতে দুনিয়াতেও তার প্রয়োজনাদি পূর্ণ হয় এবং পরকালেও জান্নাতের চিরস্থায়ী নিয়ামত হাতছাড়া না হয়?

فَاَمَّا مَنْ اُوْتِیَ كِتَابَهٗ بِیَمِیْنِهٖ فَسَوْفَ یُحَاسَبُ حِسَابًا یَّسِیْرًا وَّیَنْقَلِبُ اِلٰۤی اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا : এতে মু'মিনের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাদের আমলনামা ডান হাতে আসবে এবং তাদের সহজ হিসাব নিয়ে জান্নাতের সুসংবাদ দান করা হবে। তারা তাদের পরিবার-পরিজনের কাছে হৃষ্টচিত্তে ফিরে যাবে।

হযরত আয়েশা (রা.)-এর রেওয়ায়েতক্রমে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : مَنْ حُوْسِبَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ عُذِّبَ -অর্থাৎ কিয়ামতের দিন যার হিসাব নেওয়া হবে, সে আজাব থেকে রক্ষা পাবে না। একথা শুনে হযরত আয়েশা (রা.) প্রশ্ন করলেন : কুরআনে কি یُحَاسَبُ حِسَابًا یَّسِیْرًا বলা হয়নি? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এই আয়াতে যাতে সহজ হিসাব বলা হয়েছে, সেটা প্রকৃতপক্ষে পরিপূর্ণ হিসাব নয় বরং কেবল আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের সামনে উপস্থিতি। যে ব্যক্তির কাছ থেকে তার কাজকর্মের পুরোপুরি হিসাব নেওয়া হবে, সে আজাব থেকে কিছুতেই রক্ষা পাবে না। –[বুখারী]

এই হাদীস থেকে জানা গেল যে, মু'মিনদের কাজকর্মও সব আল্লাহ্‌র সামনে পেশ করা হবে কিন্তু তাদের ঈমানের বরকতে প্রত্যেক কর্মের চুলচেরা হিসাব হবে না। এরই নাম সহজ হিসাব। পরিবার-পরিজনের কাছে হৃষ্টচিত্তে ফিরে আসার বিবিধ অর্থ হতে পারে। এক. পরিবার-পরিজনের অর্থ জান্নাতের হুরগণ। তারাই সেখানে মু'মিনদের পরিবার-পরিজন হবে। দুই. দুনিয়ার পরিবার-পরিজনই অর্থ। হাশরের ময়দানে হিসাবের পর যখন মু'মিন ব্যক্তি সফল হবে, তখন দুনিয়ার অভ্যাস অনুযায়ী সাফল্যের সুসংবাদ শুনানোর জন্য সে তাদের কাছে যাবে। তাফসীরকারকগণ উভয় অর্থ বর্ণনা করেছেন। –[কুরতুবী]

اِنَّهٗ كَانَ فِیْۤ اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا : অর্থাৎ যার আমলনামা তার পিঠের দিক থেকে বাম হাতে আসবে সে মরে মাটি হয়ে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করবে, যাতে আজাব থেকে বেঁচে যায় কিন্তু সেখানে তা সম্ভবপর হবে না। তাকে জাহান্নামে দাখিল করা হবে। এর এক কারণ এই বলা হয়েছে যে, সে দুনিয়াতে তার পরিবার-পরিজনের মধ্যে পরকালের প্রতি উদাসীন হয়ে আনন্দ-উল্লাসে দিন যাপন করত। মু'মিনগণ এর বিপরীত। তারা পার্থিব জীবনে কখনও নিশ্চিন্ত হয় না। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও আরাম-আয়েশের মধ্যেও তারা পরকালের কথা বিস্মৃত হয় না। কুরআন পাক তাদের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলে : اِنَّا كُنَّا فِیْۤ اَهْلِنَا مُشْفِقِیْنَ : অর্থাৎ আমরা পরিবার-পরিজন পরিবেষ্টিত হয়েও পরকালের ভয় রাখতাম। তাই উভয় দলের পরিণতি তাদের জন্য উপযুক্ত হয়েছে। যারা দুনিয়াতে পরিবার-পরিজনের মধ্য থেকে পরকালের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে বিলাস-ব্যসন ও আনন্দ-উল্লাসে দিন অতিবাহিত করত, আজ তাদের ভাগ্যে জাহান্নামের আজাব এসেছে। পক্ষান্তরে যারা দুনিয়াতে পরকালের হিসাব-নিকাশ ও আজাবের ভয় রাখত, তারা আজ অনাবিল আনন্দ ও খুশি অর্জন করেছেন। এখন তারা তাদের পরিবার-পরিজনের মধ্যে চিরস্থায়ী আনন্দে বসবাস করবে। এ থেকে বোঝা গেল যে, দুনিয়ার সুখে মত্ত ও বিভোর হয়ে যাওয়া মু'মিনের কাজ নয়। সে কোনো সময় কোনো অবস্থাতেই পরকালের হিসাবের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয় না।

فَلَاۤ اُقْسِمُ بِالشَّفَقِ : এখানে আল্লাহ তা'আলা চারটি বস্তুর শপথ করে মানুষকে আবার اِنَّكَ كَادِحٌ اِلٰی رَبِّكَ আয়াতে বর্ণিত বিষয়ের প্রতি মনোযোগী করেছেন। শপথের জবাবে বলা হয়েছে যে, মানুষ এক অবস্থার উপর স্থিতিশীল থাকে না এবং তার অবস্থা প্রতিনিয়তই পরিবর্তিত হতে থাকে। চিন্তা করলে দেখা যায় যে, শপথের চারটি বস্তু এই বিষয়বস্তুর সাক্ষ্য দেয়। প্রথমে شَفَقْ -এর শপথ করা হয়েছে। এর অর্থ সেই লাল আভা, যা সূর্যাস্তের পর পশ্চিম দিগন্তে দেখা যায়। এটা রাত্রির সূচনা, যা মানুষের অবস্থায় একটি বড় পরিবর্তনের পূর্বাভাস। এ সময় আলো বিদায় নেয় এবং অন্ধকারের সয়লাব চলে আসে। এরপর স্বয়ং রাত্রির শপথ করা হয়েছে, যা এই পরিবর্তনকে পূর্ণতা দান করে। এরপর সেসব জিনিসের শপথ করা হয়েছে, যেগুলোকে রাত্রির অন্ধকার নিজের মধ্যে একত্র করে। وَسَقْ -এর আসল অর্থ একত্র করা। এর ব্যাপক অর্থ নেওয়া হলে এতে জীবজন্তু, উদ্ভিদ, জড় পদার্থ, পাহাড়-পর্বত, নদীনালা ইত্যাদি সবই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা রাত্রির অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যায়। এই অর্থও হতে পারে যে, যেসব বস্তু সাধারণত দিনের আলোতে চারদিকে ছড়িয়ে থাকে, রাত্রিবেলায় সেগুলো জড়ো হয়ে নিজ নিজ ঠিকানায় একত্রিত হয়ে যায়। মানুষ তার গৃহে, জীবজন্তু নিজ নিজ গৃহে ও বাসায় একত্রিত

হয়। কাজ-কারবারে ছড়ানো আসবাবপত্র গুটিয়ে এক জায়গায় জমা করা হয়। এই বিরাট পরিবর্তন স্বয়ং মানুষ ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট সবকিছুর মধ্যে হয়ে থাকে। চতুর্থ শপথ হচ্ছে : وَالْقَمَرِ اِذَا اتَّسَقَ এটাও وَسَقَ থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ একত্র করা। চন্দ্রের একত্র করার অর্থ তার তার আলোকে একত্র করা। এটা চৌদ্দ তারিখের রাত্রিতে হয়, যখন চন্দ্র ষোল কলায় পূর্ণ হয়ে যায়। এখানে চন্দ্রের বিভিন্ন অবস্থার দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। চন্দ্র প্রথমে খুবই সরু ধনুকের মতো দেখা যায়। এরপর প্রত্যহ এর আলো বৃদ্ধি পেতে পেতে পূর্ণিমার চাঁদ হয়ে যায়। অবিরাম ও উপর্যুপরি পরিবর্তনের সাক্ষ্যদাতা চারটি বস্তুর শপথ করে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ উপরে নিচে স্তরে স্তরে সাজানো জিনিসপত্রের এক একটি স্তরকে طَبَقٌ বলা হয়। رُكُوْبٌ-এর অর্থ আরোহণ করা। অর্থ এই যে, হে মানুষ, তোমরা সর্বদাই এক স্তর থেকে অন্য স্তরে আরোহণ করতে থাকবে। উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ সৃষ্টির আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত কোনো সময় এক অবস্থায় স্থির থাকে না বরং তার উপর পর্যায়ক্রমে পরিবর্তন আসতে থাকে।

মানুষের অস্তিত্বে অগণিত পরিবর্তন, অব্যাহত সফর এবং তার চূড়ান্ত মনজিল : সে বীর্য থেকে জমাট রক্ত হয়েছে, এরপর গোশ্‌তপিণ্ড হয়েছে, অতঃপর তাতে অস্থি সৃষ্টি হয়েছে, অস্থির উপর গোশ্‌ত হয়েছে এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পূর্ণতা লাভ করেছে, এরপর রূহ্ স্থাপন করার ফলে সে একজন জীবিত মানুষ হয়েছে। মায়ের পেটে তার খাদ্য ছিল গর্ভাশয়ের পচা রক্ত। নয় মাস পরে আল্লাহ তা'আলা তার পৃথিবীতে আসার পথ সুগম করে দিলেন। সে পচা রক্তের বদলে মায়ের দুধ পেল, দুনিয়ার সুবিস্তৃত পরিমণ্ডল দেখল, আলো-বাতাসের ছোঁয়া পেল। সে বাড়তে লাগল এবং নাদুস-নুদুস হয়ে গেল। দু'বছরের মধ্যে হাঁটি হাঁটি পা-পাসহ কথা বলারও শক্তি লাভ করল। মায়ের দুধ ছাড়া পেয়ে আরও অধিক সুস্বাদু ও রকমারি খাদ্য আসল। খেলাধুলা ও ক্রীড়াকৌতুক তার দিবারাত্রির একমাত্র কাজ হয়ে গেল। যখন কিছু জ্ঞান ও চেতনা বাড়ল তখন শিক্ষাদীক্ষার যাঁতা কলে আবদ্ধ হয়ে গেল। যখন যৌবনে পদার্পণ করল তখন অতীতের সব কাজ পরিত্যক্ত হয়ে যৌবনসুলভ কামনা-বাসনা তার স্থান দলখ করে বসল এং এক রোমাঞ্চকর জগৎ সামনে এলো। বিয়ে-শাদী, সন্তান-সন্ততি ও পরিবার পরিচালনার কর্মব্যস্ততায় দিবারাত্রি অতিবাহিত হতে লাগল। অবশেষে এ যুগেরও সমাপ্তি ঘটল। আঙ্গিক শক্তি ক্ষয় পেতে লাগল। প্রায়ই অসুখ-বিসুখ দেখা দিতে লাগল। অবশেষে বার্ধক্য আসল এবং ইহকালের সর্বশেষ মনজিল কবরে যাওয়ার প্রস্তুতি চলল। এসব বিষয় তো চোখের সামনে থাকে, যা কারও অস্বীকার করার সাধ্য নেই কিন্তু অদূরদর্শী মানুষ মনে করে যে, মৃত্যু ও কবরই তার সর্বশেষ মনজিল। এরপর কিছুই নেই। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞানী ও সব বিষয়ের খবর রাখেন। তিনি পয়গম্বরগণের মাধ্যমে গাফিল মানুষকে অবহিত করেছেন যে, কবর তোমার সর্বশেষ মনজিল নয়; বরং এটা এক প্রতীক্ষাগার। সামনে এক মহাজগৎ আসবে। তাতে এক মহাপরীক্ষার পর মানুষের সর্বশেষ মনজিল নির্ধারিত হবে, যা হয় চিরস্থায়ী আরাম ও সুখের মনজিল হবে, না হয় অনন্ত আজাব ও বিপদের মনজিল হবে। এই সর্বশেষ মনজিলেই মানুষ তার সত্যিকার আবাসস্থল লাভ করবে এবং পরিবর্তনের চক্র থেকে অব্যাহতি পাবে। কুরআন পাকে বলা হয়েছে اِنَّ اِلٰى رَبِّكَ الرُّجْعٰى - اِلٰى رَبِّكَ এবং كَادِحٌ اِلٰى رَبِّكَ –বলে এই বিষয়বস্তুই বর্ণনা করেছে। সে গাফিল মানুষকে এই সর্বশেষ মনজিল সম্পর্কে অবহিত করে হুঁশিয়ার করেছে যে, বয়স হচ্ছে দুনিয়ার সব পরিবর্তন, সর্বশেষ মনজিল পর্যন্ত যাওয়ার সফর এবং তার বিভিন্ন পর্যায়। মানুষ চলাফেরায়, নিদ্রা ও জাগরণে, দাঁড়ানো ও উপবিষ্ট–সর্বাবস্থায় এই সফরের মনজিলসমূহ অতিক্রম করছে। অবশেষে সে তার পালনকর্তার কাছে পৌঁছে যাবে এবং সারা জীবনের কাজ-কর্মের হিসাব দিয়ে সর্বশেষ মনজিলে অবস্থান লাভ করবে, সেখানে হয় সুখই সুখ এবং নিরবচ্ছিন্ন আরাম, না হয় আজাবই আজাব এবং অশেষ বিপদ রয়েছে। এতএব, বুদ্ধিমান মানুষের কর্তব্য হচ্ছে দুনিয়াতে নিজেকে একজন মুসাফির মনে করা এবং পরকালের জন্য আসবাবপত্র তৈরি ও প্রেরণের চিন্তাকেই দুনিয়ার সর্ববৃহৎ লক্ষ্য স্থির করা। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : كُنْ فِى الدُّنْيَا كَاَنَّكَ غَرِيْبٌ اَوْ عَابِرُ سَبِيْلٍ : অর্থাৎ তুমি দুনিয়াতে এভাবে থাক, যেমন কোনো মুসাফির কয়েক দিনের জন্য কোথাও অবস্থান করে অথবা কোনো পথিক পথে চলতে চলতে বিশ্রামের জন্য থেমে যায়। উপরে বর্ণিত طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ-এর তাফসীরের বিষয়বস্তু সম্বলিত একটি রেওয়ায়েত আবূ নাঈম (র.) জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.)-এর রেওয়ায়েতক্রমে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। এই দীর্ঘ হাদীসটি এ স্থলে কুরতুবী আবূ নাঈমের এবং ইবনে কাছীর (র.) ইবনে আবী হাতেম (র.)-এর বরাত দিয়ে বিস্তারিত উদ্ধৃত করেছেন। এসব আয়াতে গাফিল মানুষকে তার সৃষ্টি ও দুনিয়াতে সংঘটিত পরিবর্তনসমূহ সামনে এনে নির্দেশ করা হয়েছে যে, হে মানুষ এখনও সময় আছে, নিজের পরিণতি ও পরকালের চিন্তা কর। কিন্তু এতসব উজ্জ্বল নির্দেশ সত্ত্বেও অনেক মানুষ গাফলতি ত্যাগ করে না। তাই শেষে বলা হয়েছে : فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ –অর্থাৎ এই গাফিল ও মূর্খ লোকদের কি হলো যে, তারা সবকিছু শোনা ও জানার পরও আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে না?

وَاِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْاٰنُ لَا يَسْجُدُوْنَ : অর্থাৎ যখন তাদের সামনে সুস্পষ্ট হেদায়তে পরিপূর্ণ কুরআন পাঠ করা হয়, তখনও তারা আল্লাহর দিকে নত হয় না।

سُجُوْدٌ ও سِجْدَةٌ-এর আভিধানিক অর্থ নত হওয়া। এর মাধ্যমে আনুগত্য ও ফরমাবরদারী বোঝানো হয়। বলা বাহুল্য, এখানে পরিভাষিক সেজদা উদ্দেশ্য নয়; বরং আল্লাহর সামনে আনুগত্য সহকারে নত হওয়া তথা বিনীত হওয়া উদ্দেশ্য। এর সুস্পষ্ট কারণ এই যে, এই আয়াতে কোনো বিশেষ আয়াত সম্পর্কে সেজদার নির্দেশ নেই; বরং নির্দেশটি সমগ্র কুরআন সম্পর্কিত। সুতরাং এই আয়াতে পরিভাষিক সেজদা অর্থ নেওয়া হলে কুরআনের প্রত্যেক আয়াতে সেজদা করা অপরিহার্য হবে, যা উম্মতের ইজমার কারণে হতে পারে না। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আলিমগণের মধ্যে কেউ এর প্রবক্তা। এখন প্রশ্ন থাকে যে, এই আয়াত পাঠ করলে ও শুনলে সেজদা ওয়াজিব হবে কি না? বলা বাহুল্য কিঞ্চিৎ সদর্থের আশ্রয় নিয়ে এই আয়াতকেও সেজদা ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণ হিসাবে পেশ করা যায়। কোনো কোনো হানাফী ফিকহ্‌বিদ তাই করেছেন। তাঁরা বলেন : এখানে اَلْقُرْاٰنُ বলে সমগ্র কুরআন বোঝানো হয়নি বরং اَلِفْ لَامْ عَهْدِىْ হওয়ার ভিত্তিতে বিশেষভাবে এই আয়াতই বোঝানো হয়েছে। কিন্তু এটা এক প্রকার সদর্থই, যাকে সম্ভাবনার পর্যায়ে শুদ্ধ বলা যেতে পারে। কিন্তু বাহ্যিক ভাষাদৃষ্টে এটা অবান্তর মনে হয়। তাই নির্ভুল কথা এই যে, এর ফয়সালা হাদীস এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামের কর্মপদ্ধতি দ্বারা হতে পারে। তেলাওয়াতের সেজদা সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার হাদীস বর্ণিত আছে। ফলে মুজতাহিদ আলিমগণও বিষয়টিতে মতবিরোধ করেছেন। ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে এই আয়াতেও সেজদা ওয়াজিব। তিনি নিম্নোদ্ধৃত হাদীস সমূহকে এর প্রমাণ হিসাবে পেশ করেন :

সহীহ্ বুখারীতে আছে, হযরত আবূ রাফে' (রা.) বলেন : আমি একদিন ইশার নামাজ হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর পিছনে পড়লাম। তিনি নামাজে সূরা ইন্‌শিকাক পাঠ করলেন এবং এই আয়াতে সেজদা করলেন। নামাজান্তে আমি হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম : এ কেমন সেজদা? তিনি বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পশ্চাতে এই আয়াত সেজদা করেছি। তাই হাশরের ময়দানে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হওয়া পর্যন্ত আমি এই আয়াতে সেজদা করে যাব।

সহীহ্ মুসলিমে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, আমরা নবী করীম ﷺ-এর সাথে সূরা ইন্‌শিকাক ও সূরা ইকরায় সেজদা করেছি। ইবনে আরাবী (র.) বলেন : এটাই ঠিক যে, এই আয়াতটিও সেজদার আয়াত। যে এই আয়াত তেলাওয়াত করে অথবা শুনে তার উপর সেজদা ওয়াজিব। –(কুরতুবী) কিন্তু ইবনে আরাবী (র.) যে সম্প্রদায়ে বসবাস করতেন, তাদের মধ্যে এই আয়াতে সেজদা করার প্রচলন ছিল না। তারা হয়তো এমন ইমামের মুকাল্লিদ (অনুসারী) ছিল, যার মতে এই আয়াতে সেজদা নেই। তাই ইবনে আরাবী (র.) বলেন : আমি যখন কোথাও ইমাম হয়ে নামাজ পড়াতাম তখন সূরা ইনশিকাক পাঠ করতাম না। কারণ আমার মতে এই সূরায় সেজদা ওয়াজিব। কাজেই যদি সেজদা না করি, তবে গোনাহ্‌গার হব। আর যদি করি, তবে গোটা জামাত আমার এই কাজকে অপছন্দ করবে। কাজেই অহেতুক মতানৈক্য সৃষ্টি করার প্রয়োজন নেই।

শব্দ বিশ্লেষণ :

أُنْشَقَّتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব إِنْفِعَالٌ মাসদার إِنْشِقَاقٌ মূলবর্ণ (ش – ق – ق) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– বিদীর্ণ হবে।

اَذِنَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার اِذْنٌ মূলবর্ণ (أ – ذ – ن) জিনস مهموز فاء অর্থ– শ্রবণ করেছে, শুনেছে।

حُقَّتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার حَقٌّ মূলবর্ণ (ح – ق – ق) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– সে তারই যোগ্য নিশ্চিত করা হবে।

مُدَّتْ : সীগহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى مجهول বাব نَصَرَ মাসদার مَدٌّ মূলবর্ণ (م – د – د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– বিস্তৃত করা হবে।

اَلْقَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব إِفْعَالٌ মাসদার اِلْقَاءٌ মূলবর্ণ (ل – ق - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– উপরিয়ে বাইরে নিক্ষেপ করবে।

تَخَلَّتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفَعُّلْ মাসদার تَخَلِّىْ মূলবর্ণ (خ – ل – و) জিনস ناقص واوى অর্থ– শূন্যগর্ভ হয়ে যাবে, জমিন খালি হওয়া।

كَادِحٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব فَتَحَ মাসদার كَدْحٌ মূলবর্ণ (ك - د - ح) জিনস صحيح অর্থ– পরিশ্রমকারী, মেহনতকারী।

مُلَاقِيْهِ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার مُلَاقَاةٌ মূলবর্ণ (ل - ق - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– মিলা, সাক্ষাত করা।

ظَهْرٌ : পিঠ। পেট ও পিঠ দুই পরস্পর বিপরীত অঙ্গ। بَطْنٌ উদর, পেট পাকস্থলী। ظَهَرَ পৃষ্টদেশ, পশ্চাৎ ভাগ। তাজুল উরুসের মধ্যে আছে, মানুষের কাঁধ থেকে শুরু করে নিতম্বের নিকট পর্যন্ত অংশকে পিঠ বলা হয়। এটি আরবি ভাষায় মুযাক্কার হিসেবে আসে। তাছাড়া এটি সে সকল ইসমের অন্তর্ভুক্ত, যা যরফের স্থানে ব্যবহার করা হয়। এর বহুবচন أَظْهُرٌ، ظُهُوْرٌ، ظُهْرَانٌ এবং আসে।

ثُبُوْرٌ : মাসদার ও ইসম। বাব : نَصَرَ -এর মাসদার। মূলবর্ণ (ث – ب – ر) জিনস صحيح অর্থ– ধ্বংস হওয়া, মরে যাওয়া, ধ্বংস, মৃত্যু।

لَنْ يَّحُوْرَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ نفى تاكيد بلن در فعل مستقبل معروف বাব نَصَرَ মাসদার حُوْرٌ মূলবর্ণ (ح – و – ر) জিনস اجوف واوى অর্থ–তাকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে না।

وَسَقَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার وَسْقٌ মূলবর্ণ (و - س - ق) জিনস مثال واوى অর্থ– সে যা কিছু সমাবেশ ঘটায়। অর্থাৎ রাত মানুষ, জীবজন্তু ও পাখি সবাইকে একত্র করে এবং প্রত্যেককেই তার নিজস্ব ঠিকানায় পৌঁছে দেয়।

إِتَّسَقَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব إِفْتِعَالٌ মাসদার إِتِّسَاقٌ মূলবর্ণ (و – س – ق) জিনস مثال واوى অর্থ– পরিপূর্ণ হয়।

تَرْكَبُنَّ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع بانون تاكيد বাব سَمِعَ মাসদার رُكُوْبٌ মূলবর্ণ (ر – ك – ب) জিনস صحيح অর্থ– অবশ্যই তোমাদেরকে উপনীত হতে হবে।

يُوْعُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব إِفْعَالٌ মাসদার إِيْعَاءٌ মূলবর্ণ(و – ع – ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– তার যা সঞ্চয় করেছে।

بَشِّرْهُمْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব تَفْعِيْلٌ মাসদার تَبْشِيْرٌ মূলবর্ণ (ب - ش - ر) জিনস صحيح অর্থ তুমি তাদেরকে সুসংবাদ শুনিয়ে দাও। هُمْ যমীর জমা মুযাক্কার গায়েব মাফউল।

غَيْرُ مَمْنُوْنٍ : غَيْرٌ অর্থ– ব্যতীত, নয়। আর مَمْنُوْنٌ সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব نَصَرَ মাসদার مَنٌّ মূলবর্ণ (م – ن – ن) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– যা কখনো বিচ্ছিন্ন হবার নয়।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوْعُوْنَ : এখানে واو টা হরফে আতফ اَللّٰهُ শব্দটি মুবতাদা أَعْلَمُ তার খবর। আর بِمَا টা متعلق হয়েছে أَعْلَمُ -এর সাথে। আর يُوْعُوْنَ -এর কোনো محل নেই যেহেতু ما এর সেলাহ হয়েছে।

فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيْمٍ : এখানে فَبَشِّرْ হলো فعل তার মধ্যস্থ উহ্য যমীর أَنْتَ হলো ফায়েল। আর هُمْ হলো مفعول به আর بِعَذَابٍ টা بَشِّرْ -এর সাথে متعلق হয়েছে। আর أَلِيْمٍ হলো عَذَابٍ -এর সিফাত।

–[ই'রাবুল কুরআন ৮ম খণ্ড: পৃ. ২৬৫-২৬৬]

سُوْرَةُ الْبُرُوْجِ مَكِّيَّةٌ

সূরা বুরূজ

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত– ২২, রুকূ'– ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি ।

অনুবাদ	আয়াত
১. বুরূজ [বড় বড় নক্ষত্র] বিশিষ্ট আসমানের শপথ ।	وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ ۝١
২. আর প্রতিশ্রুত দিবসের [কিয়ামত দিবসের] ।	وَالْيَوْمِ الْمَوْعُوْدِ ۝٢
৩. আর উপস্থিত হওয়ার [দিনের শপথ] আর যাতে [যে দিনে লোকদের] উপস্থিতি হয় তার ।	وَشَاهِدٍ وَّمَشْهُوْدٍ ۝٣
৪. অভিশপ্ত হয়েছে খন্দকের অধিবাসীগণ ।	قُتِلَ اَصْحٰبُ الْاُخْدُوْدِ ۝٤
৫. অর্থাৎ বহু ইন্ধনযুক্ত অগ্নির অধিকারী [আয়োজনকারী] গণ ।	النَّارِ ذَاتِ الْوَقُوْدِ ۝٥
৬. যখন তারা তার আশেপাশে উপবিষ্ট ছিল ।	اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُوْدٌ ۝٦
৭. এবং তারা মুসলমানদের প্রতি যা কিছু [অত্যাচার] করছিল, তা দেখছিল ।	وَّهُمْ عَلٰى مَا يَفْعَلُوْنَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ شُهُوْدٌ ۝٧
৮. আর ঐ কাফেররা সেই মুসলমানদের মধ্যে এতদ্ব্যতীত আর কোনো দোষ পায়নি যে, তারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছিল, যিনি মহাপরাক্রান্ত, প্রসংশনীয় ।	وَمَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ اِلَّآ اَنْ يُّؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ۝٨

শাব্দিক অনুবাদ :

১. وَالسَّمَآءِ শপথ সে আসমানের ذَاتِ الْبُرُوْجِ যা বড় বড় নক্ষত্রবিশিষ্ট ।

২. وَالْيَوْمِ শপথ সে দিবসের الْمَوْعُوْدِ যা প্রতিশ্রুত

৩. وَشَاهِدٍ শপথ উপস্থিত হওয়ার وَّمَشْهُوْدٍ এবং যাতে (লোকদের) উপস্থিতি হয় তার ।

৪. قُتِلَ অভিশপ্ত হয়েছে اَصْحٰبُ الْاُخْدُوْدِ খন্দকের অধিবাসীগণ ।

৫. النَّارِ অগ্নির ذَاتِ الْوَقُوْدِ বহু ইন্ধনযুক্ত

৬. اِذْ هُمْ যখন তারা عَلَيْهَا তার আশেপাশে قُعُوْدٌ উপবিষ্ট ছিল ।

৭. وَّهُمْ এবং তারা عَلٰى مَا يَفْعَلُوْنَ যা কিছু করছিল, তা بِالْمُؤْمِنِيْنَ মুসলমানদের সাথে شُهُوْدٌ দেখছিল ।

৮. وَمَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ আর তারা দোষ খুঁজে পায়নি اِلَّآ اَنْ يُّؤْمِنُوْا এটা ছাড়া যে তারা ঈমান আনে بِاللّٰهِ এমন আল্লাহর প্রতি الْعَزِيْزِ যিনি মহাপরাক্রান্ত الْحَمِيْدِ প্রসংশনীয় ।

৯. তিনি এমন যে, তারই জন্য আসমানসমূহ ও জমিনের রাজত্ব; আর আল্লাহ প্রত্যেক বস্তু সম্বন্ধে অবগত আছেন।	الَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدٌ ؕ ﴿٩﴾
১০. যারা মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে কষ্ট দেয়, অতঃপর তওবা না করে, তবে তাদের জন্য দোজখের আজাব এবং [বিশেষভাবে] তাদের জন্য দহন-যন্ত্রণা রয়েছে।	اِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوْبُوْا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيْقِ ؕ ﴿١٠﴾
১১. [আর] অবশ্যই যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তাদের জন্য উদ্যানসমূহ রয়েছে; যার পাদদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত হবে; এটাই বিরাট সফলতা।	اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيْرُ ؕ ﴿١١﴾
১২. আপনার প্রভুর পাকড়াও অত্যন্ত কঠোর।	اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيْدٌ ؕ ﴿١٢﴾
১৩. তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেন এবং পুনর্বার সৃষ্টি করবেন।	اِنَّهٗ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيْدُ ؕ ﴿١٣﴾
১৪. আর তিনি অতিশয় ক্ষমাশীল, অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ।	وَهُوَ الْغَفُوْرُ الْوَدُوْدُ ۙ ﴿١٤﴾
১৫. আরশের অধিপতি, মর্যাদাশীল।	ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيْدُ ۙ ﴿١٥﴾
১৬. তিনি যা ইচ্ছা করেন, তা করেই ছাড়েন।	فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ ؕ ﴿١٦﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৯. الَّذِىْ لَهٗ যার জন্য রয়েছে مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ আসমানসমূহ ও জমিনের রাজত্ব وَاللّٰهُ আর আল্লাহ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ প্রত্যেক বস্তু সম্বন্ধে شَهِيْدٌ অবগত আছেন।

১০. اِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُوا যারা কষ্ট দেয় الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে ثُمَّ لَمْ يَتُوْبُوْا অতঃপর তওবা না করে فَلَهُمْ তাদের জন্য রয়েছে عَذَابُ جَهَنَّمَ দোজখের আজাব وَلَهُمْ এবং তাদের জন্য রয়েছে عَذَابُ الْحَرِيْقِ দহন-যন্ত্রণা।

১১. اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ এবং নেক কাজ করেছে لَهُمْ তাদের জন্য রয়েছে এমন উদ্যানসমূহ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا যার পাদদেশ দিয়ে প্রবাহিত হবে الْاَنْهٰرُ নহরসমূহ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيْرُ এটাই বিরাট সফলতা।

১২. اِنَّ بَطْشَ নিশ্চয় পাকড়াও رَبِّكَ আপনার প্রভুর لَشَدِيْدٌ অত্যন্ত কঠোর।

১৩. اِنَّهٗ هُوَ নিশ্চয় তিনিই يُبْدِئُ প্রথমবার সৃষ্টি করেন وَيُعِيْدُ এবং পুনর্বার সৃষ্টি করবেন।

১৪. وَهُوَ الْغَفُوْرُ আর তিনি অতিশয় ক্ষমাশীল الْوَدُوْدُ অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ।

১৫. ذُو الْعَرْشِ আরশের অধিপতি الْمَجِيْدُ মর্যাদাশীল।

১৬. فَعَّالٌ তিনি ভালোভাবেই করতে পারেন لِّمَا يُرِيْدُ যা তিনি ইচ্ছা করেন।

অনুবাদ	আয়াত
১৭. আপনার নিকট কি ঐ সেনাদলসমূহের কাহিনী পৌঁছেছে।	هَلْ أَتٰىكَ حَدِيْثُ الْجُنُوْدِ ﴿١٧﴾
১৮. অর্থাৎ ফেরাউন ও ছামূদের।	فِرْعَوْنَ وَثَمُوْدَ ﴿١٨﴾
১৯. বরং এই কাফেররা [কুরআনকে] মিথ্যা প্রতিপন্ন করার মধ্যে [লিপ্ত] রয়েছে।	بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ تَكْذِيْبٍ ﴿١٩﴾
২০. আর আল্লাহ তাদেরকে চতুর্দিক হতে বেষ্টন করে আছেন।	وَّاللّٰهُ مِنْ وَّرَآئِهِمْ مُّحِيْطٌ ﴿٢٠﴾
২১. বরং তা এক সম্মানিত কুরআন।	بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ ﴿٢١﴾
২২. যা সংরক্ষিত ফলকে [অর্থাৎ লওহে মাহফূজে লিপিবদ্ধ] রয়েছে।	فِيْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ ﴿٢٢﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৭. هَلْ أَتٰىكَ আপনার নিকট কি পৌঁছেছে/এসেছে حَدِيْثُ الْجُنُوْدِ ঐ সেনাদলসমূহের কাহিনী।
১৮. فِرْعَوْنَ ফেরাউন وَثَمُوْدَ ও ছামূদের।
১৯. بَلِ الَّذِيْنَ বরং যারা كَفَرُوْا কুফরি করেছে فِيْ تَكْذِيْبٍ [তারা লিপ্ত রয়েছে] মিথ্যা প্রতিপন্ন করার মধ্যে ।
২০. وَاللّٰهُ আর আল্লাহ مِنْ وَّرَآئِهِمْ তাদের চতুর্দিক হতে مُّحِيْطٌ পরিবেষ্টন করে আছেন।
২১. بَلْ هُوَ বরং তা قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ এক সম্মানিত কুরআন।
২২. فِيْ মাঝে لَوْحٍ ফলকের مَّحْفُوْظٍ সংরক্ষিত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : এ সূরাটির নামকরণ করা হয়েছে প্রথম আয়াতের 'আল-বুরূজ' শব্দ অবলম্বনে। এতে ২২টি আয়াত, ১০৯টি বাক্য ও ৪৩৮টি অক্ষর রয়েছে।

সূরাটি অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট : এ সূরাটি মহানবী ﷺ -এর মাক্কী জীবনের সূরা সমূহের মধ্যে অন্যতম। সম্ভবত সূরাটি মাক্কী জীবনের শেষভাগে অবতীর্ণ হয়েছে। নবী করীম ﷺ -এর ক্রমাগতভাবে দীনের দাওয়াতের ফলে মানুষ ইসলামে প্রবেশ করছিল। ইসলামের এ ক্রমোন্নতি ছিল মক্কার কাফের সর্দারদের নিকট অসহনীয়। তারা দীনের দাওয়াত ও আন্দোলনকে নস্যাৎ করার জন্য সম্ভাব্য সব উপায়ই অবলম্বন করল। অসহায়-দরিদ্র মুসলমানদের প্রতি অমানুষিক জুলুম-অত্যাচার করা; ধূসর মরুভূমিতে প্রখর রৌদ্র তাপের মধ্যে হাত-পা বেঁধে রাখা, জ্বলন্ত অগ্নি দ্বারা দেহে দাগ কাটা. শূলীতে চড়ানো, মারপিট করা ইত্যাদি কোনো পন্থাই তারা হাতছাড়া করল না। এটা দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য ছিল সত্য-সনাতন দীন ইসলাম হতে সে সকল লোককে ফিরিয়ে রাখা। এ সময়ই আল্লাহ তা'আলা মুসলিম ও কাফের উভয় দলের শিক্ষার জন্য এ ঐতিহাসিক তত্ত্বসমৃদ্ধ সূরাটি অবতীর্ণ করেন।

সূরাটির আলোচ্য বিষয় ও মূলবক্তব্য : কাফেররা ঈমানদারদের উপর যে অত্যাচার ও নিপীড়ন চালাচ্ছিল, তার নির্মম পরিণতি সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করা এবং সে সঙ্গে মুসলমানদেরকে এ কথা বলে সান্ত্বনা দেওয়া যে, তারা যদি এ জুলুম-নির্যাতনের মুখেও নিজেদের ঈমান ও আদর্শের উপর সুদৃঢ় ও অবিচল হয়ে থাকতে পারে, তাহলে তাদেরকে উত্তম প্রতিফল দেওয়া হবে এবং আল্লাহ এ জালেমদের হতে এর প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন, এটাই হলো এ সূরার বিষয়বস্তু ও মূলবক্তব্য।

এ প্রসঙ্গে সূরাটির প্রথমে আসহাবে উখদূদের কাহিনী শুনানো হয়েছে। তারা ঈমানদার লোকদেরকে অগ্নিগর্তে নিক্ষেপ করে ধ্বংস করেছিল। এ কাহিনী বর্ণনার মাধ্যমে প্রকারান্তরে মু'মিন ও কাফেরদেরকে কয়েকটি কথা বুঝাতে চাওয়া হয়েছে। তন্মাধ্যে একটি হলো, উখদূদ সম্প্রদায় যেভাবে আল্লাহর অভিশাপে ধ্বংস হয়ে গেছে মক্কার কাফের সর্দাররাও মুসলমানদের সাথে শত্রুতা করে অনুরূপ অবস্থার সম্মুখীন হবে।

দ্বিতীয়ত, তখনকার সময় ঈমানদার লোকেরা যেভাবে অগ্নিগর্তে নিক্ষিপ্ত হতে ও প্রাণের কুরবানি দিতে প্রস্তুত হয়েছিল; কিন্তু ঈমানের অমূল্য সম্পদ হারাতে কোনোক্রমেই প্রস্তুত হয়নি। অনুরূপভাবে বর্তমানে ঈমানদার লোকদের কর্তব্য হলো সর্বপ্রকার অত্যাচার নিপীড়ন অকাতরে বরদাশত করে নেওয়া আর ঈমানের মহা মূল্যবান ধন কোনো অবস্থাই হস্তচ্যুত না করা।

তৃতীয়ত, যে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার কারণে কাফেরা ক্রুদ্ধ ও বিক্ষুব্ধ হয়েছে এবং ঈমানদার লোকেরাও তার উপর অবিচল থাকতে বদ্ধ পরিকর সে আল্লাহ সর্বজয়ী সর্বশক্তিমান। তিনিই জমিন ও আসমানের একচ্ছত্র মালিক। তিনি স্বীয় সত্তায় প্রশংসিত। তিনি উভয় সমাজের লোকদের অবস্থা দেখছেন। কাজেই কাফেররা তাদের কুফরির শাস্তি স্বরূপ জাহান্নামে যেতে বাধ্য হবে। শুধু এটাই শেষ নয়; বরং তা ছাড়াও তাদের এ জুলুমের শাস্তি স্বরূপ দাউ দাউ করে জ্বলা অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হবে। অনুরূপভাবে ঈমানদার লোকেরা নেক আমল করে জান্নাতে যাবে। এটাই তাদের বিরাট ও চূড়ান্ত সাফল্য এটাও নিঃসন্দেহে। এরপর কাফেরদেরকে সর্তক করা হয়েছে এ বলে যে; আল্লাহর পাকড়াও নিশ্চিত ও অত্যন্ত শক্ত। তোমাদের মনে জনশক্তির কারণে যদি কোনো অহমিকতা জেগে থাকে, তাহলে তোমাদের মনে রাখা উচিত, তোমাদের পূর্বে ফেরাউন ও নমরুদের জনশক্তি বিন্দুমাত্র কম ছিল না। তা সত্ত্বেও তাদের জনতার যে পরিণতি ঘটেছে তা দেখে তোমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা কর্তব্য। আল্লাহর অমোঘ অপ্রতিরোধ্য শক্তি তোমাদেরকে গ্রাস করে আছে। এ গ্রাস হতে তোমরা কিছুতেই নিষ্কৃতি পেতে পার না। তোমরা যে কুরআনকে মিথ্যা প্রমাণ ও অবিশ্বাস করার জন্য বদ্ধ পরিকর, সে কুরআনের প্রতিটি কথা অটল অপরিবর্তনীয়। তা এমন সুরক্ষিত যে, তার লেখা পরিবর্তন করার শক্তি কারো নেই।

قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ [٤] النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ [٥] إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ [٦] وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ [٧] وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ [٨] الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ [٩]

শানে নুযূল–১ : আবদ বিন হুমাইদ ইবনে আবাসী এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, মুহাজিরগণ যখন কোনো এক গাযওয়া বা যুদ্ধ অভিযান হতে প্রত্যাবর্তন করেন, তখন তাদের নিকট হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রা.)-এর মৃত্যু বরণ করার অপপ্রচার পৌছল। তখন মুহাজিরগণ পরস্পরে বলতে লাগল যে, অগ্নিপূজকদের বিধান কি? পক্ষান্তরে তারা তো, আহলে কিতাব এবং আরবের মুশরিক কোনোটিই নয় কি? হযরত আলী (রা.) বললেন, ওরা তো আহলে কিতাব ছিল। তাদের জন্যে মদ্যপান বৈধ ছিল। সুতরাং কোনো এক বাদশা মদ্যপান করে মাতাল হয়ে নিজ বোনকে পেয়ে তার সাথে যৌন মিলনে লিপ্ত হয়। সেই নরাধম মাতাল মুক্ত হবার পর বোনকে বলল, তোমার জন্যে আফসোস হয়! আমি যে অপকর্মে লিপ্ত হয়েছি তা হতে উত্তরণের পন্থা কি হতে পারে? তুমি মানুষকে বোঝাও যে, বোনদের বিবাহ করা বৈধ। সুতরাং সে জনসমক্ষে বলতে লাগল, হে মানুষেরা! আল্লাহ বোনদের বিবাহ করার অনুমতি দান করেছেন। মানুষেরা বলল, আমরা এমন কথা থেকে আল্লাহর নিকট হতে দায়মুক্ত হচ্ছি। আমাদের কোনো নবী ও কিতাব আসেনি। অতঃপর লজ্জিত হয়ে সে ফিরে এসে বলল, মানুষেরা মেনে নিতে অস্বীকার করছে। অতঃপর বোনের পরামর্শক্রমে তাদের উপর বেত্রাঘাত ধার্য করল, তাতেও তারা মেনে নেয়নি। ফলে লজ্জিত হয়ে ফিরে এসে বলল, তোমার জন্যে অনুতাপ তারাতো তাতেও একমত হচ্ছে না। অতঃপর সে বলল, আবারোও তাদের বোঝাও। যদি মেনে নিতে অস্বীকার করে, তাহলে তাদের ব্যাপারে তরবারি কোষমুক্ত করে নেবে। এমনি করেও নিস্ফল হয়ে ফিরে এসে বলল, মানুষেরা তাতেও মেনে নিচ্ছেনা। তখন সে বলল, তাহলে তাদের জন্যে লম্বা গর্ত খনন করা হোক। অতঃপর অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে সেই অগ্নিগর্ত পারে তাদের উপস্থিত কর। যারা মেনে নিতে অস্বীকার করবে, তাদেরকে আগুনে ফেলে দেবে। সুতরাং সে তাই করল। যারা মানেনি তাদেরকে অগ্নিগর্তে ফেলে দেয়। এহেন নৃসংশতা প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

–[তাবারী ৫২৩/১২]

শানে নুযূল–২ : আব্দুল্লাহ বিন আবী জাফর হযরত ইবনে আনাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমরা একটি সম্প্রদায় সম্পর্কে শুনতে পেয়েছি যে, তারা নবী শূন্য সময়ে লোক সমাজে কোনো প্রকারের ফেতনা ফ্যাসাদ দেখতে পেলে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে যেত এবং নিজ নিজ মতাদর্শ নিয়ে উল্লসিত থাকত। তারা কোনো একটি জনপদে গিয়ে একনিষ্ঠতার সাথে আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন হয়ে যায়। নামাজ প্রতিষ্ঠা ও জাকাত আদায়ে অনড় থাকে। কোনো এক দূরাচারী বাদশাহ তাদের এ সংবাদ পেয়ে যায়। সুতরাং তাদের নিকট লোক প্রেরণ করা হলো, তাদেরকে যেন প্রতিমা পূজারীতে পরিণত করে। তারা তাকে অস্বীকার করে বলল, আমরা একক আল্লাহ ভিন্ন অন্য কাউকে উপাসনা করব না। বাদশাহ বলল, আমি যার উপাসনা করি, তার উপাসনা তোমরা যদি না কর, তাহলে আমি তোমাদেরকে হত্যা করে দেব। কিন্তু তারা তা মেনে নেয়নি। অতঃপর তাদের জন্যে অগ্নিগর্ত খনন করা হয় এবং দূরাচার বাদশাহ তাদেরকে অগ্নিগর্তের পাশে দাড় করিয়ে বলল, হয় অগ্নিকে বরণ করে নেবে না হয় আমি যে পথে রয়েছি তাতে আসবে। তারা বলল, অগ্নিগর্তই আমাদের নিকট অতিপ্রিয়। তাদের স্ত্রী সন্তানেরা তাতে ভীত হয়ে গেল। তাদের বড়রা ছোটদেরকে বলল আজকের আগুনের পর আমাদের জন্যে আর কোনো আগুন হবে না। সুতরাং তারা অগ্নি গোহায় ঝাঁপিয়ে পরল। তবে অগ্নিতাপ তাদের গায়ে লাগার আগেই, তাদের আত্মা বের হয়ে যায়। অপর দিকে আগুনও গুহার সীমা ছাড়িয়ে দূরাচারী বাদশাহ ও তাদের দল বলকে জ্বালিয়ে পুঁড়িয়ে ফেলে। সেই অতীত প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে মু'মিনদের সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত সমূহ নাজিল করেন। –[ইবনে কাছীর ৪৯৩/৪]

بُرُوْجٌ : وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ শব্দটি بَرَجٌ-এর বহুবচন। অর্থ বড় প্রাসাদ ও দুর্গ। অন্য আয়াতে আছে وَلَوْ كُنْتُمْ فِىْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ –এখানে এই অর্থই বোঝানো হয়েছে। এর মূল ধাতু بَرَجٌ-এর আভিধানিক অর্থ যাহির হওয়া। تَبَرُّجْ -এর অর্থ বেপর্দা খোলাখুলি চলাফেরা করা। এক আয়াতে আছে وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُوْلٰى –অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে আলোচ্য আয়াতে بُرُوْجٌ-এর অর্থ বড় বড় গ্রহ-নক্ষত্র। কয়েকজন তাফসীরবিদ এস্থলে অর্থ নিয়েছেন প্রাসাদ অর্থাৎ সেসব গৃহ, যা আকাশে প্রহরী ও তত্ত্বাবধায়ক ফেরেশতাদের জন্য নির্ধারিত। পরবর্তী কোনো কোনো তাফসীরবিদ দার্শনিকদের পরিভাষায় বলেছেন যে, সমগ্র আকাশমণ্ডলী বার ভাগে বিভক্ত। এ প্রত্যেক ভাগকে بَرْجٌ-বলা হয়। তাঁদের ধারণা এই যে, স্থিতিশীল নক্ষত্রসমূহ এসব بَرْجٌ-এর মধ্যেই অবস্থান করে। গ্রহসমূহ আকাশের গতিতে গতিশীল হয়ে এসব بَرْجٌ-এর মধ্যে অবতরণ করে। কিন্তু এটা সম্পূর্ণ ভুল। কুরআন পাক গ্রহসমূহকে আকাশে প্রোথিত বলে না যে, এগুলো আকাশের গতিতে গতিশীল হবে বরং কুরআনের মতে প্রত্যেক গ্রহ নিজস্ব গতিতে গতিশীল। সূরা ইয়াসীনে আছে : وَكُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ এখানে فَلَكٌ-এর অর্থ আকাশ নয় বরং গ্রহের কক্ষপথ, যেখানে সে বিচরণ করে।

وَالْيَوْمِ الْمَوْعُوْدِ وَشَاهِدٍ وَّمَشْهُوْدٍ : মারেফুল কুরআনের তাফসীরের সার-সংক্ষেপে তিরমিযীর হাদীসের বরাত দিয়ে লিখিত হয়েছে যে, প্রতিশ্রুত দিনের অর্থ কিয়ামতের দিন, شَاهِدٌ-এর অর্থ শুক্রবার দিন এবং مَشْهُوْدٌ-এর অর্থ আরাফার দিন। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা চারটি বস্তুর শপথ করেছেন। **এক.** বুরূজবিশিষ্ট আকাশের, **দুই.** কিয়ামত দিবসের, **তিন.** শুক্রবারের এবং **চার.** আরাফার দিনের। এসব শপথের সম্পর্ক এই যে, এগুলো আল্লাহ তা'আলার পরিপূর্ণ শক্তি, কিয়ামতের হিসাব-নিকাশ এবং শাস্তি ও প্রতিদানের দলিল। শুক্রবার আরাফাতের দিন মুসলমানদের জন্য পরকালের পুঁজি সংগ্রহের পবিত্র দিন। অতঃপর শপথের জবাবে সেই কাফেরদেরকে অভিশাপ করা হয়েছে, যারা মুসলমানদেরকে ঈমানের কারণে অগ্নিতে পুড়িয়ে মেরেছে। এরপর মু'মিনদের পরকালীন মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে।

গর্তওয়ালাদের ঘটনার কিছু বিবরণ : এই ঘটনাই সূরা অবতরণের কারণ। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে অতীন্দ্রিয়বাদীর পরিবর্তে জাদুকর বলা হয়েছে এবং এই বাদশাহ্ ছিল ইয়ামেন দেশের বাদশাহ্। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রেওয়ায়েত মতে তার নাম ছিল 'ইউসুফ যুনওয়াস'। তার সময় ছিল রাসূলে কারীম ﷺ-এর জন্মের সত্তর বছর পূর্বে। যে বালককে অতীন্দ্রিয়বাদী অথবা জাদুকরের কাছে তার বিদ্যা শিক্ষা করার জন্য বাদশাহ্ আদেশ করেছেন, তার নাম আব্দুল্লাহ ইবনে তামের। পাদ্রী খ্রিস্টধর্মের আবেদ ও যাহেদ ছিল। তখন খ্রিস্টধর্ম ছিল সত্যধর্ম, তাই এই পাদ্রী তখনকার খাঁটি মুসলমান ছিল। বালকটি পথিমধ্যে পাদ্রীর কাছে যেয়ে তার কথাবার্তা শুনে প্রভাবান্বিত হতো এবং অবশেষে মুসলমান হয়ে গেল। আল্লাহ তা'আলা তাকে পাকাপোক্ত ঈমান দান করেছিলেন। ফলে বহু নির্যাতনের মুখেও সে ঈমানে অবিচল ছিল। পথিমধ্যে সে পাদ্রীর কাছে বসে কিছু সময় অতিবাহিত করত। ফলে অতীন্দ্রিয়বাদী অথবা জাদুকরের কাছে বিলম্বে

পৌছার কারণেও সে তাকে প্রহার করত। ফেরার পথে আবার পাদ্রীর কাছে যেত। ফলে গৃহে পৌছতে বিলম্ব হতো এবং গৃহের লোকেরা তাকে মারত। কিন্তু সে কোনো কিছুর পরোয়া না করে পাদ্রীর কাছে যাতায়াত অব্যাহত রাখল। এরই বরকতে আল্লাহ তা'আলা তাকে পূর্বোল্লিখিত কারামত তথা অলৌকিক ক্ষমতা দান করলেন। এই অত্যাচারী বাদশাহ্ মু'মিনদেরকে শাস্তি দেওয়ার জন্য গর্ত খনন করিয়ে তা অগ্নিতে ভর্তি করে দিল। অতঃপর মু'মিনদের এক একজনকে উপস্থিত করে বলল : ঈমান পরিত্যাগ কর নতুবা এই গর্তে নিক্ষিপ্ত হবে। আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে এমন দৃঢ়তা দান করেছিলেন যে, তাদের একজনও ঈমান ত্যাগ করতে সম্মত হলো না এবং অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হওয়াকেই পছন্দ করে নিল। মাত্র একজন স্ত্রীলোক, যার কোলে শিশু ছিল, সে অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হতে সামান্য ইতস্তত করছিল। তখন কোলের শিশু বলে উঠল : আম্মা, সবর করুন, আপনি সত্যের উপর আছেন। এই প্রজ্বলিত আগুনে নিক্ষিপ্ত হয়ে যারা প্রাণ দিয়েছিল, তাদের সংখ্যা কোনো কোনো রেওয়ায়েতে বার হাজার এবং কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আরও বেশি বর্ণিত আছে।

বালক নিজেই বাদশহ্কে বলেছিল : আপনি আমার তূন থেকে একটি তীর নিন এবং 'বিসমিল্লাহি রব্বী' বলে আমার গায়ে নিক্ষেপ করুন, আমি মরে যাব। এ পদ্ধতিতে সে তার প্রাণ দেওয়ার সাথে সাথে বাদশহ্র গোটা সম্প্রদায় আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিয়ে উঠে এবং মুসলমান হওয়ার কথা ঘোষণা করে দেয়। এভাবে কাফের বাদশহকে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতেও বিফল মনোরথ করে দেন।

মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র.)-এর রেওয়ায়েতে আছে, ইয়ামেনের যে স্থানে এই বালকের সমাধি ছিল, ঘটনাক্রমে কোনো প্রয়োজনে সেই জায়গা হযরত ওমর (রা.)-এর খেলাফতকালে খনন করানো হলে তার লাশ সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় নির্গত হয়। লাশটি উপবিষ্ট অবস্থায় ছিল এবং হাত কোমরদেশে রক্ষিত ছিল। বাদশাহের তীর সেখানেই লেগেছিল। কোনো একজন দর্শক তার হাতটি সরিয় দিলে ক্ষতস্থান থেকে রক্ত নির্গত হতে থাকে। হাতটি আবার পূর্বের ন্যায় রেখে দেওয়া হলে রক্ত বন্ধ হয়ে যায়। তার হাতের আংটিতে اَللّٰهُ رَبِّىْ (আল্লাহ্ আমার পালনকর্তা) লিখিত ছিল। ইয়ামেনের গর্ভনর খলীফা হযরত ওমর (রা.)-কে এই ঘটনার সংবাদ দিলে তিনি উত্তরে লিখে পাঠালেন : তাকে আংটিসহ পূর্বাবস্থায় রেখে দাও। –[ইবনে কাছীর]

ইবনে কাছীর ইবনে আবী হাতেমের বরাত দিয়ে লিখেছেন : অগ্নিকুণ্ডের ঘটনা দুনিয়াতে একটি নয়-বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে অনেক সংঘটিত হয়েছে। এরপর ইবনে আবী হাতেম বিশেষভাবে তিনটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন–এক. ইয়ামেনের অগ্নি-কুণ্ড, যার ঘটনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্মের সত্তর বছর পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল, দুই. সিরিয়ার অগ্নিকুণ্ড এবং তিন, পারস্যের অগ্নিকুণ্ড। এই সূরায় বর্ণিত অগ্নিকুণ্ড আরবের ভূখণ্ড ইয়ামেনের নাজারানে ছিল।

اِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِيْنَ : এখানে অত্যাচারী কাফেরদের শাস্তি বর্ণিত হয়েছে, যারা মু'মিনদেরকে কেবল ঈমানের কারণে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেছিল। শাস্তি প্রসঙ্গে দু'টি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে–এক وَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ অর্থাৎ তাদের জন্য পরকালে জাহান্নামের আজাব রয়েছে দুই. وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيْقِ অর্থাৎ তাদের জন্য দহন যন্ত্রণা রয়েছে। এখানে দ্বিতীয়টি প্রথমটিরই বর্ণনা ও তাকীদ হতে পারে। অর্থাৎ জাহান্নামে যেয়ে তারা চিরকালে দহন যন্ত্রণা ভোগ করবে। এটাও সম্ভবপর যে, দ্বিতীয় বাক্যে দুনিয়ার শাস্তি বর্ণিত হয়েছে। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে, মু'মিনদেরকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করার পর অগ্নি স্পর্শ করার পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা তাঁদে রূহ কবজ করে নেন। এভাবে তিনি তাদেরকে দহন যন্ত্রণা থেকে রক্ষা করেন। ফলে তাদের মৃতদেহই কেবল অগ্নিতে দগ্ধ হয়। অতঃপর এই অগ্নি আরও বেশি প্রজ্বলিত হয়ে তার লেলিহান শিখা শহরে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে যারা মুসলমানদের অগ্নিদগ্ধ হওয়ার তামাশা দেখছিল, তারাও এই আগুনে পুড়ে ভস্ম হয়ে যায়। কেবল বাদশাহ 'ইউসুফ যুনওয়াস' পালিয়ে যায়। সে অগ্নি থেকে আত্মরক্ষার জন্য সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং সেখানেই সলিল সমাধি লাভ করে। –[মাযহারী]

কাফেরদের জাহান্নামের আজাব দহন যন্ত্রণার খবর দেওয়ার সাথে সাথে কুরআন বলেছে : ثُمَّ لَمْ يَتُوْبُوْا– অর্থাৎ এই আজাব তাদের উপর পতিত হবে, যারা এই দুষ্কর্মের কারণে অনুতপ্ত হয়ে তওবা করেনি। এতে তাদেরকে তওবার দাওয়াত দেওয়া হয়েছে। হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন : বাস্তবিকই আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও কৃপার কোনো পারাপার নেই। তারা তো আল্লাহর ওলীগণকে জীবিত দগ্ধ করে তামাশা দেখেছে, আল্লাহ তা'আলা এরপরও তাদেরকে তওবা ও মাগফিরাতের দাওয়াত দিচ্ছেন। –[ইবনে কাছীর]

শব্দ বিশ্লেষণ :

شَاهِدٍ : সীগাহ واحد مذكر اسم فاعل বহছ سَمِعَ বাব اَلشُّهُوْدُ মাসদার (ش - ه - د) মূলবর্ণ صحيح জিনস অর্থ– সাক্ষী, উপস্থিত, বক্তা। এখানে উদ্দেশ্য জুমার দিন। শাহেদ হুজুর ﷺ এর পবিত্র নামেরও একটি। কারণ তিনি কেয়ামতের দিন উম্মতের জন্য সাক্ষ্য দিবেন এবং দুনিয়ায় আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান তাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন এবং বলে গেছেন।

مَشْهُوْدٍ : সীগাহ واحد مذكر اسم مفعول বহছ سَمِعَ বাব اَلشُّهُوْدُ মাসদার (ش - ه - د) মূলবর্ণ صحيح জিনস অর্থ– উপস্থিতকৃত অর্থাৎ নামাজ। মাগরিবের নামাজ, ফজরের নামাজ। ফজরের নামাজের কেরাতে ফেরেশতা উপস্থিত হন। মাশহূদ বলতে জুমার দিন কেয়ামতের দিন ও আরাফার দিন। তবে এখানে তিরমিযীর রেওয়ায়েত অনুযায়ী কেয়ামতের দিন উদ্দেশ্য। অনেক তাফসীরবিদদের মতে আরাফার দিন উদ্দেশ্য।

اُخْدُوْدٌ : একবচন; বহুবচন اَخَادِيْدُ; অর্থ : দাগ, রেখা, গর্ত, খাদ, পরিখা। اَصْحَابُ الْاُخْدُوْدِ পরিখা খননকারী। এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলার ঐ সকল দুশমন উদ্দেশ্য, যারা গর্ত খনন করে তাতে আগুন দিয়ে আল্লাহর ইবাদত কারীদেরকে সেখানে নিক্ষেপ করেছিল।

شُهُوْدٌ : شَاهِدٌ-এর বহুবচন। যেমন سُجُوْدٌ শব্দটি سَاجِدٌ-এর বহুবচন। অর্থ– দেখছিল, স্বচক্ষে প্রত্যক্ষকারী, উপস্থিত, বিদ্যমান।

مَا نَقَمُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى منفى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার نَقْمٌ মূলবর্ণ (ن – ق – م) জিনস صحيح অর্থ– তার দোষ খুজে পায়নি, প্রতিশোধ গ্রহণ করেনি।

فَتَنُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার فَتْنٌ মূলবর্ণ (ف – ت – ن) জিনস صحيح অর্থ– কষ্ট দেয়, দুঃখ দিয়েছে।

حَرِيْقٌ : সিফাতে মুশাব্বাহ। ফায়েল ও মাফউল উভয় অর্থ দেয়। অর্থ, অগ্নি প্রজ্জ্বলনকারী। حرق থেকে নির্গত। অর্থ– জ্বালানো। বাবে ضَرَبَ

تَكْذِيْبٌ : মাসদার বাব تَفْعِيْلٌ মূলবর্ণ (ك – ذ – ب) জিনস صحيح অর্থ– মিথ্যা প্রতিপন্ন করা, মিথ্যারোপ করা।

مُحِيْطٌ : সীগাহ واحد مذكر اسم فاعل বহছ إِفْعَالٌ বাব إِحَاطَةٌ মাসদার (ح – و – ط) মূলবর্ণ اجوف واوى জিনস অর্থ– বেষ্টন করে আছেন। বেষ্টনকারী।

বাক্য বিশ্লেষণ :

قُتِلَ اَصْحٰبُ الْاُخْدُوْدِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُوْدِ : এখানে قُتِلَ ফে'ল আর اَصْحٰبُ الْاُخْدُوْدِ হলো نائب فاعل ; اَلنَّارِ হলো الْاُخْدُوْدُ থেকে بدل الاشتمال আর ذَاتِ الْوَقُوْدِ হলো اَلنَّارِ-এর সিফত।

وَاللّٰهُ مِنْ وَّرَآئِهِمْ مُّحِيْطٌ : এখানে واو আতফ اَللّٰهُ শব্দটি মুবতাদা مِنْ وَّرَآئِهِمْ টা مُحِيْطٌ-এর সাথে متعلق হয়েছে, আর مُحِيْطٌ হলো খবর اَللّٰهُ মুবতাদার। –[ই'রাবুল কুরআন ৮ম খণ্ড; পৃ. ২৬৮]

سُوْرَةُ الطَّارِقِ مَكِّيَّةٌ

সূরা ত্বারিক

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত– ১৭, রুকূ'– ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. শপথ আসমানের আর সে বস্তুর যা রাত্রিকালে আত্মপ্রকাশ করে।	وَالسَّمَآءِ وَالطَّارِقِ ﴿١﴾
২. আর আপনার কি জানা আছে যে, রাত্রিকালে আত্মপ্রকাশকারী বস্তুটি কী?	وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الطَّارِقُ ﴿٢﴾
৩. এটা উজ্জ্বল নক্ষত্র।	النَّجْمُ الثَّاقِبُ ﴿٣﴾
৪. এমন কোনো মানুষই নেই যার সঙ্গে [আমলের] স্মরণকারী কোনো [ফেরেশতা] নিযুক্ত নেই।	اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ﴿٤﴾
৫. অতএব মানুষের লক্ষ্য করা উচিত যে, তাকে কী বস্তু দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে।	فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ﴿٥﴾
৬. তাকে স্ববেগে নির্গত পানি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে।	خُلِقَ مِنْ مَّآءٍ دَافِقٍ ﴿٦﴾
৭. যা মেরুদণ্ড এবং বক্ষদেশের [অর্থাৎ সমগ্র দেহের] মধ্য হতে নির্গত হয়।	يَّخْرُجُ مِنْۢ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَآئِبِ ﴿٧﴾
৮. নিশ্চয় তিনি তাকে পুনর্বার সৃষ্টি করতে সক্ষম।	اِنَّهٗ عَلٰى رَجْعِهٖ لَقَادِرٌ ﴿٨﴾

শব্দ বিশ্লেষণ :

১. وَالسَّمَآءِ শপথ আসমানের وَالطَّارِقِ আর সে বস্তুর যা রাত্রিকালে আত্মপ্রকাশ করে।
২. وَمَآ اَدْرٰىكَ আর আপনার কি জানা আছে যে مَا الطَّارِقُ রাত্রিকালে আত্মপ্রকাশকারী বস্তুটি কী?
৩. النَّجْمُ নক্ষত্র الثَّاقِبُ উজ্জ্বল।
৪. اِنْ كُلُّ نَفْسٍ এমন কোনো মানুষই নেই لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ যার সঙ্গে কোনো স্মরণকারী নিযুক্ত নেই।
৫. فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ অতএব মানুষের লক্ষ্য করা উচিত যে مِمَّ خُلِقَ তাকে কী বস্তু দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে।
৬. خُلِقَ তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে مِنْ مَّآءٍ دَافِقٍ স্ববেগে নির্গত পানি দ্বারা।
৭. يَّخْرُجُ যা নির্গত হয় مِنْۢ بَيْنِ الصُّلْبِ মেরুদণ্ডের মধ্য হতে وَالتَّرَآئِبِ এবং বক্ষদেশের।
৮. اِنَّهٗ নিশ্চয় তিনি عَلٰى رَجْعِهٖ তাকে পুনর্বার সৃষ্টি করতে لَقَادِرٌ সক্ষম।

অনুবাদ	আয়াত
৯. যেদিন সকলের গুপ্ত বিষয় প্রকাশ হয়ে যাবে।	يَوْمَ تُبْلَى السَّرَآئِرُ ﴿٩﴾
১০. অতঃপর সেই মানুষের না নিজের কোনো [প্রতিরোধ] ক্ষমতা থাকবে, আর না তার কোনো সহায়ক থাকবে।	فَمَا لَهٗ مِنْ قُوَّةٍ وَّلَا نَاصِرٍ ﴿١٠﴾
১১. শপথ আসমানের, যা হতে বৃষ্টিপাত হয়।	وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ﴿١١﴾
১২. আর শপথ জমিনের, যা [বীজ অঙ্কুরিত হওয়ার সময়] ফেটে যায়।	وَالْاَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ﴿١٢﴾
১৩. নিশ্চয় এই কুরআন [সত্য ও অসত্যের মধ্যে] মীমাংসাকারী বাণী।	اِنَّهٗ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ﴿١٣﴾
১৪. আর এটা কোনো নিরর্থক বস্তু নয়।	وَّمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ﴿١٤﴾
১৫. তারা বিভিন্ন রকমের তদবীর করছে।	اِنَّهُمْ يَكِيْدُوْنَ كَيْدًا ﴿١٥﴾
১৬. আর আমি [তাদের তদবীর বিফল করার জন্য] বিভিন্ন রকমের তদবীর করছি।	وَّاَكِيْدُ كَيْدًا ﴿١٦﴾
১৭. সুতরাং আপনি এই কাফেরদেরকে এভাবেই থাকতে দিন, [বেশি দিন নয়] অল্প কিছু দিনের জন্য থাকতে দিন।	فَمَهِّلِ الْكٰفِرِيْنَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ﴿١٧﴾ ع

শব্দ বিশ্লেষণ :

৯. يَوْمَ تُبْلَى যেদিন প্রকাশ হয়ে যাবে السَّرَآئِرُ সকলের গুপ্ত বিষয়।

১০. فَمَا لَهٗ مِنْ قُوَّةٍ অতঃপর তার না কোনো ক্ষমতা থাকবে وَّلَا نَاصِرٍ আর না কোনো সহায়ক থাকবে।

১১. وَالسَّمَآءِ শপথ সে আসমানের ذَاتِ الرَّجْعِ যা বৃষ্টিবর্ষণ করে।

১২. وَالْاَرْضِ শপথ সে জমিনের ذَاتِ الصَّدْعِ যা ফেটে যায়।

১৩. اِنَّهٗ নিশ্চয় তা لَقَوْلٌ فَصْلٌ মীমাংসাকারী বাণী।

১৪. وَّمَا هُوَ আর এটা নয় بِالْهَزْلِ নিরর্থক কোনো বস্তু।

১৫. اِنَّهُمْ নিশ্চয় তারা يَكِيْدُوْنَ তদবীর করে كَيْدًا বিভিন্ন রকমের।

১৬. وَّاَكِيْدُ আর আমি [ও] তদবীর করি كَيْدًا বিভিন্ন রকমের।

১৭. فَمَهِّلِ সুতরাং আপনি অবকাশ দিন/থাকতে দিন الْكٰفِرِيْنَ এই কাফেরদেরকে اَمْهِلْهُمْ আপনি তাদেরকে অবকাশ দিন/থাকতে দিন رُوَيْدًا অল্প কিছু দিনের জন্য।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : অত্র সূরার প্রথম আয়াতে الطَّارِقِ শব্দটি উল্লেখ থাকার কারণে একে سُوْرَةُ الطَّارِقِ নামে নামকরণ করা হয়েছে। এতে ১৭টি আয়াত, ৬১টি বাক্য এবং ২৩৯টি অক্ষর রয়েছে।

সূরাটি নাজিলের সময়কাল : সূরাটির ভাষণ দ্বারা অনুমিত হয় যে, এটা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ প্রাথমিক পর্যায়ের সূরাসমূহের একটি। অবতীর্ণের সঠিক সময়কাল নির্ণয় করা সম্ভবপর নয়। তবে মক্কার কাফেরগণ যখন কুরআনের দাওয়াত এবং এর উপস্থাপিত বিধান সম্পর্কে নানারূপ ষড়যন্ত্র এ এবং বিষয় নিয়ে কৌতুক করত, তখনই এ সূরা অবতীর্ণ হয়।

সূরাটির বিষয়বস্তু ও মূলবক্তব্য : এ সূরার বিষয়বস্তু ও মূলবক্তব্য দু'টি। একটি হচ্ছে : মৃত্যুর পর অবশ্যই মানুষকে আল্লাহর নিকট হাজির হতে হবে। আর দ্বিতীয়, কুরআন একটি চূড়ান্ত বাণী। কাফেরদের কোনো অপকৌশল কোনো ষড়যন্ত্রই এর ক্ষতি সাধনে সক্ষম নয়।

সর্বপ্রথম আকাশ মণ্ডলে বিস্তীর্ণ নক্ষত্ররাজিকে সাক্ষী হিসাবে পেশ করে বলা হয়েছে যে, বিশ্বলোকের কোনো বস্তুই এক মহান সুদৃঢ় সংরক্ষণ ব্যবস্থা ব্যতিরেকে নিজ স্থানে স্থির ও প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকতে পারে না। পরে মানুষের নিজ সত্তার প্রতি তার দৃষ্টি আকৃষ্ট করা হয়েছে। মানব সৃষ্টির মূল সূত্রের উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, একবিন্দু শুক্রকীট দ্বারা তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তাকে এক জীবন্ত, চলন্ত ও পূর্ণাঙ্গ সত্তায় পরিণত করা হয়েছে। বলা হয়েছে, যে মহান সত্তা এভাবে মানুষকে অস্তিত্ব দান করেছেন– মৃত্যুর পর তিনি যে তাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করতে পারবেন, তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। মানুষকে পুনরায় জীবিত করা হবে এই উদ্দেশ্যে যে, দুনিয়ার জীবনে যেসব তত্ত্ব ও তথ্য অজ্ঞানতার অন্তরালে লুকিয়ে রয়ে গেছে পরবর্তী জীবনে তাই যাচাই ও পরীক্ষা করা হবে। এ সময় মানুষ তার কর্মফল ভোগ করতে বাধ্য হবে। এ ফল ভোগ করা হতে- না সে নিজের বলে আত্মরক্ষা করতে পারবে আর না অন্য কেউ তাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারবে। পরিশেষে বলা হয়েছে যে, আকাশ হতে বৃষ্টিপাত এবং জমিনে গাছপালা ও শস্যের উৎপাদন যেমন কোনো অর্থহীন উদ্দেশ্যহীন খেলা নয়; বরং এক গুরুত্বপূর্ণ ও উদ্দেশ্যমূলক বিরাট কাজ, কুরআনের যেসব সত্য ও তথ্য বিবৃত হয়েছে তাও ঠিক তেমনি কোনো হাসি-তামাশার ব্যাপার নয়। এটা অতীব পাকা-পোক্ত এবং অবিচল ও অটল বাণী। কাফেররা নানা অপকৌশল দ্বারা কুরআনকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারবে বলে মনে করছে, তা তাদের মারাত্মক ভুল বৈ আর কিছুই নয়। তারা জানে না যে, আল্লাহ তা'আলাও তার এক নিজস্ব পরিকল্পনায় ও ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত রয়েছেন। তার এ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার মোকাবিলায় কাফেরের সমস্ত ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে যেতে বাধ্য।

অতঃপর একটি বাক্যাংশে নবী করীম ﷺ-কে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে। আর সান্ত্বনা বাণীর অন্তরালে কাফেরদেরকে ধমক দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে আপনি একটু ধৈর্যধারণ করুন। কাফেরদেরকে কিছু দিন তাদের ইচ্ছা মাফিক চলতে দিন। অপেক্ষা করুন বেশি দিন লাগবে না। তারা যেখানেই কুরআনকে আঘাত দেওয়ার জন্য চেষ্টা করবে, কুরআন মাজীদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হবে, সেখানেই কুরআন বিজয়ী হবে। আর তারা নিজেরাই তা স্বচক্ষে দেখতে পাবে।

وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ [١٠]

শানে নুযূল : আবূ সালেহ হযরত ইবনে আব্বস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা আবূ তালিব এর সাথে কোথাও বসা ছিলেন। তখন একটি তারকা খসে পড়তে দেখতে পেলেন এতে ভূপৃষ্ঠ আলোকোজ্জ্বল হযে যায়। তখন আবূ তালিব সংকিত হয়ে পড়ল এবং বলল, তা কি? জবাবে হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এ হচ্ছে আল্লাহর কুদরতের নির্দশনাবলির অন্যতম নির্দশন। এতে আবূ তালিব আশ্চর্য হয়ে পড়ল। আবূ তালিবের আশ্চর্য হয়ে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[কুরতুবী ৫/২০]

فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ .... الاية

শানে নুযূল : এই আয়াত আবুল আশাদ এর ব্যাপারে নাজিল হয়েছে। সে চামড়ার উপর দাঁড়িয়ে বলত। হে কোরাইশগণ! যে আমাকে এ চামড়া থেকে নামাতে পারবে তার জন্য এই এই পুরস্কার রয়েছে। এবং আরও বলত মুহাম্মদ ﷺ মনে করেন যে, দোজখের উপর উনিশজন পাহারাদার রয়েছেন। দশজনের বিরুদ্ধে তো আমি একাই যথেষ্ট আর বাকি নয়জনের জন্যে তোমরা আমাকে সাহায্য করবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত নাজিল হয়। –[লুবাবুন নুকূল]

এই সূরায় আল্লাহ তা'আলা আকাশ ও নক্ষত্রের শপথ করে বলেছেন : প্রত্যেক মানুষের উপর একজন তত্ত্বাবধায়ক ফেরেশতা নিযুক্ত আছে। সে তার সমস্ত কাজকর্ম ও নড়াচড়া দেখে, জানে। এর পরিপ্রেক্ষতে মানুষের চিন্তা করা উচিত যে, সে দুনিয়াতে যা কিছু করছে, তা সবই কিয়ামতের দিন হিসাব-নিকাশের জন্য আল্লাহ কাছে সংরক্ষিত রয়েছে। তাই কোনো সময় পরকাল ও কিয়ামতের চিন্তা থেকে গাফিল হওয়া অনুচিত। এরপর পুনরুজ্জীবন সম্পর্কে শয়তান মানুষের মনে যে অসম্ভাব্যতার সন্দেহ সৃষ্টি করে, তার জবাব প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : মানুষ লক্ষ্য করুক যে, সে কিভাবে বিভিন্ন অণু, কণা ও বিভিন্ন উপকরণ থেকে সৃজিত হয়েছে। যিনি প্রথম সৃষ্টিতে সারা বিশ্বের কণাসমূহ একত্র করে একজন জীবিত, শ্রোতা ও দ্রষ্টা মানব সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন, তিনি তাকে মৃত্যুর পর পুনরায় তদ্রূপ সৃষ্টি করতেও সক্ষম। এরপর কিয়ামতের কিছু অবস্থা বর্ণনা করে আবার আকাশ ও পৃথিবীর শপথ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, মানুষকে পরকাল চিন্তার যে

শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, সে যেন তাকে হাসি-তামাশা মনে না করে। এটা এক বাস্তব সত্য, যা অবশ্যই সংঘটিত হবে। অবশেষে দুনিয়াতেই কোনো আজাব আসে না– কাফেরদের এই প্রশ্নের জবাবের মাধ্যমে সূরা সমাপ্ত করা হয়েছে।

প্রথম শপথে আকাশের সাথে طَارِقْ শব্দ যোগ করা হয়েছে। এর অর্থ রাত্রিতে আগমনকারী। নক্ষত্র দিনের বেলায় লুক্কায়িত থাকে এবং রাতে প্রকাশ পায়, এজন্য নক্ষত্রকে طَارِقْ বলা হয়েছে। কুরআন এ সম্পর্কে প্রশ্ন রেখে নিজেই জবাব দিয়েছে اَلنَّجْمُ الثَّاقِبُ –অর্থাৎ উজ্জ্বল নক্ষত্র। আয়াতে কোনো নক্ষত্রকে নির্দিষ্ট করা হয়নি। তাই যে কোনো নক্ষত্রকে বুঝানো যায়। কোনো কোনো তাফসীরবিদ এর অর্থ নিয়েছেন বিশেষ নক্ষত্র 'সুরাইয়া', যা সপ্তর্ষিমণ্ডলস্থ একটি নক্ষত্র কিংবা 'শনিগ্রহ' অর্থ নিয়েছেন। আরবি ভাষায় সুরাইয়া ও শনিগ্রহকে نَجْم বলা হয়ে থাকে।

اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ -এটা শপথের জবাব। অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষের উপর তত্ত্বাবধায়ক অর্থাৎ আমলনামা লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতা নিযুক্ত রয়েছে। এখানে حَافِظٌ শব্দ একবচনে উল্লেখ করা হলেও তারা যে একাধিক তা অন্য আয়াত থেকে জানা যায়। অন্য আয়াতে আছে : وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِيْنَ كِرَامًا كَاتِبِيْنَ। حَافِظ -এর অপর অর্থ আপদবিপদ থেকে হেফাজতকারীও হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মানুষের হেফাজতের জন্য ফেরেশতা নিযুক্ত করেছেন। তারা দিনরাত মানুষের হেফাজতে নিয়োজিত থাকে। তবে আল্লাহ তা'আলা যার জন্য যে বিপদ অবধারিত করে দিয়েছেন, তারা সে বিপদ থেকে হেফাজত করে না। অন্য এক আয়াতে একথা পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হয়েছে : لَهٗ مُعَقِّبٰتٌ مِّنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ يَحْفَظُوْنَهٗ অর্থাৎ মানুষের জন্য পালাক্রমে আগমনকারী পাহারাদার ফেরেশতা নিযুক্ত রয়েছে। তারা আল্লাহর আদেশে সামনে ও পেছনে থেকে তার হিফাজত করে।

এক হাদীসে রাসূলে কারীম ﷺ বলেন– প্রত্যেক মু'মিনের উপর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তার হেফাজতের জন্য তিনশ ষাট জন ফেরেশতা নিযুক্ত রয়েছে। তারা তার প্রত্যেক অঙ্গের হেফাজত করে। তন্মধ্যে সাতজন ফেরেশতা কেবল চোখের হেফাজতের জন্য নিযুক্ত রয়েছে। এসব ফেরেশতা অবধারিত নয়–এমন প্রত্যেক বালা-মসিবত থেকে এভাবে মানুষের হেফাজত করে, যেমন মধুর পাত্রে আগমনকারী মাছিকে পাখা ইত্যাদির সাহায্যে দূর করে দেওয়া হয়। মানুষের উপর এরূপ পাহারা না থাকলে শয়তান তাকে ছিনিয়ে নিত। –[কুরতুবী]

خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ : অর্থাৎ মানুষ সৃজিত হয়েছে এক সবেগে স্খলিত পানি থেকে যা পৃষ্ঠ ও বক্ষের অস্থিপিঞ্জরের মধ্য থেকে নির্গত হয়। সাধারণভাবে তাফসীরবিদগণ এর এই অর্থ করেছেন যে, বীর্য পুরুষের পৃষ্ঠদেশ এবং নারীর বক্ষদেশ থেকে নির্গত হয়। কিন্তু মানবদেহ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণের সুচিন্তিত অভিমত ও অভিজ্ঞতা এই যে, বীর্য প্রকৃতপক্ষে মানুষের প্রত্যেক অঙ্গ থেকে নির্গত হয় এবং সন্তানের প্রত্যেক অঙ্গ নারী ও পুরুষের সেই অঙ্গ থেকে নির্গত বীর্য দ্বারা গঠিত হয়। তবে এ ব্যাপারে সব চেয়ে বেশি প্রভাব থাকে মস্তিষ্কের। এ কারণেই সাধারণত দেখা যায়, যারা অতিরিক্ত স্ত্রীমৈথুন করে, তারা প্রায়ই মস্তিষ্কের দুর্বলতায় আক্রান্ত হয়। তাদের আরও সুচিন্তিত অভিমত এই যে, বীর্য সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে স্খলিত হয়ে মেরুদণ্ডের মাধ্যমে অণ্ডকোষে জমা হয় এবং সেখান থেকে নির্গত হয়।

এই অভিমত বিশুদ্ধ হলে তাফসীরবিদগণের উপরিউক্ত উক্তির সঙ্গত ব্যাখ্যাদান অবান্তর নয়। কেননা চিকিৎসাবিদগণ এ বিষয়ে একমত যে, বীর্য উৎপাদনে সর্বাধিক প্রভাব রয়েছে মস্তিষ্কের। আর মস্তিষ্কের স্থলাভিষিক্ত হচ্ছে সেই শিরা, যা মেরুদণ্ডের ভেতর দিয়ে মস্তিষ্ক থেকে পৃষ্ঠদেশে ও পরে অণ্ডকোষে পৌছেছে। এরই কিছু উপাশিরা বক্ষের অস্থি-পাঁজরে এসেছে। এটা সম্ভবপর যে, নারীর বীর্যে বক্ষপাঁজর থেকে আগত বীর্যের এবং পুরুষের বীর্যে পৃষ্ঠদেশ থেকে আগত বীর্যের প্রভাব বেশি। –[বায়যাভী]

কুরআন পাকের ভাষার দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, এতে নারী ও পুরুষের কোনো বিশেষত্ব নেই। শুধু এতটুকু বলা হয়েছে যে, পৃষ্ঠদেশ ও বক্ষদেশের মধ্য থেকে নির্গত হয়। এর সরাসরি অর্থ এরূপ হতে পারে যে, বীর্য নারী ও পুরুষ উভয়ের সমস্ত দেহ থেকে নির্গত হয়। তবে সামনের ও পশ্চাতের প্রধান অঙ্গের নাম উল্লেখ করে সমস্ত দেহ ব্যক্ত করা হয়েছে। সম্মুখভাগে বক্ষ এবং পশ্চাদ্ভাগে পৃষ্ঠ প্রধান অঙ্গ। এই দুই অঙ্গ থেকে নির্গত হওয়ার অর্থ নেওয়া হবে সমস্ত দেহ থেকে নির্গত হওয়া।

وَاِنَّهٗ عَلٰى رَجْعِهٖ لَقَادِرٌ : رَجْع -এর অর্থ ফিরিয়ে দেওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, যে বিশ্বস্রষ্টা প্রথমবার মানুষকে বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাকে পুনরায় ফিরিয়ে দিতে অর্থাৎ মৃত্যুর পর জীবিত করতে আরও ভালোরূপে সক্ষম।

يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ : تُبْلٰى -এর শাব্দিক অর্থ পরীক্ষা করা, যাচাই করা। উদ্দেশ্য এই যে, মানুষের যেসব বিশ্বাস, চিন্তাধারা, মনন ও সংকল্প অন্তরে লুক্কায়িত ছিল, দুনিয়াতে কেউ জানত না, এবং যেসব কাজকর্ম সে গোপনে করেছিল, কিয়ামতের দিন সে সবগুলোই পরীক্ষিত হবে। অর্থাৎ প্রকাশ করে দেওয়া হবে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন : কিয়ামতের দিন মানুষের সব গোপন ভেদ খুলে যাবে। প্রত্যেক ভালোমন্দ বিশ্বাস ও কর্মের আলামত হয় মানুষের মুখমণ্ডলে শোভা পাবে না হয় অন্ধকার ও কাল রঙের আকারে প্রকাশ করে দেওয়া হবে। –[কুরতুবী]

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ : رَجْع -এর অর্থ পর পর বর্ষিত বৃষ্টি। একবার বৃষ্টি হয়ে শেষ হয়ে যায়, আবার হয়।

إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ : অর্থাৎ কুরআন সত্য ও মিথ্যার ফয়সালা করে; এতে কোনো সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ নেই। হযরত আলী (রা.) বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কুরআন সম্পর্কে বলতে শুনেছি :

كِتَابٌ فِيْهِ خَيْرُ مَا قَبْلَكُمْ وَحُكْمُ مَا بَعْدَكُمْ وَهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ.

অর্থাৎ এই কিতাবে তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের সংবাদ এবং তোমাদের পরে আগমনকারীদের জন্য বিধি-বিধান রয়েছে। এটা চূড়ান্ত উক্তি; আমার মুখের কথা নয়।

শব্দ বিশ্লেষণ :

اَلطَّارِقُ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার طُرُوْقٌ – طَرْقٌ মূলবর্ণ (ط – ر – ق) জিনস صحيح অর্থ– রাতে আগমনকারী, যা রাত্রিকালে আত্মপ্রকাশ করে।

اَلثَّاقِبُ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার ثُقُوْبٌ মূলবর্ণ (ث – ق – ب) জিনস صحيح অর্থ : উজ্জ্বল নক্ষত্র, দীপ্তিমান, বিজলী।

دَافِقٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ، نَصَرَ মাসদার دَفْقٌ মূলবর্ণ (د – ف – ق) জিনস صحيح অর্থ– স্ববেগে নির্গত।

صُلْبٌ : একবচন; বহুবচন أَصْلَابٌ ; অর্থ– পিঠ। ইমাম রাগেব (র.) লিখেন, صُلْبٌ -এর অর্থ– কঠিন হওয়া, শক্ত হওয়া।

لِيَنْظُرْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ امر غائب معروف বাব نَصَرَ মাসদার نَظْرٌ মূলবর্ণ (ن ـ ظ ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– যেন সে দেখে।

سَرَائِرُ : এটি سَرِيْرَةٌ এর বহুবচন। অর্থ গোপন করা, গোপন বিষয় রহস্য। আল্লামা ইবনে খালুবিয়াহ লিখেন, ياء কে বহুবচনের মধ্যে হামযাহ্ বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। কেননা বহুবচনে ইয়ার পূর্বে আলিফ সাকিন রয়েছে। তাই ইয়াকে হামযা দ্বারা বদল করে দুই সাকিন একত্রিত হওয়ার কারণে তাকে যের দেওয়া হয়েছে। যেমন, قَبِيْلَةٌ এর বহুবচনে ياء টি মৌলিক হলে তাকে হামযা বানানো যেত না। যেমন, مَعِيْشَةٌ শব্দটি। আল্লাহ তা'আলা এর বহুবচনে প্রমাণস্বরূপ বলেন, وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ এখানে ياء কে বিদ্যমান রেখেছেন।

رَجْعٌ : মাসদার। ইসম অর্থ : ফিরা, প্রত্যাবর্তন করা, বৃষ্টি, মেঘ। বাব ضَرَبَ হতে মুতা'আদ্দী অর্থে।

صَدْعٌ : মাসদার। অর্থ : ভেঙ্গে যাওয়া, ফেঁটে যাওয়া। বাব فَتَحَ ; মূলবর্ণ (ص – د – ع) জিনস صحيح ; এখানে صَدْعٌ দ্বার উদ্দেশ্য চাষকৃত জমিন হতে ফসল ফেঁটে বা বিদীর্ণ করে বের হওয়া।

فَصْلٌ : হক ও বাতিলের মাঝে পার্থক্য। সত্য কথা, সটিক বিচারকারী কথা। হককে বাতিল থেকে পৃথককারী কথা বা বাক্য। হাড্ডি ও অঙ্গের জোড়া। দুই জিনিস মিলিত হওয়াকে বাঁধা দানকারী। আয়াতে প্রথমটি উদ্দেশ্য।

اَلْهَزْلُ : ইসম ও মাসদার। বাব : سَمِعَ ও ضَرَبَ ; অর্থ : বাতিল, নিরর্থক, তামাশা করা, কৌতুক করা।

يَكِيْدُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার كَيْدٌ মূলবর্ণ (ك – ى – د) জিনস اجوف يائى অর্থ– তদবীর করে, চক্রান্ত করে, কৌশল করে।

مَهِّلْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَمْهِيْلٌ মূলবর্ণ (م – ه – ل) জিনস صَحِيح অর্থ– এভাবেই থাকতে দিন, অবকাশ দিন, সুযোগ দিন, ঢিল দিন।

বাক্য বিশ্লেষণ :

إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَّمَا هُوَ بِالْهَزْلِ : এখানে إِنَّ হরফে মুশাববাহ বিল ফে'ল আর ه হলো اسم ان আর لَقَوْلٌ -এর لام হলো المزحلقة যা তাকিদের জন্য হয়েছে। আর قَوْلٌ হলো خبر ان আর فَصْلٌ হলো قَوْلٌ -এর সিফাত। আর وَمَاهُوَ -এর واو টা হরফে আতফ। আর مَا হলো ما بمعنى ليس আর هُوَ হলো তার ইসিম। আর باء হলো হরফে زائد। আর اَلْهَزْلُ হলো শাব্দিকভাবে مجرور কিন্তু হিসেবে محل منصوب যেহেতু مَا -এর খবর হয়েছে।

إِنَّهُمْ يَكِيْدُوْنَ كَيْدًا : এখানে إِنَّ হলো حرف مشبه بالفعل আর هُمْ হলো اسم ان আর বাক্যটি يَكِيْدُوْنَ খবর إِنَّ আর كَيْدًا হলো يَكِيْدُوْنَ -এর মাফঊলে মুতলাক। –[ই'রাবুল কুরআন ৮ম খণ্ড, পৃ. ২৮০]

سُوْرَةُ الْاَعْلٰى مَكِّيَّةٌ

সূরা আ'লা

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত– ১৯, রুকূ'– ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

অনুবাদ	আয়াত
১. আপনি স্বীয় মহোন্নত প্রভুর নামের পবিত্রতা বর্ণনা করুন।	سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى ﴿١﴾
২. যিনি সৃষ্টি করেছেন, অনন্তর যথাযথভাবে বানিয়েছেন।	الَّذِىْ خَلَقَ فَسَوّٰى ﴿٢﴾
৩. আর যিনি [প্রত্যেক প্রাণীর জন্য তদুপযোগী বস্তুসমূহের] ব্যবস্থা করেছেন, অনন্তর পথ প্রদর্শন করেছেন।	وَالَّذِىْ قَدَّرَ فَهَدٰى ﴿٣﴾
৪. আর যিনি ঘাস উৎপন্ন করেছেন।	وَالَّذِىْٓ اَخْرَجَ الْمَرْعٰى ﴿٤﴾
৫. অনন্তর তাকে মলিন খড়-কুটায় পরিণত করেছেন।	فَجَعَلَهٗ غُثَآءً اَحْوٰى ﴿٥﴾
৬. আমি আপনাকে [কুরআন] পাঠ করিয়ে দিব। অতঃপর আপনি ভুলবেন না।	سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسٰٓى ﴿٦﴾
৭. কিন্তু যা আল্লাহর ইচ্ছা হয়, তিনি প্রত্যেক প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য বিষয় অবগত আছেন।	اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ؕ اِنَّهٗ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفٰى ﴿٧﴾
৮. আর আমি এই সহজ শরিয়তের জন্য আপনার সুবিধা করে দিব।	وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرٰى ﴿٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. سَبِّحِ আপনি পবিত্রতা বর্ণনা করুন اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى স্বীয় মহোন্নত প্রভুর নামের।

২. الَّذِىْ خَلَقَ যিনি সৃষ্টি করেছেন فَسَوّٰى অনন্তর যথাযথভাবে বানিয়েছেন।

৩. وَالَّذِىْ قَدَّرَ আর যিনি ব্যবস্থা করেছেন فَهَدٰى অনন্তর পথ প্রদর্শন করেছেন।

৪. وَالَّذِىْٓ اَخْرَجَ আর যিনি উৎপন্ন করেছেন الْمَرْعٰى ঘাস।

৫. فَجَعَلَهٗ অনন্তর তাকে পরিণত করেছেন غُثَآءً اَحْوٰى মলিন খড়-কুটায়।

৬. سَنُقْرِئُكَ আমি আপনাকে [কুরআন] পাঠ করিয়ে দিব فَلَا تَنْسٰٓى অতঃপর আপনি ভুলবেন না।

৭. اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ কিন্তু যা আল্লাহর ইচ্ছায় হয় اِنَّهٗ يَعْلَمُ তিনি অবগত আছেন الْجَهْرَ وَمَا يَخْفٰى প্রত্যেক প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য বিষয়।

৮. وَنُيَسِّرُكَ আর আমি আপনার সুবিধা করে দিব لِلْيُسْرٰى এই সহজ শরিয়তের জন্য।

০৯. সুতরাং আপনি উপদেশ দান করতে থাকুন, যদি উপদেশ ফলপ্রদ হয়।	فَذَكِّرْ اِنْ نَّفَعَتِ الذِّكْرٰى ﴿٩﴾
১০. যে ভয় করে সে উপদেশ গ্রহণ করবে।	سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَّخْشٰى ﴿١٠﴾
১১. আর যে অতিশয় হতভাগ্য সে তা হতে বিমুখ থাকে।	وَيَتَجَنَّبُهَا الْاَشْقَى ﴿١١﴾
১২. যে [পরিণামে] ভয়াবহ অগ্নিতে প্রবেশ করবে।	الَّذِىْ يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرٰى ﴿١٢﴾
১৩. অনন্তর সে তন্মধ্যে না মরবে না আর [আরামে] বাঁচবে।	ثُمَّ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى ﴿١٣﴾
১৪. সফলকাম হয়েছে সে ব্যক্তি যে পবিত্রতা লাভ করেছে।	قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى ﴿١٤﴾
১৫. এবং স্বীয় প্রতিপালকের নাম স্মরণ করতে ও নামাজ পড়তে রয়েছে।	وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى ﴿١٥﴾
১৬. বরং তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দাও।	بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ﴿١٦﴾
১৭. অথচ আখেরাত বহুগুণে উত্তম ও স্থায়ী।	وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ﴿١٧﴾
১৮. এটা [শুধু কুরআনেরই দাবি নয়; বরং] পূর্ববর্তী সহীফাসমূহেও রয়েছে।	اِنَّ هٰذَا لَفِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى ﴿١٨﴾
১৯. অর্থাৎ ইবরাহীম ও মূসার সহীফাসমূহে।	صُحُفِ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى ﴿١٩﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

০৯. فَذَكِّرْ সুতরাং আপনি উপদেশ দান করতে থাকুন اِنْ نَّفَعَتِ যদি ফলপ্রদ হয় الذِّكْرٰى উপদেশ।
১০. سَيَذَّكَّرُ কিন্তু সে ব্যক্তিই উপদেশ গ্রহণ করবে مَنْ يَّخْشٰى যে ভয় করে।
১১. وَيَتَجَنَّبُهَا আর সে তা হতে বিমুখ থাকে الْاَشْقَى যে অতিশয় হতভাগ্য।
১২. الَّذِىْ يَصْلَى যে (পরিণামে) প্রবেশ করবে النَّارَ الْكُبْرٰى ভয়াবহ অগ্নিতে।
১৩. ثُمَّ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا অনন্তর সে তন্মধ্যে না মরবে وَلَا يَحْيٰى না আর (আরামে) বাঁচবে।
১৪. قَدْ اَفْلَحَ সফলকাম হয়েছে সে ব্যক্তি مَنْ تَزَكّٰى যে পবিত্রতা লাভ করেছে।
১৫. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ এবং স্বীয় প্রতিপালকের নাম স্মরণ করতে فَصَلّٰى ও নামাজ পড়তে রয়েছে।
১৬. بَلْ تُؤْثِرُوْنَ বরং তোমরা প্রাধান্য দাও الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا পার্থিব জীবনকে।
১৭. وَالْاٰخِرَةُ অথচ আখেরাত خَيْرٌ বহু গুণে উত্তম وَّاَبْقٰى ও স্থায়ী।
১৮. اِنَّ هٰذَا এটা لَفِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى পূর্ববর্তী সহীফা সমূহেও রয়েছে।
১৯. صُحُفِ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى অর্থাৎ ইবরাহীম ও মূসার সহীফাসমূহে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : এ সূরার প্রথম আয়াতে উল্লিখিত الاعلى শব্দটি সূরার নামকরণে নির্বাচন করা হয়েছে। আল-আ'লা অর্থ– সুমহান, সুউচ্চ। অর্থাৎ এ গুণটি দ্বারা আল্লাহর মহানত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের কথা বুঝানো হয়েছে। এ সূরাটির অপর নাম হলো 'সূরাতুস-সাব্বাহ'। এতে ১৯ টি আয়াত, ৭২ টি বাক্য এবং ২৮৪ টি অক্ষর রয়েছে।

নাজিল হওয়ার সময়কাল : এতে যে বিষয় আলোচিত হয়েছে তা হতে বুঝা যায় যে, এ সূরাটিও মাক্কী জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে অবতীর্ণ সূরাসমূহের অন্যতম। এর ৬ নং আয়াতে রাসূল ﷺ-কে বলা হয়েছে। আমি তোমাকে পড়িয়ে দিবো; অতঃপর তুমি আর ভুলে যাবে না। এটা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, এ সূরাটি একেবারে প্রাথমিক কালের এবং সে সময়ে অবতীর্ণ যখন নবী করীম ﷺ ওহী গ্রহণে পুরোপুরি অভ্যস্ত হয়ে উঠেনি। ওহী নাজিল হওয়ার সময়ে তাঁর মনে আশঙ্কা জাগত যে, তিনি এর শব্দ ও ভাষা ভুলে যেতে পারেন। এ আয়াতের সাথে সূরা ত্বাহার ১১৪ নং আয়াত এবং সূরা ক্বিয়ামাহ-এর ১৬-১৯ নং আয়াত মিলালে দেখা যায় এদের মধ্যে গভীর মিল রয়েছে। সর্বপ্রথম এ সূরার মাধ্যমে নবী করীম ﷺ-কে এই বলে নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে যে, স্মরণ রাখতে পারার ব্যাপার নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না। অতঃপর দীর্ঘদিন পর যখন সূরা ক্বিয়ামাহ নাজিল হয়। তখন নবী করীম ﷺ অস্থিরভাবে ওহীর শব্দসমূহ বারবার পড়ে আয়ত্ত ও মুখস্থ করতে লাগলেন, তখন তাকে বলা হলো 'হে নবী'! এ ওহীকে তাড়াতাড়ি মুখস্থ করার জন্য নিজের মুখ দ্রুত চালু করবেন না। এটা মুখস্থ করে দেওয়া ও পড়ে দেওয়া তো আমার কাজ-আমার দায়িত্ব। কাজেই যখন এটা পাঠ করা হয় তখন আপনি মনোযোগ সহকারে তা শ্রবণ করুন। তাছাড়া এর অর্থ ও তাৎপর্য বুঝিয়ে দেওয়াও আমারই দায়িত্ব।

শেষবারে সূরা ত্বহা নাজিল হওয়ার সময় মানবিক দুর্বলতার কারণে নবী করীম ﷺ-এর আশঙ্কা জাগল যে, এ ১১৩ টি আয়াত-যা একই সঙ্গে ক্রমাগত নাজিল হলো। এটা হতে কোনো একটি অংশও যেন আমার স্মৃতি বহির্ভূত হয়ে না যায়। এ জন্য তিনি তা মুখস্থ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। এ উপলক্ষে নবী করীম ﷺ-কে বলা হলো : 'কুরআন পড়ায় খুব তাড়াহুড়া করবেন না, যতক্ষণ না এ ওহী আপনার নিকট পুরা মাত্রায় পৌছে যায়। অতঃপর আর কোনো সময় ভুলে যাওয়ার আশঙ্কা নেই এবং আর কোনো কথা বলার কখনো প্রয়োজন হয়নি। কুরআন মাজীদের অন্য কোথাও এ ব্যাপারে আর কোনো উল্লেখ নেই।

সূরাটির বিষয়বস্তু ও সারকথা : এ সূরার মূল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে– তাওহীদ। এর সাথে নবী করীম ﷺ-কে উপদেশ দান, পাপিষ্ঠ ও বেঈমান লোকদের অশুভ পরিণতি এবং ঈমানদার ও পবিত্র লোকদের পরকালীন সাফল্যের কথা তুলে ধরা হয়েছে।

প্রথম পর্যায়ে ১-৫ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলার নামে তাসবীহ পাঠের আহ্বান জানিয়ে মূলত তাওহীদের কথা বলেছেন। কেননা মহান আল্লাহ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার জন্যই তাঁর সম্পর্কে কল্পিত রূপ ও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। সুতরাং আল্লাহর সত্তা, গুণ, ক্ষমতা ও একত্ববাদ কোনো প্রকারে ক্ষুণ্ন হয় এবং দোষত্রুটি প্রকাশ পায় এমন নাম বর্জন করে তাঁর সুমহান নামসমূহের দ্বারা তাসবীহ পাঠের আহ্বান জানানো হয়েছে। এরপর আল্লাহ স্বীয় সৃষ্টি কৌশলের কথা বলেছেন– সে মহান আল্লাহর গুণগান কর, যিনি সৃষ্টিলোককে সঠিক ও সুচারুভাবে সৃষ্টি করেছেন। এদের জন্য তাকদীর নির্ধারণ করে প্রত্যেকের জন্য পৃথক পৃথক আইন ও বিধান দিয়ে পথের দিশা দিয়েছেন। তিনিই জীবকুলের জন্য চারণভূমিতে সবুজের মহাসমারোহ সৃষ্টি করেন আবার একে আবর্জনায় পরিণত করেন। তাঁর নির্দেশেই ঘটে বসন্তের আগমন ও শীতের সমাগম। তিনিই মহান ক্ষমতার অধিকারী।

দ্বিতীয় পর্যায়ে ৬-৮ নং আয়াতে নবী করীম ﷺ-কে ওহী স্মরণ থাকার বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে– আপনি ওহী হৃদয়ঙ্গম করুণ এবং মন হতে এটা বিস্মৃত হয়ে যাওয়ার কথা ভাববেন না। আপনার স্মৃতিপটে একে স্থায়ীভাবে মুদ্রিত করে দেওয়ার দায়িত্ব আমার। আপনি উচ্চৈঃস্বরে ও নিঃশব্দে কুরআন পাঠ করেন এ সম্পর্কে আমি অবগত। আপনার জন্য এটা স্মরণ রাখাকে আমি খুব সহজতর করে দিবো। আপনার কোনোই অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে না।

তৃতীয় পর্যায়ে ৯-১৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, আপনি মানুষের কাছে আল্লাহর দীনের কথা প্রচার করতে থাকুন এবং তাদেরকে নসিহত করার ধারা অব্যাহত রাখুন। আপনার দাওয়াত ও নসিহত তারাই গ্রহণ করবে যারা অদৃশ্য আল্লাহকে ভয় করে কিন্তু; যারা হতভাগ্য ও দুষ্ট প্রকৃতির লোক তারা আপনার দাওয়াত ও নসিহত গ্রহণ করবে না এবং ঈমানও আনবে না। তারা মহা অগ্নিকুণ্ড জাহান্নামে প্রবেশ করবে। তাতে তারা জ্যান্ত-মরা অবস্থায় অবস্থান করবে।

চতুর্থ পর্যায়ে ১৪-১৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, যারা দাওয়াত ও নসিহত গ্রহণ করে আকীদা-বিশ্বাস ও চরিত্র-আমলে পবিত্রতা অর্জন করবে এবং জিকির ও নামাজ আদায় করবে, পরকালে তারাই হবে সফলকাম। তারাই সফল জীবন লাভ

করে মহাসুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন যাপন করবে; কিন্তু অনেক লোকই পরকালীন সে মহাসুখ-শান্তি ও স্থায়ী আনন্দের কথা চিন্তা-ভাবনা করে না; বরং পার্থিব জগতের ক্ষণকালীন আরাম-আয়েশ, বিলাসিতা ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের চিন্তায় নিমগ্ন থাকে এবং একেই তারা পরকালের উপর প্রাধান্য দেয় অথচ পরকালের আনন্দ ও সুখ-শান্তিই সর্বোত্তম, অনন্ত ও চিরন্তন। সর্বশেষে বলা হয়েছে যে, আমার এসব কথা নতুন কিছু নয়। হাজার হাজার বছর পূর্ব হতে মানুষের কাছে এটা পৌঁছিয়ে আসছি। এমনকি হযরত ইবরাহীম ও হযরত মূসা (আ.)-কে প্রদত্ত গ্রন্থাবলিতেও এসব আলোচনা বিদ্যমান। আমি নতুন কিছুই বলিনি। এতএব, তোমরা পার্থিব জীবনের ধাঁধায় পতিত হয়ে অনন্ত সুখ-শান্তি পরিত্যাগ করো না।

سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسٰى .... الاية

শনে নুযূল : হযরত জিবরাইল (আ.) যখন ওহী নিয়ে হুজুরের খেদমতে আসতেন, তখন হযরত জিবরাইল (আ.) আয়াত পাঠ শেষ করতে না করতেই হুজুর ﷺ কুরআনের শব্দগুলো শুরু থেকে আবৃত্তি করতে থাকতেন। এ আশঙ্কায় যেন কুরআনের শব্দাবলি বিস্মৃত হয়ে না যায়। বরং যেন তা মুখস্ত হয়ে যায়। এ পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত নাজিল হয়। –[কুরতুবী ২০ : ১৮]

سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَّخْشٰى [١٠]

শানে নুযূল : আবূ সালেহ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আলোচ্য আয়াত অন্ধ সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ বিন উম্মে মাকতূম (রা.) সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। –[কুরতুবী ২১/২০]

وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى [١١]

শানে নযূল : আলোচ্য আয়াত আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের সম্পর্কে নাজিল করেছেন।

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى [١٤]

শানে নুযূল : হযরত আত্বা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আলোচ্য আয়াত হযরত উছমান বিন আফফান (রা.) সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে যে, মদীনায় এক আনসারীর বাড়ীর পার্শ্ববর্তী এক মুনাফিকের খেজুর গাছ আনসারীর বাড়ির দিকে হেলে পড়ে রয়েছিল। যখন বাতাস প্রবাহিত হতো, তখন আনসারীর বাড়িতে তার গাছের পাকা ও তরতাজা খেজুর পরত। ফলে তার সন্তান-সন্ততিরা তা কুড়িয়ে খেয়ে ফেলত। এতে করে মুনাফিক আনসারীর সাথে ঝগড়া বাঁড়িয়ে দিত। সুতরাং নিরীহ আনসারী সাহাবী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে সে সম্পর্কে অভিযোগ জানালো। হযরত রাসূল ﷺ-এর নিকট তার নেফাক সম্পর্কে জানা ছিল না। তিনি তাকে ডেকে এনে বললেন যে, তোমার আনসারী ভাই বলল তোমার গাছের পাকা ও তরতাজা খেজুর তার বাড়িতে পরলে তার সন্তান-সন্ততিরা সেগুলো খেয়ে ফেলে। আমি বেহেশতের মাঝে এর বিনিময়ে একটি গাছ তোমাকে দিয়ে দেব কী? সে বলল, আমি নগদকে বাকির বিনিময়ে কি বিক্রি করে দেব? এমনটি করব না। তখন হযরত উছমান বিন আফফান (রা.) বেহেশতের খেজুর গাছটির পরিবর্তে একটি বাগান তাকে দিয়ে দিলেন। হযরত উসমান গনী (রা.)-এর এ দানের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। যাহহাক বলেন, আলোচ্য আয়াত হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। –[কুরতুবী ২৩/১২]

মাস'আলা : আলিমগণ বলেন : নামাজের বাইরে سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى তেলাওয়াত করলে سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلٰى বলা মুস্তাহাব। সাহাবায়ে কেরাম এ সূরা তেলাওয়াত শুরু করলে এরূপ বলতেন। –[কুরতুবী]

ওকবা ইবনে আমের জোহানী (রা.) বর্ণনা করেন, যখন সূরা আ'লা নাজিল হয়, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : اِجْعَلُوْهَا فِيْ سُجُوْدِكُمْ অর্থাৎ তোমরা سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلٰى কালেমা টি সেজদায় পাঠ কর। تَسْبِيْحٌ শব্দের অর্থ পবিত্র রাখা, পবিত্রতা বর্ণনা করা। سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ -এর অর্থ এই যে, আপন পালনকর্তার নাম পবিত্র রাখুন। অর্থাৎ পালনকর্তার নামের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করুন। আল্লাহর নাম উচ্চারণ করার সময় বিনয়, নম্রতা ও আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখুন। তাঁর উপযুক্ত নয়– এমন যাবতীয় বিষয় থেকে তাঁর নামকে পবিত্র রাখুন। এর এক অর্থ এরূপও হতে পারে যে, আল্লাহ স্বয়ং নিজের যেসব নাম বর্ণনা করেছেন, তাঁকে কেবল সেসব নামের মাধ্যমেই ডাকুন। অন্য কোনো নামে তাঁকে ডাকা জায়েজ নয়। এর অপর অর্থ এই যে, যেসব নাম আল্লাহর জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট, সেগুলো কোনো মানুষের জন্য ব্যবহার করা তাঁর পবিত্রতার পরিপন্থি, তাই নাজায়েজ। যেমন রহমান, রায্যাক, গাফফার, কুদ্দূস ইত্যাদি। (কুরতুবী) আজকাল এ ব্যাপারে উদাসীনতার অন্ত নেই। মানুষ নাম সংক্ষেপ করতে খুবই আগ্রহী। মানুষ অবলীলাক্রমে আব্দুর রহমানকে রহমান, আব্দুর রায্যাককে রায্যাক এবং আব্দুল গাফ্ফারকে গাফ্ফার বলে থাকে। কেউ একথা বোঝে না যে, যে এরূপ বলে এবং যে শুনে উভয়ই গোনাহ্গার হয়। এই নিরর্থক গোনাহ্ দিবারাত্রি অহেতুক হতে থাকে। কোনো কোনো তাফসীরবিদ এ ক্ষেত্রে اِسْمٌ -এর অর্থ নিয়েছেন যার নাম তার

সত্তা। আরবি ভাষায় এর অবকাশ আছে এবং কুরআন পাকেও اِسْم শব্দটি এ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে কালেমাটি নামাজের সেজদায় পাঠ করার আদেশ দিয়েছেন, সেটি سُبْحَانَ اِسْمِ رَبِّكَ الْاَعْلٰى নয়; বরং سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى এ থেকেও জানা যায় যে, এ ক্ষেত্রে নাম উদ্দেশ্য নয়; বরং স্বয়ং সত্তা উদ্দেশ্য। –[কুরতুবী]

বিশ্ব সৃষ্টির নিগূঢ় তাৎপর্য : اَلَّذِىْ خَلَقَ فَسَوّٰى وَالَّذِىْ قَدَّرَ فَهَدٰى এগুলো সব জগৎ সৃষ্টিতে আল্লাহর অপার রহস্য ও শক্তি সম্পর্কিত গুণাবলি। প্রথম গুণ خَلَقَ-এর অর্থ কেবল সৃষ্টি করাই নয় বরং কোনো পূর্ব নমুনা ব্যতিরেকে কোনো কিছুকে নাস্তি থেকে আস্তিতে আনয়ন করা। কোনো সৃষ্টির এ কাজ করার সাধ্য নেই; একমাত্র আল্লাহ তা'আলার অপার কুদরতেই কোনো পূর্বনমুনা ব্যতিরেকে যখন ইচ্ছা, যাকে ইচ্ছা নাস্তি থেকে আস্তিতে আনয়ন করে। দ্বিতীয় গুণ فَسَوّٰى এটা تَسْوِيَةٌ থেকে উদ্ভূত। অর্থ সামঞ্জস্যপূর্ণ। উদ্দেশ্য এই যে, তিনি প্রত্যেক বস্তুর দৈহিক গঠন, আকার-আকৃতি ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে বিশেষ মিল রেখে তাকে অস্তিত্ব দান করেছেন। মানুষ ও প্রত্যেক জীব-জানোয়ারকে তার প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্যশীল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়েছেন। হস্তপদ ও অঙ্গসমূহের মধ্যে এমন জোড় ও প্রাকৃতিক স্পিং সংযুক্ত করেছেন, যার ফলে এগুলোকে চতুর্দিকে ঘোরানো-মোড়ানো যায়। এই বিস্ময়কর মিল স্রষ্টার রহস্য ও শক্তি সামর্থ্যে বিশ্বাস স্থাপন করার জন্য যথেষ্ট।

তৃতীয়গুণ : تَقْدِيْرٌ – قَدَّرَ-এর অর্থ কোনো বস্তুকে বিশেষ পরিমাণ সহকারে সৃষ্টি করা। শব্দটি ফয়সালা অর্থেও ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তু সম্পর্কে আল্লাহর ফয়সালা। এখানে এ অর্থই বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার বস্তুসমূহকে সৃষ্টি করেই ছেড়ে দেননি; প্রত্যেক বস্তুকে বিশেষ কাজের জন্য সৃষ্টি করে সে কাজের উপযুক্ত সম্পদ দিয়ে তাকে সে কাজে নিয়োজিত করে দিয়েছেন। চিন্তা করলে দেখা যায় যে, এটা কোনো বিশেষ শ্রেণির সৃষ্টির মধ্যে সীমিত নয়- সমগ্র সৃষ্টি জগৎ ও সৃষ্টিকেই আল্লাহ তা'আলা বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং সে কাজেই নিয়োজিত করে দিয়েছেন। প্রত্যেক বস্তু তার পালনকর্তার নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। আকাশ, নক্ষত্র, বিদ্যুৎ, বৃষ্টি থেকে শুরু করে মানুষ, জীবজন্তু উদ্ভিদ, জড় পদার্থ সবাইকে নিজ নিজ কর্তব্য পালন করে যেতে দেখা যায় : ابروبادومہ خورشید وفلک رکاورند মাওলানা রুমী বলেছেন :

خاک وباد وآب وآتش بندہ اند * بامن وتو مردہ باحق زندہ اند

বিশেষত মানুষ ও জীবজন্তুর প্রত্যেক প্রকারকে আল্লাহ তা'আলা যে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তারা প্রকৃতিগতভাবে সে কাজই করে যাচ্ছে। তাদের উৎসাহ ও উদ্দীপনা সে কাজকে কেন্দ্র করেই পরিচালিত হচ্ছে :

ہر کیے بہر کارے ساختند * میل اور ادر دلش انداختند

চতুর্থ গুণ : فَهَدٰى অর্থাৎ স্রষ্টা যে কাজের জন্য যাকে সৃষ্টি করেছেন, তাকে সে কাজের পথনির্দেশও দিয়েছেন। সত্যিকারভাবে এ পথনির্দেশ আকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয় সৃষ্টিতেই অন্তর্ভুক্ত আছে। কেননা এক বিশেষ ধরনের বৃদ্ধি ও চেতনা আল্লাহ তা'আলা সবাইকে দিয়েছেন, যদিও তা মানুষের বৃদ্ধি ও চেতনা থেকে নিম্নস্তরের। অন্য আয়াতে আছে : اَعْطٰى كُلَّ شَىْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বস্তুকে সৃষ্টি করে এক অস্তিত্ব দিয়েছেন, অতঃপর তার সংশ্লিষ্ট কাজের পথনির্দেশ দিয়েছেন। সাধারণ এ পথনির্দেশের প্রভাবে আকাশ, পৃথিবী, গ্রহ-নক্ষত্র, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী সৃষ্টির আদি থেকে যে কাজের জন্য আদিষ্ট হয়েছে, সে কাজ হুবহু তেমনিভাবে কোনোরূপ ত্রুটি ও আলসতা ব্যতিরেকে সম্পাদন করে চলেছে। বিশেষ করে মানুষ ও জীবজন্তুর বৃদ্ধি ও চেতনা তো সবসময় চোখের সামনেই রয়েছে। তাদের সম্পর্কে চিন্তা করলেও বোঝা যায় যে, তাদের প্রত্যেক শ্রেণি বরং প্রত্যেক ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা নিজ নিজ প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র অর্জন করার এবং প্রতিকূল পরিবেশে থেকে আত্মরক্ষার জন্য বিস্ময়কর সূক্ষ্ম নৈপুণ্য শিক্ষা দিয়েছেন। সর্বাধিক বুদ্ধি ও চেতনাশীল জীব মানুষের কথা বাদ দিন, বনের হিংস্র-জন্তু, পশু-পক্ষী ও কীট-পতঙ্গকে লক্ষ্য করুন! প্রত্যেককে নিজ নিজ প্রয়োজনীয় জীবনোপকরণ সংগ্রহ, বসবাস এবং ব্যক্তিগত ও জাতিগত প্রয়োজনাদি মেটানোর জন্য কেমন সব কৌশল শিক্ষা দিয়েছেন। এগুলো বিশ্ব স্রষ্টার তরফ থেকে প্রত্যক্ষ শিক্ষা। তারা কোনো স্কুল-কলেজ থেকে কিংবা কোনো ওস্তাদের কাছ থেকে এসব শিক্ষা করেনি বরং এগুলো সব সাধারণ আল্লাহর পথ নির্দেশেরই ফলশ্রুতি যা اَعْطٰى كُلَّ شَىْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى এবং এই সূরার قَدَّرَ فَهَدٰى আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে।

বৈজ্ঞানিক শিক্ষাও প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর দান : আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সর্বাধিক জ্ঞান ও চেতনা দান করেছেন এবং তাকে সৃষ্টির সেরা করেছেন। সমগ্র পৃথিবী, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী এবং এগুলোতে সৃষ্ট বস্তুসমূহ মানুষের সেবা ও উপকারের জন্য সৃজিত হয়ে কিন্তু এগুলোর দ্বারা পুরোপুরি ও বিভিন্ন প্রকার উপকার লাভ করা এবং বিভিন্ন বস্তুর সংমিশ্রণে নতুন জিনিস সৃষ্টি করা অত্যধিক জ্ঞান ও নৈপুণ্য সাপেক্ষ কাজ। আল্লাহ তা'আলা প্রকৃতিগতভাবে মানুষের মধ্যে এমন সুতীক্ষ্ণ জ্ঞান-বুদ্ধি নিহিত রেখেছেন যে, সে পর্বত খনন করে এবং সাগর গর্ভে ডুবে গিয়ে শত প্রকার খনিজ ও সামুদ্রিক সামগ্রী আহরণ করতে পারে এবং কাঠ, লোহা, তামা, পিতল ইত্যাদির সংমিশ্রণে প্রয়োজনীয় নতুন নতুন বস্তু নির্মাণ করতে

পারে। এ জ্ঞান নৈপুণ্য বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও কলেজের শিক্ষার উপর নির্ভরশীল নয়। জগতের আদিকাল থেকে অশিক্ষিত নিরক্ষর ব্যক্তিরাও এসব কাজ করে আসছে। প্রকৃতিগত এ বিজ্ঞানই আল্লাহ তা'আলা মানুষকে দান করেছেন। অতঃপর শাস্ত্রীয় ও শিক্ষাগত গবেষণার মাধ্যমে এতে উন্নতি লাভ করার প্রতিভাও আল্লাহ তা'আলারই দান।

সবাই জানে যে, বিজ্ঞান কোনো বস্তু সৃষ্টি করে না বরং আল্লাহর সৃজিত বস্তুসমূহের ব্যবহার শিক্ষা দেয়। এ ব্যবহারের সামান্য স্তর তো আল্লাহ তা'আলা মানুষকে প্রকৃতিগত ভাবে শিখিয়ে দিয়েছেন। অতঃপর এতে কারিগরি গবেষণা ও উন্নতির এক বিস্তৃত ময়দান খোলা রেখে মানুষের প্রকৃতিতে তা বোঝার যোগ্যতা ও প্রতিভা নিহিত রেখেছেন। বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে নিত্যই নতুন নতুন আবিষ্কার সামনে আসছে এবং আল্লাহ জানেন ভবিষ্যতে আরও কি কি আসবে। বলা বাহুল্য, এ সবই আল্লাহ প্রদত্ত যোগ্যতা ও প্রতিভার বহিঃপ্রকাশ এবং কুরআনের একটি মাত্র শব্দ فَهَدٰى -এর প্রকৃষ্ট ব্যাখ্যা। আল্লাহ তা'আলাই মানুষকে এসব কাজের পথ দেখিয়েছেন এবং তা সম্পাদন করার প্রয়োজনীয় যোগ্যতা দান করেছেন। পরিতাপের বিষয়, যারা বিজ্ঞানে উন্নতি লাভ করেছে, তারা কেবল এ মহাসত্য সম্পর্কে অজ্ঞই নয় বরং দিন দিন অন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

وَالَّذِىْٓ اَخْرَجَ الْمَرْعٰى فَجَعَلَهٗ غُثَآءً اَحْوٰى – مَرْعٰى শব্দের অর্থ পশু-চারণ ভূমি এবং غُثَآءً শব্দের অর্থ আবর্জনা যা বন্যার পানির উপর ভাসমান থাকে। اَحوى শব্দের অর্থ কৃষ্ণাভ গাঢ় সবুজ রং। এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা উদ্ভিদ সম্পর্কিত স্বীয় কুদরত ও হিকমত বর্ণনা করেছেন। তিনি ভূমি থেকে সবুজ-শ্যামল ঘাস উৎপন্ন করেছেন, অতঃপর একে শুকিয়ে কালো রং-এ পরিণত করেছেন এবং সবুজতা বিলীন করে দিয়েছেন। এতে মানুষের পরিণতির দিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, দেহের এ সজীবতা, সৌন্দর্য, স্ফূর্তি ও চাতুর্য আল্লাহ তা'আলারই দান। কিন্তু পরিশেষে এসবই নিঃশেষিত হয়ে যাবে।

سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسٰٓى اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ –পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কুদরত ও হিকমতের কতিপয় বহিঃপ্রকাশ বর্ণনা করার পর এস্থলে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে নবুয়তের কর্তব্য সম্পর্কে কয়েকটি জরুরি নির্দেশ দিয়েছেন। নির্দেশ দানের পূর্বে তাঁর কাজ সহজ করে দেওয়ার সুসংবাদ দিয়েছেন। প্রথমদিকে যখন হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে কুরআনের কোনো আয়াত শোনাতেন, তখন তিনি আয়াতের শব্দাবলি বিস্মৃত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর সাথে সাথে তা পাঠ করতেন। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কুরআন মুখস্থ করানোর দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করেছেন এবং ব্যক্ত করেছেন যে, হযরত জিবরাঈর (আ.)-এর চলে যাওয়ার পর কুরআনের আয়াতসমূহ বিশুদ্ধরূপে পাঠ করানো এবং স্মৃতিতে সংরক্ষিত করা আমার দায়িত্ব। কাজেই আপনি চিন্তিত হবেন না। এর ফলে فَلَا تَنْسٰٓى اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ -অর্থাৎ আপনি কোনো বিষয় বিস্মৃত হবেন না সে অংশ ব্যতীত যা কোনো উপযোগিতার কারণে আল্লাহ তা'আলা আপনার স্মৃতি থেকে মুছে দিতে চাইবেন। উদ্দেশ্য এই যে, কুরআনে কিছু আয়াত রহিত করার এক সুবিদিত পদ্ধতি হচ্ছে প্রথম আদেশের বিপরীতে পরিষ্কার দ্বিতীয় আদেশ নাজিল করা। এর আর একটি পদ্ধতি হলো সংশ্লিষ্ট আয়াতটিই রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সকল মুসলমানের স্মৃতি থেকে তা মুছে দেওয়া। এ সম্পর্কে এক আয়াতে আছে : مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا অর্থাৎ আমি কোনো আয়াত রহিত করি অথবা আপনার স্মৃতি থেকে উধাও করে দেই। কেউ কেউ اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ -এর অর্থ করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা কোনো উপযোগিতা বশত কোনো আয়াত সাময়িকভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর স্মৃতি থেকে মুছে দিয়ে পরবর্তীকালে তা স্মরণ করিয়ে দিতে পারেন এটা সম্ভবপর। হাদীসে আছে, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো একটি সূরা তেলাওয়াত করলেন এবং মাঝখান থেকে একটি আয়াত বাদ পড়ল। ওহী লেখক উবাই ইবনে কা'ব মনে করলেন যে, আয়াতটি বোধ হয়ে মনসূখ হয়ে গেছে। কিন্তু জিজ্ঞাসার জবাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : মনসূখ হয়নি, আমিই ভুলক্রমে পাঠ করিনি। (কুরতুবী) অতএব উল্লিখিত ব্যতিক্রমের সারমর্ম এই যে, সময়িকভাবে কোনো আয়াত ভুলে যাওয়া অতঃপর তা স্মরণে আসা বর্ণিত প্রতিশ্রুতির পরিপন্থি নয়।

وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرٰى -এর আক্ষরিক অর্থ এই যে, আমি আপনাকে সহজ করে দেব সহজ পদ্ধতির জন্য। সহজ পদ্ধতি বলে ইসলামি শরিয়ত বোঝানো হয়েছে। এক্ষেত্রে বাহ্যত এরূপ বলা সঙ্গত ছিল যে, আমি এ পদ্ধতি এবং এ শরিয়তকে আপনার জন্য সহজ করে দেব। কিন্তু এর পরিবর্তে কুরআন বলেছে, আপনাকে এই শরিয়তের জন্য সহজ করে দেব। এর তাৎপর্য একথা ব্যক্ত করা যে, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে এরূপ করে দিবেন যে, শরিয়ত আপনার মজ্জা ও স্বভাবে পরিণত হবে এবং আপনি তার ছাঁচে গঠিত হয়ে যাবেন।

فَذَكِّرْ اِنْ نَّفَعَتِ الذِّكْرٰى পরবর্তী আয়াতসমূহে নবুয়তের কর্তব্য পালনে আল্লাহ প্রদত্ত সুবিধাদির বর্ণনা ছিল। এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এই কর্তব্য পালনের আদেশ দেওয়া হয়েছে। অর্থ এই যে, উপদেশ ফলপ্রসূ হলে আপনি মানুষকে উপদেশ দিন। এখানে উদ্দেশ্য শর্ত নয় বরং আদেশকে জোরদার করাই উদ্দেশ্য। আমাদের পরিভাষায় এর দৃষ্টান্ত কাউকে এরূপ বলা যে, যদি তুমি মানুষও হও তবে তোমাকে কাজ করতে হবে। অথবা তুমি যদি অমুকের ছেলে হও তবে একাজ

করা উচিত। বলা বাহুল্য, এখানে উদ্দেশ্য শর্ত নয় বরং কাজটি যে, অপরিহার্য, তা প্রকাশ করাই লক্ষ্য। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, উপদেশ ও প্রচার যে ফলপ্রসু, একথা নিশ্চিত, তাই এই উপকারী উপদেশ আপনি কোনো সময় পরিত্যাগ করবেন না। قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى - زَكٰوة-এর আসল অর্থ শুদ্ধ করা। ধন-সম্পদের জাকাতকেও এ কারণে জাকাত বলা হয় যে, তা ধন-সম্পদকে শুদ্ধ করে। এখানে تَزَكّٰى শব্দের অর্থ ব্যাপক। এতে ঈমানগত ও চরিত্রগত শুদ্ধ এবং আর্থিক জাকাত প্রদান সবই অন্তর্ভুক্ত। وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى অর্থাৎ তারা পালনকর্তার নাম স্মরণ করে এবং নামাজ আদায় করে। বাহ্যত এতে ফরজ ও নফল সবরকম নামাজ অন্তর্ভুক্ত। কেউ কেউ ঈদের নামাজ দ্বারা এর তাফসীর কারেছেন। তাও এতে শামিল। بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন : সাধারণ মানুষের মধ্যে ইহকালকে পরকালের উপর প্রাধান্য দেওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। এর কারণ এই যে, ইহকালের নিয়ামত ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য উপস্থিত এবং পরকালের নিয়ামত ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দৃষ্টি থেকে উধাও ও অনুপস্থিত। তাই অপরিণামদর্শী লোকেরা উপস্থিতকে অনুপস্থিতের উপর প্রাধান্য দিয়ে বসে, যা তাদের জন্য চিরস্থায়ী ক্ষতির কারণ হয়ে যায়। এ ক্ষতির কবল থেকে উদ্ধার করার জন্যই আল্লাহ তা'আলা আল্লাহর কিতাবও রাসূলগণের মাধ্যমে পরকালের নিয়ামত ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে এমনভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন, যেন সেগুলো উপস্থিত ও বিদ্যমান। একথাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা যাকে নগদ মনে করে অবলম্বন কর, তা আসলে কৃত্রিম, অসম্পূর্ণ ও দ্রুত ধ্বংসশীল। এরূপ বস্তুতে মজে যাওয়া ও তার জন্য স্বীয় শক্তি ব্যয় করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। এ সত্যকেই ফুটিয়ে তোলার জন্য অতঃপর বলা হয়েছে : وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى অর্থাৎ তোমরা যারা দুনিয়াকে পরকালের উপর প্রাধান্য দাও, একটু চিন্তা কর যে, তোমরা কি বস্তু ছেড়ে কি বস্তু অবলম্বন করছ। যে দুনিয়ার জন্য তোমরা পাগলপারা, প্রথমত তার বৃহত্তম সুখ এবং আনন্দ ও দুঃখ-কষ্ট ও পরিশ্রমের মিশ্রণ থেকে মুক্ত নয়, দ্বিতীয়ত তার কোনো স্থিরতা ও স্থায়িত্ব নেই। আজ যে বাদশাহ, কাল সে পথের ভিখারী। আজিকার যুবক ও বীর্যবান, আগামীকাল দুর্বল ও অক্ষম। এটা দিবারাত্রি চোখের সামনে ঘটছে। এর বিপরীতে পরকাল এসব দোষ থেকে মুক্ত। পরকালের প্রত্যেক নিয়ামত ও সুখ উৎকৃষ্টই উৎকৃষ্ট। দুনিয়ার কোনো নিয়ামত ও সুখের সাথে তার কোনো তুলনা হয় না। তদুপরি তা اَبْقٰى অর্থাৎ চিরস্থায়ী। মানুষ চিন্তা করুক, যদি তাকে বলা হয় তোমার সামনে দু'টি গৃহ আছে। একটি সুউচ্চ প্রাসাদ যা যাবতীয় বিলাসসামগ্রী দ্বারা সুসজ্জিত এবং অপরটি মামুলী কুঁড়েঘর, যাতে কোনো সাজসরঞ্জামও নেই। এখন হয় তুমি এই প্রাসাদোপম বাংলো গ্রহণ কর কিন্তু কেবল এক দু'মাসের জন্য এরপর একে খালি করে দিতে হবে, না হয় এই কুঁড়েঘর গ্রহণ কর, যা তোমার চিরস্থায়ী মালিকানার থাকবে। এখন প্রশ্ন এই যে, বুদ্ধিমান মানুষ এতদুভয়ের মধ্যে কোনটিকে প্রাধান্য দেবে? এর পরিপ্রেক্ষিতে পরকালের নিয়ামত যদি অসম্পূর্ণ নিম্নস্তরেরও হতো, তবুও চিরস্তায়ী হওয়ার কারণে তাই অগ্রাধিকারের যোগ্য ছিল। অথচ বাস্তবে যখন এই নিয়ামত দুনিয়ার নিয়ামতের মোকাবিলায় উৎকৃষ্ট, উত্তম ও চিরস্থায়ীও, তখন কোনো বোকারাম হতভাগাই এ নিয়ামত পরিত্যাগ করে দুনিয়ার নিয়ামতকে প্রাধান্য দিতে পারে।

اِنَّ هٰذَا لَفِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى صُحُفِ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى অর্থাৎ এই সূরার সব বিষয়বস্তু অথবা সর্বশেষ বিষয়বস্তু (অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম (আ.) ও হযরত মূসা (আ.)-এর সহীফা সমূহে। হযরত মূসা (আ.)-কে তাওরাতের পূর্বে কিছু সহীফাও দেওয়া হয়েছিল। এখনে সেগুলোই বোঝানো হয়েছে অথবা তওরাতও বোঝানো যেতে পারে।

ইবরাহীমী সহীফার বিষয়বস্তু : হযরত আবূযর গিফারী (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করেছিলেন, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সহীফা কিরূপে ছিল? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : এসব সহীফায় শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত বর্ণিত হয়েছিল। তন্মধ্যে এক দৃষ্টান্তে অত্যাচারী বাদশাহকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে : হে ভুঁইফোঁড় গর্বিত বাদশাহ, আমি তোমাকে ধনৈশ্বর্য স্তূপীকৃত করার জন্য রাজত্ব দান করিনি বরং আমি তোমাকে এজন্য শাসনক্ষমতা অর্পণ করেছি, যাতে তুমি উৎপীড়িতের বদদোয়া আমা পর্যন্ত পৌছতে না দাও। কেননা আমার আইন এই যে, আমি উৎপীড়িতের দোয়া প্রত্যাখ্যান করি না, যদিও তা কাফেরের মুখ থেকে হয়।

অপর এক দৃষ্টান্তে সাধারণ মানুষকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে : বুদ্ধিমানের কাজ হলো, নিজের সময়কে তিনভাগে বিভক্ত করা। এক ভাগ তার পালনকর্তার ইবাদত ও তাঁর সাথে মুনাজাতের, এক ভাগ আত্মসমালোচনার ও আল্লাহর মহাশক্তি এবং কারিগরি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার এবং এক ভাগ জীবিকা উপার্জনের ও স্বাভাবিক প্রয়োজনাদি মোটানোর।

আরও বলা হয়েছে : বুদ্ধিমান ব্যক্তির জন্য অপরিহার্য এই যে, সে সমসাময়িক পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিফাল থাকবে, উদ্দিষ্ট কাজে নিয়োজিত থাকবে এবং জিহ্বার হেফাজত করবে। যে ব্যক্তি নিজের কথাকেও নিজের কর্ম বলে মনে করবে, তার কথা খুবই কম হবে এবং কেবল জরুরি বিষয়ে সীমিত থাকবে।

হযরত মূসা (আ.)-এর সহীফার বিষয়বস্তু : হযরত আবূযর (রা.) বলেন : অতঃপর আমি হযরত মূসা (আ.)-এর সহীফা সম্পর্কে প্রশ্ন করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এসব সহীফায় কেবল শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুই ছিল। তন্মধ্যে কয়েকটি বাক্য নিম্নরূপ : আমি সে ব্যক্তির ব্যাপারে বিস্ময়বোধ করি, যে মৃত্যুর দৃঢ় বিশ্বাস রাখে। অতঃপর সে কিরূপে আনন্দিত থাকে! আমি সে ব্যক্তির ব্যাপারে আশ্চর্যবোধ করি, যে বিধিলিপি বিশ্বাস করে, অতঃপর সে কিরূপে অপারক, হতোদ্যম ও চিন্তাযুক্ত হয়! আমি সে ব্যক্তির ব্যাপারে আশ্চর্যবোধ করি, যে দুনিয়া, দুনিয়ার পরিবর্তনাদি ও মানুষের উত্থান-পতন দেখে, সে কিরূপে দুনিয়া নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকে। আমি সে ব্যক্তির ব্যাপারে আশ্চর্যবোধ করি, যে পরকালের হিসাব-নিকাশে বিশ্বাসী। অতঃপর সে কিরূপে কর্ম পরিত্যাগ করে বসে থাকে? হযরত আবূযর (রা.) বলেন : অতঃপর আমি প্রশ্ন করলাম : এসব সহীফার কোনো বিষয়বস্তু আপনার কাছে আগত ওহীর মধ্যেও আছে কি? তিনি বলেন : হে আবূযর, এ আয়াতগুলো সূরার শেষ পর্যন্ত পাঠ কর- قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى –[কুরতুবী]

শব্দ বিশ্লেষণ :

سَبِّحْ :	সীগাহ امر حاضر معروف বহছ واحد مذكر حاضر বাব تَفْعِيْل মাসদার تَسْبِيْحٌ মূলবর্ণ (س - ب - ح) জিনস صحيح অর্থ– পবিত্রতা বর্ণনা করুন।
مَرْعٰى :	জরফে মাকান। অর্থ– চারণভূমি। বিবচরণ ক্ষেত্র। জানোয়ার ও মানুষের খাদ্য অর্থাৎ শস্য, ফল, ঘাস-পাতা ইত্যাদি। মূলতঃ رَعْىٌ -এর অর্থ প্রাণীর হেফাজত করা. রক্ষাণাবেক্ষণ করা। চাই খাদ্য দিয়ে হোক কিংবা শত্রুর অনিষ্টতা হতে রক্ষা করার মাধ্যমে হোক কিংবা সুব্যবস্থাপনার দ্বারা হোক।
غُثَاءً :	অর্থ– আবর্জনা, বন্যার খড় কুটা, ময়লা, ধূলা, হাড্ডির শ্লেষ্মা, ফেনা। غُثَاءً -এর ثاء -এর মধ্যে তাশদীদ দিয়েও ব্যবহার করা যায়। এর থেকে ফে'ল আসে غَثَا- يَغْثُوْ- غَثْوًا বাব نَصَرَ আর غَثَا - يَغْثِىْ - غِثْيَانًا - বাব ضَرَبَ ; থেকে আসে।
اَحْوٰى :	অর্থ– গাঢ় লাল, কালো অন্ধকার। حَوَّةٌ থেকে নির্গত হয়েছে। মাসদার حَوًى বাব سَمِعَ
سَنُقْرِئُكَ :	সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِقْرَاءٌ মূলবর্ণ (ق - ر - ء) জিনস مهموز لام অর্থ– আমি আপনাকে পাঠ করিয়ে দিব।
لَا تَنْسٰى :	সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ مضارع منفى معروف বাব سَمِعَ মাসদার نِسْيَانٌ মূলবর্ণ (ن - س - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– আপনি ভুলবেন না।
نُيَسِّرُ :	সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَيْسِيْرٌ মূলবর্ণ (ى - س - ر) জিনস مثال يائى অর্থ– আমি সুবিধা করে দিব।
اَلذِّكْرٰى :	মাসদার। অর্থ– নসিহত করা, উপদেশ দেওয়া, আলোচনা করা, স্মরণ, উপদেশ। এটি ذِكْرٌ থেকে বেশি বালাগাতপূর্ণ।
يَتَجَنَّبُ :	সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার تَجَنُّبٌ মূলবর্ণ (ج - ن - ب) জিনস صحيح অর্থ– সে বিমুখ থাকে।
اَشْقٰى :	اسم تفضيل অর্থ অতিশয় হতভাগ্য, বড় হতভাগা, নিতান্ত বদনসীব। মাসদার شَقَاوَةٌ অর্থ, দুর্ভাগা হওয়া। হতভাগ্য হওয়া। বাবে سَمِعَ।
تَزَكّٰى :	সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّزَكِّىْ মূলবর্ণ (ز - ك - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– পবিত্রতা লাভ করেছে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى الَّذِىْ خَلَقَ فَسَوّٰى : এখানে سَبِّحْ ফে'ল তার যমীর اَنْتَ ফায়েল, আর اِسْمَ رَبِّكَ হলো مفعول له আর اَلْاَعْلٰى হলো رَبِّكَ -এর সিফত, ইবনে হিশাম এটাকে اِسْمَ -এর সিফত বলা বৈধ বলেছেন, আর اَلَّذِىْ - خَلَقَ فَسَوّٰى -এর হলো রব -এর দ্বিতীয় সিফত, আর خَلَقَ বাক্যটি اَلَّذِىْ -এর সেলাহ হয়েছে। আর خَلَقَ -এর মাফউল উহ্য রয়েছে, অর্থাৎ كُلَّ شَيْئٍ আর فَسَوّٰى -এর فاء টি আতেফা। আর سَوّٰى টা خَلَقَ -এর উপর আতফ হয়েছে। –[ই'রাবুল কুরআন ৮ম খণ্ড; পৃ. ২৮৫-২৮৬]

سُوْرَةُ الْغَاشِيَةِ مَكِّيَّةٌ

সূরা গাশিয়া

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত– ২৬, রুকূ'– ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

অনুবাদ	আয়াত
১. আপনার নিকট কি সে সর্বগ্রাসী ঘটনার [অর্থাৎ কিয়ামতের] কোনো সংবাদ পৌঁছেছে?	هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ ﴿١﴾
২. বহু মুখমণ্ডল সেদিন লাঞ্ছিত হবে।	وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ﴿٢﴾
৩. কষ্টভোগী [এবং কষ্টভোগের দরুন] কাতর হবে।	عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ﴿٣﴾
৪. [তারা] দগ্ধকারী অগ্নিতে প্রবেশ করবে।	تَصْلٰى نَارًا حَامِيَةً ﴿٤﴾
৫. তাদেরকে উত্তপ্ত ঝরনা হতে পানি পান করানো হবে।	تُسْقٰى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ ﴿٥﴾
৬. [এবং] কাঁটাযুক্ত গুল্ম ব্যতীত অপর কোনো খাদ্য তাদের ভাগ্যে জুটবে না।	لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ ﴿٦﴾
৭. যা না পুষ্ট করবে আর না ক্ষুধা নিবারণ করবে।	لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِيْ مِنْ جُوْعٍ ﴿٧﴾
৮. বহু মুখমণ্ডল সেদিন হর্ষোৎফুল্ল হবে।	وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ ﴿٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. هَلْ اَتٰىكَ আপনার নিকট কি পৌঁছেছে حَدِيْثُ কোনো সংবাদ الْغَاشِيَةِ সে সর্বগ্রাসী ঘটনার।

২. وُجُوْهٌ বহু মুখমণ্ডল হবে يَّوْمَئِذٍ সেদিন خَاشِعَةٌ লাঞ্ছিত।

৩. عَامِلَةٌ কষ্টভোগী نَّاصِبَةٌ কাতর হবে।

৪. تَصْلٰى (তারা) প্রবেশ করবে نَارًا حَامِيَةً দগ্ধকারী অগ্নিতে।

৫. تُسْقٰى তাদেরকে পানি পান করানো হবে مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ উত্তপ্ত ঝরনা হতে।

৬. لَيْسَ لَهُمْ তাদের ভাগ্যে জুটবে না طَعَامٌ অপর কোনো খাদ্য اِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ কাঁটাযুক্ত গুল্ম ব্যতীত।

৭. لَّا يُسْمِنُ যা না পুষ্ট করবে وَلَا يُغْنِيْ আর না নিবারণ করবে مِنْ جُوْعٍ ক্ষুধা।

৮. وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ বহু মুখমণ্ডল সেদিন হবে نَّاعِمَةٌ হর্ষোৎফুল্ল।

অনুবাদ	আয়াত
৯. নিজেদের কৃতকর্মের জন্য সন্তুষ্ট হবে।	لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ﴿٩﴾
১০. [আর তারা] উচ্চ বেহেশতে থাকবে।	فِىْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿١٠﴾
১১. যাতে কোনো নিরর্থক কথাবার্তা শুনতে পাবে না।	لَّا تَسْمَعُ فِيْهَا لَاغِيَةً ﴿١١﴾
১২. তন্মধ্যে প্রবাহিত ঝরণাসমূহ থাকবে।	فِيْهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ﴿١٢﴾ وقف لازم
১৩. তাতে উঁচু উঁচু আসনসমূহ রয়েছে।	فِيْهَا سُرُرٌ مَّرْفُوْعَةٌ ﴿١٣﴾
১৪. এবং প্রস্তুত রয়েছে পানপাত্রসমূহ।	وَّاَكْوَابٌ مَّوْضُوْعَةٌ ﴿١٤﴾
১৫. আর সারি সারি তাকিয়াসমূহ রয়েছে।	وَّنَمَارِقُ مَصْفُوْفَةٌ ﴿١٥﴾
১৬. এবং সর্বদিকে গালিচাসমূহ সম্প্রসারিত রয়েছে।	وَّزَرَابِيُّ مَبْثُوْثَةٌ ﴿١٦﴾
১৭. তবে কি তারা উটের দিকে লক্ষ্য করে না যে, কী [বিচিত্র] রূপে সৃষ্টি করা হয়েছে।	اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿١٧﴾ وقفة
১৮. আর আসমানের দিকে যে, [তাকে] কিরূপে উচ্চ করা হয়েছে?	وَاِلَى السَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿١٨﴾ وقفة
১৯. আর পর্বতমালার দিকে যে, কিরূপে [তাকে] দাঁড় করানো হয়েছে?	وَاِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿١٩﴾ وقفة

শাব্দিক অনুবাদ :

৯. لِسَعْيِهَا নিজেদের কৃত কর্মের জন্য رَاضِيَةٌ সন্তুষ্ট হবে।

১০. فِىْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ (আর তারা) উচ্চ বেহেশতে থাকবে।

১১. لَا تَسْمَعُ فِيْهَا যাতে শুনতে পাবে না لَاغِيَةً কোনো নিরর্থক কথাবার্তা।

১২. فِيْهَا তন্মধ্যে থাকবে عَيْنٌ جَارِيَةٌ প্রবাহিত ঝরণাসমূহ।

১৩. فِيْهَا তাতে রয়েছে سُرُرٌ আসনসমূহ مَّرْفُوْعَةٌ উঁচু উঁচু।

১৪. وَّاَكْوَابٌ এবং পানপাত্রসমূহ مَّوْضُوْعَةٌ প্রস্তুত রয়েছে।

১৫. وَنَمَارِقُ আর তাকিয়াসমূহ রয়েছে مَصْفُوْفَةٌ সারি সারি।

১৬. وَزَرَابِىُّ এবং সর্ব দিকে গালিচাসমূহ مَبْثُوْثَةٌ সম্প্রসারিত রয়েছে।

১৭. اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ তবে তারা কি লক্ষ্য করে না যে اِلَى الْاِبِلِ উটের দিকে كَيْفَ خُلِقَتْ কিরূপে সৃষ্টি করা হয়েছে।

১৮. وَاِلَى السَّمَآءِ আর আসমানের দিকে যে كَيْفَ رُفِعَتْ কিরূপে উচ্চ করা হয়েছে।

১৯. وَاِلَى الْجِبَالِ আর পর্বতমালার দিকে যে كَيْفَ نُصِبَتْ কিরূপে (তাকে) দাঁড় করানো হয়েছে।

২০. আর জমিনকে যে, কিভাবে [তাকে] সম্প্রসারিত করা হয়েছে?	وَاِلَى الْاَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿٢٠﴾
২১. সুতরাং আপনি [কেবল] উপদেশ দিতে থাকুন; কেননা আপনি তো কেবল উপদেষ্টা মাত্র।	فَذَكِّرْ ۗ اِنَّمَاۤ اَنْتَ مُذَكِّرٌ ﴿٢١﴾
২২. আপনি তাদের উপর দায়গ্রস্ত অধিকারী [নিযুক্ত] নন।	لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ ﴿٢٢﴾
২৩. কিন্তু যে বিমুখ হবে এবং কুফরি করবে।	اِلَّا مَنْ تَوَلّٰى وَكَفَرَ ﴿٢٣﴾
২৪. তবে আল্লাহ তাকে অত্যন্ত কঠোর শাস্তি প্রদান করবেন।	فَيُعَذِّبُهُ اللّٰهُ الْعَذَابَ الْاَكْبَرَ ﴿٢٤﴾
২৫. আমারই নিকট তাদের আসতে হবে।	اِنَّ اِلَيْنَاۤ اِيَابَهُمْ ﴿٢٥﴾
২৬. অতঃপর তাদের হতে হিসাব নেওয়া আমারই কাজ।	ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ﴿٢٦﴾

النصف ع ١٢ ٢٦

শাব্দিক অনুবাদ :

২০. وَاِلَى الْاَرْضِ আর জমিনকে যে كَيْفَ سُطِحَتْ কিভাবে (তাকে) সম্প্রসারিত করা হয়েছে।
২১. فَذَكِّرْ সুতরাং আপনি উপদেশ দিতে থাকুন اِنَّمَاۤ اَنْتَ مُذَكِّرٌ কেননা আপনি তো কেবল উপদেষ্টা মাত্র।
২২. لَسْتَ عَلَيْهِمْ আপনি তাদের উপর নন بِمُصَيْطِرٍ দায়গ্রস্ত অধিকারী।
২৩. اِلَّا مَنْ تَوَلّٰى কিন্তু যে বিমুখ হবে وَكَفَرَ এবং কুফরি করবে।
২৪. فَيُعَذِّبُهُ اللّٰهُ আল্লাহ তাকে প্রদান করবেন الْعَذَابَ الْاَكْبَرَ অত্যন্ত কঠোর শাস্তি।
২৫. اِنَّ اِلَيْنَاۤ আমারই নিকট اِيَابَهُمْ তাদের আসতে হবে।
২৬. ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا অতঃপর আমারই কাজ حِسَابَهُمْ তাদের থেকে হিসাব নেওয়া।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : সূরাটির প্রথম আয়াতের اَلْغَاشِيَةُ শব্দটি এর নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। এতে ২৬টি আয়াত, ২৯০টি বাক্য এবং ৩৮১টি অক্ষর রয়েছে।

নাজিল হওয়ার সময়কাল : সূরাটিতে উল্লিখিত বিষয়সমূহ প্রমাণ করে যে, এটাও মক্কার প্রাথমিক কালে অবতীর্ণ সূরাসমূহের অন্যতম। তবে এটা নাজিল হয়েছিল তখন, যখন নবী করীম ﷺ দীন প্রচারের কাজ শুরু করে দিয়েছিলেন। আর মক্কার লোকেরা শুনে উপেক্ষা করার নীতি অবলম্বন করেছিল। এর প্রতি তাদের বিরূপ মনোভাব প্রবল হচ্ছিল।

সূরার বিষয়বস্তু ও মূলকথা : সূরাটির প্রধান আলোচ্য বিষয় হলো– তাওহীদ ও পরকাল। সর্বপ্রথম মানুষকে শঙ্কিত করার উদ্দেশ্য সহসা তাদের সম্মুখে একটি প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে। জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, তোমরা কি খবর রাখ সে সময়ের যখন সমগ্র জগত আচ্ছন্নকারী এক মহাবিপদ এসে পড়বে? পরে এর বিস্তারিত জবাব দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, তখন সমস্ত মানুষ দুটি ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে দু'টি ভিন্নতর পরিণতির সম্মুখীন হবে। একটি দল জাহান্নামে যাবে। তাদেরকে নানাবিধ আজাব ভোগ করতে হবে। অন্যদিকে অপর দল উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদেরকে নানা রকম নিয়ামত দেওয়া হবে। চিরদিন তারা তথায় থাকবে।

কথার মোড় পাল্টিয়ে পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, কুরআনের তাওহীদ শিক্ষা ও পরকাল সংক্রান্ত সংবাদ শুনে যারা নাক ছিটকায়, বিরক্তি প্রকাশ করে তারা কি তাদের সম্মুখে প্রতি মুহূর্তে সংঘটিত ঘটনাবলি লক্ষ্য করে দেখে না? তারা কি একটু

ভেবে দেখে না যে, কে মরুভূমির উপযোগী করে উষ্ট্রীকে সৃষ্টি করেছেন? উর্ধ্বলোকে এ আকাশ কিভাবে চতুর্দিক আচ্ছন্ন ও পরিবেষ্টন করে আছে? সম্মুখে ঐ পাহাড় কিভাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে? নিম্নের ধরণীতল কি করে বিস্তীর্ণ হয়ে রয়েছে? এ সব কোনো মহাশক্তিমান, নিরঙ্কুশ ক্ষমতাধর ও সুবিজ্ঞ সুনিপুণ শিল্পীর অপূর্ব দক্ষতা ছাড়া সম্ভবপর হয়েছে কি? এক সৃষ্টিকর্তা তাঁর অসামান্য বুদ্ধিমত্তা ও অসীম ক্ষমতা বলে এ সব তৈরি করেছেন। এ ব্যাপারে অপর কেউই তাঁর শরিক নেই। এটা হতে প্রমাণিত হয় তিনি পুনরুত্থানে সক্ষম। অতঃপর কাফেরদের দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নবী করীম ﷺ -কে সম্বোধন করা হয়েছে। তাঁকে বলা হয়েছে, এ লোকেরা এহেন যুক্তি সঙ্গত ও বিবেক সম্মত কথা যদি না-ই মানে, তো না মানুক। আপনাকে এদের উপর জবরদস্তিকারী, বানিয়ে পাঠানো হয়নি। কাজেই জোর করে তাদের দ্বারা কোনো কথা স্বীকার করানোর কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। আপনার কাজ হলো শুধু উপদেশ দিয়ে যাওয়া। কাজেই আপনি তাই কারতে থাকুন। শেষ পর্যন্ত আমার নিকটই তাদেরকে ফিরে আসতে হবে। আমি তাদের নিকট হতে কড়ায় গণ্ডায় হিসাব গ্রহণ করাবো এবং কাফের ও পাপিষ্ঠদেরকে কঠোর শাস্তি দিবো। অতএব, আপনি তাদের ব্যাপারে অত্যধিক ব্যতিব্যস্ত হয়ে নিজের মানসিক যন্ত্রণা সৃষ্টি করবেন না; বরং আপনি নিশ্চিত মনে আপনার দায়িত্ব পালন করে যান।

لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِيْ مِنْ جُوْعٍ (৭)

শানে নুযূল : জাহান্নামীরা "যরী" ব্যতীত অন্য কোনো খাবার পাবে না। কথা শুনে কাফের মুশরিকরা বলতে লাগল যে, আমাদের উট গুলোতো যরী খেয়েই এত মোটা-তাজা হচ্ছে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা কাফের মুশরিকদের এহেন বিদ্রূপাত্মক উক্তি করার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[কুরতুবী ৩১/২০ ফতহুল কাদীর ৪২৯/৫]

বাশশার হযরত কাতাদাহ (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, জান্নাতে যা কিছু রয়েছে, সে সম্পর্কে হযরত রাসূল ﷺ যখন বয়ান করেন, তখন পথ ভ্রষ্ট দলের লোকেরা আর্শ্চয হলো। তাদের এহেন আর্শ্চয বোধতার নিরসন করার জন্যে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[তাবারী ৫৫৬/১২, কুরতুবী ৩৩/২০]

اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ (১৭)

শানে নুযূল : যখন আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের বিভিন্ন জিনিসের সৌন্দর্য বর্ণনা করেন। তখন পথভ্রষ্ট লোকেরা তাতে অত্যন্ত আশ্চর্যবোধ করত। এ পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত নাজিল হয়।

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ কিয়ামতের দিন মু'মিন ও কাফের আলাদা আলাদা বিভক্ত দু'দল হবে এবং মুখমণ্ডল দ্বারা পৃথকভাবে পরিচিত হবে। এই আয়াতে কাফেরদের মুখমণ্ডলের এক অবস্থা এই বর্ণিত হয়েছে যে, তা خَاشِعَةٌ অর্থাৎ হেয় হবে। خُشُوْعٌ শব্দের অর্থ নত হওয়া ও লাঞ্ছিত হওয়া। নামাজে খুশুর অর্থ আল্লাহর সামনে নত হওয়া, হেয় হওয়া। যারা দুনিয়াতে আল্লাহর সামনে খুশু অবলম্বন করেনি, কিয়ামতে এর শাস্তিস্বরূপ তাদের মুখমণ্ডল লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থা হবে : عَامِلَةٌ – نَاصِبَةٌ –বাকপদ্ধতিতে অবিরাম কর্মের কারণে পরিশ্রান্ত ব্যক্তিকে عَامِلَةٌ এবং ক্লান্ত ও ক্লিষ্ট ব্যক্তিকে বলা হয় نَاصِبَةٌ –বলা বাহুল্য, কাফেরদের এ দু'অবস্থা দুনিয়াতেই হবে। কেননা পরকালে কোনো কর্ম ও মেহনত নেই। তাই কুরতুবী প্রমুখ তাফসীরবিদ বলেন : প্রথম অবস্থা অর্থাৎ মুখমণ্ডল লাঞ্ছিত হওয়া তো পরকালে হবে এবং পরবর্তী দু'অবস্থা কাফেরদের দুনিয়াতেই হয়। কেননা অনেক কাফের দুনিয়াতে মুশরিকসুলভ ইবাদত এবং বাতিল পন্থায় অধ্যাবসায় ও সাধনা করে থাকে। হিন্দু, যোগী ও খ্রিস্টান পাদ্রী অনেক এমন আছে, যারা আন্তরিকতা সহকারে আল্লাহ তা'আলারই সন্তুষ্টির জন্য দুনিয়াতে ইবাদত ও সাধনা করে থাকে এবং এতে অসাধারণ পরিশ্রম স্বীকার করে। কিন্তু এসব ইবাদত মুশরিকসুলভ ও বাতিল পন্থায় হওয়ার কারণে আল্লাহর কাছে ছওয়াব ও পুরস্কার লাভের যোগ্য হয় না। অতএব, তাদের মুখমণ্ডল দুনিয়াতেও ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত রইল এবং পরকালে তাদেরকে লাঞ্ছনা ও অপমানের অন্ধকার আচ্ছন্ন করে রাখবে।

হযরত হাসান বসরী (র.) বর্ণনা করেন, খলীফা হযরত ওমর ফারুক (রা.) যখন শাম দেশে সফরে গমন করেন, তখন জনৈক খ্রিস্টান বৃদ্ধ পাদ্রী তাঁর কাছে আগমন করে। সে তার ধর্মীয় ইবাদত, সাধনা ও মোজাহাদায় এত বেশি আত্মনিয়োগ করেছিল যে, অতিরিক্ত পরিশ্রমের কারণে চেহারা বিকৃত এবং দেহ শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। তার পোশাকের মধ্যেও কোনো শ্রী ছিল না। খলীফা তাকে দেখে অশ্রু সংবরণ করতে পারলেন না। ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসিত হয়ে তিন বললেন : এই বৃদ্ধের করুণ অবস্থা দেখে আমি ক্রন্দন করতে বাধ্য হয়েছি। বেচারা স্বীয় লক্ষ্য অর্জনের জন্য জীবনপথ পরিশ্রম ও সাধনা করেছে কিন্তু সে তার লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারেনি। অতঃপর খলীফা হযরত ওমর (রা.) وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ –আয়াত তেলাওয়াত করলেন। –[কুরতুবী]

حَامِيَةً – نَارًا حَامِيَةً শব্দের অর্থ গরম, উত্তপ্ত। অগ্নি স্বভাবতই উত্তপ্ত। এর সাথে উত্তপ্ত বিশেষণ যুক্ত করা একথা বলার জন্য যে, এই অগ্নির উত্তাপ দুনিয়ার অগ্নির ন্যায় কোনো সময় কম অথবা নিঃশেষ হয় না বরং এটা চিরন্তন উত্তপ্ত।

لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ –অর্থাৎ যরী ব্যতীত জাহান্নামীরা কোনো খাদ্য পাবে না। যরী পৃথিবীর এক প্রকার কণ্টকবিশিষ্ট ঘাস যা মাটিতেই ছড়ায়। দুর্গন্ধযুক্ত বিষাক্ত কাঁটার কারণে জন্তু-জানোয়ার এর ধারেকাছেও যায় না।

জাহান্নামে ঘাস, বৃক্ষ কিরূপে হবে : এখানে প্রশ্ন হয় যে, ঘাস-বৃক্ষ তো আগুনে পুড়ে যায়। জাহান্নামে এগুলো কিরূপে থাকবে? জবাব এই যে, আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে এগুলোকে পানি ও বায়ু দ্বারা লালন করেছেন। তিনি জাহান্নামে এগুলোকে অগ্নিতে পরিণত করতেও সক্ষম; ফলে আগুনেই বাড়বে, ফলন্ত হবে।

কুরআনে জাহান্নামীদের খাদ্য সম্পর্কে যরী ব্যতীত যাক্কূম ও গিস্লীনেরও উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে সীমিত করে বলা হয়েছে যে, যরী ব্যতীত অন্য কোনো খাদ্য থাকবে না। এর অর্থ এই যে, জাহান্নামীরা কোনো সুস্বাদু ও পুষ্টিকর খাদ্য পাবে না বরং যরীর মতো কষ্টদায়ক বস্তু খেতে দেওয়া হবে। অতএব, যাক্কূম এবং গিসলীনও যরীর অন্তর্ভুক্ত। কুরতুবী বলেন : সম্ভবত জাহান্নামীদের বিভিন্ন স্তর থাকবে এবং বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন খাদ্য হবে–কোথাও যরী, কোথাও যাক্কূম এবং কোথাও গিসলীন।

لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِيْ مِنْ جُوْعٍ –জাহান্নামীদের খাদ্য হবে যরী–একথা শুনে কোনো কোনো কাফের বলতে থাকে যে, আমাদের উট তো যরী খেয়ে খুব মোটাতাজা হয়ে যায়। এর জবাবে বলা হয়েছে যে, দুনিয়ার যরী দ্বারা জাহান্নামের যরীকে বোঝার চেষ্টা করো না। জাহান্নামের যরী খেয়ে কেউ মোটাতাজা হবে না এবং এতে ক্ষুধা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না।

لَا تَسْمَعُ فِيْهَا لَاغِيَةً –অর্থাৎ জান্নাতে জান্নাতীরা কোনো অসার ও মর্মন্তুদ কথাবার্তা শুনতে পাবে না। মিথ্যা, কুফরি কথাবার্তা, গালিগালাজ, অপবাদ ও পীড়াদায়ক কথাবার্তা সবই এর অন্তর্ভুক্ত। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে : لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيْمًا –অর্থাৎ তারা জান্নাতে কোনো অনর্থক ও দোষারোপের কথা শুনবে না। আরও কতিপয় আয়াতে এ বিষয়বস্তু উল্লিখিত হয়েছে।

এ থেকে জনা গেল যে, দোষরোপ ও অশালীন কথাবার্তা খুবই পীড়াদায়ক। তাই জান্নাতীদের অবস্থায় একে গুরুত্ব সহকারে বর্ণনা করা হয়েছে।

কতিপয় সামাজিক রীতিনীতি : وَاَكْوَابٌ مَّوْضُوْعَةٌ – اَكْوَابٌ শব্দটি كُوْبٌ-এর বহুবচন। অর্থ পানপাত্র, যথা গ্লাস ইত্যাদি। مَوْضُوْعَةٌ অর্থাৎ নির্দিষ্ট জায়গায় পানির সন্নিকটে রক্ষিত থাকবে। এতে একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক নীতি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ পানপাত্র পানির কাছে নির্দিষ্ট জায়গায় থাকা উচিত। যদি এদিক-সেদিক থাকে এবং পানি পান করার সময় তালাশ করতে হয়, তবে এটা কষ্টকর ব্যাপার। তাই সব ব্যবহারের বস্তু–যেমন বদনা, গ্লাস, তোয়ালে ইত্যাদি নির্দিষ্ট জায়গায় থাকা এবং ব্যবহারের পর সেখানেই রেখে দেওয়ার ব্যাপারে প্রত্যেকেরই যত্নবান হওয়া উচিত যাতে অন্যদের কষ্ট না হয়। জান্নাতীদের পানপাত্র পানির কাছে রক্ষিত থাকবে –একথা উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা উপরিউক্ত নীতির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ –কিয়ামতের অবস্থা এবং মু'মিন ও কাফেরের প্রতিদান এবং শাস্তি বর্ণনা করার পর কিয়ামতে অবিশ্বাসী হঠকারীদের পথ প্রদর্শনের জন্য আল্লাহ তা'আলা তাঁর কুদরতের কয়েকটি নিদর্শন সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করার কথা বলেছেন। আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন আকাশ ও পৃথিবীতে অসংখ্য। এখানে মরুচারী আরবদের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যশীল চারটি নিদর্শনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আরবরা উটে সওয়ার হয়ে দূর-দূরান্তে সফর করে। তখন তাদের সর্বাধিক নিকটে থাকে উট, উপরে আকাশ, নিচে ভূপৃষ্ঠ এবং অগ্র-পশ্চাতে সারি সারি পর্বতমালা। এই চারটি বস্তু সম্পর্কেই তাদেরকে চিন্তাভাবনা করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ অন্যান্য নিদর্শন বাদ দিয়ে যদি এ চারটি বস্তু সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করা হয়, যা প্রতিনিয়ত তাদের সামনে রয়েছে। তবে আল্লাহর অপার কুদরত চাক্ষুষ দেখা যাবে। জন্তুদের মধ্যে উটের এমন কিছু বৈশিষ্ট্যও রয়েছে, যা বিশেষভাবে চিন্তাশীলদের জন্য আল্লাহ তা'আলার হিকমত ও কুদরতের দর্পণ হতে পারে। প্রথমত আরবে দেহাবয়বের দিক দিয়ে সর্ববৃহৎ জীব হচ্ছে উট। সে দেশে হাতী নেই। দ্বিতীয়ত আল্লাহ তা'আলা এই বিশাল বপু জীবকে এমন সহজলভ্য করেছেন যে, আরবের বেদুইন ও দারিদ্রতম ব্যক্তিও এই বিরাট জীবকে লালন-পালন করতে মোটেই অসুবিধা বোধ করে না। কারণ একে ছেড়ে দিলে নিজে নিজেই পেটভরে খেয়ে চলে আসে। উঁচু বৃক্ষের পাতা ছিঁড়ে দেওয়ার কষ্টও স্বীকার করতে হয় না। সে নিজেই বৃক্ষের ডাল খেয়ে খেয়ে দিনাতিপাত করে। হাতী ও অন্যান্য জীবের ন্যায় তাকে দুর্মূল্য খাবার দিতে হয় না। আরবের প্রান্তরে পানি খুবই দুষ্প্রাপ্য বস্তু। সর্বত্র সর্বদা পাওয়া যায় না। আল্লাহ তা'আলা উটের পেটে একটি রিজার্ভ টাংকী স্থাপন করেছেন। সে সাত-আট দিনের পানি একবারে পান করে এক টাংকীতে ভরে নেয়। অতঃপর ক্রমে ক্রমে সে এই রিজার্ভ পানি ব্যয় করে। এত উঁচু জীবের পিঠে সওয়ার হওয়ার জন্য স্বভাবতই সিড়িঁর প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তার পা তিন ভাঁজে সৃষ্টি করেছেন অর্থাৎ প্রত্যেক পায়ে দু'টি করে হাঁটু রেখেছেন। সে যখন সবগুলো হাঁটু গেড়ে বসে যায়, তখন তার পিঠে সওয়ার হওয়া ও নামা খুব সহজ হয়ে যায়। উট এত পরিশ্রমী যে, সব জীবের চেয়ে অধিক বোঝা বহন করতে পারে। আরবের প্রান্তরসমূহে অসহনীয় রৌদ্রতাপের কারণে দিবাভাগে সফর করা অত্যন্ত দুরূহ কাজ। তাই আল্লাহ তা'আলা এই জীবকে

সারারাত্রি সফরে অভ্যস্ত করে দিয়েছেন। উট এত নিরীহ প্রাণী যে, একটি ছোট বালিকাও তার নাকরশি ধরে যেদিকে ইচ্ছা নিয়ে যেতে পারে। এছাড়া আল্লাহর কুদরতের সবক দেয় এমন আরও বহু বৈশিষ্ট্য উটের মধ্যে রয়েছে। সূরার উপসংহারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সান্ত্বনার জন্য বলা হয়েছে : لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ –অর্থাৎ আপনি তাদের শাসক নন যে, তাদেরকে মু'মিন করতেই হবে। আপনার কাজ শুধু প্রচার করা ও উপদেশ দেওয়া। এতটুকু করেই আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। তাদের হিসাব-নিকাশ, শাস্তি ও প্রতিদান আমার কাজ।

শব্দ বিশ্লেষণ :

غَاشِيَةً : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم فاعل বাব سَمِعَ মাসদার غِشَاوَةً মূলবর্ণ (غ - ش - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– সর্বগ্রাসী, সকল দিক থেকে বেষ্টনকারী শাস্তি।

نَاصِبَةً : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার نَصْبٌ মূলবর্ণ (ن - ص - ب) জিনস صحيح অর্থ– কাতর। অক্ষম, বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি।

تَصْلٰى : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার صَلْىٌ মূলবর্ণ (ص - ل - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– প্রবেশ করবে।

حَامِيَةً : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم فاعل বাব سَمِعَ মাসদার حَمْىٌ মূলবর্ণ (ح - م - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– দগ্ধকারী অগ্নি।

اٰنِيَةٍ : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ মাসদার اَنْىٌ মূলবর্ণ (ا - ن - ى) জিনস মুরাক্কাব مهموز فاء এবং ناقص يائى অর্থ– উত্তপ্ত।

ضَرِيْعٍ : কণ্টকময় গাছ। কাটা। সহীহ বুখারীতে আছে, ضَرِيْعٌ- এক প্রকার ঘাস যাকে শিবরাক বলা হয়। এ ঘাস যখন শুকিয়ে যায়, তখন আরবরা একে ضَرِيْعٌ বলে থাকে। যেগুলো উট ভক্ষণ করে।

لَا يُسْمِنُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع منفى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَسْمَانٌ মূলবর্ণ (س - م - ن) জিনস صحيح অর্থ– না পুষ্ট করবে।

نَاعِمَةٌ : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم فاعل বাব سَمِعَ মাসদার نُعُوْمَةً মূলবর্ণ (ن - ع - م) জিনস صحيح অর্থ– হর্ষোৎফুল্ল, আনন্দ। সন্তুষ্ট ও সজীবতা।

لَاغِيَةً : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার لَغْوٌ মূলবর্ণ (ل - غ - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– নিরর্থক কথাবার্তা, অর্থহীন।

نَمَارِقُ : نَمْرَقَةٌ-এর বহুবচন অর্থ– ঠেস, বালিশ, তাকিয়া, نَمْرَقَةٌ ও نَمْرَقٌ ছোট তাকিয়া, জ্বিন-পালং, অল্প বৃষ্টি ভরা মেঘ। (কামূস)। হেলান দেওয়ার বালিশ। (মহল্লী, রূহুল মা'আনী)

مَصْفُوْفَةٌ : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم مفعول বাব نَصَرَ মাসদার صَفٌّ মূলবর্ণ (ص - ف - ف) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– সারিসারি। কাতারে বিন্যস্ত, সোজাসুজি।

اِيَابَهُمْ : তাদের প্রত্যাবর্তন, তাদের ফিরে আসা। মাসদার اِيَابٌ বাব نَصَرَ।

سُطِحَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى مجهول বাব فَتَحَ মাসদার سَطْحٌ মূলবর্ণ (س - ط - ح) জিনস صحيح অর্থ– সম্প্রসারিত করা হয়েছে।

مُصَيْطِرٍ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব فَيْعَلَةٌ মাসদার صَيْطَرَةٌ মূলবর্ণ (ص - ط - ر) জিনস صحيح অর্থ– দায়গ্রস্ত অধিকার।

বাক্য বিশ্লেষণ :

اِنَّ اِلَيْنَا اِيَابَهُمْ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ : এখানে اِنَّ হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল اِلَيْنَا হলো خبر مقدم আর اِيَابَهُمْ হলো اسم موخر আর ثُمَّ হলো হরফে আতফ। আর اِنَّ হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল عَلَيْنَا হলো خبر مقدم এবং حِسَابَهُمْ হলো اسم مقدم –[ই'রাবুল কুরআন ৮ম খণ্ড; পৃ. ২৯৭]

سُوْرَةُ الْفَجْرِ مَكِّيَّةٌ
সূরা ফাজ্‌র

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত– ৩০, রুকূ'– ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. শপথ ফজরের।	وَالْفَجْرِ ۝١
২. আর [জিলহজের] দশ রাত্রির।	وَلَيَالٍ عَشْرٍ ۝٢
৩. আর জোড় ও বেজোড়ের [অর্থাৎ জিলহজের দশম ও নবম তারিখের]।	وَّالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ۝٣
৪. আর রাত্রির শপথ যখন তা গমন করতে থাকে।	وَالَّيْلِ اِذَا يَسْرِ ۝٤
৫. নিশ্চয় তাতে জ্ঞানবানদের জন্য যথেষ্ট শপথ রয়েছে।	هَلْ فِيْ ذٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِيْ حِجْرٍ ۝٥
৬. আপনার কি জানা নেই যে, আপনার প্রতিপালক 'আদ সম্প্রদায়ের সাথে কী ব্যবহার করেছেন?	اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۝٦
৭. অর্থাৎ ইরাম সম্প্রদায়ের সাথে, যাদের অবয়ব থামের মতো [লম্বা সুদৃঢ়] ছিল।	اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ۝٧
৮. [সমগ্র দুনিয়ার] নগরসমূহে যাদের সদৃশ কোনো মানুষ সৃষ্ট হয়নি।	الَّتِيْ لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ۝٨

শাব্দিক অনুবাদ :

১. وَالْفَجْرِ শপথ ফজরের।
২. وَلَيَالٍ عَشْرٍ আর (জিলহজের) দশ রাত্রির।
৩. وَالشَّفْعِ আর জোড় وَالْوَتْرِ ও বেজোড়ের।
৪. وَالَّيْلِ আর রাত্রির শপথ اِذَا يَسْرِ যখন তা গমন করতে থাকে।
৫. هَلْ فِيْ ذٰلِكَ قَسَمٌ নিশ্চয় তাতে যথেষ্ট শপথ রয়েছে لِّذِيْ حِجْرٍ জ্ঞানবানের জন্য।
৬. اَلَمْ تَرَ আপনার কি জানা নেই যে كَيْفَ فَعَلَ কী ব্যবহার করেছেন رَبُّكَ আপনার প্রতিপালক بِعَادٍ আদ সম্প্রদায়ের সাথে।
৭. اِرَمَ অর্থাৎ ইরাম সম্প্রদায়ের সাথে ذَاتِ الْعِمَادِ যাদের অবয়ব থামের মতো ছিল।
৮. الَّتِيْ لَمْ يُخْلَقْ কোনো মানুষ সৃষ্ট হয়নি مِثْلُهَا তাদের সদৃশ فِي الْبِلَادِ নগরসমূহে।

অনুবাদ	আয়াত
৯. আর ছামূদের সাথে যারা ওয়াদিল ক্বোরাতে [পর্বতের] প্রস্তরসমূহ কাটত [এবং গৃহ নির্মাণ করত]।	وَثَمُوْدَ الَّذِيْنَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ﴿٩﴾
১০. আর কীলকের অধিকারী ফেরাউনের সাথে।	وَفِرْعَوْنَ ذِى الْاَوْتَادِ ﴿١٠﴾
১১. যারা নগরসমূহে সীমালঙ্ঘন করেছিল।	الَّذِيْنَ طَغَوْا فِى الْبِلَادِ ﴿١١﴾
১২. এবং তাতে বহু ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে রেখেছিল।	فَاَكْثَرُوْا فِيْهَا الْفَسَادَ ﴿١٢﴾
১৩. অনন্তর আপনার প্রতিপালক তাদের উপর শাস্তির চাবুক বর্ষণ করেছিলেন।	فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ﴿١٣﴾
১৪. নিঃসন্দেহে আপনার প্রতিপালক পর্যবেক্ষণ ঘাঁটিতে রয়েছেন। [অর্থাৎ বান্দার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখেন।]	اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ﴿١٤﴾
১৫. অনন্তর মানুষকে যখন তার প্রভু পরীক্ষা করেন, অর্থাৎ [দুনিয়াতে] তাকে সম্মান ও সম্পদ দান করেন, তখন সে [গর্ব করে] বলে আমার প্রভু আমার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিয়েছেন।	فَاَمَّا الْاِنْسَانُ اِذَا مَا ابْتَلٰىهُ رَبُّهٗ فَاَكْرَمَهٗ وَنَعَّمَهٗ فَيَقُوْلُ رَبِّىْۤ اَكْرَمَنِ ﴿١٥﴾
১৬. আর যখন তাকে [অন্যভাবে] পরীক্ষা করেন, অর্থাৎ তার জন্য তার জীবিকা সংকীর্ণ করে দেন, তখন সে বলে, আমার প্রভু আমার মর্যাদা ক্ষুণ্ন করেছেন।	وَاَمَّاۤ اِذَا مَا ابْتَلٰىهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهٗ فَيَقُوْلُ رَبِّىْۤ اَهَانَنِ ﴿١٦﴾
১৭. কখনো এরূপ নয়, বরং তোমরা এতিমের সম্মান করো না।	كَلَّا بَلْ لَّا تُكْرِمُوْنَ الْيَتِيْمَ ﴿١٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৯. وَثَمُوْدَ আর ছামূদের সাথে الَّذِيْنَ جَابُوا الصَّخْرَ যারা প্রস্তরসমূহ কাটত بِالْوَادِ ওয়াদিল কোরাতে।

১০. وَفِرْعَوْنَ আর ফেরাউনের সাথে ذِى الْاَوْتَادِ কীলকের অধিকারী।

১১. اَلَّذِيْنَ طَغَوْا যারা সীমালঙ্ঘন করেছে فِى الْبِلَادِ নগরসমূহে।

১২. فَاَكْثَرُوْا فِيْهَا الْفَسَادَ এবং তাতে বহু ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে রেখেছিল।

১৩. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ অনন্তর তাদের উপর বর্ষণ করেছিলেন رَبُّكَ আপনার প্রতিপালক سَوْطَ عَذَابٍ শাস্তির চাবুক।

১৪. اِنَّ رَبَّكَ নিঃসন্দেহে আপনার প্রতিপালক لَبِالْمِرْصَادِ পর্যবেক্ষণ ঘাঁটতি রয়েছেন।

১৫. فَاَمَّا الْاِنْسَانُ অনন্তর মানুষকে اِذَا مَا ابْتَلٰهُ رَبُّهٗ যখন তার প্রভু পরীক্ষা করেন فَاَكْرَمَهٗ وَنَعَّمَهٗ অর্থাৎ তাকে সম্মান ও সম্পদ দান করেন فَيَقُوْلُ তখন সে বলে رَبِّىْۤ اَكْرَمَنِ আমার প্রভু আমার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিয়েছেন।

১৬. وَاَمَّاۤ اِذَا مَا ابْتَلٰهُ আর যখন তাকে পরীক্ষা করেন فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهٗ অর্থাৎ তার জন্য তার জীবিকা সংকীর্ণ করে দেন فَيَقُوْلُ তখন সে বলে رَبِّىْۤ اَهَانَنِ আমার প্রভু আমার মর্যাদা ক্ষুণ্ন করেছেন।

১৭. كَلَّا কখনো এরূপ নয় بَلْ বরং لَا تُكْرِمُوْنَ الْيَتِيْمَ তোমরা এতিমের সম্মান করো না।

১৮. আর অপরকেও মিসকিনদেরকে খাদ্য দানে উৎসাহিত করো না।	وَلَا تَحٰٓضُّوْنَ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ﴿١٨﴾
১৯. আর তোমরা উত্তরাধিকারীত্ব সম্পদ আয়ত্ত করে পূর্ণটুকু খেয়ে ফেল।	وَتَاْكُلُوْنَ التُّرَاثَ اَكْلًا لَّمًّا ﴿١٩﴾
২০. আর তোমরা ধন-সম্পদের অত্যধিক মায়া রাখ।	وَّتُحِبُّوْنَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ﴿٢٠﴾
২১ কখনো এরূপ নয়, যে সময়ে জমিনকে ভেঙ্গে ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেওয়া হবে।	كَلَّآ اِذَا دُكَّتِ الْاَرْضُ دَكًّا دَكًّا ﴿٢١﴾
২২. আর আপনার প্রতিপালক এবং দলে দলে ফেরেশতাগণ [হাশরের মাঠে] আগমন করবেন।	وَّجَآءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴿٢٢﴾
২৩. আর সেদিন দোজখকে আয়ন করা হবে, ঐদিন মানুষের বুঝে আসবে, আর তখন বুঝে আসার সুযোগ থাকল কোথায় [অর্থাৎ তখন বুঝে লাভ কী?]	وَجِايْٓءَ يَوْمَئِذٍۭ بِجَهَنَّمَ ۙ يَوْمَئِذٍ يَّتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَاَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰى ﴿٢٣﴾
২৪. অতঃপর বলতো, হায়! যদি আমি আমার এই [পরকালের] জীবনের জন্য কোনো কাজ পূর্বে পাঠিয়ে রাখতাম।	يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِيْ قَدَّمْتُ لِحَيَاتِيْ ﴿٢٤﴾
২৫. অনন্তর সেদিন আল্লাহর শাস্তির ন্যায় কেউ শাস্তি প্রদানকারী হবে না।	فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهٗٓ اَحَدٌ ﴿٢٥﴾
২৬. আর না তার বন্ধনের ন্যায় কেউ বন্ধনকারী হবে।	وَّلَا يُوْثِقُ وَثَاقَهٗٓ اَحَدٌ ﴿٢٦﴾
২৭. হে নফসে মুত্‌মাইন্না! [অর্থাৎ শান্তিময় আত্মা]।	يٰٓاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৮. وَلَا تَحٰضُّوْنَ আর অপরকেও উৎসাহিত করো না عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ মিসকিনদের খাদ্য দানে।
১৯. وَتَاْكُلُوْنَ আর তোমরা খেয়ে ফেল التُّرَاثَ উত্তরাধিকারিত্ব সম্পদ اَكْلًا لَّمًّا পূর্ণটুকু আয়ত্ব করে।
২০. وَتُحِبُّوْنَ আর তোমরা মায়া রাখ الْمَالَ ধন-সম্পদের حُبًّا جَمًّا অত্যধিক মায়া।
২১. كَلَّا কখনো এরূপ নয় اِذَا دُكَّتِ الْاَرْضُ যে সময় জমিনকে ভেঙ্গে করে দেওয়া হবে دَكًّا دَكًّا চূর্ণ বিচূর্ণ।
২২. وَجَآءَ আর আগমন করবেন رَبُّكَ আপনার প্রতিপালক وَالْمَلَكُ এবং ফেরেশতাগণ صَفًّا صَفًّا দলে দলে।
২৩. وَجِايْٓءَ يَوْمَئِذٍ সেদিন আনয়ন করা হবে بِجَهَنَّمَ দোজখকে يَوْمَئِذٍ ঐদিন يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ মানুষের বুঝে আসবে وَاَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰى আর তখন বুঝে আসার সুযোগ রইল কোথায়?
২৪. يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِيْ অতঃপর বলতো হায় قَدَّمْتُ لِحَيَاتِيْ যদি আমি আমার এই জীবনের জন্য কোনো কাজ পূর্বেই পাঠিয়ে রাখতাম।
২৫. فَيَوْمَئِذٍ অনন্তর সেদিন لَّا يُعَذِّبُ শাস্তি প্রদানকারী হবে না عَذَابَهٗٓ আল্লাহর শাস্তির ন্যায় اَحَدٌ কেউ।
২৬. وَلَا يُوْثِقُ আর না বন্ধনকারী হবে وَثَاقَهٗٓ তাঁর বন্ধনের ন্যায় اَحَدٌ কেউ।
২৭. يٰٓاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ হে নফসে মুতমাইন্না (শান্তিময় আত্মা)।

২৮. তুমি তোমার প্রতিপালকের দিকে চল, এভাবে যে তুমি তার প্রতি সন্তুষ্ট এবং তিনিও তোমার প্রতি সন্তুষ্ট ।	ارْجِعِيْٓ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿٢٨﴾
২৯. অনন্তর তুমি আমার বিশিষ্ট বান্দাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও ।	فَادْخُلِيْ فِيْ عِبٰدِيْ ﴿٢٩﴾
৩০. আর আমার বেহেশতে প্রবেশ কর ।	وَادْخُلِيْ جَنَّتِيْ ﴿٣٠﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২৮. ارْجِعِيْٓ তুমি চল এইভাবে যে اِلٰى رَبِّكِ তোমার প্রতিপালকের দিকে رَاضِيَةً তুমি তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট مَّرْضِيَّةً এবং তিনিও তোমার প্রতি সন্তুষ্ট।

২৯. فَادْخُلِيْ অনন্তর তুমি অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও فِيْ عِبٰدِيْ আমার বিশিষ্ট বান্দাদের মধ্যে ।

৩০. وَادْخُلِيْ আর প্রবেশ কর جَنَّتِيْ আমার বেহেশতে ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরার নামকরণের কারণ : আলোচ্য সূরার প্রথম শব্দটিকেই এর নাম রূপে গ্রহণ করা হয়েছে । এতে ৩০টি আয়াত, ১৩৯টি বাক্য এবং ৫৯৭টি অক্ষর রয়েছে ।

সূরাটি নাজিলের সময়কাল : এর বিষয়বস্তু ও আলোচিত কথা হতে বুঝা যায় যে, মক্কায় যখন ইসলাম গ্রহণকারীদের উপর জুলুম-অত্যাচারের ষ্টীমরোলার চালানো শুরু হয়ে গিয়েছিল, ঠিক সে সময়ই এ সূরাটি নাজিল হয় । এ কারণে সূরাটিতে মক্কার লোকদেরকে 'আদ, ছামূদ ও ফেরাউনের পরিণতির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে সতর্ক করা হয়েছে ।

সূরার শানে নুযূল : হযরত ইবনে আব্বাস, ইবনে যোবায়ের ও আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) প্রমুখ সাহাবী ও তাফসীরকারদের মতে এ সূরা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হয়েছিল । আরবের অধিবাসীরা একসময় বলেছিল যে, আল্লাহ তা'আলা যদি মানুষের ভালো বা মন্দ কাজের জন্য সন্তুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হতেন, তবে ইহলোকেই তো তার জন্য পুরস্কার অথবা শাস্তি প্রদান করতেন । তিনি যখন ইহলোকে কিছু করছেন না, তখন পরলোকেও কিছু করবেন না । পুনরুজ্জীবন, হাশর-নশর, শাস্তি ও পুরস্কার এক ভিত্তিহীন উক্তি ছাড়া আর কিছুই নয় । অবিশ্বাসীদের এ সকল উক্তির জবাবেই আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য সূরা নাজিল করেন ।

সূরার আলোচ্য বিষয় : আলোচ্য সূরায় পরকালের শাস্তি ও পুরস্কারের আলোচনা করা হয়েছে । কেননা মক্কাবাসীরা এটা বিশ্বাস করত না । এ উদ্দেশ্যে সূরাটিতে ক্রমাগত ও পর পর যুক্তি উপস্থাপন করা হয়েছে । এখানে সে পুরস্কার অনুযায়ী যুক্তিসমূহ বিবেচনার দাবি রাখে ।

সূরাটির শুরুতেই ফজর, দশ রাত, জোড়-বেজোড় এবং বিদায়ী রাতের শপথ করা হয়েছে এবং শ্রোতাদের নিকট প্রশ্ন করা হয়েছে যে, তোমরা যে কথাকে মান্য করছ না, এর সত্যতার সাক্ষী এবং প্রমাণ হিসাবে এ জিনিসগুলো কি যথেষ্ট নয়? এর পর মানুষের ইতিহাস হতে যুক্তি পেশ করা হয়েছে । ইতিহাস খ্যাত 'আদ, ছামূদ ও ফেরাউনের মর্মান্তিক পরিণতি পেশ করে বলা হয়েছে যে, এরা যখন সীমালঙ্ঘন করল এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করল, তখনই আল্লাহর আজাবের চাবুক তাদের উপর বর্ষিত হলো । এটা হতে বোধগম্য হয় যে, এক মহাবিজ্ঞানী ও সুবিজ্ঞ কুশলী শাসক এর উপর রাজত্ব করছেন । বুদ্ধি-বিবেক ও নৈতিক অনুভূতি দিয়ে যাকে তিনি এ জগতে ক্ষমতা চালানোর এখতিয়ার দিয়েছেন । তার নিকট জিজ্ঞাসাবাদ করা, তার নিকট হতে যাবতীয় কাজের হিসাব গ্রহণ করা এবং এর ভিত্তিতে তাকে শাস্তি বা ভালো প্রতিফল দান করা তাঁরই এক অপরিবর্তনীয় নীতি । এরপর মানব সমাজের নৈতিক অবস্থার পর্যালোচনা করা হয়েছে । আরবে তো তখন নৈতিক অবস্থার ছিল চরম দুর্দিন । এ অবস্থার দু'টি দিকের সমালোচনা করা হয়েছে । একটি হলো লোকদের বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি । এর দরুনই তারা নৈতিকভাবে ভালো-মন্দ বিবেচনা না করে নিছক বৈষয়িক প্রতিপত্তিকেই মর্যাদা ও লাঞ্ছনার মানদণ্ড বানিয়ে রেখেছিল । ধন-সম্পদ দান করে অথবা এটা ছিনিয়ে নিয়ে আল্লাহ যে শুধু মানুষকে পরীক্ষা করতে চান তা তারা সম্পূর্ণ ভুলেই বসেছিল ।

দ্বিতীয়টি হচ্ছে– পিতার মৃত্যু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমাজে এতিম সন্তান চরমভাবে অসহায় হয়ে পড়ে। গরিবের পৃষ্ঠপোষক কোথাও কেউ নেই। সুযোগ পেলেই তাদেরকে অধিকার হতে বঞ্চিত করা হয়, অর্থ লোভ এক অতৃপ্ত পিপাসার মতো মানুষকে পেয়ে বসেছে। যত সম্পদই করায়ত্ত হোক না কেন, মানুষের ধনক্ষুধা কোনো ক্রমেই চরিতার্থ হয় না। এটাই হলো মানব সামাজের সাধারণ নৈতিক অবস্থা। এটা দ্বারা মানুষের মনে এ জিজ্ঞাসার জন্ম দেওয়া হয়েছে যে, এরপরও তাদেরকে শুভ প্রতিফল ও শাস্তির সম্মুখীন না করে ছেড়ে দেওয়া হবে কেন? এটা কি কোনো বিবেক সমর্থন করতে পারে? সুতরাং এর নিরিখেই সূরার শেষ পর্যায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, হিসাব-নিকাশ সেদিন অবশ্যই হবে, যেদিন আল্লাহ আল্লাহ তা'আলার আদালত কায়েম হবে। এ হিসাব-নিকাশ অমান্যকারীরা সেদিন সে কথাটি হাড়ে হাড়ে টের পাবে। যা আজ শত বুঝানোর পরও বুঝতে পারছে না। সেদিন তারা শত অনুতপ্তও হবে, কিন্তু তাতে কোনো ফলোদয় হবে না।

পক্ষান্তরে দুনিয়ার জীবনে যারা আসমানি কিতাব ও নবী-রাসূলগণের উপস্থাপিত চরম সত্যকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করেছে, আল্লাহ তা'আলা সেদিন তাদের প্রতি রাজি হবেন। আর তারাও আল্লাহর দান পেয়ে সন্তুষ্ট হয়ে যাবে। সেদিন তাদেরকে আল্লাহর নৈকট্য লাভকারীদের জামাতে শামিল হওয়ার এবং জান্নাতে দাখিল হওয়ার উদাত্ত আহ্বান জানানো হবে।

সূরাটির ফজিলত : নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন–

"مَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ الْفَجْرِ فِى اللَّيَالِىْ الْعَشَرَةِ مِنْ ذِى الْحَجَّةِ غُفِرَلَهٗ وَمَنْ قَرَأَهَا فِىْ سَائِرِ الْاَيَّامِ كَانَتْ لَهٗ نُوْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ"

অর্থাৎ জিলহজ মাসের প্রথম দশ রাতে যে ব্যক্তি সূরা ফজর তেলাওয়াত করবে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। আর সর্বদা যে, এটা তেলাওয়াত করবে কিয়ামতের দিন এটা তার জন্য নূর হবে।

كَلَّا بَلْ لَّا تُكْرِمُوْنَ الْيَتِيْمَ [١٨]

শানে নুযূল : মুকাতিল বলেন যে, আলোচ্য আয়াত কুদামাহ বিন মাজউন সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে যে, কুদামাহ বিন মাজউন উমাইয়া বিন খালফ এর তত্ত্বাবধানে ছিল। তখন সে যথাযথভাবে তাকে লালন পালন করেনি। সুতরাং এতিমের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[কুরতুবী ৪৮/২০]

يٰۤاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ .... الاية.

শানে নুযূল : নবী করীম ﷺ একদা ঘোষণা করলেন যে, যে ব্যক্তি রুমা কূপটি ক্রয় করে তা আল্লাহর জন্য ওয়াকফ করে দিবে, তাকে আল্লাহ পাক মাফ করে দিবেন। অতঃপর হযরত ওসমান (রা.) সে কূপটি ক্রয় করে নিলেন। রাসূল ﷺ তখন তাকে বললেন যে, তুমি তা জনকল্যাণে ওয়াকফ করে দিতে পার? তিনি বললেন, নিশ্চয় হে আল্লাহর রাসূল! ﷺ তখন হযরত ওসমান (রা.)-এর ব্যাপারে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। –[কুরতুবী ২০ : ৫৮]

এ সূরায় পাঁচটি বস্তুর শপথ করে اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ আয়াতে বর্ণিত বিষয়বস্তুকে জোরদার করা হয়েছে। অর্থাৎ এ দুনিয়াতে তোমরা যা কিছু করছ, তার শাস্তি ও প্রতিদান অপরিহার্য ও নিশ্চিত। তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের যাবতীয় কাজকর্মের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখছেন।

শপথের পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে প্রথম বিষয় হচ্ছে ফজর অর্থাৎ সোবহে-সাদেকের সময়। এখানে প্রত্যেক দিনের প্রভাতকালও উদ্দেশ্য হতে পারে। কারণ প্রভাতকাল বিশ্বে এক মহাবিপ্লব আনয়ন করে এবং আল্লাহ তা'আলার অপার কুদরতের দিকে পথ প্রদর্শন করে। এখানে বিশেষ দিনের প্রভাতকালও বুঝানো যেতে পারে। তাফসীরবিদ সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও ইবনে যুবায়র (রা.) থেকে প্রথম অর্থ এবং হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর এক রেওয়ায়েতে ও হযরত কাতাদাহ (রা.) থেকে দ্বিতীয় অর্থ অর্থাৎ মহররম মাসের প্রথম তারিখের প্রভাতকাল বর্ণিত হয়েছে। এ দিনটি ইসলামি চান্দ্র বছরের সূচনা।

কেউ কেউ এর অর্থ নিয়েছেন জিলহজ মাসের দশম তারিখের প্রভাতকাল। মুজাহিদ (র.) ও ইকরিমা (রা.)-এর উক্তি তাই। বিশেষ করে এদিনের শপথ করার কারণ এই যে, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক দিনের সাথে একটি রাত্রি সংযুক্ত করে দিয়েছেন, যা ইসলামী নিয়মানুযায়ী দিনের পূর্বে থাকে। একমাত্র 'ইয়াওমুন্নাহর' তথা জিলহজের দশম তারিখ এমন একটি দিন, যার সাথে কোনো রাত্রি নেই। কারণ এর পূর্বের রাত্রি এ দিনের রাত্রি নয় বরং আইনত তা আরাফারই রাত্রি। এ কারণেই কোনো হাজী যদি 'ইয়াওমে-আরাফা' তথা নবম তারিখে দিনের বেলায় আরাফাতের ময়দানে পৌঁছতে না পারে এবং রাত্রিতে সোবহে সাদেকের পূর্বে কোনো সময় পৌঁছে যায়, তবে তার আরাফাতে অবস্থান সিদ্ধ ও হজ শুদ্ধ হয়ে যায়। এ থেকে জানা গেল যে, আরাফা দিবসের রাত্রি দু'টি–একটি পূর্বে ও একটি পরে এবং 'ইয়াওমুন্নাহর' তথা দশম তারিখের কোনো রাত্রি নেই। এদিক দিয়ে এ দিনটি সব দিনের তুলনায় বিশেষ শানের অধিকারী। –[কুরতুবী]

শপথের দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে দশ রাত্রি। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও কাতাদাহ এবং মুজাহিদ (র.) প্রমুখ তাফসীরবিদের মতে এতে জিলহজের প্রথম দশ রাত্রি বোঝানো হয়েছে। কেননা হাদীসে এসব রাত্রির ফজিলত বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : ইবাদত করার জন্য আল্লাহর কাছে জিলহজের দশদিন সর্বোত্তম দিন। এর প্রত্যেক দিনের রোজা এক বছর রোজার সমান এবং এতে প্রত্যেক রাত্রির ইবাদত শবে কদরের ইবাদতের সমতুল্য। –(মাযহারী) হযরত জাবের (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বয়ং وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ-এর তাফসীর করেছেন, জিলহজের দশদিন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন : হযরত মূসা (আ.)-এর কাহিনীতে وَاتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ বলে এই দশ রাত্রিকেই বোঝানো হয়েছে। কুরতুবী বলেন : হযরত জাবের (রা.)-এর হাদীস থেকে জানা গেল যে, জিলহজের দশ দিন সর্বোত্তম দিন এবং হাদীস থেকে জানা গেল যে, হযরত মূসা (আ.)-এর জন্যও এই দশ দিনই নির্ধারিত করা হয়েছিল।

وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ– এ দু'টি শব্দের আভিধানিক অর্থ যথাক্রমে 'জোড়' ও 'বেজোড়'। এই জোড় ও বেজোড় বলে আসলে কি বোঝানো হয়েছে, আয়াত থেকে নির্দিষ্টভাবে তা জানা যায় না। তাই এ ব্যাপারে তাফসীরকারগণের উক্তি অসংখ্য। কিন্তু হযরত জাবের (রা.) বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :

اَلْوَتْرُ يَوْمُ عَرَفَةَ وَالشَّفْعُ يَوْمُ النَّحْرِ –অর্থাৎ وَتْر-এর অর্থ আরাফা দিবস, (জিলহজের নবম তারিখ) এবং شَفْع-এর অর্থ ইয়াওমুন্নাহ্‌র [জিলহজের দশম তারিখ]।

কুরতুবী এ হাদীসটি উদ্ধৃত করে বলেন : এটা সনদের দিক দিয়ে হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) বর্ণিত হাদীস অপেক্ষা অধিক সহীহ, যাতে জোড় ও বেজোড় নামাজের কথা আছে। তাই হযরত ইবনে আব্বাস, ইকরিমা (রা.) প্রমুখ তাফসীরবিদ প্রথমোক্ত তাফসীরই অবলম্বন করেছেন।

কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন : জোড় বলে সমগ্র সৃষ্টজগৎ বোঝানো হয়েছে। কেননা আল্লাহ তা'আলা সমস্ত সৃষ্টিকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন। তিনি বলেন : وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ –অর্থাৎ আমি সবকিছু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি; যথা কুফর ও ঈমান, সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য, আলো ও অন্ধকার, রাত্রি ও দিন, শীত ও গ্রীষ্ম, আকাশ ও পৃথিবী, জিন ও মানব এবং নর ও নারী। এগুলোর বিপরীতে বেজোড় একমাত্র আল্লাহ তা'আলা সত্তার– هُوَ اللّٰهُ الْاَحَدُ الصَّمَدُ

وَاللَّيْلِ اِذَا يَسْرِ – يَسْرِىْ অর্থ রাত্রিতে চলা। অর্থাৎ রাত্রির শপথ, যখন সে চলতে থাকে তথা খতম হতে থাকে। এই পাঁচটি শপথ উল্লেখ করার পর আল্লাহ তা'আলা গাফেল মানুষকে চিন্তা-ভাবনা করার জন্য বলেছেন :

هَلْ فِىْ ذٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِىْ حِجْرٍ : حِجْر-এর শাব্দিক অর্থ বাধা দেওয়া। মানুষের বিবেক মানুষকে মন্দ ও ক্ষতিকর বিষয়াদি থেকে বাধাদান করে। তাই حِجْر -এর অর্থ বিবেকও হয়ে থাকে। এখানে তাই বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, বিবেকবানের জন্য এসব শপথও যথেষ্ট কি না? এই প্রশ্ন প্রকৃত পক্ষে মানুষকে গাফলতি থেকে জাগ্রত করার একটি কৌশল। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলার মাহাত্ম্য সম্পর্কে, তাঁর শপথ করে কোনো বিষয় বর্ণনা করা সম্পর্কে এবং শপথের বিষয়সমূহের মাহাত্ম্য সম্পর্কে সামান্য চিন্তা-ভাবনা করলে যে বিষয়ের জন্য শপথ করা হয়, তার নিশ্চয়তা প্রমাণিত হয়ে যাবে। এখানে যে বিষয়ের জন্য শপথ করা হয়েছে, তা এই যে, মানুষের প্রত্যেক কর্মের পরকালে হিসাব হওয়া এবং তার শাস্তি ও প্রতিদান হওয়া সন্দেহ ও সংশয়ের উর্ধ্বে। শপথের এই জবাব পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয়নি কিন্তু পূর্বাপর বর্ণনা থেকে তা বোঝা যায়। পরবর্তী আয়াতসমূহে কাফেরদের উপর আজাব আসার কথা বর্ণনা করেও একথা ব্যক্ত করা হয়েছে যে, কুফর ও গোনাহের শাস্তি পরকালে হওয়া তো স্থিরীকৃত বিষয়ই। মাঝে মাঝে দুনিয়াতেও তাদেরে প্রতি আজাব প্রেরণ করা হয়। এ ক্ষেত্রে তিনটি জাতির আজাবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে– **এক.** আ'দ বংশ, **দুই.** ছামূদ গোত্র এবং **তিন.** ফিরাউন সম্প্রদায়। আ'দ ও ছামূদ জাতিদ্বয়ের বংশতালিকা উপরের দিকে ইরামে গিয়ে এক হয়ে যায়। এভাবে ইরাম শব্দটি আ'দ ও ছামূদ উভয়ের বেলায় প্রযোজ্য।

اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ –এখানে ইরাম শব্দ ব্যবহার করে আ'দ-গোত্রের পূর্ববর্তী বংশধর তথা প্রথম আ'দকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। তারা দ্বিতীয় আ'দের তুলনায় আ'দের পূর্বপুরুষ ইরামের নিকটতম বিধায় তাদেরকে আ'দে-ইরাম শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। তাদেরকেই এখানে عَادٍ اِرَمَ শব্দ দ্বারা এবং সূরা নজমে عَادًا الْاُوْلٰى শব্দ দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে তাদের বিশেষণে বলা হয়েছে : ذَاتِ الْعِمَادِ – عِمَادٌ ও عَمُوْدٌ শব্দের অর্থ স্তম্ভ। তারা অত্যন্ত দীর্ঘকায় জাতি ছিল বিধায় তাদেরকে ذَاتِ الْعِمَادِ বলা হয়েছে। এই আ'দ জাতি দৈহিক গঠন ও শক্তি-সাহসে অন্য সব জাতি থেকে স্বতন্ত্র ছিল। কুরআন পাক তাদের এই স্বাতন্ত্র্য অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছে : لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِى الْبِلَادِ অর্থাৎ এমন দীর্ঘকায় ও শক্তিশালী জাতি ইতিপূর্বে পৃথিবীতে সৃজিত হয়নি। এতদসত্ত্বেও কুরআন তাদের দেহের মাপ অনাবশ্যক বিবেচনা করে উল্লেখ করেনি। ইসরাইলী রেওয়ায়েতসমূহে তাদের দৈহিক গঠন ও শক্তি সম্পর্কে অদ্ভুত

ধরনের কথাবার্তা বর্ণিত আছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও মুকাতিল (র.) থেকে তাদের উচ্চতা বার হাত তথা ১৮ ফুট বর্ণিত আছে। বলা বাহুল্য, তাঁরা ইসরাইলী রেওয়ায়েতদৃষ্টেই একথা বলেছেন।

কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন : ইরাম আ'দ তনয় শাদ্দাদ নির্মিত বেহেশতের নাম। এরই বিশেষণ ذَاتِ الْعِمَادِ - কেননা এই অনুপম প্রাসাদটি বহু স্তম্ভের উপর দণ্ডায়মান এবং স্বর্ণরৌপ্য ও মণিমুক্ত দ্বারা নির্মিত ছিল, যাতে মানুষ পরকালের বেহেশতের পরিবর্তে এই নগদ বেহেশতকে পছন্দ করে নেয়। কিন্তু এই বিরাট প্রাসাদের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর যখন শাদ্দাদ সভাসদসহ সমভিব্যাহারে এ বেহেশতে প্রবেশ করার ইচ্ছা করল, তখনই আল্লাহর পক্ষ থেকে আজাব নাজিল হলো। ফলে সবাই ধ্বংস হলো এবং কৃত্রিম বেহেশতও ধুলিসাৎ হয়ে গেল। (কুরতুবী) এ তাফসীরের দিক দিয়ে আয়াতে আ'দ গোত্রের একটি বিশেষ আজাব বর্ণিত হয়েছে, যা শাদ্দাদ নির্মিত বেহেশতের উপর নাজিল হয়েছে। প্রথম তাফসীর অনুযায়ী এতে আ'দ গোত্রের সমস্ত আজাবের কথাই বর্ণিত হয়েছে।

وَفِرْعَوْنَ ذِى الْاَوْتَادِ – اَوْتَادٌ শব্দটি وَتَدٌ-এর বহুবচন। এর অর্থ কীলক। ফেরাউনকে কীলকওয়ালা বলার বিভিন্ন কারণ তাফসীরবিদগণ বর্ণনা করেছেন। এই শব্দের মধ্যে তার জুলুম-নিপীড়ন ও শাস্তির বর্ণনা রয়েছে। অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে এ কারণই প্রসিদ্ধ। ফেরাউন যার প্রতি কুপিত হতো, তার হস্তপদ চারটি কীলকে বেঁধে অথবা চার হাতপায়ে কীলক মেরে রৌদ্রে শুইয়ে দিত এবং তার দেহে সাপ, বিচ্ছু ছেড়ে দিত। কোনো কোনো তাফসীরবিদ এ প্রসঙ্গে ফিরাউনের স্ত্রী আছিয়ার ঈমান প্রকাশ করা এবং ফেরাউন কর্তৃক তাঁকে এ ধরনের শাস্তি দেওয়ার দীর্ঘ কাহিনী বর্ণনা করেছেন। –[মাযহারী]

فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ –আ'দ, সামূদ ও ফেরাউন গোত্রের অপকীর্তি বর্ণনা প্রসঙ্গে তাদের আজাবকে কশাঘাতের শিরোনামে ব্যক্ত করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, কশাঘাত যেমন দেহের বিভিন্ন অংশে হয়, তেমনি তাদের উপরও বিভিন্ন প্রকার আজাব নাজিল করা হয়।

اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ – مِرْصَادٌ ও مَرْصَدٌ শব্দের অর্থ সতর্ক দৃষ্টি রাখার ঘাঁটি, যা কোনো উচ্চ স্থানে স্থাপিত হয়ে থাকে। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি লোকের প্রতিটি ক্রিয়া-কর্ম ও গতিবিধির উপর দৃষ্টি রাখছেন এবং সবাইকে প্রতিদান ও শাস্তি দেবেন। কোনো কোনো তাফসীরবিদ এ বাক্যকে পূর্বোক্ত শপথ বাক্যসমূহের জবাব সাব্যস্ত করেছেন।

দুনিয়াতে জীবনোপকরণের বাহুল্য ও স্বল্পতা আল্লাহর কাছে প্রিয়পাত্র ও প্রত্যাখ্যাত হওয়ার আলামত নয় : فَاَمَّا الْاِنْسَانُ –আয়াতে আসলে কাফের ইনসানকে বোঝানো হয়েছে। কিন্তু ব্যাপক অর্থে সেসব মুসলমানও এর অন্তর্ভুক্ত যারা নিম্নরূপ ধারণায় লিপ্ত থাকে।

আল্লাহ তা'আলা যখন কাউকে জীবনোপকরণে সমৃদ্ধি ও স্বাচ্ছন্দ্য, ধনসম্পদ ও সুস্বাস্থ্য দান করেন, তখন শয়তান তাকে দু'টি ভ্রান্ত ধারণায় লিপ্ত করে দেয়– **এক.** সে মনে করতে থাকে যে, এটা আমার ব্যক্তিগত প্রতিভা, গুণগরিমা ও কর্ম প্রচেষ্টারই অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতি, যা আমার লাভ করাই সঙ্গত। আমি এর যোগ্যপাত্র। **দুই.** আমি আল্লাহ্‌র কাছেও প্রিয়পাত্র। যদি প্রত্যাখ্যাত হতাম, তবে তিনি আমাকে এসব নিয়ামত দান করতেন না। এমনিভাবে কেউ অভাব-অনটন ও দারিদ্র্যের সম্মুখীন হলে একে আল্লাহর কাছে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার দলিল মনে করে এবং তাঁর প্রতি এ কারণে ক্রুদ্ধ হয় যে, সে অনুগ্রহ ও সম্মানের পাত্র ছিল কিন্তু তাকে অহেতুক লাঞ্ছিত ও হেয় করা হয়েছে। কাফের ও মুশরিকদের মধ্যে এ ধরনের ধারণা বিদ্যমান ছিল এবং কুরআন পাকে কয়েক জায়গায় তা উল্লেখও ররেছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, আজকাল অনেক মুসলমানও এ বিভ্রান্তিতে লিপ্ত রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতসমূহে এ ধরনের লোকদের অবস্থাই উল্লেখ করেছেন : كَلَّا –অর্থাৎ তোমাদের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন। দুনিয়াতে জীবনোপকরণের স্বাচ্ছন্দ্য সৎ ও আল্লাহর প্রিয়পাত্র হওয়ার আলামত নয়, তেমনি অভাব-অনটন ও দারিদ্র্য প্রত্যাখ্যাত ও লাঞ্ছিত হওয়ার দলিল নয় বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যাপার সম্পূর্ণ উল্টো হয়ে থাকে। খোদায়ী দাবি করা সত্ত্বেও ফিরাউনের কোনোদিন মাথা ব্যথাও হয়নি, অপরপক্ষে কোনো কোনো পয়গম্বরকে শত্রুরা করাত দিয়ে চিরে দ্বিখণ্ডিত করে দিয়েছে। রাসূলে কারীম ﷺ বলেছেন, মুহাজিরগণের মধ্যে যারা দারিদ্র ও নিঃস্ব ছিল, তারা ধনী মুহাজিরগণ অপেক্ষা চল্লিশ বছর আগে জান্নাতে যাবে। –(মাযহারী) অন্য এক হাদীসে আছে আল্লাহ তা'আলা যে বান্দাকে ভালোবাসেন, তাকে দুনিয়া থেকে এমনভাবে বাঁচিয়ে রাখেন, যেমন তোমরা রোগীকে পানি থেকে বাঁচিয়ে রাখ। –[মাযহারী]

এতিমের জন্য ব্যয় করাই যথেষ্ট নয়, তাকে সম্মান করাও জরুরি : এরপর কাফেরদের কয়েকটি মন্দ অভ্যাস বর্ণনা করা হয়েছে। لَا تُكْرِمُوْنَ الْيَتِيْمَ –অর্থাৎ তোমরা এতিমকে সম্মান করো না। এখানে আসলে বলা উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা এতিমদের প্রাপ্য আদায় করো না এবং তাদের প্রয়োজনীয় ব্যয় বহন করো না। কিন্তু 'সম্মান করো না' বলার মধ্যে

ইঙ্গিত রয়েছে যে, এতিমদের প্রাপ্য আদায় এবং তাদের ব্যয়ভার বহন করলেই তোমাদের যৌক্তিক, মানবিক ও আল্লাহ প্রদত্ত ধনসম্পদের কৃতজ্ঞতা সম্পর্কিত দায়িত্ব পালিত হয়ে যায় না; বরং তাদেরকে সম্মানও করতে হবে; নিজেদের সন্তানদের মোকাবিলায় তাদেরকে হেয় মনে করা যাবে না। কাফেররা যে দুনিয়ার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে সম্মান এবং অভাব-অনটনকে অপমান মনে করত, এটা বাহ্যত তারই জবাব। এখানে বলা হয়েছে যে, তোমরা কোনো সময় অভাব-অনটনের সম্মুখীন হলে তা এ কারণে হয় যে, তোমরা এতিমের ন্যায় দয়াযোগ্য বালক-বালিকাদের প্রাপ্যও আদায় কর না। তাদের দ্বিতীয় মন্দ অভ্যাস হলো : وَلَا تَحٰٓضُّوْنَ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ অর্থাৎ তোমরা নিজেরা তো গরিব-মিসকিনকে অন্নদান করই না, পরন্তু অপরকেও এ কাজে উৎসাহিত করো না। এতেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, ধনী ও বিত্তশালীদের উপর যেমন গরিব-মিসকিনের হক আছে, তেমনি যারা দান করার সামর্থ্য রাখে না, তাদের উপরও হক আছে যে, তারা অপরকে এ বিষয়ে উৎসাহিত করবে।

তৃতীয় মন্দ অভ্যাস এই যে, وَتَأْكُلُوْنَ التُّرَاثَ اَكْلًا لَّمًّا –অর্থাৎ তোমরা হারাম ও হালাল সবরকম উত্তরাধিকারীত্ব সম্পত্তি একত্র করে খেয়ে ফেল এবং নিজের অংশের সাথে অপরের অংশও ছিনিয়ে নাও। সবরকম হালাল ও হারাম ধনসম্পদ একত্র করা নাজায়েজ কিন্তু এখানে বিশেষভাবে ওয়ারিশী সম্পত্তির কথা উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত এই যে, ওয়ারিশী সম্পত্তির দিকে বেশি দৃষ্টি রাখা ও তার পেছনে লেগে থাকা ভীরুতা ও কাপুরুষতার লক্ষণ। এ ধরনের লোক মৃতভোজী জন্তুদের মতোই তাকিয়ে থাকে, কবে সম্পত্তির মালিক মরবে এবং তারা সম্পত্তি ভাগ-বাটোয়ারা করে নেবার সুযোগ পাবে। যারা কৃতী পুরুষ, তারা নিজেদের উপার্জনেই সন্তুষ্ট থাকে এবং মৃতদের সম্পত্তির প্রতি লোলুপদৃষ্টি নিক্ষেপ করে না। চতুর্থ মন্দ অভ্যাস হচ্ছে : وَتُحِبُّوْنَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا –অর্থাৎ তোমরা ধনসম্পদকে অত্যধিক ভালোবাস। অত্যধিক বলার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ধনসম্পদের ভালোবাসা এক পর্যায়ে নিন্দনীয় নয় বরং মানুষের জন্মগত তাগিত। তবে সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া এবং তাতে মজে যাওয়া নিন্দনীয়। কাফেরদের এসব মন্দ অভ্যাস বর্ণনা করার পর আবার আসল বিষয়বস্তু পরকালের প্রতিদান ও শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে প্রথমে কিয়ামত আগমনের কথা বলা হয়েছে।

اِذَا دُكَّتِ الْاَرْضُ دَكًّا دَكًّا – دَكًّا- এর শাব্দিক অর্থ কোনো বস্তুকে আঘাত করে ভেঙ্গে দেওয়া। এখানে কিয়ামতের ভূকম্পন বোঝানো হয়েছে যা পর্বতমালাকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেবে। دَكًّا دَكًّا বারবার বলায় ইঙ্গিত হয়েছে যে, কিয়ামতের ভূকম্পন একের পর এক অব্যাহত থাকবে।

وَجَآءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا –অর্থাৎ আপনার পালনকর্তা ও ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে হাশরের ময়দানে আগমন করবেন। আল্লাহ তা'আলা কিভাবে আগমন করবেন, তা তিনি ব্যতীত কেউ জানে না। وَجِايْٓءَ يَوْمَئِذٍۭ بِجَهَنَّمَ –অর্থাৎ সেদিন জাহান্নামকে আনা হবে অর্থাৎ সামনে উপস্থিত করা হবে। এর উদ্দেশ্য কি এবং কিভাবে জাহান্নামকে হাশরের ময়দানে আনা হবে, তার স্বরূপ আল্লাহ তা'আলাই জানেন। তবে বাহ্যত বোঝা যায় যে, সপ্তম পৃথিবীর গভীরে অবস্থিত জাহান্নাম তখন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে এবং সব সমুদ্র অগ্নিময় হয়ে তাতে শামিল হয়ে যাবে। এভাবে জাহান্নাম হাশরের আঙিনায় সবার সামনে এসে যাবে।

يَوْمَئِذٍ يَّتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَاَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰى – تَذَكُّرٌ- এর অর্থ এখানে বুঝে আসা। অর্থাৎ কাফেররা সেদিন বুঝতে পারবে যে, দুনিয়াতে তার কি করা উচিত ছিল আর সে কি করেছে। কিন্তু তখন এই বুঝে আসা নিষ্ফল হবে। কেননা পরকাল কর্মজগৎ নয়– প্রতিদান জগৎ। অতঃপর সে يٰلَيْتَنِيْ قَدَّمْتُ لِحَيَاتِيْ বলে আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করবে যে, হায়! আমি যদি দুনিয়াতে কিছু সৎকর্ম করতাম! কিন্তু কুফর ও শিরকের শাস্তি সামনে এসে যাওয়ার পর এ আকাঙ্ক্ষায় কোনো লাভ হবে না। এখন আজাব ও পাকড়াওয়ের সময়। আল্লাহ তা'আলার পাকড়াওয়ের মতো কঠিন পাকড়াও কারো হতে পারে না। অতঃপর মু'মিনদের ছওয়াব ও জান্নাতে প্রবেশের কথা বলা হয়েছে।

يٰٓاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ –এখানে মু'মিনদের রূহকে نَفْسٌ مُطْمَئِنَّةٌ (প্রশান্ত আত্মা) বলে সম্বোধন করা হয়েছে। অর্থাৎ সে আত্মা, যে আল্লাহর স্মরণ ও আনুগত্যের দ্বারা প্রশান্তি লাভ করে এবং তা না করলে অশান্তি ভোগ করে। সাধনা ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে মন্দস্বভাব ও হীনমন্যতা দূর করেই এই স্তর অর্জন করা যায়। আল্লাহর আনুগত্য, জিকির ও শরিয়ত এরূপ ব্যক্তির মজ্জার সাথে একাকার হয়ে যায়। সম্বোধন করে বলা হয়েছে : اِرْجِعِيْٓ اِلٰى رَبِّكِ –অর্থাৎ নিজের পালনকর্তার দিকে ফিরে যাও। ফিরে যাওয়া বাক্যের দ্বারা বোঝা যায় যে, তার প্রথম বাসস্থানও পালনকর্তার কাছে ছিল। সেখানেই ফিরে যেতে বলা হচ্ছে। এতে সে হাদীসের সমর্থন রয়েছে যাতে বলা হয়েছে যে, মু'মিনগণের আত্মা তাদের আমলনামাসহ সপ্তম আকাশে আরশের ছায়াতলে অবস্থিত ইল্লিয়্যীনে থাকবে। সমস্ত আত্মার আসল বাসস্থান সেখানেই। সেখান থেকে এনে মানব দেহে প্রবিষ্ট করানো হয় এবং মৃত্যুর পর সেখানেই ফিরে যায়।

رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً –অর্থাৎ এ আত্মা আল্লাহর প্রতি তাঁর সৃষ্টিগত ও আইনগত বিধি-বিধানে সন্তুষ্ট এবং আল্লাহ তা'আলাও তার প্রতি সন্তুষ্ট। কেননা বান্দার সন্তুষ্টির দ্বারাই বোঝা যায় যে, আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট না হলে বান্দা আল্লাহর ফয়সালার সন্তুষ্ট হওয়ার তাওফীকই পায় না। এমনি আত্মা মৃত্যুকালে মৃত্যুতেও সন্তুষ্ট ও আনন্দিত হয়। হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রা.) বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : مَنْ اَحَبَّ لِقَاءَ اللّٰهِ اَحَبَّ اللّٰهُ لِقَائَهٗ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللّٰهِ كَرِهَ اللّٰهُ لِقَائَهٗ অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সাথে সাক্ষাতকে পছন্দ করে, আল্লাহ তা'আলাও তার সাথে সাক্ষাৎকে পছন্দ করেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সাথে সাক্ষাৎকে অপছন্দ করে, আল্লাহ তা'আলাও তার সাক্ষাৎকে অপছন্দ করেন। এই হাদীস শুনে হযরত আয়েশা (রা.) বললেন : আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ তো মৃত্যুর মাধ্যমেই হতে পারে। কিন্তু মৃত্যু আমাদের অথবা কারো পছন্দনীয় নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আসল ব্যাপার তা নয়। প্রকৃতপক্ষে মু'মিন ব্যক্তিকে মৃত্যুর সময় ফেরেশতাদের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়, যা শুনে মৃত্যু তার কাছে অত্যধিক প্রিয় বিষয় হয়ে যায়। এমনিভাবে মৃত্যুর সময় কাফেরের সামনে আজাব ও শাস্তি উপস্থিত করা হয়। ফলে তখন তার কাছে মৃত্যুর চেয়ে অধিক মন্দ ও অপছন্দনীয় কোনো বিষয় মনে হয় না। –(মাযহারী) সারকথা বর্তমানে যে মানুষমাত্রই মৃত্যুকে অপছন্দ করে, তা ধর্তব্য নয় বরং আত্মা নির্গত হওয়ার সময়ে যে ব্যক্তি মৃত্যুতে এবং আল্লাহর সাথে সাক্ষাতে সন্তুষ্ট থাকে, আল্লাহ তা'আলাও তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন। رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً -এর মর্ম তাই।

فَادْخُلِىْ فِىْ عِبَادِىْ –প্রশান্ত আত্মাকে সম্বোধন করে বলা হবে, আমার বিশেষ বান্দাদের কাতারভুক্ত হয়ে যাও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর। এ আদেশ হতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, জান্নাতে প্রবেশ করা ধর্মপরায়ণ সৎ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার উপর নির্ভরশীল। তাদের সাথেই জান্নাতে প্রবেশ করা যাবে। এ থেকে জানা যায় যে, যারা দুনিয়াতে ধার্মিক ও সৎকর্মপরায়ণ লোকদের সঙ্গ ও সংসর্গ অবলম্বন করে, তারা যে তাদের সাথে জান্নাতে যাবে, এটা তারই আলামত। এ কারণেই হযরত সোলায়মান (আ.) দোয়া প্রসঙ্গে বলেছিলেন : وَاَدْخِلْنِىْ بِرَحْمَتِكَ فِىْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ এবং হযরত ইউসুফ (আ.) দোয়া করতে গিয়ে বলেছিলেন : وَاَلْحِقْنِىْ بِالصّٰلِحِيْنَ এতে বোঝা গেল, সৎসর্গ একটি মহানিয়ামত, যা পয়গম্বরগণও উপেক্ষা করতে পারেন না।

وَادْخُلِىْ جَنَّتِىْ –এতে আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে 'আমার জান্নাত' বলেছেন। এতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, জান্নাত কেবল চিরন্তন সুখ-শান্তির আবাসস্থলই নয় বরং সর্বোপরি এটা আল্লাহর সন্তুষ্টির স্থান।

আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত মু'মিনগণকে আল্লাহ তা'আলার সম্মানসূচক এ সম্বোধন কখন হবে, সে সম্পর্কে কোনো কোনো তাফসীরকারক বলেন, কিয়ামতে হিসাব-নিকাশের পর এ সম্বোধন হবে। আয়াতসমূহের পূর্বাপর বর্ণনার দ্বারাও এর সমর্থন হয়। কারণ পূর্বোল্লিখিত কাফেরদের আজাব কিয়ামতের পরেই হবে। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, মু'মিনদের প্রতি এ সম্বোধনও তখনই হবে। কেউ কেউ বলেন : এ সম্বোধন মৃত্যুর সময় দুনিয়াতেই হয়। অনেক হাদীসও এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। তাই ইবনে কাছীর বলেছেন : উভয় সময়েই মু'মিনদের আত্মাকে এই সম্বোধন করা হবে– মৃত্যুর সময়েও এবং কিয়ামতেও।

যেসব হাদীস থেকে মৃত্যুর সময় সম্বোধন হবে বলে জানা যায়, তন্মধ্যে একটি হচ্ছে পূর্বোল্লিখিত ওবাদা ইবনে সামেত (রা.)-এর হাদীস। অপর একটি হাদীস হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে মুসনাদে আহমদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজায় বর্ণিত আছে, যাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যখন মু'মিনের মৃত্যুর সময় আসে, তখন রহমতের ফেরেশতা সাদা রেশমী বস্ত্র সামনে রেখে তার আত্মাকে সম্বোধন করে اُخْرُجِىْ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً اِلٰى رَوْحِ اللّٰهِ وَرَيْحَانِ اللّٰهِ অর্থাৎ তুমি আল্লাহর প্রতি এবং আল্লাহ তোমার প্রতি সন্তুষ্ট– এমতাবস্থায় তুমি এ দেহে থেকে বের হয়ে আস। এই বের হওয়া হবে আল্লাহর রহমত এবং জান্নাতের চিরন্তন সুখের দিকে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন : আমি একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সামনে يٰۤاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ আয়াতখানি পাঠ করলাম। হযরত আবূ বকর (রা.) মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ ! এটা কি চমৎকার সম্বোধন ও সম্মান প্রদর্শন! রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : শুনে রাখুন, মৃত্যুর পর ফেরেশতা আপনাকে এই সম্বোধন করবে। –[ইবনে কাছীর]

কয়েকটি আশ্চর্যজনক ঘটনা : হযরত সায়ীদ ইবনে জুবায়র (রা.) বলেন : তায়েফ নগরে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর ইন্তিকাল হয়। জানাযা প্রস্তুত হওয়ার পর সেখানে একটি পাখী এসে উপস্থিত হলো যার অনুরূপ পাখী কখনো দেখা যায়নি। অতঃপর পাখীটি শবাধারে ঢুকে পড়ল। এরপর কেউ তাকে বের হতে দেখেনি। অতঃপর মৃতদেহ কবরে নামানোর সময় কবরের এক পাশ থেকে একটি অদৃশ্য কণ্ঠ يٰۤاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ –আয়াতখানি পাঠ করল। সবাই তালাশ করল কিন্তু কে পাঠ করল, তার কোনো হদিস পাওয়া গেল না। –[ইবনে কাছীর]

ইমাম হাফেজ তাবারানী 'কিতাবুল আজায়েব' গ্রন্থে ফাত্তান ইবনে রুযাইনের একটি ঘটনা উদ্ধৃত করেছেন। ফাত্তান ইবনে রুযাইন বলেন : একবার রোমদেশে আমরা বন্দী হয়ে সেখানকার বাদশাহের সামনে নীত হলাম। এই কাফের বাদশাহ্ আমাদের উপর তার ধর্ম অবলম্বন করার জন্য জোর-জবরদস্তি চালাল। সে বলল : যে কেউ আমার ধর্ম অবলম্বন করতে অস্বীকার করবে, তার গর্দান উড়িয়ে দেওয়া হবে। আমাদের মধ্যে তিন ব্যক্তি প্রাণের ভয়ে ধর্মত্যাগী হয়ে বাদশাহের ধর্ম অবলম্বন করল। চতুর্থ ব্যক্তি বাদশাহের সামনে নীত হলো। সে তার ধর্ম অবলম্বন করতে অস্বীকার করল। সেমতে তার গর্দান কেটে মস্তকটি নিকটবর্তী একটি নহরে নিক্ষেপ করা হলো। তখন মস্তকটি পানির গভীরে চলে গেল বটে কিন্তু পরক্ষণেই পানির উপর ভেসে উঠল এবং তাদের দিকে চেয়ে প্রত্যেকের নাম নিয়ে বলতে লাগল, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : يَاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِىٓ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِىْ فِىْ عِبَادِىْ وَادْخُلِىْ جَنَّتِىْ এরপর মস্তকটি আবার পানিতে ডুবে গেল।

উপস্থিত সবাই এই বিস্ময়কর ঘটনা দেখল ও শুনল। সেখানকার খ্রিস্টানরা এ ঘটনা দেখে প্রায় সবাই মুসলমান হয়ে গেল। ফলে বাদশাহের সিংহাসন কেঁপে উঠল। ধর্মত্যাগী তিন ব্যক্তি আবার মুসলমান হয়ে গেল। অতঃপর খলীফা আবূ জাফর মনসূর (র.) আমাদেরকে বাদশাহ্র কবল থেকে মুক্ত করে আনেন। –[ইবনে কাছীর]

শব্দ বিশ্লেষণ :

اَلْفَجْرِ : ইসমে ফে'ল। মাসদার। অর্থ– ফেঁটে যাওয়া, সকালের আলো প্রকাশিত হওয়া, বিদীর্ণ করে প্রবাহিত করা, গুনাহ করা। বখশিস, উদারতা, দয়া, মাল ও প্রচুর মাল। কুরআন মাজীদে এর ব্যবহার কেবল ফজরের সময় ও প্রভাত উদিত হওয়ার অর্থে হয়েছে।

لَيَالٍ : বহুবচন لَيْلٌ وَلَيْلَةٌ একবচন। রাত্রি। মূলতঃ শব্দটি لَيَالِىٌ ছিল। তা'লিল হয়ে يَاءٌ পড়ে গেছে। এখানে জিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ রাত উদ্দেশ্য। (আহমদ ও নাসাঈতে মারফূরূপে জাবের থেকে উদ্ধৃত) মুজাহিদ, ক্বাতাদাহ এবং যাহহাক প্রমুখেরও এই মত। দ্বিতীয়তঃ যাহহাকের মতে এখানে মুহাররম মাসের দশ তারিখ উদ্দেশ্য। (আ'আলিম)

اَلشَّفْعِ : জোড়া, দম্পতি, মিথুন। কোনো জিনিস তার মতোই আরেকটি জিনিসের সাথে মিলে যাওয়া। লুগাতে এ অর্থ করা হয়েছে। কিন্তু شَفْعٌ দ্বারা উদ্দেশ্য জিলহজের দশম তারিখ।

اَلْوَتْرِ : ইসম। বেজোড়। জোড়ের বিপরীত। এক কেরাতে واو এ যের দিয়ে اَلْوِتْرُ পড়া হয়। এর দ্বারা উদ্দেশ্য জিলহজের নবম তারিখ।

يَسْرِ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার سُرًى মূলবর্ণ (س - ر - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– গমন করতে থাকে। সে চলছে।

اِرَمَ : -এর তাফসীরের ক্ষেত্রে মুফাসসিরগণের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। তবে সবচেয়ে বিশুদ্ধ মতে এটি একটি গোত্রের নাম। যা প্রবীণ পুরুষ ইর্‌ম ইবনে সাম ইবনে নূহের নামে রাখা হয়েছে। এটি গাইরে মুনসারিফ। মুয়ান্নাছ হলো তার আলামত।

جَابُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার جَوْبٌ মূলবর্ণ (ج - و - ب) জিনস اجوف واوى অর্থ– তারা কাটত। বিদীর্ণ করেছে।

اَوْتَادِ : وَتَدٌ-এর বহুবচন। অর্থ– তীলক, পেরেক, খুঁটি।

طَغَوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার طُغْيَانٌ মূলবর্ণ (ط - غ - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– সীমালঙ্ঘন করেছে, নাফরমানি করেছে।

صَبَّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার صَبٌّ মূলবর্ণ (ص - ب - ب) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তিনি বর্ষন করেছেন। তিনি প্রবাহিত করলেন, তিনি উপর থেকে ঢাললেন।

سَوْطَ : চামড়ার চাবুক। এর বহুবচন سِيَاطٌ ও سَوَاطٌ আসে। سَوْطٌ-এর মূল অর্থ হলো, কোনো বস্তু একত্রে মিলে যাওয়া। চাবুককের কড়াগুলো এমনিতেই মোচড়ানো থাকে বলে একে চাবুক বলে। ইবনে দুরাইদ বলেন, যখন বেত্রাঘাত বা চাবুক মারা হয়, তখন বেত্রাঘাতের কারণে গোস্তকে রক্তের সাথে মিলিয়ে ফেলা হয়। তাই চাবুককে سَوْطٌ বলা হয়।

اِبْتَلٰهُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِبْتِلَاءٌ মূলবর্ণ (ب - ل - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তাকে পরীক্ষা করেন।

نَعَّمَهٗ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْلٌ মাসদার تَنْعِيْمٌ মূলবর্ণ (ن - ع - م) জিনস صحيح অর্থ– সম্পদ দান করেন।

قَدَرَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার قُدْرَةٌ মূলবর্ণ (ق - د - ر) জিনস صحيح অর্থ– তিনি সংকর্ণি করেদেন, কমিয়ে দেন।

أَهَانَنِ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِهَانَةٌ মূলবর্ণ (ه - و - ن) জিনস اجوف واوى অর্থ– আমার মর্যাদা ক্ষুণ্ন করেছেন।

تَحٰٓضُّوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার اَلْمُحَاضَّةُ মূলবর্ণ (ح - ض - ض) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তোমরা উৎসাহিত করো না।

تُرَاثٌ : অর্থ– মিরাস, উত্তরাধিকারী, মৃত ব্যক্তির সম্পদ। মূলতঃ শব্দটি وَارِثٌ ছিল। واو-কে تاء দ্বারা বদল করা হয়েছে।

جَمًّا : মাসদার। বাব ضَرَبَ ও نَصَرَ মাসদার আসে। মূলবর্ণ (ج - م - م) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– মন ভরে, অনেক, অত্যধিক। প্রত্যেক প্রকারের খুশি ও অতিরিক্ত বুঝানোর জন্য আসে।

دُكَّتِ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার دَكًّا মূলবর্ণ (د - ك - ك) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেওয়া হবে।

جِآْئَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْمَجِيْئُ মূলবর্ণ (ج - ى - ء) জিনস মুরাক্কাব مهموز لام এবং اجوف يائى অর্থ– আনয়ন করা হবে।

قَدَّمْتُ : সীগাহ واحد متكلم বহছ ماضى معروف বাব تفعيل মাসদার تَقْدِيْمٌ মূলবর্ণ (ق - د - م) জিনস صحيح অর্থ– পূর্বে পাঠিয়ে রাখতাম।

لَا يُعَذِّبُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع منفى معروف বাব تفعيل মাসদার تَعْذِيْبٌ মূলবর্ণ (ع - ذ - ب) জিনস صحيح অর্থ– তিনি শাস্তি দিবেন না।

لَا يُوْثِقُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع منفى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْثَاقٌ মূলবর্ণ (و - ث - ق) জিনস مثال واوى অর্থ– কেউ বন্ধন কারী হবে না।

اُدْخُلِىْ : সীগাহ واحد مؤنث حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার دُخُوْلٌ মূলবর্ণ (د - خ - ل) জিনস صحيح অর্থ– তুমি প্রবেশের কর।

رَاضِيَةً : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم فاعل বাব سَمِعَ মাসদার اَلرِّضْوَانُ মূলবর্ণ (ر - ض - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তুমি সন্তুষ্ট।

বাক্য বিশ্লেষণ :

يٰٓاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِىْٓ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِىْ فِىْ عِبٰدِىْ وَادْخُلِىْ جَنَّتِىْ : এখানে يَا হলো হরফে নেদা, আর اَيَّةُ হলো মুনাদা যা ضمه-এর উপর مبنى হয়েছে আর هاء টা تنبيه-এর জন্য। النَّفْسُ হলো بدل আর الْمُطْمَئِنَّةُ হলো النَّفْسُ-এর সিফত। আর ارْجِعِىْ ফেল, যমীর اَنْتِ ফায়েল اِلٰى رَبِّكِ টা ارْجِعِىْ-এর সাথে متعلق হয়েছে। আর رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً টা حال হয়েছে। আর فَادْخُلِىْ টা ارْجِعِىْ-এর উপর বিন্যস্ত করা হয়েছে। আর فِىْ عِبٰدِىْ টা اُدْخُلِىْ-এর সাথে متعلق হয়েছে। এবং وَادْخُلِىْ جَنَّتِىْ টাও আতফ হয়েছে। –[ই'রাবুল কুরআন ৮ম খণ্ড; পৃ. ৩১২]

سُوْرَةُ الْبَلَدِ مَكِّيَّةٌ

সূরা বালাদ

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত– ২০, রুকূ'– ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

অনুবাদ	আয়াত
১. আমি এই [মক্কা] নগরের শপথ করছি।	لَآ اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ ﴿١﴾
২. এবং আপনার জন্য এই নগরে যুদ্ধ করা বৈধ হবে।	وَاَنْتَ حِلٌّ بِهٰذَا الْبَلَدِ ﴿٢﴾
৩. আর পিতার [আদমের] এবং সন্তান সন্ততির [সমস্ত আদম সন্তানের] শপথ।	وَوَالِدٍ وَّمَا وَلَدَ ﴿٣﴾
৪. আমি মানুষকে অত্যন্ত ক্লেশের মধ্যে [ক্লেশ বিজড়িত করে] সৃষ্টি করেছি।	لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ كَبَدٍ ﴿٤﴾
৫. সে কি এমন ধারণা করে যে, তার উপর কারো ক্ষমতা চলবে না?	اَيَحْسَبُ اَنْ لَّنْ يَّقْدِرَ عَلَيْهِ اَحَدٌ ﴿٥﴾
৬. [যদি এরূপ না হয়, তবে সে কেন এমন ভ্রমে পড়ে আছে, এবং] বলছে যে, আমি এত অধিক মাল খরচ করে ফেলেছি।	يَقُوْلُ اَهْلَكْتُ مَالًا لُّبَدًا ﴿٦﴾
৭. সে কি ধারণা করে যে, তাকে কেউ দেখেনি?	اَيَحْسَبُ اَنْ لَّمْ يَرَهٗٓ اَحَدٌ ﴿٧﴾
৮. আমি কি তাকে দুটি চক্ষু প্রদান করিনি?	اَلَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ عَيْنَيْنِ ﴿٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. لَآ اُقْسِمُ আমি শপথ করছি بِهٰذَا الْبَلَدِ এই (মক্কা) নগরের।

২. وَاَنْتَ حِلٌّ আপনার জন্য যুদ্ধ করা বৈধ হবে بِهٰذَا الْبَلَدِ এই নগরে।

৩. وَوَالِدٍ আর পিতার وَّمَا وَلَدَ এবং সন্তান-সন্ততির শপথ।

৪. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি فِيْ كَبَدٍ অত্যন্ত ক্লেশের মধ্যে।

৫. اَيَحْسَبُ সে কি এমন ধারণা করে যে اَنْ لَّنْ يَّقْدِرَ ক্ষমতা চলবেনা عَلَيْهِ اَحَدٌ তার উপর কারো।

৬. يَقُوْلُ বলছে যে اَهْلَكْتُ আমি খরচ করে ফেলেছি مَالًا لُّبَدًا এত অধিক মাল।

৭. اَيَحْسَبُ সে কি এমন ধারণা করে যে اَنْ لَّمْ يَرَهٗٓ اَحَدٌ তাকে কেউ দেখেনি।

৮. اَلَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ আমি কি প্রদান করিনি عَيْنَيْنِ দুটি চক্ষু।

অনুবাদ	আয়াত
৯. এবং জিহ্বা ও দুটি ঠোঁট?	وَلِسَانًا وَّشَفَتَيْنِ (٩)
১০. আর অনন্তর আমি তাকে [নেক ও বদ] উভয় পথ প্রদর্শন করেছি [যেন সে মন্দ পথ হতে বাঁচতে পারে এবং ভালো পথে চলতে পারে।]	وَهَدَيْنٰهُ النَّجْدَيْنِ (١٠)
১১. অনন্তর সে [ধর্মের] ঘাঁটি-স্থল দিয়ে [পথ] অতিক্রম করল না।	فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ (١١)
১২. আপনার কি জানা আছে যে, ঘাটি-স্থল কী বস্তু?	وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْعَقَبَةُ (١٢)
১৩. [তা হলো] কোনো গর্দানকে [দাসত্ব হতে] মুক্ত করে দেওয়া।	فَكُّ رَقَبَةٍ (١٣)
১৪. অথবা খাদ্য দান করা অনাহার বা দুর্ভিক্ষের দিনে।	اَوْ اِطْعٰمٌ فِيْ يَوْمٍ ذِيْ مَسْغَبَةٍ (١٤)
১৫. কোনো আত্মীয় এতিমকে।	يَّتِيْمًا ذَا مَقْرَبَةٍ (١٥)
১৬. কিংবা ধুলায় লুণ্ঠিত দরিদ্রকে।	اَوْ مِسْكِيْنًا ذَا مَتْرَبَةٍ (١٦)
১৭. অতঃপর ঐ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়নি যারা ঈমান এনেছে এবং একে অন্যকে [ঈমানের উপর] ধৈর্যধারণের উপদেশ দিয়েছে এবং একে অন্যকে [আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি] সদয় হতে উপদেশ দিয়েছে।	ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ (١٧)

শাব্দিক অনুবাদ :

৯. وَلِسَانًا এবং জিহবা وَّشَفَتَيْنِ ও দুটি ঠোঁট।

১০. وَهَدَيْنٰهُ আর অনন্তর আমি তাকে প্রদর্শন করেছি النَّجْدَيْنِ উভয় পথ।

১১. فَلَا اقْتَحَمَ অনন্তর সে অতিক্রম করল না الْعَقَبَةَ ঘাটি-স্থল দিয়ে।

১২. وَمَآ اَدْرٰىكَ আপনার কি জানা আছে যে مَا الْعَقَبَةُ ঘাটি-স্থল কি বস্তু?

১৩. فَكُّ رَقَبَةٍ কোন গর্দানকে মুক্ত করে দেওয়া।

১৪. اَوْ اِطْعٰمٌ অথবা খাদ্য দান করা فِيْ يَوْمٍ ذِيْ مَسْغَبَةٍ অনাহারের দিনে।

১৫. يَّتِيْمًا ذَا مَقْرَبَةٍ কোন আত্মীয় এতিমকে।

১৬. اَوْ مِسْكِيْنًا কিংবা দরিদ্রকে ذَا مَتْرَبَةٍ ধুলায় লুণ্ঠিত।

১৭. ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا অতঃপর ঐ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়নি যারা ঈমান এনেছে وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ এবং একে অন্যকে ধৈর্য ধারণের উপদেশ দিয়েছে وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ এবং একে অন্যকে সদয় হতে উপদেশ দিয়েছে।

১৮. তারাই ডান দিকওয়ালা [সৌভাগ্যশীল]।

১৯. আর যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করল তারাই বাম দিকওয়ালা [হতভাগ্য]।

২০. [তাদের পরিণাম এই হবে যে,] তাদের উপর অগ্নি পরিবেষ্টিত হবে যা অবরুদ্ধ করে দেওয়া হবে।

শাব্দিক অনুবাদ :

১৮. أُولَٰئِكَ এরাই أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ডান দিক ওয়ালা।

১৯. وَالَّذِينَ كَفَرُوا আর যারা অস্বীকার করল بِآيَاتِنَا আমার আয়াতসমূহকে هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ তারাই বামদিক ওয়ালা।

২০. عَلَيْهِمْ نَارٌ তাদের উপর অগ্নি পরিবেষ্টিত হবে مُؤْصَدَةٌ যা অবরুদ্ধ করে দেওয়া হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : সূরার প্রথম আয়াত لَا أُقْسِمُ بِهَٰذَا الْبَلَدِ শব্দটিকে এর নামরূপে নির্দিষ্ট করা হয়েছে এতে ২০টি আয়াত, ৮২টি বাক্য এবং ৩২০টি অক্ষর রয়েছে।

সূরাটি অবতীর্ণ হওয়ার সময়কাল : বিষয়বস্তু হতে প্রতীয়মান হয় যে, এ সূরাটি মাক্কী জীবনের প্রথম দিকে নাজিল হয়েছে। তা ছাড়া এমন সময় এটা নাজিল হয়েছিল বলে বুঝা যায় যখন নবী করীম ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের উপর অকথ্য নির্যাতন শুরু হয়েছিল।

সূরাটির শানে নুযূল :

১. আবুল আসাদ ইবনে কালাদাহ যাহমী কুরইশদের মধ্যে সর্বাধিক শক্তিশালী বীর ছিল। তার গায়ে এত শক্তি ছিল যে, সে একটি আস্ত চামড়া পায়ের নিচে রেখে লোকদেরকে তা টেনে বের করার জন্য আহ্বান জানাত। লোকেরা তা টেনে হেঁচড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলত, তথাপি এটা তার পায়ের নিচে হতে বের হতো না।
নবী করীম ﷺ যখন তাকে তাওহীদের দাওয়াত দিলেন তখন সে তাঁর সাথে দুর্ব্যবহার করল এবং বলল, হে মুহাম্মদ ﷺ! তুমি আমাকে যে জাহান্নামের ভয় দেখাও তার উনিশজন প্রহরীকে শায়েস্তা করার জন্য আমার বাম হাতই যথেষ্ট। আর তুমি যে জান্নাতের লোভ দেখাচ্ছ, আমি বিবাহ করে ও মেহমানদারী করে যে সম্পদ উড়িয়ে দিয়েছি তা তার সমানও তো হবে না। তার অনুরূপ বক্তব্যের ব্যাপারে আলোচ্য সূরাটি অবতীর্ণ হয়েছে।
২. কেউ কেউ বলেছেন, ওয়ালদি ইবনে মুগীরার ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের প্রেক্ষিতে এ সূরাটি নাজিল হয়েছে।
৩. কারো কারো মতে, আবূ জাহলের বর্বরোচিত ব্যবহারের পরিপ্রেক্ষিতে এ সূরাটি অবতীর্ণ হয়েছে।
৪. কেউ কেউ বলেন, এটা হারিছ ইবনে আমেরের ব্যাপারে নাজিল হয়েছে।
৫. কোনো কোনো মুফাসসিরের মতে, ইরামবাসী আদ ও ছামূদ জাতির ধ্বংসের বিবরণ শোনার পর নবী করীম ﷺ-কে মক্কার মুশরিকরা বলল, তুমি তোমার আল্লাহকে বল, তিনি যেন আমাদের উপরও 'আদ ও ছামূদ জাতির ন্যায় আজাব নাজিল করে এ শহরসহ আমাদেরকেও ধ্বংস করে দেন। তাদের এ ধৃষ্টতাপূর্ণ বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য সূরাটি নাজিল হয়েছে।

সূরাটির বিষয়বস্তু ও সারকথা : এটা মক্কায় অবতীর্ণ প্রাথমিক প্রত্যাদেশসমূহের অন্যতম এবং অনেকের মতে নবী করীম ﷺ-এর নবুয়তের প্রথম বছরই এ সূরা অবতীর্ণ হয়েছিল। আলোচ্য সূরার দ্বিতীয় আয়াতে নবী করীম ﷺ-এর মক্কা বিজয়ের সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী এ সূরার সর্বপ্রধান বিশেষত্ব। এ সূরায় বহুলাংশে সৎকর্মের আলোচনা করা হয়েছে। সূরার প্রথমাংশে ভূমিকা স্বরূপ সৎকর্মের তথা দুঃখ-কষ্টের এবং মানুষের উপর আল্লাহর দানের উল্লেখ করা হয়েছে। আর পরিশিষ্টে দুষ্কর্ম ও সৎকর্মের প্রতিফলের উল্লেখ রয়েছে।

এ সূরাতে একটি অনেক বড় বক্তব্যকে কয়েকটি সংক্ষিপ্ত বাক্যের মধ্যে সন্নিবেশিত করে দেওয়া হয়েছে। একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন দর্শন এ ক্ষুদ্রকায় সূরাটির মধ্যে অতীব মর্মস্পর্শী ভঙ্গিতে বিবৃত হয়েছে। দুনিয়াতে মানুষ ও মানুষের জন্য দুনিয়ার সঠিক মর্যাদা বা হিসাবটা কি তা বুঝানোই হলো এ সূরার মূল বিষয়বস্তু। বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষের

সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য লাভের দু'টি পথই খুলে দিয়েছেন। আর সে পথে চলার উপায়-উপকরণও দিয়েছেন। মানুষ কল্যাণের পথে চলে শুভ পরিণতি লাভ করবে, না অকল্যাণের পথে চলে অশুভ পরিণতি লাভ করবে, তা তার নিজের চেষ্টার উপর নির্ভর করে। এ দুনিয়া মানুষের জন্য কোনো নিশ্চিত বিশ্রামের স্থান নয়; বরং কঠোর পরিশ্রম করে পরকালের জন্য কিছু উপার্জনের স্থান। এ সত্যটি প্রমাণ করার জন্য সূরার প্রথমে মক্কা নগরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর উপর আপতিত বিপদাপদ এবং গোটা আদম সন্তানের সঠিক অবস্থা পেশ করা হয়েছে।

অতঃপর মানুষের একটা ভুল ধারণা দূর করা হয়েছে। মানুষ মনে করে যে, সে যা কিছু নিশ্চিন্তে করছে তার কোনো হিসাব-নিকাশ গ্রহণ করা হবে না। তার উপর কোনো শক্তিমান ক্ষমতা প্রয়োগ করবে না, কোন পথে অর্থ উপার্জন করল আর কোন পথে ব্যয় করল তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হবে না।

মহান আল্লাহ আরও বলেন, আমি মানুষকে উপলব্ধি করার পন্থা ও যোগ্যতা দিয়েছি। সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য উভয় পথই তার জন্য উন্মুক্ত রয়েছে– সৌভাগ্যের পথ কণ্টকাকীর্ণ ও দুর্গম, আর দুর্ভাগ্যের পথ মোহময় ও আকর্ষণীয়। মানুষ স্বাভাবিক দুর্বলতার কারণে দুর্ভাগ্যের পথকে বেছে নেয় এবং শেষ পর্যন্ত অধঃপতিত হয়।

উপসংহারে আল্লাহ তা'আলা সৌভাগ্যমণ্ডিত উচ্চতর পথ নির্দেশ করেছেন। লোক দেখানো কার্যকলাপ ও অহংকারমূলক অর্থ ব্যয় পরিহার করে এতিম-মিসকিনের সাহায্যে অর্থ ব্যয় করা এবং ঈমানদার লোকদের দলে শামিল হয়ে আল্লাহর নির্দেশিত পথে ধৈর্য সহকারে সমাজ গঠন করাই সৌভাগ্যের পথ। আর এর বিপরীতটা হলো দুর্ভাগ্য বা জাহান্নামের পথ।

لَا أُقْسِمُ بِهَٰذَا الْبَلَدِ [١] وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ [٢]

শানে নুযূল : ইবনে মারদুভিয়া হযরত ইবনে আবী বারযা আসলমী (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি মক্কা বিজয়কালে বের হয়ে আব্দুল্লাহ বিন খাতালকে কা'বা গৃহের গেলাফে লুকিয়ে থাকতে দেখতে পেলাম, তখন রুকনে ইয়ামানী ও মাকামে ইবরাহীমের মধ্যখানে তার মাথায় আঘাত করি। সেই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমার সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[দুররে মানছুর ৩৫১/৬]

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ [٤] أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ [٥]

শানে নুযূল : আল্লামা কালবী (র.) বলেন যে, আলোচ্য আয়াত বনূ জুমাহা গোত্রের এক লোক সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। তার নাম হচ্ছে আবুল আশাদ্দীন। সে উকাযী চামড়া সংগ্রহ করে তার পদ দ্বয়ের নিচে রেখে বলল যে, তা হতে স্থানান্তর করতে পারে এমন কেউ আছে কী? যদি থাকে তাকে অমুক পুরস্কার দেওয়া হবে। তখন তাকে দশজন লোক টেনে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে। তবে তার পা দু'টিকে নাড়াতে পারেনি। পক্ষান্তরে সে ছিল হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরম শত্রু। সেই নরাধম সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতদ্বয় নাজিল করেন। –[কুরতুবী ৫৭/২০]

لَا أُقْسِمُ بِهَٰذَا الْبَلَدِ : এখানে لا অক্ষরটি অতিরিক্ত এবং আরবি বাকপদ্ধতিতে এর অতিরিক্ত ব্যবহার সুবিদিত। অধিক বিশুদ্ধ উক্তি এই যে, প্রতিপক্ষের ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডন করার জন্য এই لا শপথ বাক্যের শুরুতে ব্যবহৃত হয়। উদ্দেশ্য এই যে, এটা কেবল তোমার ধারণা নয়; বরং আমি শপথ সহকারে যা বলছি, তাই বাস্তব সত্য। الْبَلَد (নগরী) বলে এখানে মক্কা নগরীকে বোঝানো হয়েছে। সূরা ত্বীনেও এমনিভাবে মক্কা নগরীর শপথ করা হয়েছে এবং তৎসঙ্গে أَمِين বিশেষণও উল্লেখ করা হয়েছে।

মক্কা নগরীর শপথ এ কথা জ্ঞাপন করে যে, অন্যান্য নগরীর তুলনায় এটা অভিজাত ও সেরা নগরী। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আ'দী (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরতের সময় মক্কা নগরীকে সম্বোধন করে বলেছিলেন : আল্লাহর কসম, তুমি গোটা ভূপৃষ্ঠে আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়। আমাকে যদি এখান থেকে বের হতে বাধ্য করা না হতো, তবে আমি তোমাকে পরিত্যাগ করতাম না। –[মাযহারী]

وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ : حِلٌّ শব্দের দুটি অর্থ হতে পারে–এক. এটা حُلُول থেকে উদ্ভূত। অর্থ কোনো কিছুতে অবস্থান নেওয়া, থাকা ও অবতরণ করা। অতএব, حِلٌّ -এর অর্থ হবে অবস্থানকারী, বসবাসকারী। আয়াতের মর্মার্থ এই যে, মক্কা নগরী নিজেও সম্মানিত ও পবিত্র; বিশেষত আপনিও এ নগরীতে বসবাস করেন। বসবাসকারীর শ্রেষ্ঠত্বের দরুনও বাসস্থানের শ্রেষ্ঠত্ব বেড়ে যায়। কাজেই আপনার বসবাসের কারণে এ নগরীর মাহাত্ম্য ও সম্মান দ্বিগুণ হয়ে গেছে। দুই. এটা حِلَّتْ থেকে উদ্ভূত। অর্থ হালাল হওয়া। এ দিক দিয়ে এক অর্থ এই যে, আপনাকে মক্কার কাফেররা হালাল মনে করে রেখেছে এবং আপনাকে হত্যা করার ফিকিরে রয়েছে অথচ তারা নিজেরাও মক্কা নগরীতে কোনো শিকারকেই হালাল মনে করে না। এমতাবস্থায় তাদের জুলুম ও অবাধ্যতা কতটুকু যে, তারা আল্লাহর রাসূলের হত্যাকে হালাল মনে করে দিয়েছে! অপর অর্থ এই যে, আপনার জন্য মক্কার হেরেমে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হালাল করে দেওয়া হবে। বস্তুত মক্কা বিজয়ের সময় একদিনের জন্য তাই করা হয়েছিল। মাযহারীতে সম্ভাব্য তিনটি অর্থই উল্লেখ করা হয়েছে।

وَوَالِدٍ وَّمَا وَلَدَ : এখানে وَالِدٌ বলে মানব পিতা হযরত আদম (আ.) আর مَا وَلَدَ বলে বনী-আদমকে বোঝানো হয়েছে। এভাবে এতে হযরত আদম (আ.) ও দুনিয়ার আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সব বনী-আদমের শপথ করা হয়েছে। অতঃপর শপথের জবাবে বলা হয়েছে :

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِىْ كَبَدٍ : كَبَدٌ-এর শাব্দিক অর্থ শ্রম ও কষ্ট। অর্থাৎ মানুষ সৃষ্টিগতভাবে আজীবন শ্রম ও কষ্টের মধ্যে থাকে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন : মানুষ গর্ভাশয়ে আবদ্ধ থাকে; জন্মলগ্নে শ্রম ও কষ্ট স্বীকার করে, এরপর আসে জননীর দুগ্ধ পান করার ও তা ছাড়ানোর শ্রম। অতঃপর জীবিকা ও জীবনোপকরণ সংগ্রহের কষ্ট, বার্ধক্যের কষ্ট, মৃত্যু, কবর ও হাশর এবং তাতে আল্লাহর সামনে জবাবদিহি, প্রতিদান ও শাস্তি– এসমুদয় শ্রমের বিভিন্ন পর্যায়, যা মানুষের উপর দিয়ে অতিবাহিত হয়। এ শ্রম ও কষ্ট শুধু মানুষেরই বিশেষ বৈশিষ্ট্য নয়, অন্যান্য জীব-জানোয়ারও এতে শরিক রয়েছে। কিন্তু এখানে মানুষের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, প্রথমত মানুষ সব জীব-জানোয়ার অপেক্ষা অধিক চেতনা ও উপলব্ধির অধিকারী। পরিশ্রমের কষ্ট চেতনাভেদে কম-বেশি হয়ে থাকে। দ্বিতীয়ত সর্বশেষ ও সর্ববৃহৎ শ্রম হচ্ছে হাশরের মাঠে পুনরুজ্জীবিত হয়ে সারা জীবনের কাজকর্মের হিসাব দেওয়া। এটা অন্য জীব-জানোয়াররের বেলায় নেই। কোনো কোনো আলিম বলেন : মানুষের ন্যায় অন্য কোনো সৃষ্টজীব কষ্ট সহ্য করে না অথচ সে শরীর ও দেহাবয়বে অধিকাংশ জীবের তুলনায় দুর্বল। কিন্তু মানুষের মস্তিষ্কশক্তি অত্যন্ত বেশি। একারণেই বিশেষভাবে মানুষের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মক্কা মুকাররমা, আদম ও বনী-আদমের শপথ করে আল্লাহ তা'আলা এ সত্যটি বর্ণনা করেছেন যে, আমি মানুষকে কষ্ট ও শ্রমনির্ভরশীলরূপেই সৃষ্টি করেছি। এটা এ বিষয়ের প্রমাণ যে, মানুষ আপনাআপনি সৃজিত হয়নি অথবা অন্য কোনো মানুষ তাকে জন্ম দেয়নি বরং তার সৃষ্টিকর্তা এক সর্বশক্তিমান, যিনি প্রত্যেক সৃষ্টজীবকে বিশেষ বিশেষ স্বভাব ও বিশেষ ক্রিয়াকর্মের যোগ্যতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। মানব-সৃষ্টিতে যদি মানবের কোনো প্রভাব থাকত, তবে সে নিজের জন্য কখনও এরূপ শ্রম ও কষ্ট পছন্দ করত না। –[কুরতুবী]

কষ্ট স্বীকারে জন্য মানুষের প্রস্তুত থাকা উচিত : এ শপথ ও তার জবাবে মানুষকে বলা হয়েছে যে, তোমরা দুনিয়াতে অনাবিল সুখই কামনা কর এবং কোনো কষ্টের সম্মুখীন হতে চাও না, তোমাদেরই এই কামনা একটি দুঃস্বপ্ন, যা কোনোদিন বাস্তব রূপ লাভ করবে না। তাই দুনিয়াতে প্রত্যেকের দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হওয়া অপরিহার্য। অতএব যখন শ্রম ও কষ্ট করতেই হবে, তখন বুদ্ধিমানের কাজ হলো, এমন বিষয়ে কষ্ট করা, যা চিরকাল কাজে লাগবে এবং চিরস্থায়ী সুখের নিশ্চিয়তা দেবে। বলা বাহুল্য, এটা কেবল ঈমান ও আল্লাহর আনুগত্যের মাঝেই সীমাবদ্ধ। অতঃপর পরকালে অবিশ্বাসী মানুষের কতিপয় মূর্খতাসুলভ অভ্যাস বর্ণনা করে বলা হয়েছে : اَيَحْسَبُ اَنْ لَّمْ يَرَهٗۤ اَحَدٌ –অর্থাৎ এই বোকা কি মনে করে যে, তার দুষ্কর্মসমূহ কেউ দেখেনি? তার জানা উচিত যে, তার স্রষ্টা সবকিছুই দেখেছেন।

চক্ষু ও জিহ্বা সৃষ্টির কয়েকটি রহস্য : اَلَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَّشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنٰهُ النَّجْدَيْنِ : نَجْدَيْنِ শব্দটি نَجْدٌ-এর দ্বিবচন। এর শাব্দিক অর্থ উর্ধ্বগামী পথ। এখানে প্রকাশ পথ বোঝানো হয়েছে। এর পথ দু'টির একটি হচ্ছে সৌভাগ্য সাফল্যের পথ এবং অপরটি হচ্ছে অনিষ্ট ও ধ্বংসের পথ।

পূর্ববর্তী আয়াতে মানুষকে সতর্ক করা হয়েছিল যে, সে মনে করে যে, তার উপর আল্লাহ তা'আলারও কোনো ক্ষমতা নেই এবং তার দুষ্কর্মসমূহ কেউ দেখে না। আলোচ্য আয়াতে এমন কতিপয় নিয়ামতের কথা বর্ণিত হয়েছে, যেগুলোর কারিগরি নৈপুণ্য ও রহস্য সম্পর্কে চিন্তা করলে আল্লাহ তা'আলার অতুলনীয় হিকমত ও কুদরত এর মধ্যেই নিরীক্ষণ করা যায়। এ প্রসঙ্গে প্রথম চক্ষুদ্বয়ের উল্লেখ করা হয়েছে। চোখের নাজুক শিরা-উপশিরা, তার অবস্থান ও আকার সব মিলে এটা খুবই নাজুক অঙ্গ। এর হেফাজতের ব্যবস্থা এর সৃষ্টির পরিধির মধ্যেই করা হয়েছে। এর উপরে এমন পর্দা রাখা হয়েছে, যা স্বয়ংক্রিয় মেশিনের মতো কোনো ক্ষতিকর বস্তু সামনে আসতে দেখলেই আপনাআপনি বন্ধ হয়ে যায়। এই পর্দার উপরে ধূলোবালি প্রতিরোধ করার জন্য পশম স্থাপন করা হয়েছে। মাথার দিক থেকে পতিত বস্তু যাতে সরাসরি চোখে পড়তে না পারে, সেজন্য ভ্রূর চুল রাখা হয়েছে। মুখমণ্ডলের মধ্যে চক্ষুকে এমনভাবে স্থাপন করা হয়েছে যে, উপরে ভ্রূর শক্ত হাড় এবং নিচে গণ্ডদলের শক্ত হাড় রয়েছে। ফলে মানুষ যদি কোথাও উপুড় হয়ে পড়ে যায় কিংবা মুখমণ্ডলে কোনো কিছু পড়ে, তবে উপর নিচের শক্ত অস্থিদ্বয় চক্ষুকে অনায়াসে রক্ষা করতে পারে।

দ্বিতীয় নিয়ামত হচ্ছে জিহ্বা। এর কারিগরিও বিস্ময়কর। এই রহস্যঘন স্বয়ংক্রিয় মেশিনের মাধ্যমে মনের ভাব ব্যক্ত করা হয়। এর বিস্ময়কর কর্মপদ্ধতি লক্ষ্য করুন- মনের মাঝে কোনো একটি বিষয়বস্তু উঁকি দিল, মস্তিষ্ক সে সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করল এবং এর জন্য ভাষা তৈরি করল। অতঃপর সে ভাষা জিহ্বার মেশিন দিয়ে বের হতে লাগল। এই দীর্ঘ কাজটি অতি দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হয়। ফলে শ্রোতা অনুভবও করতে পারে না যে, কতগুলো মেশিনারী কর্মরত হওয়ার পর এই ভাষাগুলো জিহ্বায় এসেছে। জিহ্বার কাজে ওষ্ঠ খুব সহায়ক বিধায় এর সাথে ওষ্ঠেরও উল্লেখ করা হয়েছে। ওষ্ঠই

আওয়াজ ও অক্ষরকে স্বতন্ত্র রূপ দান করে। আরও একটি কারণ সম্ভবত এই যে, আল্লাহ তা'আলা জিহ্বাকে একটি দ্রুত কর্মসম্পাদনকারী মেশিন করেছেন। ফলে অর্ধ মিনিটের মধ্যে তার দ্বারা এমন কথা বলা যায় যা, তাকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে পৌঁছিয়ে দেয়। যেমন, ঈমানের কলেমা। অথবা দুনিয়াতে শত্রুর কাছেও প্রিয় করে দেয়। যেমন, বিগত অন্যায় ক্ষমা করা। এই জিহ্বা দ্বারাই ততটুকু সময়ে এমন কথাও বলা যায়, যা তাকে জাহান্নামে পৌঁছে দেয়। যেমন, কুফরের কালেমা। অথবা দুনিয়াতে তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুকেও তার শত্রুতে পরিণত করে দেয়। যেমন, গালিগালাজ ইত্যাদি। জিহ্বার উপকারিতা যেমন অসংখ্য, তেমনি এর ধ্বংসকারিতাও অগণিত। এটা যেন এক তরবারি, যা শত্রুর গর্দানও উড়াতে পারে এবং স্বয়ং তার গলাও বিচ্ছিন্ন করতে পারে। তাই আল্লাহ তা'আলা এ তরবারিকে ওষ্ঠদ্বয়ের চাদর দ্বারা আবৃত করে দিয়েছেন। এ স্থলে ওষ্ঠদ্বয়ের উল্লেখ করার মধ্যে এরূপ ইঙ্গিতও থাকতে পারে যে, যে প্রভু মানুষকে জিহ্বা দিয়েছেন, তিনি তা বন্ধ রাখার জন্য ওষ্ঠও দিয়েছেন। তাই একে বুঝে- সুঝে ব্যবহার করতে হবে এবং অস্থলে একে ওষ্ঠদ্বয়ের কোষ থেকে বের করা যাবে না। তৃতীয় নিয়ামত পথপ্রদর্শন করা দু'রকম। আল্লাহ তা'আলা ভালো ও মন্দের পরিচয়ের জন্য মানুষের মধ্যে এক প্রকার যোগ্যতা নিহিত রেখেছেন। যেমন এক আয়াতে আছে فَأَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا অর্থাৎ মানুষের নফসের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা পাপাচার ও সদাচারের উপকরণ রেখে দিয়েছেন। এভাবে একটি প্রাথমিক পথ প্রদর্শন মানুষ তার বিবেকের কাছ থেকেই পায়। অতঃপর এর সমর্থনে পয়গম্বরগণ ও ঐশী কিতাব আগমন করে। সারকথা এই যে, গাফিল ও অবিশ্বাসী মানুষ যদি তার নিজের অস্তিত্বের কয়েকটি দেদীপ্যমান বিষয় সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে, তবে সে আল্লাহর কুদরত ও হিকমত চাক্ষুষ দেখতে পাবে। চোখে দেখ, মুখে স্বীকার কর এবং পথ দু'টির মধ্য থেকে মঙ্গলজনক পথ অবলম্বন কর। অতঃপর আবার গাফিল মানুষকে হুঁশিয়ার করে বলা হয়েছে– এসব উজ্জ্বল প্রমাণ দ্বারা আল্লাহর কুদরত, কিয়ামতে পুনরুজ্জীবন ও হিসাব-নিকাশের নিশ্চিত বিশ্বাস হওয়া উচিত ছিল এবং এ বিশ্বাসের ফলেই সৃষ্টজীবের উপকার করা, তাদের অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষা করা, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা, নিজের সংশোধন করা এবং অপরের সংশোধনের চিন্তা করা দরকার ছিল, যাতে কিয়ামতে সে 'আসহাবে-ইয়ামীন' তথা জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেত। কিন্তু হতভাগ্য মানুষ তা করেনি বরং কুফরকেই আঁকড়ে রয়েছে, যার পরিণাম জাহান্নামের আগুন। সূরার শেষ অবধি এ বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। এতে কতিপয় সৎ কর্ম অবলম্বন না করার বিষয়কে বিশেষ ভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে।

فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ : عَقَبَةٌ বলা হয় পাহাড়ের বিরাট প্রস্তর খণ্ডকে এবং দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী গিরিপথ তথা মাটিকে। শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার কাজে এ মাটি মানুষকে সহায়তা করে। পাহাড়ের শীর্ষদেশে আরোহণ করে আত্মরক্ষা করা যায় অথবা মাটিতে প্রবেশ করে অন্যত্র চলে যাওয়া যায়। এস্থলে আল্লাহর ইবাদতকে একটি মাটি রূপে ব্যক্ত করা হয়েছে। মাটি যেমন শত্রুর কবল থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায়, সৎকর্মও তেমনি পরকালের আজাব থেকে মানুষকে রক্ষা করে। এসব সৎ কর্মের মধ্যে প্রথমে فَكُّ رَقَبَةٍ অর্থাৎ দাসমুক্ত করার কথা বলা হয়েছে। এটা খুব বড় ইবাদত এবং একজন মানুষের জীবন সুসংহত করার নামান্তর। দ্বিতীয় সৎ কর্ম হচ্ছে ক্ষুধার্তকে অন্নদান। যে কাউকে অন্নদান করা ছওয়াবমুক্ত নয় কিন্তু কোনো কোনো বিশেষ শ্রেণির লোককে অন্ন দান করলে তা আরও বিরাট ছওয়াবের কাজ হয়ে যায়। তাই বলা হয়েছে :

يَتِيْمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِيْنًا ذَا مَتْرَبَةٍ : অর্থাৎ বিশেষভাবে যদি আত্মীয় এতিমকে অন্নদান করা হয়, তবে তাতে দ্বিগুণ ছওয়াব হয়। এক. ক্ষুধার্তের ক্ষুধা দূর করার ছওয়াব এবং দুই. আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা ও তার হক আদায় করার ছওয়াব। فِيْ يَوْمٍ ذِيْ مَسْغَبَةٍ –অর্থাৎ বিশেষভাবে ক্ষুধার দিনে তাকে অন্ন দান করা অধিক ছওয়াবের কারণ হয়ে যায়। এমনিভাবে ধূলায় লুণ্ঠিত মিসকিন অর্থাৎ নিরতিশয় নিঃস্ব ব্যক্তিকে অন্নদান করাও অধিক ছওয়াবের কাজ। এরূপ ব্যক্তি যত বেশি অভাবী হবে, অন্নদাতার ছওয়াবও ততই বৃদ্ধি পাবে।

অপরকেও সৎ কাজের নির্দেশ দেওয়া ঈমানের দাবি : ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ এ আয়াতে ঈমানের পর মু'মিনের এই কর্তব্য ব্যক্ত করা হয়েছে যে, সে অপরাপর মুসলমান ভাইকে সবর ও অনুকম্পার উপদেশ দেবে। সবরের অর্থ নিজেকে মন্দ কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখা ও সৎ কর্ম সম্পাদন করা। مرحمة -এর অর্থ অপরের প্রতি দয়ার্দ্র হওয়া। অপরের কষ্টকে নিজের কষ্ট মনে করে তাকে কষ্টদান ও জুলুম করা থেকে বিরত হওয়া। এতে দীনের প্রায় সব নির্দেশই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

أُقْسِمُ : সীগাহ واحد متكلم বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِقْسَامٌ মূলবর্ণ (ق - س - م) জিনস صحيح অর্থ– আমি শপথ করছি।

حِلٌّ : মাসদার। বাবে ضَرَبَ; অর্থ– হালাল হওয়া। আর حَلَالٌ শব্দটি এ বাবের মাসদার আসে।

وَلَدَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার وِلَادَةٌ মূলবর্ণ (و - ل - د) জিনস مثال واوى অর্থ– সন্তান সন্ততি। সে প্রসব করেছে। পিতা হয়েছে।

كَبَدٌ : ইসম। অর্থ– কষ্ট, ক্লেশ। কঠিন, কঠোর। كَبْدٌ ,كَبَدٌ ,كَبِدٌ কলিজা। كِبَادٌ وَكُبُودٌ وَاَكْبَادٌ আন্তরিক হওয়া। كَبْدٌ অন্তরে মারা। বাব نَصَرَ، ضَرَبَ আর كَبَدٌ অন্তরে দরদ হওয়া। বাব : سَمِعَ

لُبَدًا : প্রচুর সম্পদ। لَابِدٌ ও لُبَدٌ এরও এই উদ্দেশ্য। মূলতঃ لِبَدَةٌ ও لِبَدٌ এবং لِبَدَةٌ-এর অর্থ হলো, জট বাঁধা চুল বা পশম, বিপুল সম্পদ। বেশি ব্যবহৃত হওয়ায় শব্দটি বিপুল সম্পদের অর্থে আসে। এত বেশি যে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে।

شَفَتَيْنِ : দ্বিবচন, দু'ঠোট। একবচন شَفَةٌ। কারো নিকট এটি মূলতঃ شَفْوَةٌ ছিল। واو-কে বিলুপ্ত করে তার যবরকে পূর্বক্ষরকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর شَفْوَةٌ-এর বহুবচন شَفَوَاتٌ ও شِفَاةٌ।

نَجْدَيْنِ : ইসম, দ্বিচন। একবচন اَلنَّجْدُ অর্থ দুই রাস্তা অর্থাৎ ভালোর রাস্তা ও খারাপের রাস্তা। এর বহুবচন اَنْجُدٌ، نُجُودٌ، اَنْجَادٌ আসে। উঁচুভূমি। স্পষ্ট ও আলোকিত পথ। গৃহসজ্জার আসবাবপত্র। দক্ষ পরিচালক বা পথপ্রদর্শক। চিন্তা, প্রাধান্য, চাপ প্রয়োগ। মাসদার نَجْدٌ বাব نَصَرَ জারি হওয়া, চালু হওয়া। রাস্তা আলোকিত হওয়া, প্রাধান্য পাওয়া, نَجْدٌ মাসদার। বাবে– سَمِعَ ক্লান্ত হয়ে যাওয়া, আত্মহারা হওয়া, জ্ঞানশূন্য হওয়া।

اِقْتَحَمَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِقْتِحَامٌ মূলবর্ণ (ق - ح - م) জিনস صحيح অর্থ– সে অতিক্রম করল।

عَقَبَةٌ : ঘাঁটি। বহুবচন عُقَبٌ ও عِقَابٌ পাহাড়ে আরোহণ করতে যে বন্ধুর বা কঠিন রাস্তা থাকে, তাকে عَقَبَةٌ বলা হয়।

مَسْغَبَةٌ : ইসম, মাসদার سَغْبٌ - سَغَابَةٌ এবং سُغُوبَةٌ، مَسْغَبَةٌ : বাবে نَصَرَ ও سَمِعَ মূলবর্ণ (س - غ - ب) জিনস صحيح অর্থ– ক্ষুধা, ক্ষুধার্ত হওয়া।

مَتْرَبَةٍ : ইসম। বাবে سَمِعَ মাসদার اَتْرَابًا - تَرَبًا - تَرْبٌ মুখাপেক্ষী হয়েছে। মূলবর্ণ (ت - ر - ب) জিনস صحيح অর্থ– নিঃস্ব, অসহায়, যার কিছুই নাই। মাটি ধূলা।

تَوَاصَوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفَاعُلٌ মাসদার تَوَاصٌّ মূলবর্ণ (و - ص - ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– একে অন্যকে উপদেশ দিয়েছে।

مَيْمَنَةٌ : ইসম। সোজা হাত, ডান পার্শ, ডান দিক। اَصْحَابُ الْيَمِيْنِ দ্বারা উদ্দেশ্য ডান দিকের লোক অর্থাৎ সৌভাগ্যশালী। (রাগেব) আরবরা বাম হাতকে شُوْمِىٌّ অর্থাৎ অমঙ্গল বলত। আর সোজা তথা ডান হাতকে বরকতময় বা সৌভাগ্যের প্রতীক মনে করত। তাই ডান পার্শ্বের লোকদেরকে সৌভাগ্যশালী ভাবা হয়।

مَشْئَمَةٌ : ইসম। অর্থ– বাম দিক। (জালালাইন) شُوْمِىٌّ বাম দিক, শাম দেশ কা'বা হতে বাম দিকে অবস্থিত। شُؤْمٌ খারাপের চিহ্ন বা আলামত।

مُؤْصَدَةٌ : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم مفعول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْصَادٌ মূলবর্ণ (ء - ص - د) জিনস مهموز فاء অর্থ– অবরুদ্ধ করে দেওয়া হবে। অবরুদ্ধ।

বাক্য বিশ্লেষণ :

اُولٰئِكَ اَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا هُمْ اَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ - عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةٌ : এখানে اُولٰئِكَ মুবতাদা اَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ হলো খবর। আর واو হরফে আতফ اَلَّذِيْنَ মুবতাদা كَفَرُوْا বাক্যটি সেলাহ। আর بِاٰيٰتِنَا হলো كَفَرُوْا-এর সাথে متعلق; আর هُمْ হলো মুবতাদা اَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ হলো খবর। আর هُمْ اَصْحَابُ الْمَشْئَمَةِ বাক্যটি اَلَّذِيْنَ মুবতাদার খবর হয়েছে। আর عَلَيْهِمْ হলো خبر مقدم আর نَارٌ হলো متبدا موخر আর مُّؤْصَدَةٌ হলো نَارٌ-এর সিফাত। আর পূর্ণ বাক্যটি দ্বিতীয় খবর। কিংবা جمله استينافية –[ই'রাবুল কুরআন ৮ম খণ্ড; পৃ. ৩২৪]

سُوْرَةُ الشَّمْسِ مَكِّيَّةٌ

সূরা শামস

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত– ১৫, রুকূ'–১

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

অনুবাদ	আয়াত
১. শপথ সূর্য ও তার আলোকের।	وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا ﴿١﴾
২. আর শপথ চন্দ্রের, যখন [তা] সূর্যের পশ্চাতে আসে।	وَالْقَمَرِ اِذَا تَلٰهَا ﴿٢﴾
৩. আর শপথ দিবসের, যখন তা তাকে ভালোরূপে আলোকিত করে।	وَالنَّهَارِ اِذَا جَلّٰهَا ﴿٣﴾
৪. আর শপথ রাত্রির, যখন এটা তাকে সমাচ্ছন্ন করে।	وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰهَا ﴿٤﴾
৫. আর শপথ আসমানের এবং যিনি এটাকে নির্মাণ করেছেন।	وَالسَّمَآءِ وَمَا بَنٰهَا ﴿٥﴾
৬. আর শপথ জমিনের এবং যিনি এটাকে বিছিয়েছেন তাঁর।	وَالْاَرْضِ وَمَا طَحٰهَا ﴿٦﴾
৭. আর শপথ [মানুষের] আত্মার আর যিনি তাকে যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন তার।	وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰهَا ﴿٧﴾
৮. অতঃপর তার দুষ্কার্য ও পরহেজগারীর, যা তাকে [তার অন্তরে] নিক্ষেপ করেছে।	فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا ﴿٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. وَالشَّمْسِ শপথ সূর্য وَضُحٰهَا ও তার আলোকের।

২. وَالْقَمَرِ আর চন্দ্রের اِذَا تَلٰهَا যখন সূর্যের পশ্চাতে আসে।

৩. وَالنَّهَارِ আর দিবসের اِذَا جَلّٰهَا যখন তা তাকে ভালো রূপে আলোকিত করে।

৪. وَالَّيْلِ আর রাত্রের اِذَا يَغْشٰهَا যখন তা তাকে সমাচ্ছন্ন করে।

৫. وَالسَّمَآءِ আর আসমানের وَمَا بَنٰهَا এবং যিনি এটাকে সৃষ্টি করেছেন।

৬. وَالْاَرْضِ আর জমিনের وَمَا طَحٰهَا এবং যিনি এটাকে বিছিয়েছেন।

৭. وَنَفْسٍ আর শপথ (মানুষের) আত্মার وَّمَا سَوّٰهَا আর যিনি এটাকে যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন।

৮. فَاَلْهَمَهَا অতঃপর যা তাকে (তার অন্তরে) নিক্ষেপ করেছেন فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا তার দুষ্কার্য ও পরহেজগারির।

৯. নিশ্চয় সে সফলকাম হয়েছে যে তাকে বিশুদ্ধ করেছে।

১০. আর সে বিফলকাম হয়েছে– যে তাকে [পাপে] গেড়ে দিয়েছে।

১১. ছামূদ সম্প্রদায় নিজেদের দুষ্টামির দরুন [সালেহকে] অবিশ্বাস করেছে।

১২. যখন সে সম্প্রদায়ের সর্বাপেক্ষা হতভাগ্য ব্যক্তি [উটনীকে বধ করার জন্য] দাঁড়াল।

১৩. তখন আল্লাহর রাসূল তাদেরকে বললেন, আল্লাহর উটনী এবং তার পানি পান করা সম্পর্কে সাবধান থাক।

১৪. অনন্তর তারা রাসূলকে অবিশ্বাস করল, অতঃপর সে উষ্ট্রীকে হত্যা করল, তখন তাদের প্রভু তাদের পাপের দরুন তাদের উপর ধ্বংস ক্রিয়া নাজিল করলেন এবং তাকে সর্বব্যাপী করে দিলেন।

১৫. আর আল্লাহ এর পরিণাম সম্বন্ধে কোনো খারাবির আশঙ্কা করেননি।

শাব্দিক অনুবাদ :

৯. قَدْ اَفْلَحَ নিশ্চয় সে সফল হয়েছে مَنْ زَكّٰهَا যে তাকে বিশুদ্ধ করেছে।

১০. وَقَدْ خَابَ আর সে বিফল হয়েছে مَنْ دَسّٰهَا যে তাকে পাপে গেড়ে দিয়েছে।

১১. كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ ছামূদ গোত্র (ছালেহকে) অবিশ্বাস করেছে بِطَغْوٰهَا নিজেদের দুষ্টামির দরুন।

১২. اِذِ انْۢبَعَثَ যখন দাড়াল اَشْقٰهَا সে সম্প্রদায়ের সর্বাপেক্ষা হতভাগ্য ব্যক্তি (উটনীকে বধ করার জন্য)

১৩. فَقَالَ لَهُمْ তখন তাদের কে বললেন رَسُوْلُ اللّٰهِ আল্লাহর রাসূল نَاقَةَ اللّٰهِ আল্লাহর উটনী وَسُقْيٰهَا এবং তার পানি পান করা সম্পর্কে সাবধান থাক।

১৪. فَكَذَّبُوْهُ অনন্তর তারা রাসূলকে অবিশ্বাস করল فَعَقَرُوْهَا অতঃপর সেই উষ্ট্রীকে হত্যা করল فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ তখন তাদের উপর ধ্বংসক্রিয়া নাজিল করলেন رَبُّهُمْ তাদের প্রভু بِذَنْۢبِهِمْ তাদের পাপের দরুন فَسَوّٰهَا এবং তাকে সর্বব্যাপী করে দিলেন।

১৫. وَلَا يَخَافُ আর আল্লাহ কোনো খারাবির আশঙ্কা করেননি عُقْبٰهَا এর পরিণাম সম্বন্ধে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : অত্র সূরার প্রথম শব্দই হলো "اَلشَّمْسُ" একে কেন্দ্র করেই অত্র সূরার নামকরণ করা হয়েছে। এতে ১৫টি আয়াত, ৫৪টি বাক্য এবং ২৪৭টি অক্ষর রয়েছে।

সূরাটি নাজিল হওয়ার সময়কাল : বিষয়বস্তু পর্যালোচনায় বুঝা যায় যে, এ সূরাটি মহানবী ﷺ-এর মাক্কী জীবনের প্রথম দিকে অবতীর্ণ হয়েছিল। তবে নবী করীম ﷺ-এর বিরোধিতা তখন প্রবলভাবে শুরু হয়েছিল।

সূরাটির বিষয়বস্তু ও মূলকথা : নেকী-বদী, পাপ ও পুণ্যের পার্থক্য বুঝানোই এ সূরার বিষয়বস্তু। যারা এ পার্থক্য বুঝতে অস্বীকার করে এবং পাপের পথে চলতেই থাকে, তাদেরকে অশুভ পরিণতি সম্পর্কে হুঁশিয়ার করা হয়েছে।

পঞ্চম শপথ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنٰهَا– এখানে مَا অব্যয়কে مَصْدَرِيَّةٌ ধরে এই অর্থ নেওয়া সুস্পষ্ট যে, সে শপথ আকাশের ও তা নির্মাণের। কুরআনের অন্য এক আয়াতে এর নজির আছে بِمَا غَفَرَلِى رَبِّى এমনিভাবে ষষ্ঠ শপথ وَالْاَرْضِ وَمَا طَحٰهَا বাক্যের অর্থ এরূপ হবে যে, শপথ পৃথিবীর ও তাকে বিস্তৃত করার। এখানে আকাশের সাথে নির্মাণের এবং পৃথিবীর সাথে বিস্তৃত করার উল্লেখও এতদুভয়ের পরিপূর্ণ অবস্থা বোঝানোর জন্য। এই তাফসীর হযরত কাতাদাহ (রা.) প্রমুখ তাফসীরবিদ থেকে বর্ণিত আছে। কাশশাফ, বায়যাবী ও কুরতুবী একেই পছন্দ করেছেন। কোনো কোনো তাফসীরবিদ এস্থলে مَا অব্যয়কে مَنْ -এর অর্থে ধরে এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলার সত্তা বুঝিয়েছেন। কাজেই উপরিউক্ত বাক্যদ্বয়ের অর্থ হবে শপথ আকাশের ও তাঁর, যিনি একে নির্মাণ করেছেন। শপথ পৃথিবীর ও তাঁর, যিনি একে বিস্তৃত করেছেন। কিন্তু এখানে সবগুলো শপথই সৃষ্টবস্তুর শপথ। মাঝখানে স্রষ্টার শপথ এসে যাওয়া ধারাবাহিকতার খেলাফ মনে হয়। প্রথমোক্ত তাফসীর অনুযায়ী এ আপত্তিও দেখা দেয় না যে, সৃষ্টবস্তুর শপথ স্রষ্টার শপথের অগ্রে বর্ণিত হলো কেন?

সপ্তম শপথ : وَنَفْسٍ وَمَا سَوّٰهَا এখানে দু'রকম অর্থ হতে পারে– **এক.** শপথ মানুষের প্রাণের এবং তাকে সুবিন্যস্ত করার এবং **দুই.** শপথ নফসের এবং তাঁর যিনি সেটাকে সুবিন্যস্ত করেছেন।

فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا : اَلْهَمَ -এর অর্থ নিক্ষেপ করা এবং فُجُوْرٌ শব্দের অর্থ প্রকাশ্য গোনাহ্। এই বাক্য সপ্তম শপথের সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা মানুষের নফস সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর অন্তরে অসৎ কর্ম ও সৎ কর্ম উভয়ের প্রেরণা জাগ্রত করেছেন। উদ্দেশ্য এই যে, মানব সৃষ্টিতে আল্লাহ তা'আলা গোনাহ্ ও ইবাদত উভয় কর্মের যোগ্যতা রেখেছেন, অতঃপর তাকে বিশেষ এক প্রকার ক্ষমতা দিয়েছেন, যাতে সে স্বেচ্ছায় গোনাহের পথ অবলম্বন করে অথবা ইবাদতের পথ। যখন সে নিজ ইচ্ছায় ও ক্ষমতায় এতদুভয়ের মধ্য থেকে কোনো এক পথ অবলম্বন করে, তখন এই ইচ্ছা ও ক্ষমতার ভিত্তিতেই সে ছওয়াব অথবা আজাবের যোগ্য হয়। এই তাফসীর অনুযায়ী এরূপ প্রশ্ন তোলার অবকাশ নেই যে, মানুষের সৃষ্টির মধ্যেই যখন পাপ ও ইবাদত নিহিত আছে, তখন সে তা করতে বাধ্য। এর জন্য সে কোনো ছওয়াব অথবা আজাবের যোগ্য হবে না। একটি হাদীস থেকে এই তাফসীর গৃহীত হয়েছে। সহীহ্ মুসলিমে আছে যে, তাফসীর সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জবাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করেন। এ থেকে বোঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষের মধ্যে গোনাহ্ ও ইবাদতের যোগ্যতা গচ্ছিত রেখেছেন, কিন্তু তাকে কোনো একটি করতে বাধ্য করেন নি; বরং তাকে উভয়ের মধ্য থেকে যে কোনো একটি করার ক্ষমতা দান করেছেন।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) ও ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন এই আয়াত তেলাওয়াত করতেন, তখন উচ্চৈঃস্বরে নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করতেন :

اَللّٰهُمَّ اٰتِ نَفْسِىْ تَقْوٰهَا اَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا وَاَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكّٰهَا অর্থাৎ হে আল্লাহ আমাকে তাকওয়ার তাওফীক দান কর, তুমিই আমার মুরুব্বী ও পৃষ্ঠপোষক।

সপ্তম শপথের পর জবাবে বলা হয়েছে : قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا অর্থাৎ সে ব্যক্তি সফলকাম, যে নিজের নফসকে শুদ্ধ করে। تَزْكِيَه শব্দের প্রকৃত অর্থ অভ্যন্তরীণ শুদ্ধতা। অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা অর্জন করে, সে সফলকাম। পক্ষান্তরে সে ব্যক্তি ব্যর্থ যে নিজের নফসকে পাপের পঙ্কিলে নিমজ্জিত করে দেয়। دَسَّ -এর অর্থ মাটিতে প্রোথিত করা; যেমন এক আয়াতে আছে : اَمْ يَدُسُّهٗ فِى التُّرَابِ কোনো কোনো তাফসীরবিদ এ আয়াতের অর্থ করেছেন, সে ব্যক্তি সফলকাম হয়; যাকে আল্লাহ শুদ্ধ করেন এবং সে ব্যক্তি ব্যর্থ, যাকে আল্লাহ তা'আলা গোনাহে ডুবিয়ে দেন। এ আয়াত সমগ্র মানবকে দু'ভাগে বিভক্ত করে দিয়েছে, সফলকাম ও ব্যর্থ। অতঃপর দ্বিতীয় প্রকার মানুষের একটি ঘটনা দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করে তাদের অশুভ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। ছামূদ গোত্রের ঘটনার প্রতি সংক্ষেপে ইঙ্গিত করে তাদের এই শাস্তি বর্ণনা করা হয়েছে :

فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوّٰهَا : دَمْدَمَ শব্দ এমন কঠোর শাস্তির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়, যা বারবার কোনো ব্যক্তি অথবা জাতির উপর পতিত হয়ে তাকে সম্পূর্ণ নাস্তানাবুদ করে দেয়। سَوّٰهَا -এর উদ্দেশ্য এই যে, এ আজাব জাতির আবাল-বৃদ্ধ বণিতা সবাইকে বেষ্টন করে নেয়। وَلَا يَخَافُ عُقْبٰهَا অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার শাস্তিদান ও কোনো জাতিকে নির্মূল করে দেওয়ার ব্যাপারকে দুনিয়ার ব্যাপারের মতো মনে করো না। দুনিয়াতে কোনো রাজাধিরাজ ও প্রবল পরাক্রান্ত শাসকও কোনো জাতির বিরুদ্ধে ধ্বংসাভিযান পরিচালনা করলে সে জাতির অবশিষ্ট লোক অথবা তাদের সমর্থকদের প্রতিশোধমূলক কার্যক্রম ও গণবিদ্রোহের আশঙ্কা করতে থাকে। এখানে যারা অপরকে হত্যা করে, তারা নিজেরাও হত্যার আশঙ্কা দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে। যারা অপরকে আক্রমণ করে তারা নিজেরাও আক্রান্ত হওয়ার ভয় রাখে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এরূপ নন। কারও পক্ষ থেকে কোনো সময় তাঁর কোনো বিপদশঙ্কা নেই।

পঞ্চম শপথ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنٰهَا– এখানে مَا অব্যয়কে مَصْدَرِيَّةٌ ধরে এই অর্থ নেওয়া সুস্পষ্ট যে, সে শপথ আকাশের ও তা নির্মাণের। কুরআনের অন্য এক আয়াতে এর নজির আছে بِمَا غَفَرَلِىْ رَبِّىْ এমনিভাবে ষষ্ঠ শপথ وَالْاَرْضِ وَمَا طَحٰهَا বাক্যের অর্থ এরূপ হবে যে, শপথ পৃথিবীর ও তাকে বিস্তৃত করার। এখানে আকাশের সাথে নির্মাণের এবং পৃথিবীর সাথে বিস্তৃত করার উল্লেখও এতদুভয়ের পরিপূর্ণ অবস্থা বোঝানোর জন্য। এই তাফসীর হযরত কাতাদাহ (রা.) প্রমুখ তাফসীরবিদ থেকে বর্ণিত আছে। কাশশাফ, বায়যাবী ও কুরতুবী একেই পছন্দ করেছেন। কোনো কোনো তাফসীরবিদ এস্থলে مَا অব্যয়কে مَنْ -এর অর্থে ধরে এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলার সত্তা বুঝিয়েছেন। কাজেই উপরিউক্ত বাক্যদ্বয়ের অর্থ হবে শপথ আকাশের ও তাঁর, যিনি একে নির্মাণ করেছেন। শপথ পৃথিবীর ও তাঁর, যিনি একে বিস্তৃত করেছেন। কিন্তু এখানে সবগুলো শপথই সৃষ্টবস্তুর শপথ। মাঝখানে স্রষ্টার শপথ এসে যাওয়া ধারাবাহিকতার খেলাফ মনে হয়। প্রথমোক্ত তাফসীর অনুযায়ী এ আপত্তিও দেখা দেয় না যে, সৃষ্টবস্তুর শপথ স্রষ্টার শপথের অগ্রে বর্ণিত হলো কেন?

সপ্তম শপথ : وَنَفْسٍ وَمَا سَوّٰهَا এখানে দু'রকম অর্থ হতে পারে– **এক.** শপথ মানুষের প্রাণের এবং তাকে সুবিন্যস্ত করার এবং **দুই.** শপথ নফসের এবং তাঁর যিনি সেটাকে সুবিন্যস্ত করেছেন।

فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا : اَلْهَمْ -এর অর্থ নিক্ষেপ করা এবং فُجُوْر শব্দের অর্থ প্রকাশ্য গোনাহ্। এই বাক্য সপ্তম শপথের সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা মানুষের নফস সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর অন্তরে অসৎ কর্ম ও সৎ কর্ম উভয়ের প্রেরণা জাগ্রত করেছেন। উদ্দেশ্য এই যে, মানব সৃষ্টিতে আল্লাহ তা'আলা গোনাহ্ ও ইবাদত উভয় কর্মের যোগ্যতা রেখেছেন, অতঃপর তাকে বিশেষ এক প্রকার ক্ষমতা দিয়েছেন, যাতে সে স্বেচ্ছায় গোনাহের পথ অবলম্বন করে অথবা ইবাদতের পথ। যখন সে নিজ ইচ্ছায় ও ক্ষমতায় এতদুভয়ের মধ্য থেকে কোনো এক পথ অবলম্বন করে, তখন এই ইচ্ছা ও ক্ষমতার ভিত্তিতেই সে ছওয়াব অথবা আজাবের যোগ্য হয়। এই তাফসীর অনুযায়ী এরূপ প্রশ্ন তোলার অবকাশ নেই যে, মানুষের সৃষ্টির মধ্যেই যখন পাপ ও ইবাদত নিহিত আছে, তখন সে তা করতে বাধ্য। এর জন্য সে কোনো ছওয়াব অথবা আজাবের যোগ্য হবে না। একটি হাদীস থেকে এই তাফসীর গৃহীত হয়েছে। সহীহ্ মুসলিমে আছে যে, তাফসীর সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জবাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করেন। এ থেকে বোঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষের মধ্যে গোনাহ্ ও ইবাদতের যোগ্যতা গাচ্ছিত রেখেছেন, কিন্তু তাকে কোনো একটি করতে বাধ্য করেন নি; বরং তাকে উভয়ের মধ্য থেকে যে কোনো একটি করার ক্ষমতা দান করেছেন।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) ও ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন এই আয়াত তেলাওয়াত করতেন, তখন উচ্চৈঃস্বরে নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করতেন :

اَللّٰهُمَّ اٰتِ نَفْسِىْ تَقْوٰهَا اَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا وَاَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكّٰهَا অর্থাৎ হে আল্লাহ আমাকে তাকওয়ার তাওফীক দান কর, তুমিই আমার মুরুব্বী ও পৃষ্ঠপোষক।

সপ্তম শপথের পর জবাবে বলা হয়েছে : قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا অর্থাৎ সে ব্যক্তি সফলকাম, যে নিজের নফসকে শুদ্ধ করে। تَزْكِيَه শব্দের প্রকৃত অর্থ অভ্যন্তরীণ শুদ্ধতা। অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা অর্জন করে, সে সফলকাম। পক্ষান্তরে সে ব্যক্তি ব্যর্থ যে নিজের নফসকে পাপের পঙ্কিলে নিমজ্জিত করে দেয়। دَسّ -এর অর্থ মাটিতে প্রোথিত করা; যেমন এক আয়াতে আছে : اَمْ يَدُسُّهُ فِى التُّرَابِ কোনো কোনো তাফসীরবিদ এ আয়াতের অর্থ করেছেন, সে ব্যক্তি সফলকাম হয়; যাকে আল্লাহ শুদ্ধ করেন এবং সে ব্যক্তি ব্যর্থ, যাকে আল্লাহ তা'আলা গোনাহে ডুবিয়ে দেন। এ আয়াত সমগ্র মানবকে দু'ভাগে বিভক্ত করে দিয়েছে, সফলকাম ও ব্যর্থ। অতঃপর দ্বিতীয় প্রকার মানুষের একটি ঘটনা দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করে তাদের অশুভ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। ছামূদ গোত্রের ঘটনার প্রতি সংক্ষেপে ইঙ্গিত করে তাদের এই শাস্তি বর্ণনা করা হয়েছে :

فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوّٰهَا : دَمْدَمَ শব্দ এমন কঠোর শাস্তির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়, যা বারবার কোনো ব্যক্তি অথবা জাতির উপর পতিত হয়ে তাকে সম্পূর্ণ নাস্তানাবুদ করে দেয়। سَوّٰهَا -এর উদ্দেশ্য এই যে, এ আজাব জাতির আবাল-বৃদ্ধ বণিতা সবাইকে বেষ্টন করে নেয়। وَلَا يَخَافُ عُقْبٰهَا অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার শাস্তিদান ও কোনো জাতিকে নির্মূল করে দেওয়ার ব্যাপারকে দুনিয়ার ব্যাপারের মতো মনে করো না। দুনিয়াতে কোনো রাজাধিরাজ ও প্রবল পরাক্রান্ত শাসকও কোনো জাতির বিরুদ্ধে ধ্বংসাভিযান পরিচালনা করলে সে জাতির অবশিষ্ট লোক অথবা তাদের সমর্থকদের প্রতিশোধমূলক কার্যক্রম ও গণবিদ্রোহের আশঙ্কা করতে থাকে। এখানে যারা অপরকে হত্যা করে, তারা নিজেরাও হত্যার আশঙ্কা দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে। যারা অপরকে আক্রমণ করে তারা নিজেরাও আক্রান্ত হওয়ার ভয় রাখে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এরূপ নন। কারও পক্ষ থেকে কোনো সময় তাঁর কোনো বিপদশঙ্কা নেই।

শব্দ বিশ্লেষণ :

شَمْس : অর্থ– সূর্যকেও বলা হয় আবার দুপুরের তাপকেও বলা হয়। বহুবচন شُمُوْس আসে।

ضُحٰى : অর্থ– চাশতের সময়, সকাল বেলা, পূর্বাহ্নের প্রথম প্রহর, সূর্যকিরণ ছড়ানো। আল্লামা ইবনে খালুভিয়া বলেন, ضُحٰى ইসমে মাকছুরা। যেমন هُدٰى শব্দটি ইসমে মাকসূরাহ অর্থাৎ ضُحٰى শব্দটি মুয়ান্নাছ। এর তাসগীর ضُحَيَّةٌ আসে। তবে উত্তম হলো, এর তাসগীর ضُحٰى অর্থাৎ تاء ব্যতীত আসা। যাতে তার তাসগীর ضُحَوَّةٌ-এর তাসগীরের সাথে মিলে না যায়।

اَلْقَمَر : একবচন। বহুবচন اَقْمَار তৃতীয় তারিখ থেকে মাসের শেষ পর্যন্ত চাঁদকে قَمَرٌ বলা হয়। قُمَرَاءُ চাঁদনী (রাত)। قَمَرٌ জুয়া খেলা, বাজি ধরা। বাবে– نَصَرَ - ضَرَبَ সম্ভবতঃ চাঁদের আলো তারকারাজির আলোর উপর প্রাধান্য পায় বলে قَمَرٌ কে এ নামে নামকরণ করা হয়েছে।

تَلٰهَا : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার تُلُوٌّ মূলবর্ণ (ت - ل - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– (আর শপথ চাঁদের! যখন) তা সূর্যের পশ্চাতে আসে।

جَلّٰهَا : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَجْلِيَةٌ মূলবর্ণ (ج - ل - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তাকে ভালোরূপে আলোকিত করে। আবৃত করে।

بَنٰهَا : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার بِنَاءٌ মূলবর্ণ (ب - ن - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– এটাকে নির্মাণ করেছেন, বানিয়েছেন।

طَحٰهَا : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব فَتَحَ মাসদার طَحْىٌ মূলবর্ণ (ط - ح - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– এটাকে বিছিয়েছেন, ছড়িয়েছেন।

سَوّٰهَا : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَسْوِيَةٌ মূলবর্ণ (س - و - ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ– যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন, সমান করে দিয়েছেন।

اِنْبَعَثَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِنْفِعَال মাসদার اِنْبِعَاثٌ মূলবর্ণ (ب - ع - ث) জিনস صحيح অর্থ– সে উঠে দাড়াল।

اَشْقٰهَا : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم تفضيل বাব سَمِعَ মাসদার شَقَاءٌ মূলবর্ণ (ش - ق - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– সর্বাপেক্ষা হতভাগ্য ব্যক্তি।

سُقْيٰهَا : ইসম। سَقْىٌ হতে নির্গত। অর্থ– তাকে পানি পান করানো। এর বহুবচন سُقْيَاتٌ আসে। যেমন, حُبْلٰى-এর বহুবচন حُبْلَيَاتٌ আসে।

عُقْبٰهَا : অর্থ– তার পরিণাম, পরিণতি, তার বদলা, তার ফলাফল। আল্লামা আবুল হাসান উন্দুলসী (র.) البحر المحيط গ্রন্থে লিখেন, العقبى خَاتِمَةُ الشَّئِ وَمَا يَجِئُ مِنَ الْاُمُوْرِ عَلٰى عَقْبِهٖ তথা عقبى-এর অর্থ, কোনো জিনিসের পরিণাম এবং যে কথা কোনো কিছুর পরে উঠে আসে। কাযী ছানাউল্লাহ (র.) বলেন অর্থ, কাজের প্রতিদান বা বিনিময়। তবে عُقْبٰى -এর ব্যবহার ছওয়াব ও নেকীর উত্তম প্রতিদানের সাথে নির্দিষ্ট। যেমন عِقَابٌ، عُقُوْبَةٌ -এর ব্যবহার আজাব ও মন্দতা কঠিন শাস্তির সাথে নির্দিষ্ট। আয়াতে عقبى-এর ব্যবহার ছওয়াবের জন্য হয়নি।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا وَالْقَمَرِ اِذَا تَلٰهَا : এখানে واو টি হরফে কসম ও হরফে জার। আর اَلشَّمْسِ হলো মাজরূর। এখন জার ও মাজরূর মিলে উহ্য ফেলের সাথে متعلق হয়েছে। আর ضُحٰهَا টা اَلشَّمْس -এর উপর আতফ হয়েছে। وَالْقَمَر টাও আতফ হয়েছে। আর اذا টা শুধুমাত্র ظرفية এর জন্য হয়েছেন। যা উহ্য কসমের ফে'লের সাথে متعلق হয়েছে। –[ই'রাবুল কুরআন ৮ম খণ্ড; পৃ. ৩২৯]

سُوْرَةُ الَّيْلِ مَكِّيَّةٌ

সূরা লায়ল

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত– ২১, রুকূ'– ১

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

অনুবাদ	আয়াত
১. শপথ রজনীর, যখন তা [সূর্যকে] আচ্ছন্ন করে ফেলে।	وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى ۝١
২. আর দিবসের, যখন তা আলোকিত হয়ে পড়ে।	وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰى ۝٢
৩. আর তার, যিনি নর ও মাদীকে সৃষ্টি করেছেন।	وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰٓى ۝٣
৪. নিশ্চয় তোমাদের কর্মপ্রচেষ্টা বিভিন্নমুখী।	اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتّٰى ۝٤
৫. অনন্তর যে [আল্লাহর রাস্তায়] দান করেছে এবং আল্লাহকে ভয় করেছে।	فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى ۝٥
৬. আর ভালো কথাকে [ইসলাম ধর্মকে] সত্য বলে বুঝেছে।	وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى ۝٦
৭. তবে আমি তার জন্য সুগম করে দিব সহজ পথ।	فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْيُسْرٰى ۝٧
৮. আর যে কার্পণ্য করেছে এবং নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করেছে।	وَاَمَّا مَنْۢ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى ۝٨

শাব্দিক অনুবাদ :

১. وَالَّيْلِ শপথ রাত্রির اِذَا يَغْشٰى যখন তা (সূর্যকে) আচ্ছন্ন করে ফেলে।

২. وَالنَّهَارِ আর দিবসের اِذَا تَجَلّٰى যখন তা আলোকিত হয়ে পড়ে।

৩. وَمَا خَلَقَ আর তাঁর যিনি সৃষ্টি করেছেন الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى নর ও মাদীকে।

৪. اِنَّ سَعْيَكُمْ নিশ্চয় তোমাদের প্রচেষ্টা لَشَتّٰى বিভিন্নমুখী।

৫. فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى অনন্তর যে দান করেছে وَاتَّقٰى এবং আল্লাহকে ভয় করেছে।

৬. وَصَدَّقَ আর সত্য বলে বুঝেছে بِالْحُسْنٰى ভালো কথাকে।

৭. فَسَنُيَسِّرُهٗ তবে আমি তার জন্য সুগম করে দিব لِلْيُسْرٰى সহজ পথ।

৮. وَاَمَّا مَنْۢ بَخِلَ আর যে কার্পণ্য করেছে وَاسْتَغْنٰى এবং নিজেকে স্বয়ং সম্পূর্ণ মনে করেছে।

৯. আর ভালো কথাকে [সত্য ধর্মকে] অবিশ্বাস করেছে।	وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى ۙ ﴿٩﴾
১০. তবে আমি তাকে ক্লেশদায়ক বস্তু [দোজখ] -এর জন্য আসবাব প্রদান করব।	فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْعُسْرٰى ۭ ﴿١٠﴾
১১. আর তার ধন সম্পদ তার কোনো কাজে আসবে না, যখন সে [দোজখে] অধঃপতিত হবে।	وَمَا يُغْنِيْ عَنْهُ مَالُهٗۤ اِذَا تَرَدّٰى ۭ ﴿١١﴾
১২. বাস্তবিকই আমার জিম্মায় শুধু পথ দেখিয়ে দেওয়া।	اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدٰى ۫ۖ ﴿١٢﴾
১৩. আর আমারই আয়ত্তে রয়েছে পরকাল এবং ইহকাল।	وَاِنَّ لَنَا لَلْاٰخِرَةَ وَالْاُوْلٰى ﴿١٣﴾
১৪. অনন্তর আমি তোমাদেরকে এক প্রজ্বলিত অগ্নির ভয় প্রদর্শন করছি।	فَاَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظّٰى ۚ ﴿١٤﴾
১৫. তাতে কেবল সে হতভাগ্যই প্রবেশ করবে।	لَا يَصْلٰىهَآ اِلَّا الْاَشْقَى ۙ ﴿١٥﴾
১৬. যে [সত্য ধর্মকে] অবিশ্বাস করেছে এবং [তা হতে] মুখ ফিরিয়ে রয়েছে।	الَّذِيْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ۭ ﴿١٦﴾
১৭. আর তা হতে এমন ব্যক্তিকে দূরে রাখা হবে, যে অত্যন্ত পরহেজগার।	وَسَيُجَنَّبُهَا الْاَتْقَى ۙ ﴿١٧﴾
১৮. যে স্বীয় ধন সম্পদ [শুধু] এই উদ্দেশ্যে দান করে যেন সে পবিত্র হয় [অর্থাৎ শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভই তার উদ্দেশ্য]।	الَّذِيْ يُؤْتِيْ مَالَهٗ يَتَزَكّٰى ۚ ﴿١٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৯. وَكَذَّبَ আর অবিশ্বাস করেছে بِالْحُسْنٰى ভালো কথাকে।

১০. فَسَنُيَسِّرُهٗ তবে আমি তাকে প্রদান করব لِلْعُسْرٰى ক্লেশদায়ক বস্তু (দোজখ) এর জন্য আসবাব।

১১. وَمَا يُغْنِيْ عَنْهُ مَالُهٗ আর তার ধন-সম্পদ তার কোনো কাজে আসবে না اِذَا تَرَدّٰى যখন সে [দোজখে] অধঃপতিত হবে।

১২. اِنَّ عَلَيْنَا বাস্তবিক আমার জিম্মায় শুধু لَلْهُدٰى পথ দেখিয়ে দেওয়া।

১৩. وَاِنَّ لَنَا আর আমারই আয়ত্তে রয়েছে لَلْاٰخِرَةَ পরকাল وَالْاُوْلٰى এবং ইহকাল।

১৪. فَاَنْذَرْتُكُمْ অনন্তর আমি তোমাদেরকে ভয় প্রদর্শন করছি نَارًا تَلَظّٰى এক প্রজ্বলিত অগ্নির।

১৫. لَا يَصْلٰىهَآ اِلَّا তাতে কেবল প্রবেশ করবে الْاَشْقَى সেই হতভাগ্যই।

১৬. الَّذِيْ كَذَّبَ যে অবিশ্বাস করেছে وَتَوَلّٰى এবং মুখ ফিরিয়ে রয়েছে।

১৭. وَسَيُجَنَّبُهَا আর তা হতে এমন ব্যক্তিকে দূরে রাখা হবে الْاَتْقَى যে অত্যন্ত পরহেজগার।

১৮. الَّذِيْ يُؤْتِيْ مَالَهٗ যে স্বীয় ধন-সম্পদ (শুধু) এই উদ্দেশ্যেই দান করে يَتَزَكّٰى যেন সে পবিত্র হয়।

১৯. আর তার জিম্মায় কারো কোনো ইহসান [অনুগ্রহ] ছিল না যে, তার প্রতিদান দিতে হয়।	وَمَا لِاَحَدٍ عِنْدَهٗ مِنْ نِّعْمَةٍ تُجْزٰۤى ﴿١٩﴾
২০. কেবল তার মহোন্নত প্রতিপালকের সন্তুষ্টি সাধন ব্যতীত।	اِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْاَعْلٰى ﴿٢٠﴾
২১. আর এই ব্যক্তি সত্বরই সন্তুষ্ট হয়ে যাবে।	وَلَسَوْفَ يَرْضٰى ﴿٢١﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৯. وَمَا لِاَحَدٍ عِنْدَهٗ আর তার জিম্মায় ছিলনা কারো مِنْ نِّعْمَةٍ কোনো ইহসান যে تُجْزٰۤى তার প্রতিদান দিতে হয়।
২০. اِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ কেবল সন্তুষ্টি সাধন ব্যতীত رَبِّهِ الْاَعْلٰى তার মহোন্নত প্রতিপালকের।
২১. وَلَسَوْفَ يَرْضٰى আর এই ব্যক্তি সত্বরই সন্তুষ্ট হয়ে যাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ ঃ অত্র সূরার প্রথম শব্দ اَللَّيْلِ-কে কেন্দ্র করে অত্র সূরার নামকরণ করা হয়েছে। এতে ২১টি আয়াত, ৭১টি বাক্য এবং ৩২০টি অক্ষর রয়েছে।

অবতীর্ণ হওয়ার সময়কাল ঃ অত্র সূরা ও এর পূর্ববর্তী সূরার বিষয়বস্তু প্রায় এক ও অভিন্ন। এটা হতে বুঝা যায় যে, পূর্ববর্তী সূরার ন্যায় এ সূরাও মাক্কী জীবনের প্রথম দিকে অবতীর্ণ হয়েছে।

সূরাটির বিষয়বস্তু ও মূলবক্তব্য : মানব জীবনের দু'টি ভিন্ন ভিন্ন পথের পারস্পরিক পার্থক্য এবং তার পরিণাম ও ফলাফলের তারতম্য বর্ণনা করাই এ সূরার বিষয়বস্তু।

এর মূলবক্তব্য দু'টি ভাগে বিভক্ত। শুরু হতে ১১ নং আয়াত পর্যন্ত তার প্রথম ভাগ। এ অংশে বলা হয়েছে, মানবজাতির ব্যক্তি, জাতি ও দলসমূহ দুনিয়াতে যে শ্রম ও চেষ্টা-প্রচেষ্টা করছে, তা স্বীয় নৈতিকতার দিক দিয়ে ঠিক তেমনি পরস্পর বিরোধী। যেমন পরস্পর বিরোধী দিন ও রাত এবং পুরুষ জীব ও স্ত্রী জীব। এরপর দু'প্রকারের নৈতিক বিশেষত্বের উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম প্রকারের নৈতিক বিশেষত্বসমূহ এই- দান-সদকা করা, আল্লাহভীতি ও পরহেজগারী অবলম্বন এবং ভালো ও কল্যাণকে, ভালো ও কল্যাণ বলে মেনে নেওয়া। অপর ধরনের বিশেষত্বসমূহ হচ্ছে কার্পণ্য ও বখিলী, আল্লাহর সন্তোষ ও অসন্তোষ সম্পর্কে নির্ভীক হওয়া, ভালো কথাকে মিথ্যা অভিহিত করে অমান্য করা। ফলে বলা হয়েছে যে, এ বিশেষত্বসমূহ নিজস্ব দিক দিয়ে যতটা পরস্পর বিরোধী, এদের ফলাফল অবলম্বনকারীরা দুনিয়া ও আখেরাতের সাফল্য লাভ করবে। তাদের জন্য ভালো ও কল্যাণকর কাজগুলোকে সহজ করে দেওয়া হবে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় কর্মনীতি গ্রহণকারীদের জন্য ভালো কাজ কঠিন ও মন্দ কাজ সহজ হবে। পরিশেষে বলা হয়েছে, দুনিয়ার এ সম্পদ যা অর্জনের জন্য মানুষ প্রাণ দিতেও প্রস্তুত, তা তার মালিকের সাথে কবরে তো যাবে না। তাহলে মৃত্যুর পর তা মালিকের কোন কাজে আসবে?

দ্বিতীয় অংশেও সংক্ষেপে তিনটি মৌলনীতি পেশ করা হয়েছে। প্রথমত আল্লাহ মানুষকে দুনিয়ার এ পরীক্ষা ক্ষেত্রে অজ্ঞ ও অনবহিত করে ছেড়ে দেননি। জীবনের বিভিন্ন পথের মধ্যে ঠিক কোন পথটি সুষ্ঠু ও সঠিক তা মানুষকে ভালোভাবে জানিয়ে বুঝিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব তিনি নিজের উপর গ্রহণ করেছেন।

দ্বিতীয় মৌলতত্ত্বে এই বলা হয়েছে যে, দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ের নিরঙ্কুশ মালিক একমাত্র আল্লাহই। দুনিয়া পেতে চাইলে তারই নিকট হতে পেতে হবে। আর পরকাল চাইলে তার দাতাও সে আল্লাহ। এখন তুমি বান্দা তার নিকট কি চাইবে, তার ফয়সালার দায়িত্ব তোমার নিজের।

তৃতীয়ত বলা হয়েছে, রাসূল ও কিতাবের সাহায্যে যে কল্যাণ বিধান পেশ করা হয়েছে তা যে হতভাগ্য ব্যক্তি মিথ্যা মনে করে, অমান্য ও অস্বীকার করবে তার জন্য জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডলি প্রস্তুত হয়ে আছে। অপরদিকে যে আল্লাহভীরু ব্যক্তি ঈমান এনে সৎকর্মে আত্মনিয়োগ করবে, আল্লাহ তার উপর রাজি-খুশি হবেন এবং সেও আল্লাহর দান পেয়ে সন্তুষ্ট হয়ে যাবে।

সূরাটির শানে নুযূল ঃ সূরাটি মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হয়েছে। তার আয়াতসমূহের অভিব্যক্তি সাধারণ হলেও বহু বিশিষ্ট তাফসীরকারের মতে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) এবং উমাইয়া ইবনে খালাফ নামক জনৈক ধর্মদ্রোহী সম্বন্ধে এ সূরা নাজিল হয়েছে। আরবের মধ্যে তারা উভয়েই ধনবান ও নেতৃস্থানীয় ছিল; কিন্তু উভয়ের মধ্যে চরিত্র, ধর্ম বিশ্বাস ও কার্যকলাপে বিরাট পার্থক্য ছিল। হযরত আবূ বকর (রা.) তাঁর সমস্ত অর্থ ইসলামের উন্নতি ও কল্যাণে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহায্যে এবং মুসলমানের উপকার এবং বিভিন্নরূপ সৎকার্যে ব্যয় করেছেন। পক্ষান্তরে উমাইয়া তার সঞ্চিত অর্থরাশি এক কপর্দকও কোনোরূপ সৎকার্যে ব্যয় করেনি। অধিকন্তু উমাইয়া ভয়ানক ইসলাম বিদ্বেষী ছিল এবং ইসলাম গ্রহণের কারণে সে তার কৃতদাস হযরত বেলাল (রা.)-এর উপর ভীষণ অত্যাচার করত। হযরত আবূ বকর (রা.) এ সংবাদ শ্রবণে দশ সহস্রাধিক স্বর্ণ মুদ্রা ও নিজ কৃতদাস নিসতাস রূমীর বিনিময়ে হযরত বেলালকে উমাইয়ার নিকট হতে ক্রয় করে তাঁকে মুক্ত করে দিয়েছেন। হযরত সিদ্দীক (রা.) আরও কতিপয় নওমুসলিম দাস-দাসীকে বহু স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার বিনিময়ে ক্রয় করে অত্যাচারী কাফেরদের কবল হতে মুক্ত করেছেন। তিনি তাঁর সঞ্চিত চল্লিশ সহস্র দিরহাম রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সমস্ত মুসলমানদের হিতার্থে ব্যয় করেছেন। চৌত্রিশ হাজার দিরহাম মক্কায় তেরো বছর যাবৎ মুসলমানদের হিতার্থে ব্যয় করেছেন। অবশিষ্ট ছয় হাজার দিরহাম হিজরতের পথে এবং মদীনায় মসজিদে নববীর ভূমি ক্রয়ের জন্য ব্যয় করেছেন। এভাবে ইসলাম ও ইসলামি উম্মাহর জন্য সর্বস্ব উৎসর্গ করে দিয়ে সম্পূর্ণ নিঃস্ব হয়েও তিনি কোনো দিন কারো নিকট সাহায্য ও প্রতিদান প্রার্থী হননি। একদা তিনি কম্বল জড়িয়ে বসেছিলেন। হযরত জিবরাঈল (আ.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট হাজির হয়ে বললেন, "হে আল্লাহর নবী, এ কম্বল জড়ানো ফকির কে? যিনি নিজের সমস্ত সম্পদ আপনার জন্য ব্যয় করে নিঃস্ব হয়েছেন। আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত তাঁকে সালাম জানিয়েছেন। আর আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞাসা করেছেন, এ দরিদ্রাবস্থায় তিনি সন্তুষ্ট আছেন কিনা? এ সংবাদ রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত সিদ্দীক (রা.)-কে জানিয়েছেন। হযরত সিদ্দীক (রা.) এতক্ষণে জ্ঞান ফিরে পেলেন এবং ব্যতিব্যস্ত হয়ে বলতে লাগলেন, আমি তাতেও আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট আছি, আমি আল্লাহর উপর রাজি আছি– এ সময়ই অত্র সূরাটি অবতীর্ণ হয়। –[আযীযী]

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ [١] وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ [٢] وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ............ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ [٢٠] وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ.

শানে নযূল-১ : ইবনে আবী হাতেম হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, কোনো এক ব্যক্তির খেজুর গাছের বাগানে ছিল। তন্মধ্য হতে একটি গাছের শাখা পার্শবর্তী এক সৎ ও হতদরিদ্র লোকের বাড়ির উপর ছিল। হতদরিদ্র লোকটির ছিল ছোট ছোট সন্তান-সন্ততি। গাছের মালিক যখন খেজুর আহরণ করতে আসত, তখন কোনো খেজুর পরে গেলে গরিব লোকটির সন্তান-সন্ততিরা কেউ তা তুলে নিত অথবা মুখে দিত, সে লোকটি গাছ থেকে নেমে যাদের হাতে খেজুর থাকত, তা ছিনিয়ে নিত এবং যারা মুখে দিয়ে দিত, তাদের মুখে আঙ্গুল দিয়ে তা বের করে নিয়ে আসত। সুতরাং সেই লোকটি যে বিপদের সম্মুখীন তা রাসূল ﷺ-এর নিকট গিয়ে সে বিপদ সম্পর্কে অভিযোগ করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি চলে যাও। অতঃপর তিনি খেজুর গাছের মালিকের নিকট গিয়ে বললেন যে, অমুকের বাড়ির উপর যে খেজুর গাছটি ঝুলে রয়েছে, সে গাছটি আমাকে দিয়ে দাও এর বিনিময়ে বেহেশতে একটি খেজুর গাছ পাবে। সে বলল, গাছটি আপনাকে দিয়ে দিতাম তবে এ গাছের খেজুর গুলো আমার নিকট অত্যন্ত পছন্দনীয়। আমার যদিও আরো অনেক খেজুর গাছ আছে, তবুও অন্যান্য গাছা অপেক্ষা এ গাছটির খেজুরই আমার নিকট অধিক প্রিয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ এখান থেকে নিরাশ হয়ে ফিরে চললেন। এক ব্যক্তি আড়াল থেকে কথাগুলো শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গিয়ে বলল, আমি যদি অমুক খেজুর গাছটি আপনাকে দান করি, তা হলে অমুক ব্যক্তির সাথে প্রতিশ্রুত বেহেশতের খেজুর গাছটি এর বিনিময়ে আমাকে দেবেন কী? তিনি বললেন, হ্যাঁ দেব! অতঃপর সে ব্যক্তির ৪০ চল্লিশটি খেজুর গাছের বিনিময়ে সেই খেজুর গাছটি খরিদ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে গিয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! অমুকের বাড়িতে ঝুলে পড়া খেজুর গাছটি আমার হয়েছে। আমি তা আপনাকে দিয়ে দিলাম। তখন হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ দরিদ্র সাহাবীর নিকট গিয়ে বললেন, আজ হতে গাছটি তোমার। তোমার সন্তান-সন্ততির মালিকাধীন এ গাছটি। হযরত ইকরিমা ও হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য সূরা অবতীর্ণ হয়েছে।

–[ইবনে কাছীর ৫১৭/৪, দূররে মানছূর ৩৪৭/৬]

শানে নুযূল-২ : আত্বা বলেন যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত রয়েছে, আলোচ্য সূরা হযরত আবুদ্দাহদাহ (রা.) সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে যে, কোন এক আনসারীর একটি খেজুর বৃক্ষ ছিল। সেই খেজুর বৃক্ষ হতে কাঁচা খেজুর তার পরশীর বাড়িতে পরত। তার সন্তান-সন্ততিরা সেই খেজুর কুড়িয়ে নিত। তখন সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট অভিযোগ করল। অতঃপর নবী করীম ﷺ বললেন যে, সে বৃক্ষটি আমার নিকট বেহেশতের একটি খেজুর বৃক্ষের বিনিময়ে বিক্রি করে দেবে? তাতে সে অস্বীকৃতি জানাল। ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বের হয়ে আসলেন। পথিমধ্যে আবুদ্দাহদাহ (রা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ হলে তিনি বললেন, তুমি বেহেশতের খেজুর বৃক্ষের বিনিময়ে তা খরিদ করে দেবে কী? আবুদ্দাহদাহ বললেন, বেহেশতের খেজুর বৃক্ষের বিনিময়ে আমার নিকট থেকে তা খরিদ করে নেবেন? রাসূল ﷺ বললেন, হ্যাঁ! আল্লাহর শপথ করে তার নিশ্চয়তা দিচ্ছি। আবুদ্দাহদাহ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ গাছটি আপনার! তখন রাসূলে আকরাম ﷺ সেই আনসারী পরাশীকে ডেকে এনে বললেন, এ বৃক্ষটির দায়িত্ব গ্রহণ কর। তখন সেই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য সূরাটি নাজিল হয়েছে। –[কুরতুবী ৮১/২০]

إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ [٤]

শানে নুযূল : বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) উমাইয়্যা ও উবাই বিন খালাফ এর নিকট হতে হযরত বিলাল (রা.)-কে নিজ কম্বল ও দশটি মুদ্রার বিনিময়ে ক্রয় করে তাকে দাসত্ব জীবন হতে মুক্ত করেন। তখন সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[কুরতুবী ৮০/২০]

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ [٥] وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ [٦] فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ [٧] وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ [٨] وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ [٩] فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ [١٠]

শানে নুযূল : ইবনে জারীর হযরত আবূ দারদা (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, প্রতিদিনই যখন সূর্য অস্তমিত হয়, তখন আহ্বানকারী দু'জন ফেরেশতা আহ্বান করতে থাকে। তাদের আহ্বান জিন ও মানুষ ছাড়া আল্লাহ তা'আলার সকল সৃষ্টিই শুনতে পায়। তারা বলে থাকে اللهم اعط منفقا خلفا। واعط ممسكا تلفا তখন আহ্বানকারী দু'জন ফেরেশতার আহ্বান করার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[ইবনে কাছীর ৫১৯/৪, তাবারী ৬১৩/১২]

وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ [١٩]

শানে নুযূল : আত্বা ও যাহহাক (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, মুশরিকরা হযরত বিলাল (রা.)-কে শাস্তি দিতেছিল, আর হযরত বিলাল (রা.) বলতে ছিলেন, আহাদ-আহাদ। এ মুহূর্তে হযরত নবী করীম ﷺ তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি বললেন, আহাদ অর্থাৎ আল্লাহই তোমাকে রক্ষা করবেন। অতঃপর তিনি হযরত আবূ বকর (রা.)-কে বললেন, হে আবূ বকর! বেলালকে আল্লাহর পথে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) রাসূললুল্লাহ ﷺ-এর মন্তব্যের উদ্দেশ্য অনুধাবন করে নিজ ঘরে চলে গেলেন। অতঃপর তিনি প্রায় আধাসের ওজনের স্বর্ণ সাথে নিয়ে উমাইয়্যা বিন খালফ এর নিকট গেলেন। তিনি উমাইয়্যাকে জিজ্ঞেস করলেন, বিলালকে আমার নিকট বিক্রি করবে কী? সে বলল, হ্যাঁ। সুতরাং তিনি তাকে খরিদ করে মুক্ত করে দিলেন। তখন মুশরিকরা বলেছিল যে, আবূ বকর তাকে মুক্ত করেছে তো নিজ শক্তি অর্জনের জন্যে। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) কর্তৃক বিলাল (রা.)-কে মুক্তিদান করা এবং কাফেরদের এ মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেনে।

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ (٥)

শানে নুযূল : হযরত আবূ বকর (রা.)-এর পিতা কুহাফা একদা তাকে বলল, হে আবূ বকর! আমি লক্ষ্য করছি যে, তুমি নিতান্ত অসহায় ও কমজোর লোকদেরকে আজাদ করে থাক। তা না করে তুমি যদি শক্তিশালী লোকদের আজাদ করতে তাহলে দুঃসময়ে সে তোমার কাজে আসত। তখন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) বললেন, হে পিতা! আমি কেবল তাই চাই যার দ্বারা আমার রব খুশি হন। কারণ একমাত্র তার নিকট থেকেই আমি প্রতিদানের আশা করে থাকি। তখন উক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। –[ইবনে কাছীর ৬ : ৬৪৭]

إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتّٰى – এ বাক্যটি সূরা ইনশিকাকের إِنَّكَ كَادِحٌ إِلٰى رَبِّكَ كَدْحًا বাক্যের অনুরূপ যার তাফসীর সে সূরায় বর্ণিত হয়ে গেছে। মর্মার্থ এই যে, মানুষ সৃষ্টিগতভাবে কোনো না কোনো কাজের জন্য প্রচেষ্টা ও অধ্যবসায়ে অভ্যস্ত কিন্তু কোনো কোনো লোক তার অধ্যাবসায় ও পরিশ্রম দ্বারা চিরস্থায়ী সুখের ব্যবস্থা করে দেয়, আর কেউ কেউ এই পরিশ্রম দ্বারাই অনন্ত আজাব ক্রয় করে। হাদীসে আছে, প্রত্যেক মানুষ সকাল বেলায় গাত্রোত্থান করে নিজেকে ব্যবসায়ে নিয়োজিত করে। অতঃপর কেউ এই ব্যবসায়ে সফলতা অর্জন করে এবং নিজেকে পরকালের আজাব থেকে মুক্ত করে। পক্ষান্তরে কারও শ্রম ও প্রচেষ্টাই তার ধ্বংসের কারণ হয়ে যায়। কিন্তু বুদ্ধিমানের কাজ হলো প্রথমে নিজের প্রচেষ্টা ও কর্মের পরিণতি চিন্তা করা এবং যে কর্মের পরিণতি সাময়িক সুখ ও আনন্দ হয়, তার কাছেও না যাওয়া।

কর্মপ্রচেষ্টার দিক দিয়ে মানুষের দু'দল : অতঃপর কুরআন পাক কর্মপ্রচেষ্টার ভিত্তিতে মানুষকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছে এবং প্রত্যেকের তিনটি করে বিশেষণ বর্ণনা করেছে। প্রথমে সফলকাম দলের তিনটি বিশেষণ উল্লেখ করে বলা হয়েছে : فَأَمَّا مَنْ أَعْطٰى وَاتَّقٰى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى : অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করে, আল্লাহকে ভয় করে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে, তাঁর অনুশাসনের বিরুদ্ধাচরণ থেকে বেঁচে থাকে এবং সে উত্তম কলেমাকে সত্য মনে করে। এখানে 'উত্তম কালেমা' বলে কলেমায়ে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বোঝানো হয়েছে। (ইবনে আব্বাস, যাহ্হাক) এই কালেমাকে সত্য মনে করার অর্থ ঈমান আনা। যদিও ঈমান সব কর্মেরই প্রাণ এবং সবার অগ্রবর্তী বিষয় কিন্তু এখানে পেছনে উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত এই যে, এখানে উদ্দেশ্য প্রচেষ্টা ও অধ্যবসায় সম্পর্কে আলোচনা করা। এগুলো কর্মেরই অন্তর্ভুক্ত। ঈমান হলো একটি অন্তরের বিষয় অর্থাৎ অন্তরে আল্লাহ ও রাসূলকে সত্য জানা এবং কলেমায়ে শাহাদতের মাধ্যমে মুখেও তা স্বীকার করা। বলাবাহুল্য, এই উভয় কাজে কোনো শারিরিক শ্রম নেই এবং কেউ এগুলোকে কর্মের তালিকাভুক্ত গণ্য করে না।

দ্বিতীয় দলেরও তিনটি কর্ম উল্লেখ করা হয়েছে : وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى – অর্থাৎ যে আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করার ব্যাপারে কৃপণতা করে তথা জাকাত ও ওয়াজিব সদকাও দেয় না, আল্লাহকে ভয় করার পরিবর্তে তাঁর প্রতি বিমুখ হয় এবং উত্তম কালেমা তথা ঈমানের কলেমাকে মিথ্যা মনে করে। এতদুভয়ের প্রথম দল সম্পর্কে বলা হয়েছে فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرٰى : يُسْرٰى-এর শাব্দিক অর্থ সহজ ও আরামদায়ক বিষয়, যাতে কোনো কষ্ট নেই। এখানে জান্নাত বোঝানো হয়েছে। দ্বিতীয় দল সম্পর্কে বলা হয়েছে : فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرٰى – عُسْرٰى-এর শাব্দিক অর্থ কঠিন ও কষ্টদায়ক বিষয়। এখনে জাহান্নাম বোঝানো হয়েছে। উভয় বাক্যের অর্থ এই যে, যারা তাদের প্রচেষ্টা ও শ্রম প্রথমোক্ত তিন কাজে নিয়োজিত করে, (অর্থাৎ আল্লাহর পথে ব্যয় করা, আল্লাহকে ভয় করা এবং ঈমানকে সত্য মনে করা) তাদেরকে আমি জান্নাতের কাজের জন্য সহজ করে দেই। পক্ষান্তরে যারা তাদের প্রচেষ্টা ও শ্রমকে শেষোক্ত তিন কাজে নিয়োজিত করে, আমি তাদেরকে জাহান্নামের কাজের জন্য সহজ করে দেই। এখানে বাহ্যত এরূপ বলা সঙ্গত ছিল যে, আমি তাদের জন্য জান্নাতের অথবা জাহান্নামের কাজ সহজ করে দেই। কেননা কাজকর্মই সহজ অথবা কঠিন হয়ে থাকে– ব্যক্তি সহজ অথবা কঠিন হয় না। কিন্তু কুরআন পাক এভাবে ব্যক্ত করেছে যে, স্বয়ং তাদের সত্তাকে এসব কাজের জন্য সহজ করে দেওয়া হবে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, প্রথম দলের জন্য জান্নাতের কাজকর্ম তাদের মজ্জায় পরিণত হবে। আর এর বিপরীত কাজ করতে তারা কষ্ট অনুভব করবে। এমনিভাবে দ্বিতীয় দলের জন্য জাহান্নামের কাজকর্ম মজ্জায় পরিণত করে দেওয়া হবে। ফলে তারা এজাতীয় কাজই পছন্দ করবে এবং এতেই শান্তি পাবে। উভয় দলের মজ্জায় এ অবস্থা সৃষ্টি করে দেওয়াকেই একথা বলে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, স্বয়ং তাদেরকে এসব কাজের জন্য সহজ কারে দেওয়া হবে। এক হাদীস এর সমর্থনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :

اِعْمَلُوْا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ اَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَنُيَسَّرُ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ وَاَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ اَهْلِ الشَّقَاوَةِ.

অর্থাৎ তোমরা নিজ নিজ কর্ম করে যাও। কারণ প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য সেকাজই সহজ করা হয়েছে, যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাই যে ব্যক্তি সৌভাগ্যবান, সৌভাগ্যবানদের কাজই তার স্বভাব ও মজ্জায় পরিণত হয়। আর যে হতভাগা, হতভাগাদের কাজই তার স্বভাব ও মজ্জায় পরিণত হয়। এতদুভয় বিষয় আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করার ফলশ্রুতিতে অর্জিত হয়। তাই একারণে আজাব ও ছওয়াব দেওয়া হয়। অতঃপর হতভাগ্য জাহান্নামী দলকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে :

وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى : অর্থাৎ যে ধনসম্পদের খাতিরে এ হতভাগ্য ওয়াজিব হক দিতেও কৃপণতা করত, সে ধনসম্পদ আজাব আসার সময় তার কোনো কাজে আসবে না। تَرَدَّى-এর শাব্দিক অর্থ গর্তে পতিত হওয়া ও ধ্বংস হওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, মৃত্যুর পরে কবরে অতঃপর কিয়ামতে যখন সে জাহান্নামের গর্তে পতিত হবে, তখন এই ধনসম্পদ কোনো উপকারে আসবে না।

لَا يَصْلٰهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلّٰى : অর্থাৎ এই জাহান্নামে নিতান্ত হতভাগা ব্যক্তিই দাখিল হবে, যে আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি মিথ্যারোপ করে এবং তাঁদের আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। বলাবাহুল্য, এরূপ মিথ্যা আরোপকারী কাফেরই হতে পারে। এ থেকে বাহ্যত বোঝা যায় যে, পাপী মু'মিন যে মিথ্যারোপের অপরাধে অপরাধী নয়, সে জাহান্নামে দাখিল হবে না। অথচ কুরআনের অনেক আয়াত ও হাদীস থেকে জানা যায় যে, মু'মিন ব্যক্তি গোনাহ্ করার পর যদি তওবা না করে অথবা কারও সুপারিশের বলে কিংবা বিশেষ রহমতে যদি তাকে ক্ষমা করা না হয়, তবে সেও জাহান্নামে যাবে এবং গোনাহের শাস্তি ভোগ করা পর্যন্ত জাহান্নামে থাকবে। অবশ্য শাস্তি ভোগ করার পর জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে ঈমানের কল্যাণে তাকে জান্নাতে দাখিল করা হবে। কিন্তু আলোচ্য আয়াতের ভাষা বাহ্যত এর পরিপন্থি। অতএব এ আয়াতের অর্থ এমন হওয়া জরুরি, যা অন্যান্য আয়াত ও সহীহ হাদীসের খেলাফ নয়। এখানে চিরকালের জন্য দাখিল হওয়া বোঝানো হয়েছে। এটা কাফেরেরই বৈশিষ্ট্য! মু'মিন কোনো না কোনো সময় গোনাহের শাস্তি ভোগ করার পর জাহান্নাম থেকে উদ্ধার পাবে। তাফসীরবিদগণ এছাড়া আরও কিছু ব্যাখ্যা করেছেন। তাফসীরে মাযহারীতে আছে যে, আয়াতে اَشْقٰى এবং اَتْقٰى শব্দদ্বয়ের অর্থ ব্যাপক নয় বরং এখানে তাদেরকেই বোঝানো হয়েছে যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আমলে বিদ্যমান ছিল। তাদের মধ্যে কোনো মুসলমান গোনাহ্ করা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংসর্গের বরকতে জাহান্নামে যাবে না।

সাহাবায়ে কেরাম সবাই জাহান্নাম থেকে মুক্ত : কারণ প্রথমত তাঁদের দ্বারা গোনাহ্ খুব কমই হয়েছে। তাছাড়া তাঁদের অবস্থা থেকে একথা জরুরিভাবে জানা যায় যে, তাঁদের কারও দ্বারা কোনো গোনাহ্ হয়ে থাকলে তিনি তওবা করে নিয়েছেন। আরও বলা যায় যে, তাঁদের এক একটি গোনাহের মোকাবিলায় সৎকর্মের সংখ্যা এত বেশি যে, সে গোনাহ্ অনায়াসেই মাফ হয়ে যেতে পারে। কুরআন পাকে বলা হয়েছে : إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ অর্থাৎ সৎ কর্ম অসৎ কর্মের কাফফরা হয়ে যায়। স্বয়ং রাসূলে কারীম ﷺ-এর সঙ্গও এমন একটি সৎকর্ম, যা সব সৎকর্মের উপর প্রবল। হাদীসে সৎকর্মশীল বুযুর্গদের সম্পর্কে বলা হয়েছে : هُمْ قَوْمٌ لَا يَشْقٰى جَلِيْسُهُمْ وَلَا يَخَابُ اَنِيْسُهُمْ অর্থাৎ তাঁদের সাথে যারা উঠাবসা করে, তারা হতভাগা হতে পারে না এবং তাদের সাথে যারা প্রীতির সম্পর্ক রাখে, তারা বঞ্চিত হতে পরে না। –(বুখারী, মুসলিম) সুতরাং যে ব্যক্তি পয়গম্বরকুল শিরোমণি হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ-এর সহচর হবে, সে কিরূপে হতভাগ্য হতে পারে? এ কারণেই অনেক সহীহ হাদীসে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, সাহাবায়ে কেরাম সবাই জাহান্নামের আজাব থেকে মুক্ত। খোদ কুরআনে সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে বলা হয়েছে : وَكُلًّا وَعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى –অর্থাৎ তাঁদের প্রত্যেকের জন্য আল্লাহ তা'আলা হুসনা অর্থাৎ জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। অন্য এক আয়াতে আছে : إِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنٰى اُولٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ : অর্থাৎ যাদের জন্য আমার পক্ষ থেকে হুসনা (জান্নাত) অবধারিত হয়ে গেছে, তাদেরকে জাহান্নামের অগ্নি থেকে দূরে রাখা হবে। এক হাদীসে আছে, জাহান্নামের অগ্নি সে ব্যক্তিকে সম্পর্শ করবে না, যে আমাকে দেখেছে। –[তিরমিযী]

وَسَيُجَنَّبُهَا الْاَتْقَى الَّذِيْ يُؤْتِيْ مَالَهُ يَتَزَكّٰى : এতে সৌভাগ্যশালী আল্লাহভীরুদের প্রতিদান বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহকে আনুগত্যে অভ্যস্ত এবং একমাত্র গোনাহ্ থেকে শুদ্ধ হওয়ার উদ্দেশ্যে ধনসম্পদ ব্যয় করে, তাকে জাহান্নামের অগ্নি থেকে দূরে রাখা হবে।

আয়াতের ভাষা থেকে ব্যাপকভাবে বোঝা যায় যে, যে ব্যক্তিই ঈমানসহ আল্লাহর পথে ধনসম্পদ ব্যয় করে, তাকেই জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে। কিন্তু এ আয়াতের শানে-নুযূল সংক্রান্ত ঘটনা থেকে জানা যায় যে, এখানে اَتْقٰى বলে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-কে বোঝানো হয়েছে। হযরত ওরওয়া (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, সাতজন মুসলমানকে কাফেররা গোলাম বানিয়ে রেখেছিল এবং ইসলাম গ্রহণের কারণে তাদের উপর অকথ্য নির্যাতন চালাত। হযরত আবূ বকর (রা.) বিরাট অংকের অর্থ দিয়ে তাদেরকে কাফের মালিকদের কাছ থেকে ক্রয় করে নেন এবং মুক্ত করে দেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাজিল হয়। –[মাযহারী]

এর সাথেই সম্পর্কশীল আয়াতের শেষ বাক্যে বলা হয়েছে : وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ –অর্থাৎ যেসব গোলামকে হযরত আবূ বকর (রা.) প্রচুর অর্থ দিয়ে ক্রয় করে মুক্ত করে দেন, তাদের কোনো সাবেক অনুগ্রহও তাঁর উপর ছিল না, যার প্রতিদানে এরূপ করা যেত; বরং إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ –তাঁর লক্ষ্য মহান আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অন্বেষণ ব্যতীত কিছুই ছিল না।

মুস্তাদরাক হাকিমে হযরত যুবায়ের (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবূ বকর (রা.)-এর অভ্যাস ছিল যে, তিনি কোনো মুসলমানকে কাফের মালিকের হাতে বন্দী দেখলে তাকে ক্রয় করে মুক্ত করে দিতেন। এ ধরনের মুসলমান সাধারণত দুর্বল ও শক্তিহীন হতো। একদিন তাঁর পিতা হযরত আবূ কোহাফা বললেন : তুমি যখন গোলামদেরকে মুক্তই করে দাও, তখন শক্তিশালী ও সাহাসী গোলাম দেখে মুক্ত করা উচিত, যাতে ভবিষ্যতে সে শত্রুর হাত থেকে তোমাকে হেফাজত করতে পারে। হযরত আবূ বকর (রা.) বললেন : কোনো মুক্ত করা মুসলমান দ্বারা উপকার লাভ করা আমার লক্ষ্য নয়। আমি তো কেবল আল্লহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যই তাদেরকে মুক্ত করি। –[মাযহারী]

وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যেই তার ধনসম্পদ ব্যয় করেছে এবং পার্থিব উপকার চায়নি, আল্লাহ তা'আলাও পরকালে তাকে সন্তুষ্ট করবেন এবং জান্নাতের মহা নিয়ামত তাকে দান করবেন। এই শেষ বাক্যটি হযরত আবূ বরক (রা.)-এর জন্য একটি বিরাট সুসংবাদ। আল্লাহ তাঁকে সন্তুষ্ট করবেন এ সংবাদ দুনিয়াতেই তাঁকে শোনানো হয়েছে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

يَغْشَىٰ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার غِشَاءً মূলবর্ণ (غ - ش - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– আচ্ছন্ন করে ফেলে।

تَجَلَّىٰ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার تَجَلِّيً মূলবর্ণ (ج - ل - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– আলোকিত হয়ে পড়ে।

شَتَّىٰ : অর্থ– বিভিন্ন রকম। ভিন্ন ভিন্ন। আলাদা-আলাদা। কারো নিকট এটি মুফরাদ আবার কারো নিকট شتيت -এর বহুবচন।

أَعْطَىٰ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব إِفْعَالٌ মাসদার إِعْطَاءً মূলবর্ণ (ع - ط - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– দান করেছে। দিয়েছে।

اِتَّقَىٰ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব إِفْتِعَالٌ মাসদার إِتِّقَاءً মূলবর্ণ (و - ق - ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– আল্লাহকে ভয় করেছে।

صَدَّقَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَصْدِيْقٌ মূলবর্ণ (ص - د - ق) জিনস صحيح অর্থ– সে সত্য বলে বুঝেছে।

حُسْنَىٰ : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم تفضيل বাব كَرُمَ মাসদার اَلْحُسْنُ মূলবর্ণ (ح - س - ن) জিনস صحيح অর্থ– ভালো কথা, অতি সুন্দর।

نُيَسِّرُ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيل মাসদার تَيْسِيْرًا মূলবর্ণ (ى - س - ر) জিনস مثال يائى অর্থ– আমি সুগম করে দিব।

يُسْرَىٰ : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم تفضيل বাব ضَرَبَ মাসদার يُسْرٌ মূলবর্ণ (ى - س - ر) জিনস مثال يائى অর্থ– অধিক সহজ।

بَخِلَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার بُخْلٌ মূলবর্ণ (ب - خ - ل) জিনস صحيح অর্থ– সে কৃপণতা করেছে, কার্পণ্য করেছে।

إِسْتَغْنٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব إِسْتِفْعَالْ মাসদার إِسْتِغْنَاءٌ মূলবর্ণ (غ - ن - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– নিজেকে স্বয়ং সম্পূর্ণ মনে করেছে।

عُسْرٰى : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم تفضيل বাব سَمِعَ মাসদার عُسْرٌ মূলবর্ণ (ع - س - ر) জিনস صحيح অর্থ– ক্লেশ দায়ক বস্তু, চরম কাঠিন্য, দুর্গম পথ, শক্ত জিনিস, কঠিন কাজ।

تَرَدّٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفَعُّلْ মাসদার تَرَدِّىْ মূলবর্ণ (ر - د - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– অধঃপতিত হবে।

اَنْذَرْتُ : সীগাহ واحد متكلم বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالْ মাসদার إِنْذَارٌ মূলবর্ণ (ن - ذ - ر) জিনস صحيح অর্থ– আমি ভয় দেখালাম।

تَلَظّٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفَعُّلْ মাসদার تَلَظِّىْ মূলবর্ণ (ل - ظ - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– প্রজ্বলিত অগ্নি। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে।

اَشْقٰى : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم تفضيل বাব سَمِعَ মাসদার اَلشَّقْوُ মূলবর্ণ (ش - ق - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– চরম হতভাগা।

اَتْقٰى : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم تفضيل বাব ضَرَبَ মাসদার وَقْىٌ মূলবর্ণ (و - ق - ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– অত্যন্ত পরহেজগার।

يَتَزَكّٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفَعُّلْ মাসদার تَزَكِّىْ মূলবর্ণ (ز - ك - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– সে পবিত্র হয়।

تُجْزٰى : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার جَزَاءٌ মূলবর্ণ (ج - ز - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– তার প্রতিদান দিতে হয়।

يَرْضٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার رِضًى মূলবর্ণ (ر - ض - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– সন্তুষ্ট হয়ে যাবে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَسَيُجَنَّبُهَا الْاَتْقَى الَّذِىْ يُؤْتِىْ مَالَهٗ يَتَزَكّٰى : এখানে واو টি হরফে আতফ। আর سَيُجَنَّبُهَا -এর سين টি حرف استقبال যা তাকিদের জন্য হয়েছে। আর يُجَنَّبُ ফে'ল। আর هَا হলো মাফউলে বিহী, আর الْاَتْقٰى হলো ফায়েল। আর الَّذِىْ হলো الْاَتْقٰى -এর সিফত, আর يُؤْتِىْ বাক্যটি الَّذِىْ -এর সেলাহ হয়েছে। আর مَالَهٗ হলো মাফউলে বিহী। আর يَتَزَكّٰى ফে'ল, তার উহ্য যমীর হলো ফায়েল, আর বাক্যটি হয়তো يُؤْتِىْ থেকে بدل হয়েছে। তখন এর কোনো اعراب -এর محل নেই। কেননা তখন সেটা الَّذِىْ -এর সেলাহ -এর অধীনে হয়ে যাবে। অথবা বাক্যটি يُؤْتِىْ -এর ফায়েল থেকে حال হবে অর্থাৎ مُتَزَكِّيًا بِهٖ عِنْدَ اللّٰهِ –[ই'রাবুল কুরআন ৮ম খণ্ড; পৃ. ৩৩৬]

سُوْرَةُ الضُّحٰى مَكِّيَّةٌ

সূরা দুহা

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত– ১১, রুকূ'– ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

অনুবাদ	আয়াত
১. শপথ দিনের আলোকের।	وَالضُّحٰى ﴿١﴾
২. আর রাত্রির, যখন তা প্রশান্ত হয়।	وَالَّيْلِ اِذَا سَجٰى ﴿٢﴾
৩. আপনার প্রতিপালক আপনাকে পরিত্যাগও করেনি এবং আপনার প্রতি বিরূপও হননি।	مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى ﴿٣﴾
৪. আর আপনার জন্য ইহকাল অপেক্ষা পরকাল বহুগুণে উত্তম।	وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى ﴿٤﴾
৫. আর সত্বরই আল্লাহ আপনাকে [এরূপ বস্তু] দান করবেন, অনন্তর আপনি [তা পেয়ে] সন্তুষ্ট হবেন।	وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى ﴿٥﴾
৬. আল্লাহ কি আপনাকে এতিম অবস্থায় পাননি? অতঃপর তিনি আপনাকে আশ্রয় দিয়েছেন।	اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاٰوٰى ﴿٦﴾
৭. আর আল্লাহ আপনাকে [শরিয়ত হতে] বে-খবর পেয়েছিলেন, অনন্তর আপনাকে পথ দেখিয়েছেন।	وَوَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدٰى ﴿٧﴾
৮. আর আল্লাহ আপনাকে সম্বলহীন পেয়েছিলেন, অতঃপর সম্পদশালী করেছেন।	وَوَجَدَكَ عَآئِلًا فَاَغْنٰى ﴿٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. وَالضُّحٰى কসম দিনের আলোকের।

২. وَالَّيْلِ আর রাত্রির اِذَا سَجٰى যখন তা প্রশান্ত হয়।

৩. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ আপনার প্রতিপালক আপনাকে পরিত্যাগও করেননি وَمَا قَلٰى এবং আপনার প্রতি বিরূপও হননি।

৪. وَلَلْاٰخِرَةُ আর পরকাল خَيْرٌ لَّكَ আপনার জন্য বহু গুণে উত্তম مِنَ الْاُوْلٰى ইহকাল আপেক্ষা।

৫. وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ আর সত্বরই আপনাকে দান করবেন رَبُّكَ আল্লাহ (তোমার প্রভু) فَتَرْضٰى অনন্তর আপনি (তা পেয়ে) সন্তুষ্ট হবেন।

৬. اَلَمْ يَجِدْكَ আল্লাহ কি আপনাকে পাননি يَتِيْمًا এতিম فَاٰوٰى অতঃপর তিনি আপনাকে আশ্রয় দিয়েছেন।

৭. وَوَجَدَكَ আর আল্লাহ আপনাকে পেয়েছিলেন ضَآلًّا (শরিয়ত হতে) বেখবর فَهَدٰى অনন্তর আপনাকে পথ দেখিয়েছেন।

৮. وَوَجَدَكَ আর আল্লাহ আপনাকে পেয়েছিলেন عَآئِلًا সম্বলহীন فَاَغْنٰى অতঃপর সম্পদশালী করেছেন।

৯. অতএব, আপনি এতিমের প্রতি কঠোরতা করবেন না।	فَاَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تَقْهَرْ ﴿٩﴾
১০. আর ভিক্ষুককে ভর্ৎসনা করবেন না।	وَاَمَّا السَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرْ ﴿١٠﴾
১১. আর স্বীয় প্রভুর দানসমূহের আলোচনা করতে থাকুন।	وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴿١١﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৯. فَاَمَّا الْيَتِيْمَ অতএব, আপনি এতিমের প্রতি فَلَا تَقْهَرْ কঠোরতা করবেন না।
১০. وَاَمَّا السَّآئِلَ আর ভিক্ষুককে فَلَا تَنْهَرْ ভর্ৎসনা করবেন না।
১১. وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ আর স্বীয় প্রভুর দান সমূহের فَحَدِّثْ আলোচনা করতে থাকুন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : সূরাটির প্রথম শব্দ اَلضُّحٰى -কেই এর নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। এতে ১১টি আয়াত, ৪০টি বাক্য এবং ১০২টি অক্ষর রয়েছে।

অবতীর্ণ হওয়ার সময়কাল : এ সূরার আলোচ্য বিষয় হতে জানা যায় যে, সূরাটি মাক্কী জীবনে ইসলামের প্রথমিক পর্যায়ে অবতীর্ণ হয়েছে। হাদীসের বর্ণনা হতে জানা যায় যে, কিছুদিন পর্যন্ত ওহী নাজিল হওয়া বন্ধ থাকার কারণে নবী করীম ﷺ বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। তাঁর মনে বারবার আশঙ্কা জাগছিল যে, আমার দ্বারা এমন কোনো অপরাধ তো হয়ে পড়েনি; যার কারণে আমার আল্লাহ আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হতে পারেন। এরূপ মানসিক অবস্থায় এ সূরাটি নাজিল হয়। এতে নবী করীম ﷺ -কে বিশেষভাবে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে– আপনার প্রতি আল্লাহ তা'আলার কোনোরূপ অসন্তোষ নেই এবং ওহী নাজিল হওয়াও এ কারণে বন্ধ হয়ে যায়নি; বরং একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে বন্ধ রাখা হয়েছে। দিনের আলোর পর রাতের নিঝুম অন্ধকারের প্রশান্তির মূলে যে লক্ষ্য কার্যকর থাকে তার পশ্চাতেও ঠিক তাই নিহিত রয়েছে। মূলকথা ওহীর তীব্র রশ্মি যদি আপনার উপর নিরবিচ্ছিন্নভাবে আপতিত হতে থাকে এবং মোটেই অবকাশ দেওয়া না হতো, তাহলে আপনার স্নায়ুমণ্ডলীর পক্ষে তা সহ্য করা কঠিন হয়ে পড়ত। এ কারণে মাঝখানে বিরতি দেওয়া হয়েছে। এ বিরতিকালে আপনি সম্পূর্ণ প্রশান্তি লাভ করবেন। বস্তুত ওহী নাজিল হওয়ার প্রথমিককালে নবী করীম ﷺ -এর স্নায়ুমণ্ডলীর উপর এক দুঃসহ প্রভাব পড়ত। তখন পর্যন্তও ওহীর তীব্র চাপ সহ্য কারার অভ্যাস তাঁর হয়নি, এ কারণে এ ব্যাপারে মাঝে মধ্যে অবকাশ ও বিরতি দেওয়া অপরিহার্য ছিল। পরে অবশ্য এ চাপ সহ্য করার মতো শক্তি তাঁর মধ্যে জেগেছিল। সেজন্য প্রাথমিক পর্যায় অতিক্রম হওয়ার পর ওহী নাজিল হওয়ার ব্যাপারে বিরতি দেওয়ার তেমন কোনো প্রয়োজন হয়নি।

সূরার শেষভাগে আল্লাহ তা'আলা নবী করীম ﷺ -কে বলেছেন– আপনার প্রতি আমি যেসব দয়া ও অনুগ্রহ করেছি, তার প্রত্যুত্তরস্বরূপ আল্লাহর বান্দাদের প্রতি আপনার কিরূপ ব্যবহার হওয়া উচিত এবং আমার নিয়ামতসমূহের শোকর কিভাবে আদায় করা উচিত, তা আপনি উত্তমরূপে বুঝে নিন এবং স্মৃতিপটে আঁকিয়ে রাখুন।

সূরাটির বিষয়বস্তু ও মূলবক্তব্য : নবী করীম ﷺ -কে সান্ত্বনা দান করাই এ সূরার মূলবক্তব্য ও বিষয়বস্তু। ওহী নাজিল হওয়া সাময়িকভাবে বন্ধ থাকার কারণে নবী করীম ﷺ -এর মনে যে উদ্বেগ দেখা দিয়েছিল, তা দূর করাই ছিল এ সূরার উদ্দেশ্য। সূরার শুরুতে দিনের দীপ্তি ও রাতের প্রশান্তির শপথ করা হয়েছে এবং নবী করীম ﷺ -কে সুসংবাদ শুনানো হয়েছে এই বলে যে, আপনার আল্লাহ আপনাকে কক্ষণই পরিত্যাগ করেননি। তিনি আপনার প্রতি বিন্দুমাত্র অসন্তুষ্টও নন। অল্প দিনের মধ্যেই এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে। আপনার পক্ষে প্রতিটি পরবর্তী পর্যায় পূর্ববর্তী পর্যায়ের তুলনায় উত্তম হবে এবং এ পরিবর্তন অব্যাহত ধারায় হতে থাকবে। অচিরেই আল্লাহ তা'আলা আপনার প্রতি দয়া ও অনুগ্রহের বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। তা পেয়ে আপনি অত্যন্ত তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট হবেন। পরবর্তীকালে এ ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হয়েছিল। অথচ যখন এ ভবিষ্যদ্বাণী করা হয় তখন এর কোনো সম্ভাবনাই জাগতিক দৃষ্টিতে পরিদৃষ্ট হচ্ছিল না।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা নবী করীম ﷺ -কে সম্বোধন করে ইরশাদ করেন– আমি আপনাকে পরিত্যাগ করেছি এমন ধারণা আপনার মনে কেমন করে আসল? আমি আপনাকে পরিত্যাগ করিছি– এমন ধারণা বশতঃ আপনি উদ্বিগ্নই বা হলেন

কেন? অথচ আপনার জন্ম হতেই আমি আপনার প্রতি ক্রমাগত ও অব্যাহত ধারায় অনুগ্রহ করে আসছি। আপনি তো এতিম ছিলেন, আমিই আপনার লালন-পালন ও হেফাজতের নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা করে দিয়েছি। আপনি পথের সন্ধানে ব্যাকুল ছিলেন, আমিই আপনাকে সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছি। আপনি ছিলেন নিঃসম্বল আমিই আপনাকে সম্পদশালী করেছি। মোটকথা, শুরু হতেই আমার দয়া ও অনুগ্রহ আপনার উপর বর্ষিত হচ্ছিল।

পরিশেষে বলা হয়েছে, হে নবী! আপনার প্রতি আমি যেসব দয়া ও অনুগ্রহ দান করেছি, তার প্রতিদান স্বরূপ আল্লাহর বান্দাদের প্রতি আপনার কিরূপ ব্যবহার হওয়া উচিত এবং কিভাবে আমার নিয়ামতসমূহের শোকর আদায় করা উচিত তা আপনি ভালোভাবে বুঝে নিন এবং তদনুযায়ী আমল করুন।

সূরাটির ফজিলত : বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি এ সূরা তেলাওয়াত করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে সেসব লোকের অন্তর্ভুক্ত করবেন যাদের ব্যাপারে নবী করীম ﷺ-এর সুপারিশ গৃহীত হবে। তা ছাড়া যত এতিম ও ভিক্ষুক আছে তাদের সংখ্যায় দশগুণ ছওয়াব তাকে দান করা হবে।

প্রকাশ থাকে যে, এ সূরা ও তার পরবর্তী সূরাসমূহ পাঠ করার পর لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ তাকবীর পাঠ করা সুন্নত। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ এ সূরা নাজিল হওয়ার পর উক্ত তাকবীর পাঠ করেছেন।

وَالضُّحٰى وَالَّيْلِ اِذَا سَجٰى .... الاية.

শানে নুযূল–১ : এই আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে একাধিক ঘটনাবলি রয়েছে। তিরমিযীতে হযরত যুন্দুব ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একটি আংগুলিতে আঘাত লেগে রক্ত বের হয়ে পড়লে বললেন– هَلْ اَنْتِ اِلَّا اِصْبَعٌ دُمِيْتِ × وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَا لَقِيْتِ তুমি তো একটি আংগুলিই যা রক্তাক্ত হয়ে গেছো। তুমি যে কষ্ট পেয়েছো তা আল্লাহর পথেই পেয়েছো। (কাজেই দুঃখ কিসের) এ ঘটনার পর কিছু দিন হযরত জিবরাঈল (আ.) ওহী নীয়ে আগমন করলেন না। এতে মুশরিকরা বলতে শুরু করে দেয় যে, মুহাম্মদকে তার আল্লাহ পরিত্যাগ করেছেন ও তার প্রতি রুষ্ট হয়েছেন। এরই প্রেক্ষিতে সূরা আদ দুহা অবতীর্ণ হয়।

শানে নুযূল–২ : বুখারী শরীফে জুনদুব (রা.) থেকে আরও একটি রেওয়ায়েত রয়েছে যার মধ্যে তাহাজ্জুদের আলোচনা রয়েছে। রেওয়ায়েতটির বিস্তারিত বিবরণ হলো একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ অসুস্থ হয়ে যাওয়ায় একবার দু'রাত তাহাজ্জুদের নামাজ আদায় করতে পারেননি। তখন রাসূল ﷺ-এর কাছে একজন মহিলা আসল। সে ছিল আবূ লাহাবের স্ত্রী আওরা বিন তোহার এবং সুফিয়ানের বোন এবং হারব ইবনে উমাইয়্যার কন্যা। তাকে উম্মে জামিলও বলা হতো। যিনি সূরা লাহাবে ঘোষিত حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ছিলেন। সে বলল, আমার মনে হয় তোমার উপর যে শয়তান আছর করেছে সে তোমাকে ছেড়ে দিয়েছে, কেননা আমি তাকে তোমার কাছে দু'তিন রাতধরে দেখতে পাচ্ছি না। এ পরিপ্রেক্ষিতেই উক্ত আয়াত নাজিল হয়েছে। –[কুরতুবী ২০ : ৯২, বুখারী শরীফ]

শানে নুযূল–৩ : একবার কুরআন অবতরণের প্রথম ভাগে যাকে "ফাতরাতে ওহীর" কাল বলা হয়। এটাই ছিল বেশি দিনের বিলম্ব। দ্বিতীয়বার তখন বিলম্বিত হয়েছিল, যখন মুশরিকরা অথবা ইহুদিরা রাসূল ﷺ-এর কাছে রূহের স্বরূপ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল এবং তিনি পরে জবাব দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তখন ইনশাআল্লাহ না বলার কারণে ওহীর আগমন বেশ কিছু দিন বন্ধ ছিল। এতে মুশরিকরা বলাবলি শুরু করল যে, মুহাম্মদের আল্লাহ অসন্তুষ্ট হয়ে তাকে পরিত্যাগ করেছেন। সে ঘটনার প্রেক্ষিতে এ সূরা অবতীর্ণ হয়।

وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى (٤)

শানে নুযূল-১ : একদা নবী করীম ﷺ বললেন, আমার পর আমার উম্মতের বিজিত রাজ্যগুলো আমাকে দেখানো হয়েছে। তাতে আমার মন অত্যন্ত খুশি হয়েছে। সে প্রেক্ষিতেই এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। –[২০ : ৯৫]

وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى (٥)

শানে নুযূল : আসকারী, ইবনে মারদুভিয়া প্রমূখ হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, হযরত রাসূল ﷺ হযরত ফাতেমা (রা.)-এর নিকট গমন করে দেখতে পেলেন ফাতেমা চাকা দিয়ে আটা তৈরি করছে। তার পরিধানে রয়েছে উট রাখালের চাদর। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তা দেখতে পেলেন, তিনি বললেন, হে ফাতেমা! সত্বরই পরলৌকিক আরাম আয়েশের জন্যে ইহলৌকিক দুঃখ কষ্ট ভোগ করে নাও। রাসূল ﷺ কর্তৃক ফাতেমা (রা.)-কে সান্ত্বনা দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[দুররে মানছুর ৩৬১/৬]

শানে নুযূল–২ : মুজাহিদ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও উবাই বিন কা'আব (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ যখন সূরা وَالضُّحٰى শেষ করতেন তখন পরবর্তী সকল সূরার শেষেই اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলে তাকবীর বলতেন।

তাতে সূরার সাথে তাকবীর মিলিয়ে পড়তেন না বরং আলাদা করে পড়তেন। এর কারণ হচ্ছে হযরত নবী করীম ﷺ-এর প্রতি কোনো কারণ বশতঃ ওহী আসতে বিলম্বিত হওয়ার কারণে মুশরিকরা বলত যে, মুহাম্মদ এর রব মুহাম্মদকে পরিত্যাগ করেছ ও তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে পড়েছে। তখন এ সূরা নাজিল হয়েছে। তৎক্ষণাৎ তিনি বলেছিলেন আল্লাহু আকবর। সে কারণে পরবর্তী সকল সূরার শেষ করে তাকবীল বলা সুন্নত। তা হলো اَللّٰهُ اَكْبَرُ অথবা لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اللّٰهُ اَكْبَرُ –[কুরতুবী ৯৪/২০, দুররে মানছুর]

এই সূরা অবতরণের কারণ সম্পর্কে বুখারী, মুসলিম ও তিরমিযীতে হযরত জুনদুব ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি অংগুলীতে আঘাত লেগে রক্ত বের হয়ে পড়লে বললেন :

اِنْ اَنْتِ اِلَّا اِصْبَعٌ دَمِيْتِ * وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَالَقِيْتِ

অর্থাৎ তুমি তো একটি অংগুলিই যা রক্তাক্ত হয়ে গেছে। তুমি যে কষ্ট পেয়েছ, তা আল্লাহর পথেই পেয়েছ। (কাজেই দুঃখ কিসের)। এ ঘটনার পর কিছু দিন হযরত জিবরাঈল (আ.) ওহী নিয়ে আগমন করলেন না। এতে মুশরিকরা বলতে শুরু করে যে, মুহাম্মদকে তার আল্লাহ পরিত্যাগ করেছেন ও তার প্রতি রুষ্ট হয়েছেন। এরই প্রেক্ষিতে এই সূরা দুহা অবতীর্ণ হয়। বুখারীতে বর্ণিত হযরত জুনদুব (রা.)-এর রেওয়ায়েতে দু'এক রাত্রিতে তাহাজ্জুদের জন্য না উঠার কথা আছে–ওহী বিলম্বিত হওয়ার কথা নেই। তিরমিযীতে তাহাজ্জুদের জন্য না উঠার উল্লেখ নেই, শুধু ওহী বিলম্বিত হওয়ার কথা উল্লেখ আছে। বলাবাহুল্য, উভয় ঘটনাই সংঘটিত হতে পারে বিধায় উভয় রেওয়ায়েতে কোনো বিরোধ নেই। বর্ণনাকারী হয় তো এক সময়ে এক ঘটনা এবং অন্য সময়ে অন্য ঘটনা বর্ণনা করেছেন। অন্যান্য রেওয়ায়েতে আছে যে, আবূ লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামীল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিরুদ্ধে এই অপপ্রচার চালিয়েছিল। ওহী বিলম্বিত হওয়ার ঘটনা কয়েকবার সংঘটিত হয়েছিল। একবার কুরআন অবতরণের প্রথমভাগে, যাকে 'ফাতরাতে-ওহীর' কাল বলা হয়। এটাই ছিল বেশি দিনের বিলম্ব। দ্বিতীয়বার তখন বিলম্বিত হয়েছিল, যখন মুশরিকরা অথবা ইহুদিরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে রূহের স্বরূপ সম্পর্কে প্রশ্ন রেখেছিল এবং তিনি পরে জবাব দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তখন 'ইনশাআল্লাহ' না বলার কারণে ওহীর আগমন বেশ কিছুদিন বন্ধ ছিল। এতে মুশরিকরা বলাবলি শুরু করল যে, মুহাম্মদের আল্লাহ অসন্তুষ্ট হয়ে তাকে পরিত্যাগ করেছেন। যে ঘটনার প্রেক্ষিতে সূরা দুহা অবতীর্ণ হয়, সেটাও এমনি ধরনের। সবগুলো ঘটনা একই সময়ে সংঘটিত হওয়া জরুরি নয় বরং আগে-পিছেও হতে পারে।

وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى : এখানে اٰخِرَةُ ও اُوْلٰى শব্দদ্বয়ের প্রসিদ্ধ অর্থ পরকাল ও ইহকাল নেওয়া হলে এর ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে যে, মুশরিকরা আপনার বিরুদ্ধে যে অপপ্রচার চালাচ্ছে, এর আসারতা তো তারা ইহকালে দেখে নিবেই, অধিকন্তু আমি আপনাকে পরকালে নিয়ামত দান করারও ওয়াদা দিচ্ছি। সেখানে আপনাকে ইহকাল অপেক্ষা অনেক বেশি নিয়ামত দান করা হবে। এখানে اٰخِرَةُ কে শাব্দিক অর্থে নেওয়াও অসম্ভব নয়। অতএব, এর অর্থ পরবর্তী অবস্থা; যেমন اُوْلٰى শব্দের অর্থ প্রথম অবস্থা। আয়াতের অর্থ এই যে, আপনার প্রতি আল্লাহর নিয়ামত দিন দিন বেড়েই যাবে এবং প্রত্যেক প্রথম অবস্থা থেকে পরবর্তী অবস্থা উত্তম ও শ্রেয় হবে। এতে জ্ঞানগরিমা ও আল্লাহর নৈকট্যে উন্নতি লাভসহ জীবিকা এবং পার্থিব প্রভাব-প্রতিপত্তি ইত্যাদি সব অবস্থাই অন্তর্ভুক্ত।

وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى : অর্থাৎ আপনার পালনকর্তা আপনাকে এত প্রাচুর্য দেবেন যে, আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। এতে কি দেবেন, তা নির্দিষ্ট করা হয়নি। এতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, প্রত্যেক কাম্যবস্তুই প্রচুর পরিমাণে দেবেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাম্যবস্তুসমূহের মধ্যে ছিল ইসলামের উন্নতি, সারা বিশ্বে ইসলামের প্রসার, উম্মতের প্রয়োজনীয় উপকরণাদি, শত্রুর বিরুদ্ধে তাঁর বিজয়লাভ, শত্রুদেশে ইসলামের কলেমা সমুন্নত করা ইত্যাদি। হাদীসে আছে, এ আয়াত নাজিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তাহলে আমি ততক্ষণ সন্তুষ্ট হব না, যতক্ষণ আমার উম্মতের একটি লোকও জাহান্নামে থাকবে। (কুরতুবী) হযরত আলী (রা.) বর্ণিত এক রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মত সম্পর্কে আমার সুপারিশ কবুল করবেন এবং অবশেষে তিনি বলবেন : رَضِيْتَ يَا مُحَمَّدُ হে মুহাম্মদ! এখন আপনি সন্তুষ্ট হয়েছেন কি? আমি আরজ করব : يَارَبِّ رَضِيْتُ হে আমার পরওয়ারদিগার! আমি সন্তুষ্ট। সহীহ মুসলিমের রেওয়ায়েতে হযরত আমর ইবনে আস (রা.) বর্ণনা করেন : একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত ইবরাহীম (আ.) সম্পর্কিত এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন : فَمَنْ تَبِعَنِىْ فَاِنَّهٗ مِنِّىْ وَمَنْ عَصَانِىْ فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ –অতঃপর হযরত ঈসা (আ.)-এর উক্তি সম্বলিত অপর একটি আয়াত তেলাওয়াত করলেন : اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ –এরপর তিনি দু'হাত তুলে কান্না বিজড়িত কণ্ঠে বারবার বলতে লাগলেন : اَللّٰهُمَّ اُمَّتِىْ اُمَّتِىْ আল্লাহ তা'আলা জিবরাঈলকে কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করতে প্রেরণ করলেন : (এবং বললেন, অবশ্য আমি সব জানি)। জিবরাঈলের জবাবে তিনি বললেন : আমি আমার উম্মতের মাগফেরাত চাই। আল্লাহ তা'আলা জিবরাঈলকে বললেন : যাও, গিয়ে বল যে, আল্লাহ তা'আলা উম্মতের ব্যাপারে আপনাকে সন্তুষ্ট করবেন এবং আপনাকে দুঃখিত করবেন না।

উপরে কাফেরদের বলাবলির জবাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি ইহকালে ও পরকালে আল্লাহর নিয়ামতের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ছিল। অতঃপর তিনটি বিশেষ নিয়ামত উল্লেখ করে এর কিঞ্চিৎ বিবরণ দেওয়া হয়েছে : الم يجدك يتيما فاوى –এটা প্রথম নিয়ামত। অর্থাৎ আমি আপনাকে পিতৃহীন পেয়েছি। আপনার জন্মের পূর্বেই পিতা ইন্তেকাল করেছিল। পিতা কোনো বিষয়-আশয়ও ছেড়ে যায়নি, যা দ্বারা আপনার লালন-পালন হতে পারত। অতঃপর আমি আপনাকে আশ্রয় দিয়েছি। অর্থাৎ প্রথমে পিতামহ আব্দুল মুত্তালিবের ও পরে পিতৃব্য আবূ তালিবের অন্তরে আপনার প্রতি অগাধ ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছি। ফলে তারা ঔরসজাত সন্তান অপেক্ষা অধিক যত্নসহকারে আপনাকে লালন-পালন করত।

দ্বিতীয় নিয়ামত : وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدٰى : ضال শব্দের অর্থ পথভ্রষ্টও হয় এবং অনভিজ্ঞ, বেখবরও হয়। এখানে দ্বিতীয় অর্থই উদ্দেশ্য। নবুয়ত লাভের পূর্বে তিনি আল্লাহর বিধি-বিধান সম্পর্কে বেখবর ছিলেন। অতঃপর নবুয়তের পদ দান করে তাঁকে পথনির্দেশ দেওয়া হয়।

তৃতীয় নিয়ামত : وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَاَغْنٰى : অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আপনাকে নিঃস্ব ও রিক্তহস্ত পেয়েছেন। অতঃপর আপনাকে ধনশালী করেছেন। হযরত খাদীজা (রা.)-এর ধনসম্পদ দ্বারা অংশীদারী কারবার করার মাধ্যমে এর সূচনা হয়, অতঃপর হযরত খাদীজা (রা.)-কে বিবাহ করার ফলে তাঁর সমস্ত সম্পত্তিই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য উৎসর্গিত হয়ে যায়।

এ তিনটি নিয়ামত উল্লেখ করার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তিনটি বিষয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রথম নির্দেশ – فَاَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تَقْهَرْ قهر শব্দের অর্থ জবরদস্তিমূলকভাবে অধিকারভুক্ত করা। উদ্দেশ্য এই যে, আপনি কোনো পিতৃহীনকে অসহায় ও বেওয়ারিশ মনে করে তার ধনসম্পদ জবরদস্তিমূলকভাবে নিজ অধিকারভুক্ত করে নেবেন না। একারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ এতিমের সাথে সহৃদয় ব্যবহার করার জোর আদেশ দিয়েছেন এবং বেদনাদায়ক ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন : মুসলমানদের সে গৃহই সর্বোত্তম যাতে কোনো এতিম রয়েছে এবং তার সাথে সদ্ব্যবহার করা হয়। আর সে গৃহ সর্বাধিক মন্দ, যাতে কোনো এতিম রয়েছে কিন্তু তার সাথে অসদ্ব্যবহার করা হয়। –[মাযহারী]

দ্বিতীয় নির্দেশ : وَاَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ : نهر শব্দের অর্থ ধমক দেওয়া এবং سَائِلَ-এর অর্থ সাহায্যপ্রার্থী। অর্থগত ও জ্ঞানগত উভয় প্রকার সাহায্যপ্রার্থী এর অন্তর্ভুক্ত। উভয়কে ধমক দিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নিষেধ করা হয়েছে। সাহায্যপ্রার্থীকে কিছু দিয়ে বিদায় করা দিতে না পারলে নরম ভাষায় অক্ষমতা প্রকাশ করা উত্তম। এমনিভাবে যে ব্যক্তি কোনো শিক্ষণীয় বিষয় জানতে চায় তার জবাবেও কঠোরতা ও দুর্ব্যবহার করা নিষেধ। তবে যদি কোনো সাহায্যপ্রার্থী নাছোড়বান্দা হয়ে যায় তবে প্রয়োজনে তাকে ধমক দেওয়াও জায়েজ।

তৃতীয় নির্দেশ : وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ : تَحْدِيْثٌ শব্দের অর্থ কথা বলা। উদ্দেশ্য এই যে, মানুষের সামনে আল্লাহর নিয়ামতসমূহ বর্ণনা করুন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এটাও এক পন্থা। এমনকি একজন অন্যজনের প্রতি যে অনুগ্রহ করে, তারও শোকর আদায় করার নির্দেশ রয়েছে। হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি অপরের অনুগ্রহের শোকর আদায় করে না, সে আল্লাহ তা'আলারও শোকর আদায় করে না। –[মাযহারী]

এক হাদীসে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি তোমার প্রতি অনুগ্রহ করে তোমারও উচিত তার অনুগ্রহের প্রতিদান দেওয়া। যদি আর্থিক প্রতিদান দিতে অক্ষম হও, তবে মানুষের সামনে তার প্রশংসা কর। কেননা যে জানসমক্ষে তার প্রশংসা করে, সে কৃতজ্ঞাতার হক আদায় করে দেয়। –[মাযহারী]

মাস'আলা : সবরকম নিয়ামতের শোকর আদায় করাই ওয়াজিব। আর্থিক নিয়ামতের শোকর হলো তা থেকে কিছু খাঁটি নিয়তে ব্যয় করা। শরিরিক নিয়ামতের শোকর হলো শারিরিক শক্তিকে আল্লাহর ফরজ কার্য সম্পাদনে ব্যয় করা। জ্ঞানগত নিয়ামতের শোকর হলো অপরকে তা শিক্ষা দেওয়া। –[মাযহারী]

সূরা দুহা থেকে কুরআনের শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক সূরার সাথে তকবীর বলা সুন্নত। শায়েখ সালেহ মিসরীর মতে এই তাকবীর হলো : لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ –[মাযহারী]

ইবনে কাছীর প্রত্যেক সূরা শেষে এবং বগভী (র.) প্রত্যেক সূরার শুরুতে তাকবীর বলা সুন্নত বলেছেন। –(মাযহারী) উভয়ের মধ্যে যাই করা হবে, তাতে সুন্নত আদায় হয়ে যাবে।

সূরা দুহা থেকে শেষ পর্যন্ত অধিকাংশ সূরায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি আল্লাহ তা'আলার বিশেষ নিয়ামত ও তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হয়েছে এবং কয়েকটি সূরায় কিয়ামত ও তার অবস্থাবলি উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআন মহান এবং যাবতীয় সন্দেহ ও সংশয়ের উর্ধ্বে। এই বিয়বস্তু দ্বারাই কুরআন পাক শুরু করা হয়েছে এবং সেই সত্তার মহাত্ম্য বর্ণনা দ্বারা শেষ করা হয়েছে, যাঁর প্রতি কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

وَالضُّحٰى : শপথ প্রভাব বেলার। ضُحٰى-এর অর্থ, সূর্যের রশ্মি ছড়ানো ও দিন উদিত হওয়া। শাইখ মাজদুদ্দীন ফিরোযাবাদ, কামূসের মধ্যে স্পষ্ট লিখেন, ضُحٰى মুযাক্কারও আসে। আল্লামা আবুল ফযল জামাল কুরেশী লিখেন, ضُحٰى মুযাক্কারও আসে। আল্লামা আবুল ফযল জামাল কুরেশি আরো লিখেছন, যারা একে মুয়ান্নাছ বলেন, তাদের মতে এর বহুবচন ضُحْوَةٌ হবে। আর যারা মুযাক্কার বলেন, তাদের মতে এটি ইসম; فَعْلٌ-এর ওজনে। যেমন, صَرْدٌ শব্দটি। এটি যরফ গায়রে মুতামাক্কিন। যেমন, سَحْرٌ

سَجٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার سَجْوٌ মূলবর্ণ (س - ج - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– প্রশান্ত হয়। ঠাণ্ডা হয়।

مَاوَدَّعَكَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى منفى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَوْدِيْعٌ মূলবর্ণ (و - د - ع) জিনস مثال واوى অর্থ– আপনাকে পরিত্যাগ করেননি। আপনাকে ছাড়েননি।

مَاقَلٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى منفى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার قَلْىٌ মূলবর্ণ (ق - ل - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– বিরূপ ও হননি।

يُعْطِيْكَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার إِعْطَاءٌ মূলবর্ণ (ع - ط - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– সে তোমাকে দেয়।

تَرْضٰى : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার رِضًى মূলবর্ণ (ر - ض - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– আপনি সন্তুষ্ট হবেন।

لَمْ يَجِدْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف منفى بلم বাব ضَرَبَ মাসদার وَجْدٌ মূলবর্ণ (و - ج - د) জিনস مثال واوى অর্থ– তিনি পাননি।

اٰوٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব إِفْعَالٌ মাসদার إِيْوَاءٌ মূলবর্ণ (أ - و - ى) জিনস মুরাক্কাব لفيف مقرون এবং مهموز فاء অর্থ– আশ্রয় দিয়েছেন।

هَدٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার هِدَايَةٌ মূলবর্ণ (ه - د - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– পথ দেখিয়েছেন।

عَائِلًا : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ মাসদার عَيْلًا মূলবর্ণ (ع - ى - ل) জিনস اجوف يائى অর্থ– সম্বলহীন, নিঃস্ব। অক্ষম।

اَغْنٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব إِفْعَالٌ মাসদার إِغْنَاءٌ মূলবর্ণ (غ - ن - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– সম্পদশালী করেছেন।

فَلَا تَنْهَرْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব فَتَحَ মাসদার نَهْرٌ মূলবর্ণ (ن - ه - ر) জিনস صحيح অর্থ– ভর্ৎসনা করবেন না, ধমক দিবেন না।

فَحَدِّثْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ امر حاضر معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَحْدِيْثٌ মূলবর্ণ (ح - د - ث) জিনস صحيح অর্থ– তুমি বর্ণনা করো।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌلَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى : এখানে واو টা আতেফা। আর لام টা হলো لام الابتداء আর اَلْاٰخِرَةُ হলো মুবতাদা এবং خَيْرٌ হলো তার খবর। আর لَكَ টা خَيْرٌ-এর প্রথম متعلق হয়েছে। আর مِنَ الْاُوْلٰى টা خَيْرٌ-এর সাথে দ্বিতীয় متعلق হয়েছে। –[ই'রাবুল কুরআন ৮ম খণ্ড; পৃ. ৩৪২]

سُوْرَةُ اَلَمْ نَشْرَحْ مَكِّيَّةٌ

সূরা ইনশিরাহ

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত– ৮, রুকূ'– ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

অনুবাদ	আয়াত
১. আমি কি আপনার জন্য আপনার বক্ষ [বিদ্যা ও সহিষ্ণুতা দ্বারা] প্রসারিত করে দেইনি?	اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۝١
২. আর আমি আপনার উপর হতে আপনার সেই ভার অপসারিত করেছি।	وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ۝٢
৩. যা আপনার মেরুদণ্ড ভেঙ্গে রেখেছিল।	الَّذِيْٓ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ ۝٣
৪. আর আমি আপনার জন্য আপনার খ্যাতি সমুন্নত করেছি।	وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۝٤
৫. অনন্তর [আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে] নিশ্চয় বর্তমান কষ্টের সঙ্গে [সঙ্গেই] স্বস্তি রয়েছে।	فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝٥
৬. নিশ্চয় বর্তমান কষ্টের সঙ্গে [সঙ্গেই] স্বস্তি রয়েছে।	اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝٦
৭. সুতরাং আপনি যখনই অবসর পান, তখনই [নফল ইবাদতে] পরিশ্রম করবেন।	فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ۝٧
৮. আর নিজের প্রভুর দিকেই আগ্রহের দৃষ্টি রাখবেন।	وَاِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ ۝٨

শাব্দিক অনুবাদ :

১. اَلَمْ نَشْرَحْ আমি কি প্রসারিত করে দেইনি لَكَ আপনার জন্য صَدْرَكَ আপনার বক্ষ।

২. وَوَضَعْنَا আর আমি আপসারিত করেছি عَنْكَ আপনার উপর হতে وِزْرَكَ আপনার সেই ভার।

৩. الَّذِيْٓ اَنْقَضَ যা ভেঙ্গে রেখেছিল ظَهْرَكَ আপনার মেরুদণ্ড।

৪. وَرَفَعْنَا لَكَ আর আমি সমুন্নত করেছি ذِكْرَكَ আপনার খ্যাতি।

৫. فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ অন্তর নিশ্চয় বর্তমান কষ্টের সঙ্গে রয়েছে يُسْرًا স্বস্তি।

৬. اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ নিশ্চয় বর্তমান কষ্টের সঙ্গে রয়েছে يُسْرًا স্বস্তি।

৭. فَاِذَا فَرَغْتَ সুতরাং আপনি যখনই অবসর পান فَانْصَبْ (নফল ইবাদতে) পরিশ্রম করবেন।

৮. وَاِلٰى رَبِّكَ আর নিজের প্রভুর দিকেই فَارْغَبْ আগ্রহের দৃষ্টি রাখবেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : সূরার প্রথম আয়াতের প্রথমাংশকে এর নাম হিসাবে নির্বাচন করা হয়েছে। এতে ৮টি আয়াত, ২৭টি বাক্য এবং ১০৩ টি অক্ষর রয়েছে।

সূরাটি নাজিল হওয়ার সময়কাল : বিষয়বস্তু হতে অনুমতি হয় যে, পূর্ববর্তী সূরা আদ্ব-দুহা ও এ সূরাটি প্রায় একই সময় নাজিল হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এ সূরাটি মক্কা শরীফে সূরা আদ্ব-দুহার পরে নাজিল হয়েছে।

সূরাটির বিষয়বস্তু ও মূলবক্তব্য : মূলত এ সূরাতে নবী করীম ﷺ-কে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে। নবুয়তের পূর্ববর্তী সময় নবী করীম ﷺ মক্কাবসীদের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। কিন্তু তিনি ইসলাম প্রচার শুরু করতেই সমগ্র সমাজ ও জাতি যেন তাঁর শত্রুতে পরিণত হলো। তখন মক্কা নগরীতে তাঁর কথা শুনতে কেউই প্রস্তুত ছিল না। তারা প্রতি পদে পদে তাঁর সম্মুখে নানাবিধ সমস্যা ও সংকট সৃষ্টি করতে লাগল। তাঁর জন্য এ সব খুবই মর্মন্তুদ ও নিরুৎসাহ ব্যাঞ্জক ছিল। এ কারণে তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য প্রথমে সূরা আদ্ব-দুহা ও পরে এ সূরাটি নাজিল হয়।

সূরাটিতে সর্বপ্রথম নবী করীম ﷺ-কে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে, আমি আপনাকে তিনটি বড় বড় নিয়ামত দান করেছি। এ নিয়ামতসমূহ বর্তমান থাকতে আপনার নিরুৎসাহ ও হৃদয় ভারাক্রান্ত হওয়ার কোনো কারণ নেই। একটি হলো 'শরহে সদর' (বক্ষপ্রসারণ) -এর নিয়ামত। দ্বিতীয় নবুয়তের পূর্বে যে দুর্বহ বোঝা আপনার মেরুদণ্ড বাঁকা করে দিয়েছিল, আমি তা আপনার উপর হতে নামিয়ে দিয়েছি। আর তৃতীয় হলো তার উচ্চ ও ব্যাপক উল্লেখের নিয়ামত। একমাত্র আপনি ছাড়া সৃষ্টিলোকের অন্য কাউকে এরূপ নিয়ামত দান করা হয়নি।

অতঃপর সান্ত্বনা দিয়ে বলা হয়েছে বর্তমানের কঠিনতাপূর্ণ ও দুষ্কর সময় খুব বেশি দীর্ঘ হবে না। এ সংকীর্ণতাপূর্ণ অবস্থার সঙ্গে সঙ্গেই বিশালতা ও প্রশস্ততার ফল্গুধারা অব্যাহতভাবে বয়ে চলেছে।

পরিশেষে নবী করীম ﷺ-কে উপদেশ দিয়ে বলা হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ের এ কঠিনতা ও কঠোরতা, সামস্যা ও সংকটের মোকাবিলা করার শক্তি আপনার মধ্যে একটি জিনিস হতেই আসবে। আর তা হলো, আপনি যখনই আপনার নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যস্ততা হতে অবসর পাবেন, তখন আপনি ইবাদত-বন্দেগির শ্রম ও আধ্যাত্মিক সাধনায় আত্মনিমগ্ন হবেন। সবকিছু হতে মুখ ফিরিয়ে কেবলমাত্র আল্লাহর সাথে সম্পর্ক করে নিবেন।

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ ....الاية.

শানে নুযূল : যখন মুশরিকরা মুসলমানদের দারিদ্র ও অভাবের জন্যে তাদেরকে তিরস্কার করেছিল, তখন অত্র সূরা নাজিল হয়। –[কানযুন নুকূল : ১০৮]

সূরা দুহার শেষে বর্ণিত হয়েছে যে, সূরা দুহা থেকে শেষ পর্যন্ত বাইশটি সূরায় বেশির ভাগ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি নিয়ামত ও তাঁর মাহাত্ম্য সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। মাত্র কয়েকটি সূরায় কিয়ামতের অবস্থা ও অন্যান্য বিষয় আলোচিত হয়েছে। আলোচ্য সূরা ইনশিরাহেও রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রদত্ত বিশেষ অনুগ্রহ বর্ণিত হয়েছে এবং এ বর্ণনায়ও সূরা দুহার ন্যায় জিজ্ঞাসাবোধক ভঙ্গি অবলম্বন করা হয়েছে।

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ – شَرْحٌ শব্দের অর্থ উন্মুক্ত করা। জ্ঞান, তত্ত্বকথা ও উত্তম চরিত্রের জন্য বক্ষকে প্রশস্ত করে দেওয়ার অর্থে বক্ষ উম্মুক্ত করা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অন্য এক আয়াতে আছে : فَمَنْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلاِسْلَام রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্র বক্ষকে আল্লাহ তা'আলা জ্ঞান-তত্ত্বকথা ও উত্তম চরিত্রের জন্য এমন বিস্তৃত করে দিয়েছিলেন যে, বড় বড় পণ্ডিত-দার্শনিকও তাঁর জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারে কাছে পৌছতে পারেনি। এর ফলশ্রুতিতে সৃষ্টির প্রতি তাঁর মনোনিবেশ আল্লাহ তা'আলার প্রতি মনোনিবেশে কোনো বিঘ্ন সৃষ্টি করত না। কোনো কোনো সহীহ হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, ফেরেশতাগণ আল্লাহর আদেশে বাহ্যত ও তাঁর বক্ষ বিদারণ করে পরিষ্কার করেছিল কোনো কোনো তাফসীরবিদ এস্থলে বক্ষ উম্মুক্ত করার অর্থ সে বক্ষ বিদারণই নিয়েছেন। –[ইবনে কাছীর]

وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِىْ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ – وزر-এর শাব্দিক অর্থ বোঝা আর نَقْض ظَهْر-এর শাব্দিক অর্থ কোমর ভেঙ্গে দেওয়া। অর্থাৎ কোমরকে নুইয়ে দেওয়া। কোনো বড় বোঝা কারো মাথায় তুলে দিলে যেমন তার কোমর নুয়ে পড়ে, তেমনি আয়াতে বলা হয়েছে যে, যে বোঝা আপনার কোমরকে নুইয়ে দিয়েছিল, আমি তাকে আপনার উপর থেকে অপসারিত করে দিয়েছি। সে বোঝা কি ছিল, তার এক ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে যে, এতে সকল বৈধ ও অনুমোদিত কাজ বোঝানো হয়েছে, যা কোনো কোনো সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ তাৎপর্য ও উপযোগিতাবশত সম্পাদন করেছেন কিন্তু পরে জানা গেছে যে, কাজটি উপযোগিতা ও উত্তম নীতির বিরোধী ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মর্যাদা অত্যন্ত উচ্চে ছিল এবং

তিনি আল্লাহর নৈকট্যের বিশেষ স্তরে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাই এ ধরনের কাজের জন্যও তিনি অতিশয় চিন্তিত, দুঃখিত ও ব্যথিত হতেন। আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে সুসংবাদ শুনিয়ে সে বোঝা তাঁর উপর থেকে সরিয়ে দিয়েছেন এবং বলেছেন যে, এ ধরনের কাজের জন্য আপনাকে পাকড়াও করা হবে না।

কোনো কোনো তাফসীরবিদ এ ক্ষেত্রে বোঝার অর্থ প্রসঙ্গে বলেছেন যে, নবুয়তের প্রথমদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর ওহীর প্রতিক্রিয়াও গুরুতররূপে দেখা দিত। তদুপরি সারা বিশ্বে ইসলাম প্রচার করা এবং কুফর ও শিরকের বিলোপ সাধন করে সমগ্র মানব জাতিকে তাওহীদে একত্রিত করার দায়িত্বও তাঁর উপর ন্যস্ত ছিল। এসব ব্যাপারে আদেশ ছিল : فَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ অর্থাৎ আপনি আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী সরলপথে অটল থাকুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ এই গুরুভার তিলে তিলে অনুভব করতেন। এক হাদীসে আছে, তাঁর দাড়ির কতক চুল সাদা হয়ে গেলে তিনি বললেন : فَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ এই আয়াত আমাকে বুড়ো করে দিয়েছে।

এই বোঝাকেই তাঁর অন্তর থেকে সরিয়ে দেওয়ার সুসংবাদ এ আয়াতে উক্ত হয়েছে। একে সরানোর পন্থা পরের আয়াতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, আপনার প্রত্যেক কষ্টের পর স্বস্তি আসবে। আল্লাহ তা'আলা বক্ষ উন্মুক্ত করার মাধ্যমে তাঁর মনোবল আকাশচুম্বী করে দেন। ফলে প্রত্যেক কঠিন কাজই তাঁর কাছে সহজ মনে হতে থাকে এবং কোনো বোঝাই আর বোঝা থাকেনি।

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ –রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আলোচনা উন্নত করা এই যে, ইসলামের বৈশিষ্ট্যমূলক কর্মসমূহে আল্লাহর নামের সাথে তাঁর নাম উচ্চারণ করা হয়। সারা বিশ্বের মসজিদসমূহের মিনারে ও মিম্বরে 'আশহাদু আল্ লাইলাহা ইল্লাল্লাহু'র সাথে সাথে 'আশহাদু আন্না মোহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ'ও বলা হয়ে থাকে। এ ছাড়া বিশ্বের কোনো জ্ঞানী মানুষ তাঁর নাম সম্মান প্রদর্শন ব্যতীত উচ্চারণ করে না, যদিও সে অমুসলমান হয়।

এখানে তিনটি নিয়ামত উল্লেখ করা হয়েছে– شَرْحُ صَدْرٍ (বক্ষ উন্মোচন) وَضْعُ وِزْرٍ (বোঝা লাঘবকরণ) ও رَفْعُ ذِكْرٍ (আলোচনা উন্নতকরণ)। এগুলোকে তিনটি বাক্যে ব্যক্ত করা হয়েছে এবং প্রত্যেক বাক্যে কর্তা ও কর্মের মাঝখানে لَكَ অথবা عَنْكَ ব্যবহার করা হয়েছে। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বৈশিষ্ট্য ও বিশেষ মাহাত্ম্যের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এসব কাজ আপনার খাতিরেই করা হয়েছে।

فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا আরবি ভাষার একটি নীতি এই যে, আলিফ ও লাম যুক্ত শব্দকে যদি পুনরায় আলিফ ও লাম সহকারে উল্লেখ করা হয়, তবে উভয় জায়গায় একই বস্তুসত্তা অর্থ হয়ে থাকে এবং আলিফ ও লাম ব্যতিরেকে পুনরায় উল্লেখ করা হলে উভয় জায়গায় পৃথক পৃথক বস্তুসত্তা বোঝানো হয়ে থাকে। আলোচ্য আয়াতে اَلْعُسْرُ শব্দটি যখন পুনরায় اَلْعُسْرُ উল্লিখিত হয়েছে, তখন বোঝা গেল যে, উভয় জায়গায় একই عُسْر অর্থাৎ কষ্ট বোঝানো হয়েছে। পক্ষান্তরে يُسْرًا শব্দটি উভয় জায়াগায় আলিফ ও লাম ব্যতিরেকে উল্লিখিত হয়েছে। এতে নিয়মানুযায়ী বোঝা যায় যে, দ্বিতীয় يُسْر তথা স্বস্তি প্রথম يُسْر তথা স্বস্তি থেকে ভিন্ন। অতএব আয়াতে اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا -এর পুনরুল্লেখ থেকে জানা গেল যে, একই কষ্টের জন্য দু'টি স্বস্তির ওয়াদা করা হয়েছে। দু' -এর উদ্দেশ্যও ঐখানে বিশেষ দু'-এর সংখ্যা নয়; বরং উদ্দেশ্য অনেক। অতএব সারকথা এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একটি কষ্টের সাথে তাঁকে অনেক স্বস্তিদান করা হবে।

হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন : আমার কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কেরামকে এই আয়াত থেকে দু'টি সুসংবাদ শুনিয়েছেন এবং বলেছেন, لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ অর্থাৎ এক কষ্ট দুই স্বস্তির উপর প্রবল হতে পারে না। সেমতে মুসলমান ও অমুসলমানদের লিখিত সব ইতিহাস ও সীরাত গ্রন্থ সাক্ষ্য দেয় যে, যে কাজ কঠিন থেকে কঠিনতর বরং সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে অসম্ভব মনে হতো, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য সে কাজ সহজতর হয়ে গিয়েছিল।

শিক্ষা ও প্রচারকার্যে নিয়োজিত ব্যক্তিদের জন্য একান্তে জিকির ও আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করা জরুরি : فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَاِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ অর্থাৎ আপনি যখন দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ থেকে অবসর পান, তখন অন্য কাজের জন্য তৈরি হয়ে যান। আর তা হলো এই যে, আল্লাহর জিকির, দোয়া ও ইস্তেগফারে আত্মনিয়োগ করুন। অধিকাংশ তাফসীরবিদ এ তাফসীরই করেছেন। কেউ কেউ অন্য তাফসীরও করেছেন কিন্তু এটাই অধিকতর বোধগম্য তাফসীর। এর সারমর্ম এই যে, দাওয়াত, তাবলীগ, মানুষকে পথপ্রদর্শন করা এবং তাদের সংশোধনের চিন্তা করা-এসবই ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সর্ববৃহৎ ইবাদত। কিন্তু এটা সৃষ্টিজীবের মধ্যস্থতায় ইবাদত। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আপনি কেবল এজাতীয় পরোক্ষ ইবাদত করে ক্ষান্ত হবেন না বরং যখনই এ ইবাদত থেকে অবসর পাবেন, তখন একান্তে প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করুন। তাঁর কাছেই প্রত্যেক কাজে সাফল্য লাভের দোয়া করুন। আল্লাহর জিকির

ও প্রত্যক্ষ ইবাদতই তো আসল উদ্দেশ্য। এর জন্যই মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। সম্ভবত এ কারণেই পরোক্ষ ইবাদত থেকে অবসর পাওয়ার কথা বলা হয়েছে। এটা এক প্রয়োজনের ইবাদত। এ থেকে অবসর পাওয়া সম্ভব। কিন্তু প্রত্যক্ষ ইবাদত তথা আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করা এমন বিষয়, যা থেকে মু'মিন ব্যক্তি কখনো অবসর পেতে পারে না। বরং তার জীবন ও সর্বশক্তি এতে ব্যয় করতে হবে।

এ থেকে জানা গেল যে, আলিম সমাজ, যারা শিক্ষা, প্রচার ও জনসংশোধনের কাজে নিয়োজিত থাকেন, তাদের কিছু সময় আল্লাহর জিকির ও আল্লাহর দিকে মনোনিবেশে ব্যয়িত হওয়া উচিত। পূর্ববর্তী আলিমগণ এরূপই ছিলেন। এছাড়া শিক্ষা এবং প্রচারকার্যও কার্যকর হয় না এবং তাতে বরকতও হয় না। فَانْصَبْ শব্দটি نَصْبٌ থেকে উদ্ভূত। এর আসল অর্থ পরিশ্রম ও ক্লান্তি। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ইবাদত ও জিকির এতটুকু করা উচিত যে, তাতে কিছু কষ্ট ও ক্লান্তি অনুভূত হয়। আরাম পর্যন্তই সীমিত রাখা উচিত নয়। কোনো ওযিফা কিংবা নিয়ম মেনে চলাও এক প্রকার কষ্ট ও ক্লান্তি, যদিও কাজ সামান্যই হয়।

শব্দ বিশ্লেষণ :

اَلَمْ نَشْرَحْ	:	সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف منفى بلم বাব فَتَحَ মাসদার شَرْحٌ মূলবর্ণ (ش - ر - ح) জিনস صحيح অর্থ– আমি কি প্রসারিত করে দেইনি।
صَدْرٌ	:	শব্দটি একবচন; বহুবচন صدور অর্থ– বুক, বক্ষ।
وَضَعْنَا	:	সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব فَتَحَ মাসদার وَضْعٌ মূলবর্ণ (و- ض- ع) জিনস مثال واوى অর্থ– আমি অপসারিত করেছি।
وِزْرَكَ	:	ইসম (যবর বিশিষ্ট) মুযাফ। ك মুযাফ ইলাইহি। অর্থ– তোমার বোঝা।
اَنْقَضَ	:	সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব إِفْعَالٌ মাসদার إِنْقَاضٌ মূলবর্ণ (ن - ق - ض) জিনস صحيح অর্থ– ভেঙ্গে রেখেছিল।
ظَهْرٌ	:	অর্থ– পিঠ। ظهر ও بطن দুটি বিপরীত অঙ্গের নাম। بَطْنٌ অর্থ, পেট।
رَفَعْنَا	:	সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব فَتَحَ মাসদার رَفْعٌ মূলবর্ণ (ر - ف - ع) জিনস صحيح অর্থ– আমি উঁচু করেছি, আমি উঠিয়েছি।
اَلْعُسْرُ	:	কঠিন, শক্ত, কষ্ট, ক্লেশ, সমস্যা, সংকীর্ণতা, দারিদ্র, বিপদ। يُسْرٌ-এর বিপরীত শব্দ ও মাসদার। এর ফে'ল বাবে سَمِعَ ও كَرُمَ থেকে আসে। কারণ, অভাবের সাথে বিপদ ও কষ্ট-ক্লেশ আছে। তাই এটি অভাবী বা বিপদগ্রস্ত হওয়ার অর্থেও ব্যবহার হয়ে থাকে। কামূসের মধ্যে আছে, ع ও س উভয়ের উপর পেশ দিয়ে আসে। আবার উভয়টিকে যবর দিয়েও আসে। এটি يُسْرٌ-এর বিপরীত।
فَرَغْتَ	:	সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব فَتَحَ মাসদার فَرَاغٌ মূলবর্ণ (ف - ر - غ) জিনস صحيح অর্থ– আপনি অবসর পান।
اِنْصَبْ	:	সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব سَمِعَ মাসদার نَصْبٌ মূলবর্ণ (ن - ص - ب) জিনস صحيح অর্থ– পরিশ্রম করুন।
اِرْغَبْ	:	সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব سَمِعَ মাসদার رَغْبَةٌ মূলবর্ণ (ر - غ - ب) জিনস صحيح অর্থ– আগ্রহের দৃষ্টি রাখবেন।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَرَفَعْنَالَكَ ذِكْرَكَ : এখানে واو টি হরফে আতফ رَفَعْنَا ফে'ল আর نا হলো ফায়েল। আর لَكَ টা رَفَعْنَا-এর সাথে متعلق হয়েছে। আর ذِكْرَكَ হলো মাফউলে বিহী। –[ই'রাবুল কুরআন ৮ম খণ্ড; পৃ. ৩৪৯]

سُوْرَةُ التِّيْنِ مَكِّيَّةٌ

সূরা তীন

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত– ৮, রুকূ'– ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

অনুবাদ	আয়াত
১. শপথ আনজীর ও যায়তূনের।	وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ ﴿١﴾
২. আর শপথ সিনাই পর্বতের।	وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ ﴿٢﴾
৩. আর শপথ এই শান্তিময় নগর [মক্কা শরীফ]-এর।	وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ ﴿٣﴾
৪. নিশ্চয় আমি মানুষকে অত্যন্ত সুন্দর গঠনে সৃষ্টি করেছি।	لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ﴿٤﴾
৫. অতঃপর তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি। নীচ থেকে নীচে।	ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سٰفِلِيْنَ ﴿٥﴾
৬. কিন্তু যারা ঈমান এনেছে এবং ভালো কাজ করেছে, অনন্তর তাদের জন্য এরূপ প্রতিদান রয়েছে যা কখনো নিঃশেষ হবে না।	اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ﴿٦﴾
৭. অতঃপর কোন বস্তু তোমাকে কিয়ামত সম্বন্ধে অবিশ্বাসী করছে?	فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّيْنِ ﴿٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. وَالتِّيْنِ শপথ আনজীর وَالزَّيْتُوْنِ ও যায়তূনের।

২. وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ আর শপথ সিনাই পর্বতের।

৩. وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ আর শপথ এই শান্তিময় নগর (মক্কা শরীফ) -এর।

৪. لَقَدْ خَلَقْنَا নিশ্চয় আমি সৃষ্টি করেছি الْاِنْسَانَ মানুষকে فِيْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ অত্যন্ত সুন্দর গঠনে।

৫. ثُمَّ رَدَدْنٰهُ অতঃপর তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি اَسْفَلَ سٰفِلِيْنَ নীচ থেকে নীচে।

৬. اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا কিন্তু যারা ঈমান এনেছে وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ এবং ভালো কাজ করেছে فَلَهُمْ اَجْرٌ অনন্তর তাদের জন্য এরূপ প্রতিদান রয়েছে غَيْرُ مَمْنُوْنٍ যা কখনো নিঃশেষ হবে না।

৭. فَمَا يُكَذِّبُكَ অতঃপর কোন বস্তু তোমাকে আবিশ্বাসী করছে? بَعْدُ بِالدِّيْنِ কেয়ামত সম্বন্ধে।

৮. আল্লাহই কি সমস্ত বিচারক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিচারক নন?

শাব্দিক অনুবাদ :

৮. اَلَيْسَ اللّٰهُ আল্লাহই কি নন بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ সমস্ত বিচারক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিচারক।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : التين। অর্থ : আনজীর, ডুমুর বা ঐরূপ ফল বিশেষ। কেউ কেউ একে পর্বত-প্রান্তর অথবা মসজিদ বিশেষের নাম বলে উল্লেখ করেছেন। আলোচ্য সূরার প্রথম শব্দ 'ত্বীন' হতে নামকরণ করা হয়েছে। এতে ৮টি আয়াত, ৩৪টি বাক্য এবং ১৫৯টি অক্ষর রয়েছে।

সূরাটি অবতীর্ণ হওয়ার সময়কাল : হযরত কাতাদাহ (র.) বলেন, সূরাটি মাদানী। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে দু'টি বর্ণনা রযেছে, একটিতে মক্কায় অপরটিতে মদীনায় অবতীর্ণ হওয়ার কথা উল্লিখিত হয়েছে; কিন্তু বেশির ভাগ বিশেষজ্ঞ এটা মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে বলে মত প্রকাশ করেছেন। এটা মাক্কী সূরা হওয়ার সুস্পষ্ট ও অকাট্য প্রমাণ হলো, এতে মক্কা শরীফ সম্পর্কে هٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ (এ শান্তির শহর) শব্দ কয়টি ব্যবহৃত হয়েছে। এটা যদি মদীনায় অবতীর্ণ হতো, নিশ্চয় মক্কা শহরকে 'এ শহর' বলা হতো না। এ ছাড়া সূরাটির মূলবক্তব্য ও বিষয়বস্তু নিয়ে একটু চিন্তা করলেও মনে হয়, তা মক্কা শরীফে নবুয়তের প্রাথমিক পর্যায়ে নাজিল হয়েছে। মক্কায় অবতীর্ণ সূরাসমূহের যে বাচনভঙ্গি, সংক্ষিপ্ত আয়াত ও মর্মস্পর্শী বর্ণনা ধারা, তা এতে পুরাপুরি বর্তমান। পরকালে শুভ কর্মফল ও শাস্তি অপরিহার্য এবং অতীব যুক্তিসঙ্গত, এ কথাই এতে বুঝানো হয়েছে।

সূরাটির বিষয়বস্তু : এ সূরাটি সর্বসম্মত মতে মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হয়। এতে ইহুদি, খ্রিস্টান ও ইসলাম–এ তিনটি প্রধান ধর্ম এবং এর জগদ্বিখ্যাত প্রবর্তকত্রয়ের ধর্ম ও কর্মের বিকাশ স্থাপনের শপথ করে মানবের উৎপত্তি ও পরিণতির বিষয় বিবৃত করা হয়েছে।

ভালো কাজের ভালো ফল এবং মন্দ কাজের শাস্তি প্রমাণই এর বিষয়বস্তু। এ কথা প্রমাণের জন্যই নবী-রাসূলগণের অভ্যুদয়ের স্থানসমূহের নামে শপথ করে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ মানুষকে অতি উত্তম আকৃতি বিশিষ্ট ও সুঠাম করে সৃষ্টি করেছেন। নবুয়তের ন্যায় উচ্চতম মর্যাদার ধারক লোক এই মানুষের মধ্যেই সৃষ্টি করেছেন।

এরপর বলা হয়েছে– মানুষ দু' প্রকার–

১. যারা অতি উত্তম মান ও কাঠামোতে সৃষ্টি হওয়ার পর খারাপ কাজের দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং নৈতিক অধঃপতনের এত নিম্নস্তরে পৌঁছে, যে পর্যন্ত অন্য কোনো সৃষ্টি যেতে পারে না।

২. যারা ঈমান ও নেক আমলের পথ অবলম্বন করে এ পতন হতে রক্ষা পেয়ে যায় এবং উচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত থাকে। মানব সমাজের সর্বত্র ও সর্বদাই এ দু' প্রকারের বাস্তবতার কোনো ব্যতিক্রম দেখা যায় না।

সূরার শেষভাগে উপরিউক্ত বাস্তবতার উপর ভিত্তি করে বলা হয়েছে– মানুষের মাঝে যখন এ দু' ধরনের পরস্পর বিরোধী স্বভাবের মানুষ বর্তমান দেখা যায়, তখন কর্মফলকে অস্বীকার করা যেতে পারে না। অধঃপতনে পতিত লোকদেরকে কোনো শাস্তি এবং উচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত লোকদেরকে কোনো পুরস্কার যদি না-ই দেওয়া হয়, তাহলে আল্লাহর আদালতে বে-ইনসাফী ও অবিচার প্রমাণিত হয়। অথচ আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক। অতএব, এ ব্যাপার নিঃসন্দেহ যে, মহাবিচারক আল্লাহ অধঃপতিতদেরকে চরম শাস্তি দিবেন এবং ঈমান ও কর্ম দ্বারা উন্নত মর্যাদার অধিকারীদেরকে যারপরনাই পুরস্কার দান করবেন।

ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سٰفِلِيْنَ.

শানে নুযূল : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এ আয়াত সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, কিছু লোক এমন ছিল যারা শেষ বয়সে উপনীত হয়ে যাওয়ার কারণে তাদের জ্ঞান বুদ্ধি লোপ পেয়েছিল। তখন তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ পাওয়ার সময়কালের কৃতকর্মের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করে একথার জানানদেন যে, আল্লাহ পাক তাদের সেই কৃতকর্মের প্রতিদান দিবেন যা তারা বুদ্ধি বিলুপ্ত হওয়ার পূর্বে করেছিল। –[কানযুন নুকূল : ১০৯]

وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ –এ সূরায় চারটি বস্তুর শপথ করা হয়েছে। এক. তীন অর্থাৎ আঞ্জীর তথা ডুমুর বৃক্ষ। দুই. যায়তূন বৃক্ষ। তিন. তূরে সিনীন। চার. মক্কা মোকাররমা। এই বিশেষ শপথের কারণ এই হতে পারে যে, তূর পর্বত ও মক্কা নগরীর ন্যায় ডুমুর ও যায়তূন বৃক্ষও বহুল উপকারী। এটাও সম্ভবপর যে, এখানে তীন ও যায়তূন উল্লেখ করে সে স্থান বোঝানো হয়েছে, যেখানে এ বৃক্ষ প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। আর সে স্থান হচ্ছে শাম দেশ, যা পয়গম্বরগণের আবাসভূমি। হযরত ইবরাহীম (আ.)ও সে দেশে অবস্থান করতেন। তাঁকে সেখান থেকে হিজরত করিয়ে মক্কা মোকাররমায় আনা হয়েছিল। এভাবে উপরিউক্ত শপথসমূহে সেসব পবিত্র ভূমি অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে, যেখানে বিশেষ বিশেষ পয়গম্বরগণ জন্মগ্রহণ করেছেন ও প্রেরিত হয়েছেন। শাম দেশ অধিকাংশ পয়গম্বরের আবাসভূমি। তূর পর্বত হযরত মূসা (আ.)-এর আল্লাহর সাথে বাক্যালাপের স্থান। সিনীন অথবা সীনা তূর পর্বতের অবস্থানস্থলের নাম। নিরাপদ শহর শেষনবী ﷺ-এর জন্মস্থান ও বাসস্থান।

শপথের পর বলা হয়েছে : لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ - تَقْوِيْم -এর শাব্দিক অর্থ কোনো কিছুর অবয়ব ও ভিত্তিকে ঠিক করা।

اَحْسَنِ تَقْوِيْم -এর উদ্দেশ্য এই যে, তার মজ্জা ও স্বভাবকেও অন্যান্য সৃষ্ট জীবের তুলনায় উত্তম করা হয়েছে এবং তার দৈহিক অবয়ব এবং আকার-আকৃতিকেও দুনিয়ার সব প্রাণী অপেক্ষা সুন্দরতম করা হয়েছে।

সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে মানুষ সর্বাধিক সুন্দর : মানুষকে আল্লাহ তা'আলা সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে সর্বাধিক সুন্দর করেছেন। ইবনে আরাবী (র.) বলেন : আল্লাহর সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে মানুষ অপেক্ষা সুন্দর কেউ নেই। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাকে জ্ঞানী, শক্তিমান, বক্তা, শ্রোতা, দ্রষ্টা, কুশলী এবং প্রজ্ঞাবান করেছেন। এগুলো প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলার গুণাবলি। সেমতে বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে আছে : اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ اٰدَمَ عَلٰى صُوْرَتِهٖ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.)-কে নিজের আকারে সৃষ্টি করেছেন। এর অর্থ এটাই হতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলার কতিপয় গুণাবলি কোনো কোনো পর্যায়ে তাকেও দেওয়া হয়েছে। নতুবা আল্লাহ তা'আলার কোনো আকার নেই। –[কুরতুবী]

মানব সৌন্দর্যের একটি অভাবনীয় ঘটনা : কুরতুবী এস্থলে বর্ণনা করেন, ঈসা ইবনে মূসা হাশেমী খলীফা আবূ জা'ফর মানসূরের একজন বিশেষ সভাসদ ছিলেন। তিনি স্ত্রীকে অত্যধিক ভালোবাসতেন। একদিন জোসনা রাত্রিতে স্ত্রীর সাথে বসে হাসি তামাশার ছলে বলে ফেললেন : اَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا اِنْ لَمْ تَكُوْنِىْ اَحْسَنَ مِنَ الْقَمَرِ অর্থাৎ তুমি তিন তালাক, যদি তুমি চাঁদ অপেক্ষা অধিক সুন্দরী না হও। একথা বলতেই স্ত্রী উঠে পর্দায় চলে গেল এবং বলল : আপনি আমাকে তালাক দিয়েছেন। ব্যাপারটি যদিও হাসি তামাশার ছিল কিন্তু বিধান এই যে, পরিষ্কার তালাক শব্দ হাসি তামাশার ছলে উচ্চারণ করলেও তালাক হয়ে যায়। ঈসা ইবনে মূসা চরম অস্থিরতার মধ্যে রাত্রি অতিবাহিত করলেন। প্রত্যূষে খলীফা আবূ জা'ফর মনসূরের কাছে উপস্থিত হয়ে তাকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানালেন। খলীফা শহরের ফতওয়াবিদ আলিমগণকে ডেকে মাস'আলা জিজ্ঞেস করলেন। সবাই এক উত্তর দিলেন যে, তালাক হয়ে গেছে। কেননা তাদের মতে চন্দ্র অপেক্ষা সুন্দর হওয়া কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভবপরই নয়। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফার জনৈক শিষ্য আলিম চুপচাপ বসে ছিলেন। খলীফা জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি নিশ্চুপ কেন? তখন তিনি বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পাঠ করে আলোচ্য সূরা তীন তেলাওয়াত করলেন এবং বললেন : আমিরুল মু'মিনীন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, মানুষ মাত্রই অবয়ব সুন্দরতম। কোনো কিছুই মানুষ অপেক্ষা সুন্দর নয়। একথা শুনে উপস্থিত আলিমগণ বিস্ময়াভিভূত হয়ে গেলেন এবং কেউ বিরোধিতা করলেন না। সেমতে খলীফা তালাক হয়নি বলে রায় দিয়ে দিলেন।

এ থেকে জানা গেল যে, আল্লাহ তা'আলার সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে মানুষ সর্বাধিক সুন্দররূপ ও সৌন্দর্যের দিক দিয়েও এবং শারীরিক গড়নের দিক দিয়েও। তার মস্তকে কেমন অঙ্গ কি কি আশ্চর্যজনক কাজ করছে– মনে হয় যেন একটি ফ্যাক্টরী, যাতে নাযুক, সুক্ষ্ম ও স্বয়ংক্রিয় মেশিন চালু রয়েছে। তার বক্ষ ও পেটের অবস্থাও তদ্রূপ। তার হস্তপদের গঠন ও আকার হাজারো উপযোগিতার উপর ভিত্তিশীল। এ কারণেই দার্শনিকগণ বলেন : মানুষ একটি ক্ষুদ্র জগৎ অর্থাৎ সমগ্র জগতের একটি মডেল। সমগ্র জগতে যেসব বস্তু ছড়িয়ে আছে, তা সবই মানুষের মধ্যে সমবেত আছে। –[কুরতুবী]

সূফী বুযুর্গগণও এ বিষয়ের সমর্থন করেছেন এবং কেউ কেউ মানুষের আপদমস্তক বিশ্লেষণ করে তাতে জগতের সব বস্তুর নমুনা দেখিয়েছেন।

ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سَافِلِيْنَ –পূর্বের আয়াতে মানুষকে সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে সুন্দরতম সৃষ্টি করার বর্ণনা ছিল। এ আয়াতে তার বিপরীতে বলা হয়েছে যে, সে যৌবনের প্রারম্ভে যেমন সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে সর্বাধিক সুন্দর ও শ্রেষ্ঠ ছিল, তেমনি পরিশেষে সে নিকৃষ্ট থেকে নিকৃষ্টতর এবং মন্দ থেকে মন্দতর হয়ে যায়। বলাবাহুল্য, এই উৎকৃষ্টতা ও নিকৃষ্টতা তার বাহ্যিক ও শারিরিক অবস্থার দিক দিয়ে বলা হয়েছে। যৌবন অস্তমিত হয়ে গেলে তার আকার-আকৃতি বদলে যায়। বার্ধক্য এসে তাকে সম্পূর্ণ পাল্টে দেয়। সে কুশ্রী দৃষ্টিগোচার হতে থাকে এব কর্মক্ষমতা হারিয়ে অপরের উপর বোঝা হয়ে যায়। কারো কোনো উপকারে আসে না। অন্যান্য জীবজন্তু এর বিপরীত। তারা শেষ পর্যন্ত কর্মক্ষম থাকে। মানুষ তাদের কাছ থেকে দুগ্ধ, বোঝা বহন এবং অন্যান্য বহু রকম কাজ নেয়। তাদেরকে জবাই করা হলে অথবা তারা মারা গেলেও তাদের চামড়া, পশম, অস্থি মানুষের কাজে আসে। কিন্তু মানুষ যখন বার্ধক্যে অক্ষম হয়ে যায়, তখন সে সাংসারিক দিক দিয়ে সম্পূর্ণ বেকার হয়ে যায়। মৃত্যুর পরও তার কোনো অংশ দ্বারা কোনো মানুষ অথবা জন্তুর উপকার হয় না। সারকথা, মানুষ সে নিকৃষ্টদের মধ্যে নিকৃষ্টতম, এর অর্থ তা বৈষয়িক ও শারিরিক অবস্থা। হযরত যাহ্হাক প্রমুখ থেকে এ তাফসীরই বর্ণিত রয়েছে। –[কুরতুবী]

এ তাফসীর অনুযায়ী পরের আয়াতে মু'মিন সৎকর্মীর ব্যতিক্রম উল্লেখ করা হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে, মু'মিন সৎকর্মী বার্ধক্যের অক্ষম ও অপারগ হয় না। বরং উদ্দেশ্য এই যে, তাদের দৈহিক বেকারত্ব ও বৈষয়িক অকর্মণ্যতার ক্ষতি তাদের হয় না বরং ক্ষতি কেবল তাদের হয় যারা নিজেদের সমগ্র চিন্তা ও যোগ্যতা বৈষয়িক উন্নতিতেই ব্যয় করেছিল। এখন তা নিঃশেষ হয়ে গেছে এবং পরকালে তাদের কোনো অংশ নেই। কিন্তু মু'মিন সৎকর্মীর পুরস্কার ও ছওয়াব কোনো সময়ই নিঃশেষ হয় না। দুনিয়াতে বার্ধক্যের বেকারত্ব ও অপারগতার সম্মুখীন হলেও পরকালে তার জন্য উচ্চ মর্যাদা ও সুখই সুখ বিদ্যমান থাকে। বার্ধক্যজনিত বেকারত্ব ও কর্ম হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও তাদের আমলনামায় সেসব কর্ম লিখিত হয়, যা তারা শক্তিমান অবস্থায় করত। হযরত আনাস (রা.) -এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : কোনো মুসলমান অসুস্থত হয়ে পড়লে আল্লাহ তা'আলা আমল লেখক ফেরেশতাগণকে আদেশ দেন, সুস্থ অবস্থায় সে যেসব সৎ কর্ম করত, সেগুলো তার আমলনামায় লিপিবদ্ধ করতে থাক। –(বুখারী) এছাড়া এস্থলে মু'মিন সৎ কর্মীর প্রতিদান জান্নাত ও তার নিয়ামত বর্ণনা করার পরিবর্তে বলা হয়েছে : لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ –অর্থাৎ তাদের পুরস্কার কখনো বিচ্ছিন্ন ও কর্তিত হবে না। এতে এদিকেও ইঙ্গিত হতে পারে যে, তাদের এই পুরস্কার দুনিয়ার বৈষয়িক জীবন থেকেই শুরু হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা তার প্রিয় বান্দাদের জন্য বার্ধক্যে এমন খাঁটি সহচর জুটিয়ে দেন, যারা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁদের কাছ থেকে আত্মিক উপকারিতা লাভ করতে থাকেন এবং তাদের সর্বপ্রকার সেবাযত্ন করেন। এভাবে বার্ধক্যের যে স্তরে মানুষ বৈষয়িক ও দৈহিক দিক দিয়ে অকেজো, বেকার ও অপরের উপর বোঝারূপে গণ্য হয়, সে স্তরেও আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ বেকার থাকেন না। কোনো কোনো তাফসীরবিদ আলোচ্য আয়াতের এরূপ তাফসীর করেছেন যে, رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سَافِلِيْنَ –সাধারণ মানুষের জন্য নয় বরং কাফের ও পাপাচারীদের জন্য বলা হয়েছে, যারা আল্লাহ প্রদত্ত সুন্দর অবয়ব, গুণগত উৎকর্ষ ও বিবেককে বৈষয়িক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের পেছনে বরবাদ করে দেয়। এই অকৃতজ্ঞতার শাস্তি হিসাবে তাদেরকে হীনতম পর্যায়ে পৌছে দেওয়া হবে। এমতাবস্থায় اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا বাক্যের ব্যতিক্রম বাহ্যিক অর্থেই বহাল থাকে। অর্থাৎ যারা মু'মিন ও সৎকর্মী, তাদেরকে নিকৃষ্টতম পর্যায়ে পৌছানো হবে না। কেননা তাদের পুরস্কার সব সময়ই অব্যাহত থাকবে। –[মাযহারী]

فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّيْنِ –এতে কিয়ামতে অবিশ্বাসীদেরকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, আল্লাহর কুদরতের উপরিউক্ত দৃশ্য ও পরিবর্তন দেখার পরও তোমাদের জন্য পরকাল ও কিয়ামতকে মিথ্যা মনে করার কি অবকাশ থাকতে পারে। আল্লাহ তা'আলা কি সব বিচারকের মহা বিচারক নন?

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি সূরা তীনের اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحَاكِمِيْنَ পর্যন্ত পাঠ করে, তার উচিত وَاَنَا عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ বলা। সেমতে ফিকহ্‌বিদগণের মতেও এই বাক্যটি পাঠ করা মোস্তাহাব।

শব্দ বিশ্লেষণ :

اَحْسَنَ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم تفضيل বাব كَرُمَ মাসদার اَلْحُسْنُ মূলবর্ণ (ح - س - ن) জিনস صحيح অর্থ– খুব উত্তম, ভালো।

تَقْوِيْم : মাসদার। বাব تَفْعِيْل মূলবর্ণ (ق - و - م) জিনস اجوف واوى অর্থ– ঠিক করা, উত্তমরূপে গঠন করা।

رَدَدْنٰهُ : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلرَّدُّ মূলবর্ণ (ر - د - د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– ফিরিয়ে দিয়েছি।

اَسْفَلَ : اسم تفضيل সর্বনিম্ন। اَعْلٰى -এর বিপরীত বাব نَصَرَ মাসদার سُفُوْلٌ মূলবর্ণ (س - ف - ل) জিনস صحيح অর্থ– নীচ থেকে নিচে।

سَافِلِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার اَلسُّفُوْلُ মূলবর্ণ (س - ف - ل) জিনস صحيح অর্থ– নীচ।

مَمْنُوْنٍ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব نَصَرَ মাসদার مَنٌّ মূলবর্ণ (م - ن - ن) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– হ্রাসকৃত। কর্তনকৃত।

يُكَذِّبُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَكْذِيْبٌ মূলবর্ণ (ك - ذ - ب) জিনস صحيح অর্থ– অবিশ্বাস করছে।

اَحْكَمُ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم تفضيل বাব نَصَرَ মাসদার اَلْحُكْمُ মূলবর্ণ (ح - ك - م) জিনস صحيح অর্থ, উত্তম বিচারক। শ্রেষ্ঠ বিচারক।

حَاكِمِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার اَلْحُكْمُ মূলবর্ণ (ح - ك - م) জিনস صحيح অর্থ– বিচারক, হাকিম, জজ, হুকুমদাতা।

বাক্য বিশ্লেষণ :

ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سَافِلِيْنَ : এখানে ثُمَّ টি হরফে আতফ। আর رَدَدْنٰهُ হলো ফে'ল, যমীর نَا ফায়েল। আর ه হলো مفعول به আর اَسْفَلَ سَافِلِيْنَ টা মাফঊলে বিহী থেকে حال হয়েছে। –[ই'রাবুল কুরআন ৮ম খণ্ড, পৃ. ৩৫৮]

سُوْرَةُ الْعَلَقِ مَكِّيَّةٌ

সূরা 'আলাক

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত– ১৯, রুকূ'– ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

অনুবাদ	আয়াত
১. হে পয়গাম্বর! আপনি নিজ প্রভুর নাম নিয়ে কুরআন পাঠ করুন, যিনি সৃষ্টি করেছেন।	اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ﴿١﴾
২. যিনি মানুষকে জমাট রক্ত দ্বারা সৃষ্টি করেছেন।	خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾
৩. আপনি কুরআন পাঠ করুন, আর আপনার প্রভু মহামহিমান্বিত।	اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ﴿٣﴾
৪. যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন।	الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿٤﴾
৫. মানুষকে ঐ সমস্ত জিনিস শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানত না।	عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٥﴾
৬. সত্যি সত্যিই, নিঃসন্দেহে মানুষ সীমা হতে বের হয়ে যায়।	كَلَّآ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰىٓ ﴿٦﴾
৭. এ কারণে যে, সে নিজেকে অমুখাপেক্ষী মনে করে।	اَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى ﴿٧﴾
৮. [হে শ্রোতা!] তোমার প্রতিপালকের দিকেই সকলকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।	اِنَّ اِلٰى رَبِّكَ الرُّجْعٰى ﴿٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. اِقْرَاْ [হে পয়গাম্বর!] আপনি কুরআন পাঠ করুন بِاسْمِ رَبِّكَ নিজ প্রভুর নাম নিয়ে الَّذِىْ خَلَقَ যিনি সৃষ্টি করেছেন।

২. خَلَقَ الْاِنْسَانَ যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন مِنْ عَلَقٍ জমাট রক্ত দ্বারা।

৩. اِقْرَاْ আপনি কুরআন পাঠ করুন وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ আর আপনার প্রভু মহামহিমান্বিত।

৪. الَّذِىْ عَلَّمَ যিনি শিক্ষা দিয়েছেন بِالْقَلَمِ কলমের সাহায্যে।

৫. عَلَّمَ الْاِنْسَانَ মানুষকে ঐ সমস্ত জিনিস শিক্ষা দিয়েছেন مَا لَمْ يَعْلَمْ যা সে জানত না।

৬. كَلَّآ সত্যি সত্যিই اِنَّ الْاِنْسَانَ নিঃসন্দেহে মানুষ لَيَطْغٰى সীমা হতে বের হয়ে যায়।

৭. اَنْ رَّاٰهُ এ কারণে যে, সে নিজেকে মনে করে اسْتَغْنٰى অমুখাপেক্ষী।

৮. اِنَّ اِلٰى رَبِّكَ [হে শ্রোতা!] তোমার প্রতিপালকের দিকেই সকল কে করতে হবে الرُّجْعٰى প্রত্যাবর্তন।

অনুবাদ	আয়াত
৯. [হে শ্রোতা!] আচ্ছা তুমি কি তাকে দেখেছ, যে নিষেধ করে।	أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ ﴿٩﴾
১০. [আমার] এক [বিশিষ্ট] বান্দাকে যখন সে নামাজ পড়ে।	عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ ﴿١٠﴾
১১. [হে শ্রোতা!] আচ্ছা এটা তো বল, যদি সে বান্দা সৎপথে থাকে।	أَرَأَيْتَ إِن كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ ﴿١١﴾
১২. অথবা সে পরহেজগারীর শিক্ষা দান করে [তবে কি তার বিরোধিতা সঙ্গত হয়?]	أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَىٰ ﴿١٢﴾
১৩. [হে শ্রোতা!] আচ্ছা বল তো, যদি সে ধর্মকে অস্বীকার করে এবং বিমুখ হয়।	أَرَأَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴿١٣﴾
১৪. সে কি জানে না যে, আল্লাহ [তার কার্যাবলি] দেখছেন।	أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ ﴿١٤﴾
১৫. সাবধান! যদি সে ফিরে না আসে, তবে আমি ললাটের কেশগুচ্ছ ধরে তাকে হেঁচড়াব।	كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ﴿١٥﴾
১৬. যে কেশগুচ্ছ মিথ্যা ও পাপযুক্ত।	نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ﴿١٦﴾
১৭. অনন্তর সে স্বীয় পরিষদবর্গকে আহ্বান করুক।	فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ﴿١٧﴾
১৮. আমিও দোজখের পেয়াদাদেরকে আহ্বান করব।	سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ﴿١٨﴾
১৯. সাবধান! আপনি তার কথা মানবেন না আর আপনি [রীতিমতো] নামাজ পড়তে থাকুন এবং [আল্লাহর] নৈকট্য লাভ করতে থাকুন।	كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب ۩ ﴿١٩﴾

ع ١٥ السجدة ١٤

শাব্দিক অনুবাদ :

৯. أَرَأَيْتَ الَّذِي [হে শ্রোতা!] আচ্ছা তুমি কি তাকে দেখেছ يَنْهَىٰ যে নিষেধ করে।

১০. عَبْدًا এক বান্দাকে إِذَا صَلَّىٰ যখন সে নামাজ পড়ে।

১১. أَرَأَيْتَ إِن كَانَ হে শ্রোতা। আচ্ছা এটাতো বল যদি সে বান্দা থাকে عَلَى الْهُدَىٰ সৎপথে।

১২. أَوْ أَمَرَ অথবা সে শিক্ষা দান করে بِالتَّقْوَىٰ পরহেজগারীর।

১৩. أَرَأَيْتَ [হে শ্রোতা!] আচ্ছা বলতো إِن كَذَّبَ যদি সে ধর্মকে অস্বীকার করে وَتَوَلَّىٰ এবং বিমুখ হয়।

১৪. أَلَمْ يَعْلَمْ সে কি জানে না بِأَنَّ اللَّهَ যে, আল্লাহ يَرَىٰ দেখছেন।

১৫. كَلَّا সাবধান! لَئِن لَّمْ يَنتَهِ যদি সে ফিরে না আসে لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ তবে আমি ললাটের কেশ গুচ্ছ ধরে তাকে হেঁচড়াব।

১৬. نَاصِيَةٍ যে কেশ গুচ্ছ كَاذِبَةٍ মিথ্যা خَاطِئَةٍ ও পাপযুক্ত।

১৭. فَلْيَدْعُ অনন্তর সে আহ্বান করুক نَادِيَهُ স্বীয় পরিষদবর্গকে।

১৮. سَنَدْعُ আমিও আহ্বান করব الزَّبَانِيَةَ দোজখের পেয়াদাদেরকে।

১৯. كَلَّا সাবধান! لَا تُطِعْهُ আপনি তার কথা মানবেন না وَاسْجُدْ আর আপনি নামাজ পড়তে থাকুন وَاقْتَرِبْ এবং (আল্লাহর) নৈকট্য লাভ করতে থাকুন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : عَلَقٌ অর্থ : রক্ত অথবা তার ঘনীভূত প্রগাঢ় অবস্থা। এর অন্য অর্থ জলৌকাকৃতি ক্ষুদ্রতর কীটাণু বা শুক্রকীট। এর মর্মার্থে প্রেম-প্রীতি, আসক্তি, আকর্ষণ ও আলিঙ্গন প্রভৃতিও পরিগ্রহণ করা যেতে পারে। এ 'আলাক্ব' ই হচ্ছে মানব সৃষ্টির একটি মূল উপাদান। আলোচ্য সূরার দ্বিতীয় আয়াতের আলাক্ব শব্দ হতেই এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে।

এ সূরার অন্য নাম 'ইকরা'। অত্র সূরাতেই সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে পাঠ করার জন্য আদেশ করা হয়েছে। পাঠ করার নির্দেশকে আরবি 'ইকরা' দিয়ে বুঝানো হয়। তাই সূরার নাম 'ইকরা' রাখা হয়েছে।

অত্র সূরার অন্য আরেক নাম 'ক্বালাম'। কেননা ৪র্থ আয়াতে عَلَّمَ بِالْقَلَمِ বলা হয়েছে।

অত্র সূরায় ১৯টি আয়াত, ৭২টি বাক্য এবং ১২২টি অক্ষর রয়েছে।

অবতীর্ণ হওয়ার সময়কাল : আলোচ্য সূরাটির দু'টি অংশ। এক অংশ শুরু হতে পঞ্চম আয়াত مَا لَمْ يَعْلَمْ পর্যন্ত শেষ হয়েছে। আর দ্বিতীয় অংশ كَلَّا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰى হতে শুরু হয়ে শেষ পর্যন্ত চলেছে। অধিকাংশ আলেমগণের মতে, নবী করীম ﷺ -এর উপর অবতীর্ণ এটাই সর্বপ্রথম ওহী। হযরত আয়েশা (রা.), ইবনে আব্বাস (রা.), আবূ মুসা আশ'আরী (রা.) সহ বিপুল সংখ্যক সাহাবী হতে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, এ পাঁচটি আয়াতই সর্ব প্রথম নাজিল হয়েছে। সূরাটির দ্বিতীয় অংশ পরবর্তীকালে নাজিল হয়েছে। নবী করীম ﷺ যখন হারাম শরীফে নামাজ পড়তে শুরু করলেন এবং আবূ জাহল তাকে ধমক দিয়ে এ কাজ হতে বিরত রাখার চেষ্টা করছিল ঠিক সে সময় এ দ্বিতীয় অংশ নাজিল হয়।

সূরার বিষয়বস্তু : সূরাটি সর্বসম্মতিক্রমে মক্কায় অবতীর্ণ। এই সূরাটির দু'টি অংশ। পথমাংশ প্রথম হতে পঞ্চম আয়াতের مَالَمْ يَعْلَمْ পর্যন্ত। আর দ্বিতীয় كَلَّا اِنَّ الْاِنْسَانَ হতে সূরার শেষ পর্যন্ত। অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে, এই সূরার প্রথম পাঁচটি আয়াতই হচ্ছে সর্বপ্রথম প্রত্যাদেশ এবং এটা অবতীর্ণ হয়েছিল পবিত্র মক্কার অনতিদূরে হেরা গিরিগুহায়। সূরার দ্বিতীয় অংশটি পরবর্তীকালে নাজিল হয়েছে। নবী করীম ﷺ যখন হেরেম শরীফে নামাজ পড়তে শুরু করেছিলেন এবং আবূ জাহল ধমক দিয়ে এই কাজ হতে তাঁকে বিরত রাখতে চেষ্টা করেছিল, ঠিক সেই সময়ই এই দ্বিতীয় অংশ নাজিল হয়। পরে নাজিল হওয়া এ অংশ প্রথম নাজিল হওয়া আয়াতের পরে সংযোজিত হয়েছে এবং এটা খুবই স্বাভাবিক সংযোজন। কেননা প্রথম ওহী বা প্রত্যাদেশ নাজিল হওয়ার পর ইসলামের পথম প্রকাশ ঘটেছিল এ নামাজেরই মাধ্যমে। কাফেরদের সাথে তাঁর দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষও নামাজের কারণেই শুরু হয়েছিল। অত্র সূরার কয়টি আয়াতে সংক্ষেপে মানুষ সৃষ্টির রহস্য, অজানাকে জানানো ও জ্ঞান দানের রহস্য এবং মহীয়ান আল্লাহর কুদরত বর্ণনা করা হয়েছে। তাওহীদের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে। নবী করীম ﷺ-এর দীর্ঘ দিনের চিন্তা-ভাবনার অবসান ঘটিয়ে তাঁকে রিসালাতের মাধ্যমে সঠিক পথ প্রদর্শন করা হয়েছে। তিনি দিবালোকের মতো দিকনির্দেশ পেয়েছেন। শেষ দিকে ভ্রান্ত কাফেরদের অবশ্যম্ভাবী পরিণতির ইঙ্গিত প্রদান করে নবী করীম ﷺ -কে ভালো কাজগুলো করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ [١] خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ [٢]

শানে নুযূল- : সূরা আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াত দ্বারা নুযূলে কুরআন বা কুরআন নাজিল হবার ধারা শুরু হয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ কা'বা গৃহে গিয়ে নামাজ আদায় করতেন। সেখানে যেন নামাজ আদায় না করেন সে জন্যে আবূ জাহল নিষেধ করে দিল।

ইবনে জারির হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, কা'বা গৃহে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামাজ আদায় করার পথে বাঁধা দিয়ে আবূ জাহেল বলেছিল যে, মুহাম্মদ যদি নামাজ আদায়ের জন্যে কা'বা গৃহে পুনরায় আসে, তাহলে তাঁকে হত্যা করে দেব। তখন সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত সমূহ নাজিল করেন।

–[ইবনে কাছীর ৫২৯/৪, দুররে মানছুর ৩৬৯/৬/ তাবারী ৬৪৯/১২]

كَلَّا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰى

শানে নুযূল : আবূ জাহেল লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করল যে, তোমাদের সামনে মুহাম্মদ ﷺ কি সেজদা করে থাকে? তারা বলল, হ্যাঁ। তখন আবূ জাহেল বলল, লাত ও উজ্জার কসম! আমি যদি তাকে আর কখনো এমন করতে দেখি তাহলে তার গর্দান দ্বিখণ্ডিত করে দিব। তার চেহারা ধুসরিত করে দিব। সে কথার প্রেক্ষিতে আল্লাহ পাক এ আয়াত নাজিল করেন।

–[কানযুন নুকূল : ১০৯]

أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ (٩) عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ (١٠)

শানে নুযূল : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, নরাধম আবূ জাহেল কা'বা গৃহে নামাজ আদায় করার জন্যে হযরত রাসূল ﷺ কে নিষেধ করে ছিল। সে সুবাদে সে একদা বলল, আমি যদি মুহাম্মদকে নামাজ আদায় করতে দেখি, তাহলে তার গণ্ডদেশ ধুমড়ে মুচড়ে দিব। তখন তার প্রতি আশ্চর্যতা প্রকাশবোধক আঙ্গিকে আলোচ্য আয়াত আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন। –[কুরতুবী ১১৫/২০, তাবারী ৬৪৭/১২]

فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ (١٧-١٨)

শানে নুযূল : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ সালাত আদায় করছিলেন। এমন সময় আবূ জাহেল এসে বলল, আমি কি তোমাকে একাজ থেকে নিষেধ করিনি? আমি কি তোমাকে এ বিষয়ে নিষেধ করিনি? আমি কি তোমাকে এরূপ করতে নিষেধ করিনি?

নবী করীম ﷺ সালাত শেষে ফিরে তাকালেন এবং শাসালেন। আবূ জাহেল বলল, তুমি অবশ্যই জানো আমার চেয়ে বেশি লোক এই শহরে আর কারো নেই। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক উক্ত আয়াত নাজিল করেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, যদি সে তার পার্শ্বচরদের আহ্বান করত, তবে অবশ্যই তাকে আল্লাহর ফেরেশতা পাকড়াও করত। –[তিরমিযি ২ : ১৭২]

ওহীর সূচনা ও সর্বপ্রথম ওহী : বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েত থেকে প্রমাণিত রয়েছে এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অধিকাংশ আলিম এ বিষয়ে একমত যে, সূরা আলাক থেকেই ওহীর সূচনা হয় এবং এ সূরার প্রথম পাঁচটি আয়াত (مَا لَمْ يَعْلَمْ পর্যন্ত) সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়েছে। কেউ কেউ সূরা মুদ্দাস্সিরকে সর্বপ্রথম সূরা এবং কেউ কেউ সূরা ফাতিহাকে সর্বপ্রথম সূরা বলে অভিহিত করেছেন। ইমাম বগভী (র.) অধিকাংশ আলিমের মতকেই বিশুদ্ধ বলেছেন। সূরা মুদ্দাসসিরকে প্রথম সূরা বলার কারণ এই যে, সূরা আলাকের পাঁচ আয়াত নাজিল হওয়ার পর দীর্ঘকাল কুরআন অবতরণ বন্ধ থাকে, যাকে ওহীর বিরতিকাল বলা হয়ে থাকে–এই বিরতির কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ ভীষণ মর্মবেদনা ও মানসিক অশান্তির সম্মুখীন হন। এরপর একদিন হঠাৎ হযরত জিবরাঈল (আ.) সামনে আসেন এবং সূরা মুদ্দাস্সির অবতীর্ণ হয়। এ সময়ও ওহী অবতরণ এবং হযরত জিবরাঈলের সাথে সাক্ষাতের দরুন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মধ্যে সে পূর্বের মতোই ভাবান্তর দেখা দেয়, যা সূরা আলাকে অবতীর্ণ হওয়ার সময় দেখা দিয়েছিল। এভাবে বিরতিকালের পর সর্বপ্রথম সূরা মুদ্দাস্সিরের প্রাথমিক আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। ফলে একেও প্রথম সূরা আখ্যা দেওয়া যায়। সূরা ফাতিহাকে প্রথম সূরা বলার কারণ এই যে, পূর্ণ সূরা হিসাবে একত্রে সূরা ফাতিহাই সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়। এর আগে কয়েকটি সূরার অংশবিশেষই অবতীর্ণ হয়েছিল। –(মাযহারী) বুখারী ও মুসলিমের একটি দীর্ঘ হাদীসে নবুয়ত ও ওহীর সূচনা সম্পর্কে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলেন : সর্বপ্রথম সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি ওহীর সূচনা হয়। তিনি স্বপ্নে যা দেখতেন, বাস্তবে হুবহু তাই সংঘটিত হতো এবং তাতে কোনোরূপ ব্যাখ্যার প্রয়োজন থাকত না। স্বপ্নে দেখা ঘটনা দিবালোকের মতো সামনে এসে যেত।

এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মধ্যে নির্জনতার ও একান্তে ইবাদত করার প্রবল ঝোঁক সৃষ্টি হয়। এজন্য তিনি হেরা গিরিগুহাকে পছন্দ করে নেন (এ গুহাটি মক্কার কবরস্থান জান্নাতুল মুয়াল্লা থেকে একটু সামনে জাবালে নূর নামক পাহাড়ে অবস্থিত। এর শৃঙ্গ দূর থেকে দৃষ্টিগোচর হয়)। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন : তিনি এ গুহায় রাত্রিতে গমন করতেন এবং ইবাদত করতেন। পরিবার পরিজনের খবরাখবর নেওয়ার বিশেষ প্রয়োজন দেখা না দিলে তিনি সেখানেই অবস্থান করতেন এবং প্রয়োজনীয় পাথেয় সঙ্গে নিয়ে যেতেন। পাথেয় শেষ হয়ে গেল তিনি পত্নী হযরত খাদীজা (রা.)-এর কাছে ফিরে আসতেন এবং আরও কিছুদিনের পাথেয় নিয়ে গুহায় গমন করতেন। এমনিভাবে গুহায় অবস্থানকালে হঠাৎ একদিন তাঁর কাছে ওহী আগমন করে। হেরা গুহায় নির্জনবাসের সময়কাল সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। বুখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতে আছে যে, তিনি পূর্ণ রমজান মাস এ গুহায় অবস্থান করেন। ইবনে ইসহাক ও যরকানী (র.) বলেন : এর চেয়ে বেশি সময় অবস্থান করার প্রমাণ কোনো রেওয়ায়েতে নেই। ওহী অবতরণের পূর্বে নামাজ ইত্যাদি ইবাদতের অস্তিত্ব ছিল না। সুতরাং হেরা গুহায় রাসূলুল্লাহ ﷺ কিভাবে ইবাদত করতেন সে সম্পর্কে কোনো কোনো আলিম বলেন : তিনি হযরত নূহ, ইবরাহীম ও ঈসা (আ.)-এর শরিয়ত অনুসরণ করে ইবাদত করতেন। কিন্তু কোনো রেওয়ায়েতে এর প্রমাণ নেই এবং তিনি নিরক্ষর ছিলেন বিধায় একে বিশুদ্ধও মেনে নেওয়া যায় না। বরং বাহ্যত বোঝা যায় যে, তখন জনকোলাহল থেকে একান্তে গমন এবং আল্লাহ তা'আলার বিশেষ ধ্যানে মগ্ন হওয়াই ছিল তাঁর ইবাদত। –[মাযহারী]

ওহীর আগমন সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রা.) বলেন : হযরত জিবরাঈল (আ.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আগমন করে বললেন : اِقْرَأْ (পাঠ করুন)। তিনি বলেন : مَا اَنَا بِقَارِئٍ আমি পড়া জানি না। [কারণ তিনি উম্মী ছিলেন। হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর উদ্দেশ্য কি, কিভাবে পড়াতে চান এবং কোনো লিখিত বিষয় পড়তে হবে কিনা ইত্যাদি বিষয় তিনি স্পষ্টভাবে বুঝতে সক্ষম হননি। তাই ওজর পেশ করেছেন।] রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমার এ জবাব শুনে হযরত জিবরাঈল (আ.) আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং সজোরে চাপ দিলেন। ফলে আমি চাপের কষ্ট অনুভব করি। অতঃপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন : اِقْرَأْ (পাঠ করুন)। আমি আবার পূর্ববৎ জবাব দিলাম। এতে তিনি পুনরায় আমাকে চেপে ধরলেন। চাপের কষ্ট অনুভব করলাম। অতঃপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে তৃতীয় বারের মতো পাঠ করতে বললেন। আমি এবারও পূর্ববৎ জবাব দিলে তিনি তৃতীয়বারের মতো আমাকে বুকে চেপে ধরলেন এবং ছেড়ে দিয়ে বললেন :

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ - خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ.

কুরআনের এই সর্বপ্রথম পাঁচখানি আয়াত নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘরে ফিরলেন। তাঁর হৃদয় কাঁপছিল। হযরত খাদীজা (রা.)-এর কাছে পৌঁছে বললেন : زَمِّلُوْنِىْ زَمِّلُوْنِىْ আমাকে আবৃত কর, আমাকে আবৃত কর। হযরত খাদীজা (রা.) তাঁকে বস্ত্র দ্বারা আবৃত করলে কিছুক্ষণ পর ভীতি বিদূরিত হলো। এ ভাবান্তর ও কম্পন হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর ভয়ে ছিল না। তাঁর শান এর চেয়ে আরও অনেক ঊর্ধ্বে বরং এই ওহীর মাধ্যমে নবুয়তের যে বিরাট দায়িত্ব তাঁকে অর্পণ করা হয়েছিল, তারই গুরুভার তিনি তিলে তিলে অনুভব করেছিলেন। এছাড়া একজন ফেরেশতাকে তাঁর আসল আকৃতিতে দেখার কারণে তিনি স্বাভাবিকভাবেই ভীত হয়ে পড়েছিলেন।

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন : সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত খাদীজা (রা.)-কে হেরা গুহার সমুদয় বৃত্তান্ত শুনিয়ে বললেন : এতে আমার মধ্যে এমন ভাবান্তর দেখা দেয় যে, আমি জীবনের ব্যাপারে শঙ্কিত হয়ে পড়ি। হযরত খাদীজা (রা.) বললেন : না, এরূপ কখনো হতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা আপনাকে কখনো ব্যর্থ হতে দেবেন না। কেননা আপনি আত্মীয়দের সাথে সদ্ব্যবহার করেন, বোঝাক্লিষ্ট লোকদের বোঝা বহন করেন, বেকারকে কাজে নিয়োজিত করেন, অতিথি সেবা করেন এবং বিপদগ্রস্তদেরকে সাহায্য করেন। হযরত খাদীজা (রা.) ছিলেন বিদূষী মহিলা। তিনি সম্ভবত তওরাত ও ইঞ্জিল থেকে অথবা এসব আসমানি কিতাবের বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে জানতে পেরেছিলেন যে, উপরিউক্ত চরিত্রগুণে গুণান্বিত ব্যক্তি কখনো বঞ্চিত ও ব্যর্থ হন না। তাই এভাবে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন।

এরপর হযরত খাদীজা (রা.) তাঁকে আপন পিতৃব্যপুত্র ওয়ারাকা ইবনে নওফলের কাছে নিয়ে গেলেন। ইনি জাহিলিয়াতের যুগে প্রতিমাপূজা বর্জন করে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন, যা ছিল তৎকালে একমাত্র সত্য ধর্ম। শিক্ষিত হওয়ার সুবাদে হিব্রু ভাষায়ও তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। আরবি ছিল তাঁর মাতৃভাষা। তিনি হিব্রু ভাষায়ও লিখতেন এবং ইঞ্জীল আরবিতে অনুবাদ করতেন। তখন তিনি অত্যধিক বয়োবৃদ্ধ ছিলেন। বার্ধক্যের কারণে তাঁর দৃষ্টিশক্তি লুপ্তপ্রায় ছিল। হযরত খাদীজা (রা.) তাঁকে বললেন : ভাইজান, আপনি তাঁর কথাবার্তা একটু শুনুন। ওয়ারাকার জিজ্ঞাসার জবাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ হেরা গুহার সমুদয় বৃত্তান্ত বলে শোনালেন। শোনামাত্রই ওয়ারাকা বলে উঠলেন : ইনিই সে পবিত্র ফেরেশতা, যাঁকে আল্লাহ তা'আলা মূসা (আ.)-এর কাছে প্রেরণ করেছিলেন। হায়, আমি যদি আপনার নবুয়তকালে শক্তিশালী হতাম! হায়, আমি যদি তখন জীবিত থাকতাম, যখন আপনার কওম আপনাকে (দেশ থেকে) বহিষ্কার করবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন : আমার স্বজাতি কি আমাকে বহিষ্কার করবে? ওয়ারাকা বললেন : অবশ্যই বহিষ্কার করবে। কারণ যখনই কোনো ব্যক্তি সত্য পয়গাম ও সত্যধর্ম নিয়ে আগমন করে, যা আপনি নিয়ে এসেছেন, তখনই তার কওম তার উপর নিপীড়ন চালায়। যদি আমি সে সময়কাল পাই, তবে আপনাকে যথাসাধ্য সাহায্য করব। ওয়ারাকা এর কয়েকদিন পরই ইহলোক ত্যাগ করেন। এই ঘটনার পরই ওহীর আগমন বন্ধ হয়ে যায়। –(বুখারী, মুসলিম) সোহায়লী বর্ণনা করেন, ওহীর বিরতিকাল ছিল আড়াই বছর। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে তিন বছরও আছে। –[মাযহারী]

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ এখানে اِسْمِ -শব্দ যোগ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যখনই কুরআন পড়বেন, আল্লাহর নাম অর্থাৎ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম দ্বারা শুরু করবেন। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পেশকৃত ওজরের জবাবের প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আপনি যদিও বর্তমান অবস্থায় উম্মী; লেখাপড়া জানেন না কিন্তু আপনার পালনকর্তা উম্মী ব্যক্তিকে উচ্চতর শিক্ষা, বক্তৃতা নৈপুণ্য, বিশুদ্ধতা ও প্রাঞ্জলতার এমন পরাকাষ্ঠা দান করতে পারেন, যার সামনে বড় বড় পণ্ডিত ব্যক্তিও স্বীয় অক্ষমতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়। পরবর্তীকালে তাই প্রকাশ পেয়েছিল। –(মাযহারী) এ স্থলে বিশেষভাবে আল্লাহর 'রব' নামটি উল্লেখ করায় এ বিষয়বস্তু আরও জোরদার হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলাই আপনার পালনকর্তা। তিনি

সর্বতোভাবে আপনাকে পালন করেন। তিনি উম্মী হওয়া সত্ত্বেও আপনাকে পাঠ করাতে সক্ষম। আল্লাহর গুণাবলির মধ্য থেকে এ স্থলে বিশেষভাবে সৃষ্টগুণ উল্লেখ করার মধ্যে সম্ভবত রহস্য এই যে, সৃষ্টি তথা অস্তিত্ব দান করাই সৃষ্টির প্রতি আল্লাহ তা'আলার সর্বপ্রথম অনুগ্রহ। এ স্থলে ব্যাপকতার দিকে ইঙ্গিত করার জন্য خَلَقَ ক্রিয়াপদের কর্ম উল্লেখ করা হয়নি। অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বজগতই এই সৃষ্টি কর্মের ফল।

خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ পূর্বের আয়াতে সমগ্র বিশ্বজগৎ সৃষ্টির বর্ণনা ছিল। এ আয়াতে সেরা সৃষ্টি মানব সৃষ্টির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। চিন্তা করলে দেখা যায় সমগ্র বিশ্বজগতের সার-নির্যাস হচ্ছে মানুষ। জগতে যা কিছু আছে, তার প্রত্যেকটির নজির মানুষের মধ্যে বিদ্যমান। তাই মানুষকে ক্ষুদ্র জগৎ বলা হয়। বিশেষভাবে মানুষের উল্লেখ করার এক কারণ এরূপ হতে পারে যে, নবুয়ত, রিসালত ও কুরআন নাজিল করার লক্ষ্য আল্লাহর আদেশ-নিষেধ পালন করানো। এটা বিশেষভাবে মানুষেরই কাজ; عَلَقٍ –শব্দের অর্থ জমাট রক্ত, মানুষ সৃষ্টির বিভিন্ন স্তর অতিক্রান্ত হয়। মৃত্তিকা ও উপাদান চতুষ্টয় দ্বারা এর সূচনা হয়, এরপর বীর্য ও এরপর জমাট রক্তের পালা আসে। অতঃপর মাংসপিণ্ড ও অস্থি ইত্যাদি সৃষ্টি করা হয়। এসবের মধ্যে জমাট রক্ত হচ্ছে একটি মধ্যবর্তী অবস্থা। এর উল্লেখ করায় এর পূর্বাপর অবস্থাসমূহের প্রতি ইঙ্গিত হয়ে গেছে।

اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ –এখানে اِقْرَأْ আদেশের পুনরুল্লেখ করা হয়েছে। এর এক কারণ মারেফুল কুরআনের তাফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় কারণ এরূপও হতে পারে যে, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পাঠ করার জন্য প্রথম اِقْرَأْ বলা হয়েছে এবং দ্বিতীয় اِقْرَأْ তাবলীগ, দাওয়াত ও অপরকে পাঠ করানোর জন্য বলা হয়েছে। اَكْرَمُ বিশেষণে ইঙ্গিত রয়েছে যে, জগৎ সৃষ্টি ও মানব সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ তা'আলার নিজের কোনো স্বার্থ ও লাভ নেই বরং এগুলো সব দানশীলতার পরিপ্রেক্ষিতে করা হয়েছে। ফলে তিনি অযাচিতভাবে সৃষ্টিজগৎকে অস্তিত্বের মহান নিয়ামত দান করেছেন।

اَلَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ মানব সৃষ্টির পর মানব শিক্ষা বর্ণিত হয়েছে। কারণ শিক্ষাই মানুষকে অন্যান্য জীবজন্তু থেকে স্বতন্ত্র এবং সৃষ্টির সেরা রূপে চিহ্নিত করে। শিক্ষার পদ্ধতি সাধারণত দ্বিবিধ। এক. মৌখিক শিক্ষা এবং দুই. কলম ও লেখার মাধ্যমে শিক্ষা। সূরার শুরুতে اِقْرَأْ –শব্দের মধ্যে মৌলিক শিক্ষা রয়েছে কিন্তু এ আয়াতে শিক্ষাদান সম্পর্কিত বর্ণনায় কলমের সাহায্যে শিক্ষাকেই অগ্রে বর্ণনা করা হয়েছে।

শিক্ষার সর্বপ্রথম ও গুরুত্বপূর্ণ উপায় কলম ও লিখন : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর এক রেওয়ায়েতক্রমে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন– لَمَّا خَلَقَ اللّٰهُ الْخَلْقَ كَتَبَ فِىْ كِتَابِهٖ فَهُوَ عِنْدَهٗ فَوْقَ الْعَرْشِ اِنَّ رَحْمَتِىْ غَلَبَتْ غَضَبِىْ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যখন আদিকালে সবকিছু সৃষ্টি করেন, তখন আরশে তাঁর কাছে রক্ষিত কিতাবে একথা লিপিবদ্ধ করেন যে, আমার রহমত আমার ক্রোধের উপর প্রবল থাকবে। হাদীসে আরো বলা হয়েছে :

اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ الْقَلَمَ فَقَالَ لَهٗ اُكْتُبْ فَكَتَبَ مَا يَكُوْنُ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَهُوَ عِنْدَهٗ فِى الذِّكْرِ فَوْقَ عَرْشِهٖ.

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করেন এবং তাকে লেখার নির্দেশ দেন। সে মতে কলম কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু হবে, সব লিখে ফেলে। এ কিতাব আল্লাহর কাছে আরশে রক্ষিত আছে। –[কুরতুবী]

কলম তিন প্রকার : আলিমগণ বলেন : জগতে তিনটি কলম আছে : এক. আল্লাহ তা'আলা স্বহস্তে সৃজিত সর্বপ্রথম কলম, যাকে তিনি তাকদীর লেখার আদেশ করেছিলেন। দুই. ফেরেশতাগণের কলম, যা দ্বারা তারা ভবিতব্য ঘটনা, তার পরিমান এবং মানুষের আমলনামা লিপিবদ্ধ করেন। তিন. সাধারণ মানুষের কলম, যা দ্বারা তারা তাদের কথাবার্তা লিখে এবং নিজেদের অভীষ্ট কাজে ব্যবহার করে। লিখন প্রকৃতপক্ষে এক প্রকার বর্ণনা এবং বর্ণনা মানুষের বিশেষ গুণ। –(কুরতুবী) তাফসীরবিদ মুজাহিদ আবূ আমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তা'আলা সমগ্র সৃষ্ট জগতে চারটি বস্তু স্বহস্তে সৃষ্টি করেছেন। এগুলো ব্যতীত সব বস্তু 'কুন' তথা 'হয়ে যাও' আদেশের মাধ্যমে অস্তিত্ব লাভ করেছে। সেই বস্তু চতুষ্টয় এই : কলম, আরশ, জান্নাতে আদন ও আদম (আ.)।

লিখন জ্ঞান সর্বপ্রথম দুনিয়াতে কাকে দান করা হয় : কেউ কেউ বলেন–সর্বপ্রথম এই জ্ঞান মানবপিতা হযরত আদম (আ.)-কে শিক্ষা দেওয়া হয় এবং তিনিই সর্বপ্রথম লেখা শুরু করেন।–(কা'বে আহবার) কেউ কেউ বলেন, হযরত ইদরীস (আ.)-এই দুনিয়াতে সর্বপ্রথম লেখক।–(যাহ্হাক) কারও কারও মতে প্রত্যেক লেখকের শিক্ষাই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে হয়ে থাকে।

অংকন ও লিখন আল্লাহর বড় নিয়ামত : হযরত কাতাদাহ (র.) বলেন, কলম আল্লাহ তা'আলার একটি বড় নিয়ামত। কলম না থাকলে কোনো ধর্ম প্রতিষ্ঠিত থাকত না এবং দুনিয়ার কাজকারবারও সঠিকভাবে পরিচালিত হতো না। হযরত আলী (রা.) বলেন : এটা আল্লাহ তা'আলার একটা বড় কৃপা যে, তিনি তাঁর বান্দাদেরকে অজ্ঞাত বিষয়সমূহের জ্ঞান দান করেছেন এবং তাদেরকে মূর্খতার অন্ধকার থেকে জ্ঞানের আলোর দিকে বের করে এনেছেন। তিনি মানুষকে লিখন বিদ্যায় উৎসাহিত করেছেন। কেননা এর উপকারিতা অপরিসীম। আল্লাহ ব্যতীত কেউ তা গণনা করে শেষ করতে পারে না। যাবতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান, পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের ইতিহাস, জীবনালেখ্য ও উক্তি আল্লাহ তা'আলার অবতীর্ণ কিতাবসমূহ সমস্তই কলমের সাহায্যে লিখিত হয়েছে এবং পৃথিবীর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অক্ষয় হয়ে থাকবে। কলম না থাকলে ইহকাল ও পরকালের সব কাজকর্মই বিঘ্নিত হবে।

পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আলেমগণ সর্বদা লিখন কর্মের প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁদের অগণিত রচনাশৈলীই এর উজ্জ্বল সাক্ষ্য বহন করে। পরিতাপের বিষয়, বর্তমান যুগে আলিম ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির প্রতি চরম উদাসীনতা বিরাজমান রয়েছে। ফলে শত শত লোকের মধ্যে দু'চারজনই এ ব্যাপারে পণ্ডিত দৃষ্টিগোচর হয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে লিখন শিক্ষা না দেওয়ার রহস্য : আল্লাহ তা'আলা শেষনবী ﷺ-এর মর্যাদাকে মানুষের চিন্তা ও অনুমানের উর্ধ্বে রাখার জন্য তাঁর জন্মস্থান থেকে ব্যক্তিগত অবস্থা পর্যন্ত সবকিছুকে এমন করেছিলেন যে, কোনো মানুষ এসব ব্যাপারে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ও শ্রম দ্বারা কোনো উৎকর্ষ অর্জন করতে পারে না। তাঁর জন্মস্থানের জন্য আরবের মরুভূমি মনোনীত হয়েছে, যা সভ্য জগৎ ও জ্ঞান-গরিমার পীঠভূমি থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিল এবং পথ ও যোগাযোগের দিক দিয়ে অত্যধিক দুর্গম ছিল। ফলে শাম, ইরাক, মিসর ইত্যাদি উন্নত নগরীর অধিবাসীদের সাথে সেখানকার লোকদের কোনো সম্পর্ক ছিল না। এ কারণেই আরবের সবাই উম্মী বলে কথিত হয়। এমন দেশ ও গোত্রের মধ্যে জন্মগ্রহণের পর আল্লাহ তা'আলা আরও কিছু ব্যবস্থা করলেন। তা এই যে, আরবদের মধ্যে যদিও বা খুব নগণ্য সংখ্যক লোক জ্ঞান-বিজ্ঞান, অঙ্কন ও লিখন বিদ্যা শিক্ষা করত, কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে তা শিক্ষা করারও সুযোগ দেওয়া হয়নি। এহেন প্রতিকূল পরিবেশে জন্মগ্রহণকারী ব্যক্তির কাছ থেকে কে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও উন্নত চরিত্র আশা করতে পারত? হঠাৎ আল্লাহ তা'আলা তাঁকে নবুয়তের অলংকারে ভূষিত করলেন এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞার এক অশেষ ফল্গুধারা তাঁর মুখ দিয়ে প্রবাহিত করে দিলেন। বিশুদ্ধতায় ও প্রাঞ্জলতায় আরবের বড় বড় কবি ও অলংকারবিদও তাঁর কাছে হার মেনে যায়। এই প্রোজ্জ্বল মু'জিযাটি স্বচক্ষে দেখে এ প্রত্যয় না করে উপায় নেই যে, তাঁর এসব গুণ-গরিমা মানবীয় প্রচেষ্টা ও কর্মের ফলশ্রুতি নয় বরং আল্লাহ তা'আলার অদৃশ্য দান। অংকন ও লিখন শিক্ষা না দেওয়ার মধ্যে এ রহস্যই নিহিত ছিল। –[কুরতুবী]

عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ পূর্বের আয়াতে ছিল কলমের সাহায্যে শিক্ষা দানের বর্ণনা। এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রকৃত শিক্ষাদাতা আল্লাহ তা'আলা তাঁর শিক্ষার মাধ্যম অসংখ্য, অগণিত– শুধু কলমের মধ্যেই সীমিত নয়। তাই বলা হয়েছে–আল্লাহ তা'আলা মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন, যা সে পূর্বে জানত না। এতে কলম অথবা অন্য কোনো উপায় উল্লেখ না করার মাঝে ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার এ শিক্ষা মানুষের জন্মলগ্ন থেকে অব্যাহত রয়েছে। তিনি মানুষকে প্রথমে বুদ্ধি দান করেন, যা জ্ঞান লাভের সর্ববৃহৎ উপায়। মানুষ বুদ্ধির সাহায্যে কোনো শিক্ষা ব্যতিরেকে অনেক কিছু শিখে নেয়। আল্লাহ তা'আলা মানুষের সামনে ও পিছনে স্বীয় অসীম কুদরতের বহু নিদর্শন রেখে দিয়েছেন। যাতে সে সেগুলো প্রত্যক্ষ করে তার সৃষ্টিকর্তাকে চিনতে পারে। এরপর ওহী ও ইলহামের মাধ্যমে অনেক বিষয়ের জ্ঞান মানুষকে দান করেছেন। এছাড়া আরও বহু বিষয়ের জ্ঞান মানুষের মস্তিষ্ক আপনা-আপনি জাগ্রত করে দিয়েছিলেন। এতে কোনো ভাষা অথবা কলমের সাহায্যে শিক্ষার দখল নেই। একটি চেতনাহীন শিশু জননীর গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথেই তার খাদ্যের কেন্দ্র অর্থাৎ জননীর স্তনযুগলকে চিনে নেয়। স্তন থেকে দুগ্ধ বের করার জন্য মুখ চেপে ধরার কৌশল তাকে কে শিক্ষা দেয় এবং দিতে পারে? আল্লাহ তা'আলা শিশুকে ক্রন্দন করার কৌশল জন্মলগ্ন থেকেই শিখিয়ে দেন। তার এই ক্রন্দন তার অনেক প্রয়োজন মেটানোর উপায় হয়ে থাকে। তাকে ক্রন্দনরত দেখলে পিতামাতা তার কষ্টের কথা চিন্তা করে অস্থির হয়ে পড়েন। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, উত্তাপ, শৈত্য ইত্যাদি অভাব ক্রন্দনের দ্বারাই বিদূরিত হয়। সদ্যপ্রসূত শিশুকে এই ক্রন্দন কে শেখাতে পারত এবং কিভাবে শেখাত? এগুলো সবই আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান, যা আল্লাহ তা'আলার প্রত্যেক প্রাণী বিশেষত মানুষের মস্তিষ্কে সৃষ্টি করে দেন। এই জরুরি শিক্ষার পর মৌখিক শিক্ষা ও অন্তরগত শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ হতে থাকে। مَا لَمْ يَعْلَمْ (যা সে জানত না) বলার বাহ্যত কোনো প্রয়োজন ছিল না! কারণ শিক্ষা স্বভাবত অজানা

বিষয়েরই হয়ে থাকে। কিন্তু এখানে এজন্য বলা হয়েছে, যাতে মানুষ আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান ও কৌশলকে তার ব্যক্তিগত পরাকাষ্ঠা মনে করে না বসে। এতে আরও ইঙ্গিত রয়েছে যে, মানুষের উপর এমনও এক সময় আসে, যখন সে কিছুই জানে না; যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে : أَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا –অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে জননীর গর্ভ থেকে এমতাবস্থায় বের করেছেন যে, তোমরা কিছুই জান না। অতএব বুঝা গেল যে, মানুষের জ্ঞান-গরিমা তার ব্যক্তিগত পরাকাষ্ঠা নয় বরং স্রষ্টা ও প্রভু আল্লাহ তা'আলারই দান। –(মাযহারী) কোনো কোনো তাফসীরকার এ আয়াতে ইনসানের অর্থ নিয়েছেন হযরত আদম (আ.) অথবা রাসূলে কারীম ﷺ। হযরত আদম (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম শিক্ষা দান করেছেন। বলা হয়েছে : وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا এবং নবী করীম ﷺ-এই সর্বশেষ পয়গম্বর, যার শিক্ষায় পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের এবং লওহ ও কলমের শিক্ষা শামিল রয়েছে। বলা হয়েছে : وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمُ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ ।

সূরা ইকরার উপরিউক্ত পাঁচ আয়াত সর্বপ্রথম অবতীর্ণ আয়াত। এর পরবর্তী আয়াতসমূহ অনেক দিন পরে অবতীর্ণ হয়। কেননা সূরার শেষ অবধি অবশিষ্ট আয়াতসমূহ আবূ জাহেলের ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত। নবুয়ত ঘোষণার পূর্বে মক্কায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোনো বিরুদ্ধবাদী ছিল না বরং সবাই তাঁকে 'আল-আমীন' উপাধিতে ভূষিত করত, মনেপ্রাণে ভালোবাসত ও সম্মান করত। আবূ জাহলের বিরুদ্ধাচরণ ও শত্রুতা বিশেষত নামাজে নিষেধ করার ঘটনা বলা বাহুল্য তখনকার, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ নবুয়ত ও দাওয়াত ঘোষণা করেন এবং রজনীতে নামাজের হুকুম অবতীর্ণ হয়।

كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَىٰ أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَىٰ আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি ধৃষ্টতা প্রদর্শনকারী আবূ জাহেলকে লক্ষ্য করে বক্তব্য রাখা হলেও ব্যাপক ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। এতে সাধারণ মানুষের একটি নৈতিক দুর্বলতা বিধৃত হয়েছে। মানুষ যতদিন অপরের প্রতি মুখাপেক্ষী থাকে, ততদিন সোজা হয়ে চলে। কিন্তু যখন সে মনে করতে থাকে যে, সে কারও মুখাপেক্ষী নয়, তখন তার মধ্যে অবাধ্যতা এবং অপরের উপর জুলুম ও নির্যাতনের প্রবণতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। সাধারণত বিত্তশালী, শাসনক্ষমতায় আসীন ব্যক্তিবর্গ এবং ধনজন, বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের সমর্থনপুষ্ট এক শ্রেণির লোকের মধ্যে এই প্রবণতা বহুল পরিমাণে প্রত্যক্ষ করা যায়। তারা ধনাঢ্যতা ও দলবলের শক্তিতে মদমত্ত হয়ে অপরকে পরোয়াই করে না। আবূ জাহেলের অবস্থাও ছিল তথৈবচ। সে ছিল মক্কার বিত্তশালীদের অন্যতম। তার গোত্র এমনকি সমগ্র শহরের লোক তাকে সমীহ করত। সে এমনি অহংকারে মত্ত হয়ে পয়গম্বরকুল শিরোমণি ও সৃষ্টির সেরা মানব রাসূলে কারীম ﷺ-এর শানে ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে বসল। পরের আয়াতে এমনি ধরনের অবাধ্য লোকদের অশুভ পরিণতি উল্লেখ করা হয়েছে। إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ অর্থাৎ সবাইকে তাদের পালনকর্তার কাছে ফিরে যেতে হবে। এর বাহ্যিক অর্থ এই যে, মৃত্যুর পর সবাই আল্লাহর কাছে ফিরে যাবে এবং ভালোমন্দ কার্মের হিসাব নেবে। অবাধ্যতার কুপরিণাম স্বচক্ষে দেখে নেবে। এটাও অসম্ভব নয় যে, এ আয়াতে গর্বিত মানুষের গর্বের প্রতিকার বর্ণনা করার জন্য বলা হয়েছে : হে নির্বোধ, তুমি নিজেকে সবকিছুর প্রতি অমুখাপেক্ষী ও স্বেচ্ছাধীন মনে কর কিন্তু চিন্তা করলে তুমি নিজেকে প্রতিটি উঠাবসায় ও চলাফেরায় আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষী পাবে। তিনি যদি বাহ্যত তোমাকে কোনো মানুষের মুখাপেক্ষী না করে থাকেন, তবে কমপক্ষে এটা তো দেখ যে, তোমাকে প্রত্যেক বিষয়ে আল্লাহর মুখাপেক্ষী করেছেন। মানুষের মুখাপেক্ষিতা থেকে মুক্ত মনে করার বিষয়টিও বাহ্যিক বিভ্রান্তি বৈ কিছু নয়। বলা বাহুল্য, আল্লাহ মানুষকে সমাজবদ্ধ জীবরূপে সৃষ্টি করেছেন। সে একা তার কোনো প্রয়োজনই মেটাতে পারে না। সে তার মুখের একটি গ্রাসের প্রতি লক্ষ্য করলেও দেখতে পাবে যে, সেটা হাজারো মানুষ ও জন্তু-জানোয়ারের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং দীর্ঘদিনের সাধনার ফলশ্রুতি, যা সে অনায়াসে গিলে যাচ্ছে। এত হাজার হাজার মানুষকে নিজের কাজে নিয়োজিত করার সাধ্য কার আছে? মানুষের পোশাক ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের অবস্থাও তদ্রূপ। সেগুলো সরবরাহের পেছনে হাজারো, লাখো মানুষের শ্রম ব্যয়িত হচ্ছে, যারা কোনো ব্যক্তি বিশেষের গোলাম নয়। কেউ তাদের সবাইকে বেতন দিয়ে কাজ করাতে চাইলেও তা সাধ্যাতীত ব্যাপার। এসব বিষয়ে চিন্তা করলে মানুষ এ রহস্য জানতে পারে যে, মানুষের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সরবরাহ করার ব্যবস্থা তার নিজের তৈরি নয় বরং বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ তা'আলা তাঁর অচিন্তনীয় প্রজ্ঞাবলে এই পরিকল্পনা তৈরি করেছেন ও চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি কারো অন্তরে কৃষিকাজের ইচ্ছা জাগ্রত করেছেন, কারো মনে কাঠ কাটা ও মিস্ত্রীগিরির প্রেরণা সৃষ্টি করেছেন, কাউকে কর্মকারের কাজের প্রতি উৎসাহিত করেছেন, কাউকে শ্রম ও মজুরি করার মধ্যেই সন্তুষ্টি দান করেছেন এবং কাউকে

বাণিজ্য ও শিল্পের প্রতি উৎসাহিত করে মানুষের প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জামের বাজার বসিয়ে দিয়েছেন। কোনো রাষ্ট্র আইন করে এসব ব্যবস্থাপনা করতে পারে না এবং একা কোনো ব্যক্তির পক্ষেও এটা সম্ভব নয়। তাই এই চিন্তা–ভাবনার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি এই যে, إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ অর্থাৎ পরিশেষে সব মানুষই যে আল্লাহর কুদরত ও প্রজ্ঞার অধীন, একথা জীবন্ত হয়ে দৃষ্টির সামনে এসে যায়।

أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ এখান থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত একটি ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। নামাজের আদেশ লাভ করার পর যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজ পড়া শুরু করেন, তখন আবূ জাহেল তাঁকে নামাজ পড়তে বারণ করে এবং হুমকি দেয় যে, ভবিষ্যতে নামাজ পড়লে ও সেজদা করলে সে তাঁর ঘাড় পদতলে পিষ্ট করে দেবে। এর জবাবে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে। বলা হয়েছে : أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ অর্থাৎ সে কি জানে না যে, আল্লাহ দেখছেন? কি দেখছেন, এখানে তার উল্লেখ নেই। অতএব ব্যাপক অর্থে তিনি নামাজ প্রতিষ্ঠাকারী মহাপুরুষকেও দেখছেন এবং বাধাদানকারী হতভাগাকেও দেখছেন। দেখার পর কি হবে, তা উল্লেখ না করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সেই ভয়াবহ পরিণতির কল্পনাও করা যায় না।

لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ - سَفْعٌ-এর অর্থ কঠোরভাবে হেঁচড়ানো। نَاصِيَة শব্দের অর্থ কপালের উপরিভাগের কেশগুচ্ছ। যার এই কেশগুচ্ছ অন্যের মুঠোর ভেতরে চলে যায়, সে তার করতলগত হয়ে পড়ে।

كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ এতে নবী করীম ﷺ-কে আদেশ করা হয়েছে যে, আবূ জাহলের কথায় কর্ণপাত করবেন না এবং সেজদা ও নামাজে মশগুল থাকুন। কারণ এটাই আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জনের উপায়।

সেজদায় দোয়া কবুল হয় : আবূ দাউদে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতক্রমে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ অর্থাৎ বান্দা যখন সেজদায় থাকে, তখন তার পালনকর্তার অধিক নিকটবর্তী হয়। তাই তোমরা সেজদায় বেশি পরিমাণে দোয়া কর। অন্য এক হাদীসে আরো বলা হয়েছে : فَإِنَّهُ فَمِنْ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ –অর্থাৎ সেজদার অবস্থায় কৃত দোয়া কবুল হওয়ার যোগ্য।

নফল নামাজের সেজদায় দোয়া করার প্রমাণ রয়েছে। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে এর বিশেষ দোয়াও বর্ণিত আছে। বর্ণিত সে দোয়া পাঠ করাই উত্তম। ফরজ নামাজসমূহে এ ধরনের দোয়া পাঠ করার প্রমাণ নেই। কারণ ফরজ নামাজ সংক্ষিপ্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

আলোচ্য আয়াত যে পাঠ করে এবং যে শুনে, সবার উপর সেজদা করা ওয়াজিব। সহীহ্ মুসলিমে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এই আয়াত তেলাওয়াত করে সেজদা করেছেন।

শব্দ বিশ্লেষণ :

اِقْرَأْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব فَتَحَ মাসদার قِرَاءَةٌ মূলবর্ণ (ق - ر - ء) জিনস مهموز لام অর্থ– আপনি পাঠ করুন।

خَلَقَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার خَلْقٌ মূলবর্ণ (خ - ل - ق) জিনস صحيح অর্থ– তিনি সৃষ্টি করেছেন।

عَلَقٍ : অর্থ– জমাট রক্ত, যা শুকায়নি। ইমাম রাগেব (র.)-এর অর্থ শুধু 'জমাট রক্ত' বলেছেন। কিন্তু কামূসের মধ্যে عَلَقٌ -এর অর্থ, করা হয়েছে সাধারণ রক্ত বা এমন রক্ত, যা খুব লাল বা জমাট বদ্ধ।

اَلْاَكْرَمُ : اسم تفضيل। খুব দয়ালু। বাবে كَرُمَ মহা মহিমান্বিত খুব দয়ালু।

عَلَّمَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيل মাসদার تَعْلِيْمٌ মূলবর্ণ (ع - ل - م) জিনস صحيح অর্থ– তিনি শিক্ষা দিয়েছেন।

لَيَطْغَىٰ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার طُغْيَانٌ মূলবর্ণ (ط - غ - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– সীমা হতে বের হয়ে যায়।

أَنْ رَّاٰهُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব فَتَحَ মাসদার رُؤْيَةٌ মূলবর্ণ (ر - ء - ى) জিনস মুরাক্কাব ناقص يائى এবং مهموز عين অর্থ– সে নিজেকে মনে করে।

اِسْتَغْنٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব إِسْتِفْعَالٌ মাসদার إِسْتِغْنَاءٌ মূলবর্ণ (غ - ن - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– অমুখাপেক্ষী।

يَنْهٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার نَهْىٌ মূলবর্ণ (ن - ه - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– নিষেধ করে।

صَلّٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَصْلِيَةٌ মূলবর্ণ (ص - ل - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– সে নামাজ পড়েছে।

لَمْ يَنْتَهِ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع منفى بلم বাব إِفْتِعَالٌ মাসদার إِنْتِهَاءٌ মূলবর্ণ (ن - ه - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– যদি সে ফিরে না আসে।

لَنَسْفَعًا : সীগাহ جمع متكلم বহছ لام تاكيد بانون خفيفه বাব فَتَحَ মাসদার سَفْعٌ মূলবর্ণ (س - ف - ع) জিনস صحيح অর্থ– আমি তাকে হেঁচড়াব।

اَلنَّاصِيَةُ : একবচন, বহুবচন نَوَاصِىُّ ও نَاصِيَاتٌ অর্থ– ললাটের কেশগুচ্ছ।

خَاطِئَةٌ : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم فاعل বাব فَتَحَ মাসদার اَلْخَطَاءُ মূলবর্ণ (خ - ط - ء) জিনস مهموز لام অর্থ– পাপ যুক্ত, পাপী।

فَلْيَدْعُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ امر غائب معروف বাব نَصَرَ মাসদার دُعَاءٌ মূলবর্ণ (د - ع - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– সে আহ্বান করুক।

نَادِيَهُ : نَادِىَ মুযাফ। ه যমীর মুযাফ ইলাইহি। তার পরিষদবর্গ, মজলিস অর্থাৎ তার মজলিসের সাথিবৃন্দ।

اَلزَّبَانِيَةَ : অর্থ– দোজখের পেয়াদা প্রহরী, পুলিশ, দোজখের দায়িত্বে নিয়োজিত প্রহরী বা ফেরেশতা। ইবনে আবি হাতেম ও হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকেও "দোজখের ফেরেশতাগণ" অর্থ বর্ণিত আছে। আল্লামা বগভী (র.) লিখেন, زَبَانِيَة হলো زِبْنٰى -এর বহুবচন। যা زَبْنٌ থেকে নির্গত। অর্থ– দূর করা।

لَا تُطِعْهُ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِطَاعَةٌ মূলবর্ণ (ط - و - ع) জিনস اجوف واوى অর্থ– তার কথা মানবেন না।

اِقْتَرِبْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব إِفْتِعَالٌ মাসদার اِقْتِرَابٌ মূলবর্ণ (ق - ر - ب) জিনস صحيح অর্থ– নৈকট্য লাভ করতে থাকুন।

বাক্য বিশ্লেষণ :

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ : এখানে اِقْرَأْ ফে'ল, তার যমীর انت ফায়েল। بِاسْمِ رَبِّكَ টা উহ্য ফেলের সাথে متعلق হয়ে حال হয়েছে ফায়েলের যমীর থেকে অর্থাৎ مفتتحا আর اَلَّذِىْ টা رَبِّ -এর সিফাত হয়েছে। আর তা জর এর স্থানে হয়েছে। আর خَلَقَ বাক্যটির কোনো محل নেই। কেননা الذ -এর সেলাহ এর মধ্যস্থ যমীর اَلَّذِىْ -এর দিকে ফিরেছে। خَلَقَ الْاِنْسَانَ টা خلق থেকে بدل হয়েছে। আবার এটাকে تاكيد لفظى ও বলা যেতে পারে। আর اَلْاِنْسَانَ হলো مفعول به এবং مِنْ عَلَقٍ -এর সাথে متعلق হয়েছে। –[ই'রাবুল কুরআন : ৮/৩৬১-৬২]

سُوْرَةُ الْقَدْرِ مَكِّيَّةٌ

সূরা কাদ্‌র

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত– ৫, রুকূ'– ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

অনুবাদ	আয়াত
১. নিঃসন্দেহে আমি মহিমান্বিত রজনীতে কুরআন অবতীর্ণ করেছি।	اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۝١
২. আর আপনার কি জানা আছে যে, মহিমান্বিত রজনী কী?	وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۝٢
৩. মহামান্বিত রজনী হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম।	لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۙ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ ۝٣
৪. [অর্থাৎ এ রাত্রিতে ইবাদতের ছওয়াব সহস্র মাসের ইবাদতের ছওয়াব অপেক্ষাও অধিক] সে রাত্রে ফেরেশতাগণ এবং রূহুল কুদুস [হযরত জিবরাঈল (আ.)] স্বীয় প্রতিপালকের নির্দেশে প্রত্যেক মঙ্গলময় বস্তু নিয়ে [পৃথিবীতে] অবতরণ করেন।	تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ ۚ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ ۝٤
৫. [আর সে রাত্রি] শুধুই শান্তি। সে রাত্রি ফজর উদিত হওয়া পর্যন্ত [বরকতময়] থাকে।	سَلٰمٌ ۛ هِيَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۝٥

শাব্দিক অনুবাদ :

১. اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ নিঃসন্দেহে আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ মহিমান্বিত রজনীতে।

২. وَمَآ اَدْرٰىكَ আর আপনার কি জানা আছে যে مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ মহিমান্বিত রজনী কি?

৩. لَيْلَةُ الْقَدْرِ মহিমান্বিত রজনী خَيْرٌ উত্তম مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ হাজার মাস অপেক্ষা।

৪. تَنَزَّلُ অবতরণ করেন الْمَلٰٓئِكَةُ ফেরেশতাগণ وَالرُّوْحُ এবং রূহুল কুদুস فِيْهَا সে রাত্রে بِاِذْنِ رَبِّهِمْ স্বীয় প্রতিপালকের নির্দেশে مِنْ كُلِّ اَمْرٍ প্রত্যেক মঙ্গলময় বস্তু নিয়ে।

৫. سَلٰمٌ শুধুই শান্তি هِيَ সে রাত্রি থাকে حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ফজর উদিত হওয়া পর্যন্ত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : قَدْرٌ শব্দের ধাতুগত অর্থ : পরিমাণ নির্ধারণ ও ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ। এ মূলধাতু হতেই তাকদীর বা ভাগ্য শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। এর অর্থ সম্মান, গৌরব ও মহিমা। আলোচ্য সূরার প্রথম আয়াতের 'কদর' শব্দ হতেই সূরার নামকরণ করা হয়েছে। এতে ৫টি আয়াত, ৩০টি বাক্য এবং ১২১টি অক্ষর রয়েছে।

অবতীর্ণ হওয়ার সময়কাল : এ সূরাটি মাক্কী না মাদানী এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে।

ক আবুল হাইয়্যান তাঁর اَلْبَحْرُ الْمُحِيْطُ নামক গ্রন্থে বলেছেন যে, অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতে এ সূরাটি মাদানী।

খ. পক্ষান্তরে আল্লামা আল-মাওয়ারদী (র.) বলেন, অধিকাংশ কুরআন বিশারদের মতে তা মাক্কী সূরা। ইমাম সুয়ূতী (র.) আল-ইতকান গ্রন্থে এটাই লিখেছেন।

সুরাটির বিষয়বস্তু : কুরআন মাজীদের মর্যাদা, মূল্য ও গুরুত্ব বুঝানোই সূরাটির মূল বিষয়বস্তু। এ সূরায় আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম বলেছেন : আমিই এ কিতাব নাজিল করেছি। অর্থাৎ তা মুহাম্মদ ﷺ-এর নিজস্ব কোনো রচনা নয়; বরং তা আমারই নাজিল করা কিতাব। আমি এ কিতাব কদরের রাত্রে নাজিল করেছি। তা বড়ই সম্মান ও মর্যাদার রাত। পরে এ কথার ব্যাখ্যা করে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : এটা হাজার মাসের তুলনায়ও অধিক উত্তম রাত।

সূরার শেষভাগে বলা হয়েছে, এ রাতে ফেরেশতা ও রূহ জিবরাঈল (আ.) আল্লাহর অনুমতিক্রমে সব রকমের আদেশ-নির্দেশ নিয়ে অবতীর্ণ হয়ে থাকে। আর সন্ধ্যা হতে সকাল পর্যন্ত তা এক পরিপূর্ণ শান্তির রাত হয়ে থাকে। অর্থাৎ এ রাতে কোনোরূপ অশুভ বিষয়ের স্থান হতে পারে না। কেননা আল্লাহ তা'আলার ফয়সালাই যে মানবতার কল্যাণের জন্য হয়ে থাকে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এমনকি, কোনো জাতিকে ধ্বংস করে দেওয়ার ফয়সালা হলেও তা অবশ্যই গোটা মানবতার কল্যাণের জন্যই হয়ে থাকে। এ রাতে হযরত জিবরাঈল (আ.) ও অন্যান্য ফেরেশতাগণ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে মুত্তাকী মুসলমানদের গৃহে গমন করে প্রত্যেক নর-নারীকে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে সালাম ও শান্তির বাণী জ্ঞাপন করেন।

শানে নুযূল : ইবনে আবী হাতেম (রা.)-এর রেওয়ায়েতে আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার বনী ইসরাঈলের জনৈক মুজাহিদ সম্পর্কে আলোচনা করলেন। সে এক হাজার মাস পর্যন্ত অবিরাম জিহাদে মশগুল থাকে এবং কখনো অস্ত্র সংবরণ করেনি। মুসলমানগণ এ কথা শুনে বিস্মিত হলে এ সূরা কদর অবতীর্ণ হয়। এতে উম্মতের জন্য শুধু এক রাত্রির ইবাদতই সে মুজাহিদের এক হাজার মাসের ইবাদত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করা হয়েছে। ইবনে জরীর (র.) অপর একটি ঘটনা এভাবে উল্লেখ করেছেন যে, বনী ইসরাইলের জনৈক ইবাদতকারী ব্যক্তি সমস্ত রাত্রি ইবাদতে মশগুল থাকত ও সকাল হতেই জিহাদের জন্য বের হয়ে যেত এবং সারাদিন জিহাদে লিপ্ত থাকত। সে এক হাজার মাস এভাবে কাটিয়ে দেয়। এর পরিপ্রেক্ষিতেই আল্লাহ তা'আলা সূরা-কদর নাজিল করে এ উম্মতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন। এ থেকে আরো প্রতীয়মান হয় যে, শবে-কদর উম্মতে মুহাম্মদীরই বৈশিষ্ট্য। –[মাযহারী]

ইবনে কাছীর ইমাম মালিক (র.)-এর এই উক্তি বর্ণনা করেছেন। শাফেয়ী মাযহাবের কেউ কেউ একে অধিকাংশের মাযহাব বলেছেন। খাত্তাবী এর উপর ইজমা দাবি করেছেন। কিন্তু কোনো কোনো হাদীসবিদ এ ব্যাপারে ভিন্নমত ব্যক্ত করেছেন।

লায়লাতুল কদরের অর্থ : কদরের এক অর্থ মাহাত্ম্য ও সম্মান। কেউ কেউ এ স্থলে এ অর্থই নিয়েছেন। এর মাহাত্ম্য ও সম্মানের কারণে একে 'লায়লাতুল কদর' তথা মহিমান্বিত রাত বলা হয়। আবূ বকর ওয়াররাক বলেন : এ রাত্রিকে লায়লাতুল কদর বলার কারণ এই যে, কর্মহীনতার কারণে এর পূর্বে যার কোনো সম্মান ও মূল্য থাকে না, সে এই রাত্রিতে তওবা ইস্তেগফার ও ইবাদতের মাধ্যমে সম্মানিত ও মহিমান্বিত হয়ে যায়।

কদরের আরেক অর্থ তকদীর এবং আদেশও হয়ে থাকে। এ রাত্রিতে পরবর্তী এক বছরের অবধারিত বিধিলিপি ব্যবস্থাপক ও প্রয়োগকারী ফেরেশতাগণের কাছে হস্তান্তর করা হয়। এতে প্রত্যেক মানুষের বয়স, মৃত্যু, রিজিক, বৃষ্টি ইত্যাদির পরিমাণ নির্দিষ্ট ফেরেশতাগণকে লিখে দেওয়া হয়, এমনকি, এ বছর কে হজ করবে, তাও লিখে দেওয়া হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উক্তি অনুযায়ী চারজন ফেরেশতাকে এসব কাজ সোপর্দ করা হয়। তারা হলেন–ইসরাফীল, মীকাঈল, আজরাঈল ও জিবরাঈল (আ.)। –[কুরতুবী]

সূরা দুখানে বলা হয়েছে–

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ - فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا.

এ আয়াতে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, এ পবিত্র রাতে তাকদীর সংক্রান্ত সব ফয়সালা লিপিবদ্ধ করা হয়। অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ -এর অর্থ শবে-কদরই। কেউ কেউ এর অর্থ নিয়েছেন মধ্য শাবানের রাত্রি অর্থাৎ শবে-বরাত। তাঁরা বলেন যে, তাকদীর সংক্রান্ত বিষয়াদির প্রাথমিক ও সংরক্ষিত ফয়সালা শবে বরাতের হয়ে যায়। অতঃপর তার বিশদ বিবরণ শবে-কদরে লিপিবদ্ধ হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উক্তিতে এর সমর্থন পাওয়া যায়। বগভীর রেওয়ায়েতে তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা সারা বছরের তাকদীর সংক্রান্ত বিষয়াদির ফয়সালা শবে-বরাতে সম্পন্ন করেন; অতঃপর শবে-কদরে এসব ফয়সালা সংশ্লিষ্ট ফেরেশতাগণের কাছে সোপর্দ করা হয়। –(মাযহারী) পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এ রাত্রিতে তাকদীর সংক্রান্ত বিষয়াদি নিষ্পন্ন হওয়ার অর্থ এ বছর যেসব বিষয় প্রয়োগ করা হবে, সেগুলো লওহে মাহফূজ থেকে নকল করে ফেরেশতাগণের কাছে সোপর্দ করা। নতুবা আসল বিধিলিপি আদিকালেই লিখিত হয়ে গেছে।

শবে-কদর কোন রাত্রি : কুরআন পাকের সুস্পষ্ট বর্ণনা দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, শবে-কদর রমজান মাসে। কিন্তু সঠিক তারিখ সম্পর্কে আলিমগণের বিভিন্ন উক্তি রয়েছে যা সংখ্যায় চল্লিশ পর্যন্ত পৌছে। তাফসীরে মাযহারীতে আছে এসব উক্তির নির্ভুল তথ্য এই যে, শবে-কদর রমজান মাসের শেষ দশ দিনের মধ্যে আসে কিন্তু এরও কোনো তারিখ নির্দিষ্ট নেই বরং যে কোনো রাত্রিতে হতে পারে। প্রত্যেক রমজানে তা পরিবর্তিতও হয়। সহীহ হাদীসদৃষ্টে এই দশ দিনের বেজোড় রাত্রিগুলোতে শবে-কদর হওয়ার সম্ভাবনা অধিক। যদি শবে-কদরকে রমজানের শেষ দশকের বেজোড় রাত্রিগুলোতে ঘূর্ণায়মান এবং প্রতি রমজানে পরিবর্তনশীল মেনে নেওয়া যায়, তবে শবে-কদরের দিন তারিখ সম্পর্কিত হাদীসসমূহের মধ্যে কোনো বিরোধ অবশিষ্ট থাকে না। তাই অধিকাংশ ইমাম এ মতই পোষণ করেন। তবে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর এক উক্তি এই যে, শবে-কদর নির্দিষ্ট দিনেই হয়ে থাকে। –[ইবনে কাছীর]

সীহাহ বুখারীর এক রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ অর্থাৎ রমজানের শেষ দশকে শবে-কদর অন্বেষণ কর। সহীহ মুসলিমের রেওয়ায়েতে আছে : فَاطْلُبُوهَا فِي الْوِتْرِ مِنْهَا অর্থাৎ শেষ দশকের বেজোড় রাত্রিগুলোতে তালাশ কর। –[মাযহারী]

শবে-কদরের কতক ফজিলত ও তাঁর বিশেষ দোয়া : এ রাত্রির সর্ববৃহৎ ফজিলত তো আয়াতেই বর্ণিত হয়েছে যে, এক রাত্রির ইবাদত হাজার মাসের ইবাদত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

এক হাজার মাসে তিরাশি বছরের কিছু বেশি হয়। এই শ্রেষ্ঠত্ব কতগুণ, তার কোনো সীমা নেই। অতএব দ্বিগুণ, ত্রিগুণ, দশ গুণ, শতগুণ সবই হতে পারে।

বুখারী ও মুসলিমের এক রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি শবেকদরে ইবাদতে দণ্ডায়মান থাকে, তার অতীত সব গোনাহ মাফ হয়ে যায়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : শবে-কদরে সিদরাতুলমুন্তাহায় অবস্থানকারী সব ফেরেশতা হযরত জিবরাঈলের সাথে দুনিয়াতে অবতরণ করে এবং মদ্যপায়ী ও শূকরের মাংস ভক্ষণকারী ব্যতীত প্রত্যেক মু'মিন পুরুষ ও নারীকে সালাম করে।

অন্য এক হাদীসে রাসূলে কারীম ﷺ বলেন : যে বক্তি শবে-কদরের কল্যাণ ও বরকত থেকে বঞ্চিত থাকে, সে সম্পূর্ণই বঞ্চিত ও হতভাগ্য। শবে-কদরে কেউ কেউ বিশেষ নূরও প্রত্যক্ষ করেন। কিন্তু এটা সবাই লাভ করতে পারে না এবং শবে-কদরের বরকত ও ছওয়াব হাসিল হওয়ার ব্যাপারে এরূপ দেখার কোনো দখলও নেই। কাজেই এর পেছনে পড়া উচিত নয়।

হযরত আয়েশা (রা.) একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন : যদি আমি শবে-কদর পাই, কি দোয়া পাঠ করব? উত্তরে তিনি বললেন : এ দোয়া করো : اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي হে আল্লাহ, আপনি অত্যন্ত ক্ষমতাশীল। ক্ষমা আপনার পছন্দনীয়। অতএব আমার গোনাহসমূহ ক্ষমা করুন। –[কুরতুবী]

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ এ আয়াত থেকে পরিষ্কার জানা যায় যে, কুরআন পাক শবে-কদরে অবতীর্ণ হয়েছে। এর এক অর্থ এও হতে পারে যে, সমগ্র কুরআন লওহে-মাহফুজ থেকে শবে-কদরে অবতীর্ণ করা হয়েছে, অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আ.) একে ধীরে ধীরে তেইশ বছর ধরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে পৌছাতে থাকেন। দ্বিতীয় এই হতে পারে যে, এ রাতে কয়েকটি আয়াত অবতরণের মাধ্যমে সূচনা হয়ে যায়। এরপর অবশিষ্ট কুরআন পরবর্তী সময়ে ধাপে ধাপে অবতীর্ণ হয়।

সমস্ত ঐশী কিতাব রমজানেই অবতীর্ণ হয়েছে : হযরত আবূ যর গিফরী (রা.) বর্ণিত রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সহীফাসমূহ ৩রা রমজানে, তাওরাত ৬ই রমজানে, ইনজীল ১৩ই রমজানে এবং যাবূর ১৮ই রমজানে অবতীর্ণ হয়েছে। কুরআন পাক ২০শে রমজানুল-মুবারকে নাজিল হয়েছে। –[মাযহারী]

تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ – رُوحٌ বলে হযরত জিবরাঈল (আ.) কে বুঝানো হয়েছে। হাদীসে আছে, শবে-কদরে জিবরাঈল ফেরেশতাদের বিরাট একদল নিয়ে পৃথিবীতে অবতরণ করেন এবং যত নারী-পুরুষ নামাজ অথবা জিকিরে মশগুল থাকে, তাদের জন্য রহমতের দোয়া করেন। –[মাযহারী]

مِنْ كُلِّ أَمْرٍ –অর্থাৎ ফেরেশতাগণ শবে-কদরে সারা বছরের অবধারিত ঘটনাবলি নিয়ে পৃথিবীতে অবতরণ করে। কোনো কোনো তাফসীরবিদ একে سَلَامٌ-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত করে এ অর্থ করেছেন যে, এর রাত্রিটি যাবতীয় অনিষ্ট ও বিপদাপদ থেকে শান্তিস্বরূপ। –[ইবনে কাছীর]

سَلَامٌ অর্থাৎ এ রাত্রি শান্তিই শান্তি, মঙ্গলই মঙ্গল। এতে অনিষ্টের নামও নেই। –(কুরতুবী) কেউ কেউ একে مِنْ كُلِّ أَمْرٍ -এর বিশেষণ সাব্যস্ত করে অর্থ করেছেন–ফেরেশতাগণ প্রত্যেক শান্তি ও কল্যাণকর বিষয় নিয়ে আগমন করে। –[মাযহারী]

هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ অর্থাৎ শবে-কদরের এই বরকত রাত্রির কোনো বিশেষ অংশে সীমিত নয় বরং ফজরের উদয় পর্যন্ত বিস্তৃত।

জ্ঞাতব্য : এ সূরায় শবে-কদরকে এক হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। বলা বাহুল্য, এই এক হাজার মাসের মধ্যে প্রতি বছর শবে-কদর আসবে। অতএব হিসাব কিরূপে হবে? তাফসীরবিদগণ বলেছেন, এখানে এমন এক হাজার মাস বোঝানো হয়েছে যাতে 'শবে-কদর' নেই। অতএব কোনো অসুবিধা নেই। –[ইবনে কাছীর]

উদায়াচলের বিভিন্নতার কারণে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন দিনে শবে-কদর হতে পারে। প্রত্যেক দেশের দিক দিয়ে যে রাত্রি কদরের রাত্রি হবে, সে রাত্রিতেই শবে-কদরের কল্যাণ ও বরকত হাসিল হবে।

মাস'আলা : যে ব্যক্তি শবে-কদরে ইশা ও ফজরের নামাজ জামাতের সাথে পড়ে নেয়, সেও এ রাত্রির ছওয়াব হাসিল করবে। যে ব্যক্তি যত বেশি ইবাদত করবে, সে তত বেশি ছওয়াব পাবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি ইশার নামাজ জামাতের সাথে পড়ে, সে অর্ধ রাত্রির ছওয়াব অর্জন করে। যদি সে ফজরের নামাজও জামাতের সাথে পড়ে নেয়, তবে সমস্ত রাত্রি জাগরণের ছওয়াব হাসিল করে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

أَنْزَلْنَاهُ : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব إِفْعَالٌ মাসদার إِنْزَالٌ মূলবর্ণ (ن - ز - ل) জিনস صحيح অর্থ– আমি তা অবতীর্ণ করেছি।

الْقَدْرِ : অর্থ– মহিমান্বিত। বরকত ও মর্যাদাপূর্ণ রাত্রি। এমন মহান রাত্রি, যে রাত্রিতে বড় বড় কাজের তাকদিরী ফয়সালা করা হয়।

تَنَزَّلُ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার تَنَزُّلٌ মূলবর্ণ (ن - ز - ل) জিনস صحيح অর্থ– অবতরণ করেন।

مَلَائِكَةٌ : اَلْمَلَكُ-এর বহুবচন। এটি মুফরাদও হতে পারে আবার ইসমে জামেদও হতে পারে। অর্থ– ফেরেশতা।

اَلرُّوحُ : আত্মা, প্রাণ, জীবন, রহস্য। অদৃশ্য ফয়েয। ওহী। কুরআন। ফিরিশতা। ইমাম রাগেব (রহ.) লিখেন, روح মূলতঃ একক। আর رُوحٌ কে نَفْسٌ অর্থাৎ জীবন নামকরণ করা হয়েছে।

إِذْنٌ : অর্থ– হুকুম, এজাজত, ইচ্ছা, চাওয়া إِذْنٌ -এর ব্যবহার চাওয়ার অর্থ, ছাড়া হয় না।

أَمْرٌ : অর্থ– কাজ, লেনদেন, অবস্থা, হুকুম, أمر শব্দটি সকল কথা ও কাজের জন্য ব্যাপক।

سَلَامٌ : মাসদার ও ইসম, দোষ ও বিপদ হতে নিরাপদ রাখা। নিরাপত্তা, শান্তি, স্বস্তি, নিরাপদ। বাতেনী সকল বিপদপদ থেকে দূরে রাখা। "কদর রাত্রি সর্বপ্রকার ভয়-ভীতি ও বিপদ থেকে নিরাপদ এক রজনী।" –[জালালাইন]

مَطْلَعٌ : মাসদারে মীমি। অর্থ, উদিত হওয়া। مَطْلَعِ الْفَجْرِ ফজর উদিত হওয়া।

বাক্য বিশ্লেষণ :

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ : এখানে إِنَّ হলো হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল আর نَا হলো إِنَّ-এর إِسْمٌ আর أَنْزَلْنَاهُ বাক্যটি خَبَرُ إِنَّ; আর أَنْزَلْنَاهُ-এর أَنْزَلْنَا ফে'ল এবং যমীর ফায়েল আর ہ হলো مفعول به, আর فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ হলো انزلنه -এর সাথে متعلق; –[ই'রাবুল কুরআন ৮ম খণ্ড; পৃ. ৩৬৯]

سُوۡرَةُ الۡبَيِّنَةِ مَدَنِيَّةٌ
সূরা বাইয়্যিনা

মদিনায় অবতীর্ণ; আয়াত– ৮, রুকূ'– ১

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. আহলে কিতাব [ইহুদি, নাসারা] ও মুশরিকদের মধ্য হতে যারা কাফের ছিল, তারা [কুফর হতে কখনো] প্রত্যাবর্তনকারী ছিল না, যে পর্যন্ত না তাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত হয়।

২. [অর্থাৎ] আল্লাহর প্রেরিত কোনো একজন রাসূল, যিনি [তাদেরকে] পবিত্র সহীফাসমূহ পাঠ করে শুনিয়ে দেন।

৩. যাতে সঠিক বিষয়সমূহ লিপিবদ্ধ থাকে।

৪. আর যাদেরকে কিতাব প্রদান করা হয়েছিল, তাদের নিকট এই স্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত হওয়ার পরই তারা বিভক্ত হয়ে গেল।

৫. অথচ তাদের প্রতি [পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে কেবল] এই নির্দেশই হয়েছিল যে, আল্লাহ তা'আলার ইবাদত এরূপে করে, ইবাদতকে যেন তারই জন্য নির্দিষ্ট রাখে [বাতিল ধর্ম হতে] একনিষ্ঠ হয়ে, আর নামাজের পাবন্দি করে এবং জাকাত প্রদান করে, আর তাই সে [বর্ণিত] সঠিক বিষয়সমূহের পন্থা।

لَمۡ يَكُنِ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا مِنۡ اَهۡلِ الۡكِتٰبِ وَالۡمُشۡرِكِيۡنَ مُنۡفَكِّيۡنَ حَتّٰى تَاۡتِيَهُمُ الۡبَيِّنَةُ ﴿١﴾
رَسُوۡلٌ مِّنَ اللّٰهِ يَتۡلُوۡا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ﴿٢﴾
فِيۡهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ﴿٣﴾
وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِيۡنَ اُوۡتُوا الۡكِتٰبَ اِلَّا مِنۡۢ بَعۡدِ مَا جَآءَتۡهُمُ الۡبَيِّنَةُ ﴿٤﴾
وَمَاۤ اُمِرُوۡۤا اِلَّا لِيَعۡبُدُوا اللّٰهَ مُخۡلِصِيۡنَ لَهُ الدِّيۡنَ ۙ حُنَفَآءَ وَيُقِيۡمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤۡتُوا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِيۡنُ الۡقَيِّمَةِ ﴿٥﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. لَمۡ يَكُنۡ ছিল না الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا যারা কাফের ছিল مِنۡ اَهۡلِ الۡكِتٰبِ আহলে কিতাব وَالۡمُشۡرِكِيۡنَ ও মুশরিকদের মধ্য হতে مُنۡفَكِّيۡنَ প্রত্যাবর্তনকারী حَتّٰى تَاۡتِيَهُمۡ যে পর্যন্ত না উপস্থিত হয় الۡبَيِّنَةُ সুস্পষ্ট প্রমাণ।

২. رَسُوۡلٌ مِّنَ اللّٰهِ আল্লাহর প্রেরিত কোনো একজন রাসূল। يَتۡلُوۡا যিনি পাঠ করে শুনিয়ে দেন صُحُفًا مُّطَهَّرَةً পবিত্র সহীফাসমূহ।

৩. فِيۡهَا كُتُبٌ যাতে লিপিবদ্ধ থাকে قَيِّمَةٌ সঠিক বিষয়সমূহ।

৪. وَمَا تَفَرَّقَ আর বিভক্ত হয়ে গেল الَّذِيۡنَ اُوۡتُوا الۡكِتٰبَ যাদেরকে কিতাব প্রদান করা হয়েছিল তারা اِلَّا مِنۡۢ بَعۡدِ مَا جَآءَتۡهُمُ তাদের নিকট উপস্থিত হওয়ার পর الۡبَيِّنَةُ এই স্পষ্ট প্রমাণ।

৫. وَمَاۤ اُمِرُوۡۤا অথচ তাদের প্রতি এই নির্দেশই ছিল যে اِلَّا لِيَعۡبُدُوا اللّٰهَ আল্লাহ তা'আলার ইবাদত এরূপে করে مُخۡلِصِيۡنَ لَهُ الدِّيۡنَ ইবাদত কে যেন তারই জন্য নির্দিষ্ট রাখে حُنَفَآءَ একনিষ্ঠ হয়ে وَيُقِيۡمُوا الصَّلٰوةَ আর নামাজের পাবন্দি করে وَيُؤۡتُوا الزَّكٰوةَ এবং জাকাত প্রদান করে وَذٰلِكَ আর এটাই دِيۡنُ الۡقَيِّمَةِ সেই সঠিক বিষয়সমূহের পন্থা।

৬. নিশ্চয় আহলে কিতাবগণ ও মুশরিকগণের মধ্য হতে যারা কাফের হয়েছে, তারা দোজখের অগ্নির মধ্যে হবে, যেখানে তারা সদাসর্বদা অবস্থান করবে; [আর] তারাই নিকৃষ্টতর সৃষ্টি।	إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَٰبِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۚ أُولَٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ﴿٦﴾
৭. নিঃসন্দেহে যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, তারাই উৎকৃষ্টতম সৃষ্টি।	إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحَٰتِ ۙ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ﴿٧﴾
৮. তাদের প্রতিদান তাদের প্রতিপালকের নিকট সর্বদা অবস্থানের বেহেশতসমূহ রয়েছে, যার নিম্নদেশে নহরসমূহ বইতে থাকবে, যেখানে তারা অনন্তকাল অবস্থান করবে, আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন আর তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে, এটা সে ব্যক্তির জন্য, যে নিজের প্রতিপালককে ভয় করে।	جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ﴿٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৬. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا নিশ্চয় যারা কাফের হয়েছে مِنْ أَهْلِ الْكِتَٰبِ আহলে কিতাবগণ وَالْمُشْرِكِينَ ও মুশরিকগণের মধ্য হতে فِي نَارِ جَهَنَّمَ তারা দোজখের অগ্নির মধ্যে হবে خَٰلِدِينَ فِيهَا সেখানে তারা সদা সর্বদা অবস্থান করবে أُولَٰئِكَ هُمْ এরাই شَرُّ الْبَرِيَّةِ নিকৃষ্টতর সৃষ্টি।

৭. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا নিঃসন্দেহে যারা ঈমান এনেছে وَعَمِلُوا الصَّٰلِحَٰتِ এবং নেক কাজ করেছে أُولَٰئِكَ هُمْ তারাই خَيْرُ الْبَرِيَّةِ উৎকৃষ্টতম সৃষ্টি।

৮. جَزَاؤُهُمْ তাদের প্রতিদান عِنْدَ رَبِّهِمْ তাদের প্রতিপালকের নিকট جَنَّٰتُ عَدْنٍ সর্বদা অবস্থানের বেহেশতসমূহ রয়েছে تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَٰرُ যার নিম্নদেশে নহরসমূহ বইতে থাকবে। خَٰلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا যেখানে তারা অনন্তকাল অবস্থান করবে رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন وَرَضُوا عَنْهُ আর তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে ذَٰلِكَ لِمَنْ এটা সে ব্যক্তির জন্য যে خَشِيَ رَبَّهُ নিজের প্রতিপালককে ভয় করে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটি নামকরণের কারণ : সূরার প্রথম আয়াতের শেষ শব্দটি দ্বারা সূরাটির নামকরণ হয়েছে আল-বাইয়্যিনাহ। "বাইয়্যিনাহ" অর্থ স্পষ্ট দলিল ও অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ। এটা দ্বারা মূলত রাসূলে কারীম ﷺ উত্থাপিত দীন ও জীবনাদর্শের কথা বুঝানো হয়েছে। উক্ত সূরাটির আরও কয়েকটি নাম রয়েছে। যেমন : কিয়ামাহ, বালাদ, মুনফাক্কীন, বারিইয়্যা এবং লাম-ইয়াকুন। এতে ১টি রুকূ' ৮টি আয়াত, ২৫টি বাক্য এবং ১৪৯টি অক্ষর রয়েছে। -[রূহুল মা'আনী]

সূরাটি অবতীর্ণের সময়কাল : এ সূরাটি মাক্কী বা মাদানী হওয়ার বিষয়ে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। কতিপয় তাফসীরকার বলেন, সাধারণ বিশেষজ্ঞদের মতে এ সূরাটি মাক্কী। আর অপর কিছু সংখ্যক মুফাসসির বলেন, সাধারণ বিশেজ্ঞদের মতে তা মাদানী সূরা। হযরত ইবনে জুবাইর এবং আতা ইবনে ইয়াসার (র.)-এর মতে এটা মাদানী সূরা। হযরত ইবনে

আব্বাস ও কাতাদা (রা.) এ পর্যায়ে দু'টি কথা উদ্ধৃত হয়েছে। একটি কথানুযায়ী তা মাদানী। হযরত আয়েশা (রা.) তাকে মাক্কী বলেছেন। আল-বাহরুল মুহীত গ্রন্থকার আবূ হাইয়ান ও আহকামুল কুরআন প্রণেতা আবুল মুনয়িম (র.) এ সূরাটির মাক্কী হওয়াকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। এ সূরাতে বর্ণিত কথা ও বিষয়বস্তুতে এমন কোনো ইঙ্গিত নেই যে, যার ভিত্তিতে একটি কথাকে প্রাধান্য দেওয়া যায়।

সূরাটির বিষয়বস্তু ও মূলবক্তব্য : সূরাটিতে সর্বপ্রথম রাসূল প্রেরণের প্রয়োজনীয়তা ও অপরিহার্যতা উল্লেখ করা হয়েছে। সংক্ষেপে সে কথাটি হলো : দুনিয়ার মানুষ আহলে কিতাব বা মুশরিক যা-ই হোক না কেন, যে কুফরির অবস্থায় নিমজ্জিত ছিল, তা হতে মুক্তি লাভের জন্য এমন এক জন রাসূল প্রেরণ অপরিহার্য ছিল যার নিজ সত্তাই হবে তাঁর রাসূল হওয়ার অকাট্য প্রমাণ। তাকে প্রদত্ত কিতাব হবে সম্পূর্ণরূপে যথাযথ, সঠিক ও নির্ভুল শিক্ষায় পরিপূর্ণ।

এরপর আহলে কিতাব জাতিসমূহের গোমরাহীর ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পথ দেখাননি বলেই যে তারা বিভ্রান্ত হয়ে গেছে তা নয়; বরং আল্লাহর পক্ষ হতে সঠিক পথের নির্দেশ পাওয়ার পরই তারা বিভ্রান্ত হয়েছে। কাজেই তাদের গোমরাহীর জন্য তারা নিজেরাই দায়ী। আর এ প্রসঙ্গেই বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে যে নবী ও রাসূলই এসেছেন আর যে কিতাব-ই নাজিল হয়েছে, তা একটি মাত্র নির্দেশই দিয়েছে। সে নির্দেশ হলো, সকল পথ-পন্থা ও নির্দেশ পরিত্যাগ করে আল্লাহর খালেস বন্দেগি করার পথ ও পন্থা অবলম্বন করতে হবে। এটা হতেও অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, আহলে কিতাব এ আসল ও প্রকৃত দীন হতে বিচ্যুত হয়ে নিজের ধর্মে যেসব নতুন নতুন মত-পথ ও কথার উদ্ভাবন বা বৃদ্ধি করে নিয়েছে, তা সবই সম্পূর্ণ বাতিল।

কাজেই আল্লাহর এ শেষ নবী যিনি এখন এসেছেন, তিনিও সে আসল দীনের দিকে ফিরে আসার জন্য তাদেরকে অকুল আহ্বান জানিয়েছেন। সূরার শেষ ভাগে স্পষ্ট ও অকাট্য ভাষায় বলে দেওয়া হয়েছে যে, আহলে কিতাব ও মুশরিক এ নবীকে মেনে নিতে অস্বীকার করবে। তারা নিকৃষ্টতম জীব। চিরকালীন জাহান্নামই তাদের জন্য নির্দিষ্ট শাস্তি। পক্ষান্তরে যারা ঈমান এনে নেক আমলের পথ অবলম্বন করবে তারা চিরকাল জান্নাতে থাকবে। আল্লাহ তা'আলাও তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহ তা'আলার উপর সন্তুষ্ট।

لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا .... الاية

শানে নুযূল : নবী করীম ﷺ-এর আগমনের পূর্বে ইহুদি নাসারারা বলত যে, আফসোস যদি আমরা শেষ নবীকে পেতাম। তাহলে আমরা তার উপর সবার পূর্বে ঈমান আনয়ন করতাম। কিন্তু প্রিয়নবী ﷺ যখন নবুয়ত প্রাপ্ত হন তখন কতিপয় লোক ছাড়া তাদের মাঝে কেউ ঈমান আনয়ন করেনি। তাদের অবস্থা বর্ণনা করার জন্যেই এই আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। –[কানাযুন নুকূল : ১০৯]

প্রথম আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আবির্ভাবের পূর্বে দুনিয়াতে কুফর, শিরক ও মূর্খতার ঘোর অন্ধকারের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, এহেন সর্বগ্রাসী অন্ধকার দূর করার জন্য একজন পারদর্শী সংস্কারক প্রেরণ করা ছিল অপরিহার্য। রোগ যেমন জটিল ও বিশ্বব্যাপী, তার প্রতিকারের জন্য চিকিৎসকও তেমনি সুনিপুণ ও বিচক্ষণ হওয়া দরকার। অন্যথা রোগ নিরাময়ের আশা সুদূরপরাহত হতে বাধ্য। অতঃপর সেই বিচক্ষণ ও পারদর্শী চিকিৎসকের গুণাগুণ উল্লেখ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তাঁর অস্তিত্ব একটি 'বাইয়্যিনাহ' অর্থাৎ কুফর ও শিরককে অসার প্রতিপন্ন করার জন্য সুস্পষ্ট প্রমাণ হওয়া বাঞ্ছনীয়। এরপর বলা হয়েছে যে, এই চিকিৎসক হলেন আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত একজন রাসূল, যিনি কুরআনের সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে তাদের কাছে আগমন করেছেন। এ পর্যন্ত আয়াত থেকে দু'টি বিষয় জানা গেল- **এক.** পয়গম্বর প্রেরণের পূর্বে দুনিয়াতে বিরাট অনর্থ এবং মূর্খতার অন্ধকার বিরাজমান ছিল এবং **দুই.** রাসূলুল্লাহ ﷺ মহান মর্যাদার অধিকারী। অতঃপর কুরআনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে।

يَتْلُوْا – يَتْلُوْا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً فِيْهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ শব্দটি تِلَاوَتٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ 'পাঠ করা'। তবে যে কোনো পাঠকেই তিলাওয়াত বলা যায় না বরং যে পাঠ পাঠদানকারীর প্রদত্ত অনুশীলনের সম্পূর্ণ অনুরূপ হবে তাকেই 'তেলাওয়াত' বলা হয়। তাই পরিভাষায় সাধারণত কুরআন পাঠ করার ক্ষেত্রে 'তেলাওয়াত' শব্দ ব্যবহৃত হয়। صُحُفٌ শব্দটি صَحِيْفَةٌ-এর বহুবচন। যেসব কাগজে কোনো বিষয়বস্তু লিখিত থাকে সেগুলোকেই বলা হয় সহীফা। كُتُبٌ শব্দটি كِتَابٌ-এর বহুবচন। এর অর্থ লিখিত বস্তু। এদিকে দিয়ে কিতাব ও সহীফা সমার্থবোধক। কিতাব অর্থ কোনো সময় আদেশও হয়ে থাকে। যেমন, এক আয়াতে আছে لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ –এখানেও এ অর্থই বোঝানো হয়েছে। অন্যথা فِيْهَا বলার কোনো মানে থাকে না।

আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, মুশরিক ও আহলে-কিতাবদের পথভ্রষ্টতা চরমে পৌঁছে গিয়েছিল। ফলে তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস থেকে সরে আসা সম্ভবপর ছিল না, যে পর্যন্ত না তাদের কাছে আল্লাহর কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণ আসত। তাই আল্লাহ তা'আলা তাদের কাছে রাসূলকে সুসপষ্ট প্রমাণরূপে প্রেরণ করেন। তাঁর কর্তব্য ছিল তাঁদেরকে পবিত্র সহীফা তেলাওয়াত করে শুনানো অর্থাৎ তিনি সেসব বিধান শুনাতেন, যা পরে সহীফার মাধ্যমে সংরক্ষিত করা হয়। কেননা প্রথমে রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো সহীফা থেকে নয়-স্মৃতি থেকে পাঠ করে শুনাতেন। এসব সহীফায় ন্যায় ও ইনসাফ সহকারে প্রদত্ত ও চিরন্তন বিধি-বিধান লিখিত ছিল।

وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ – تفرق-এর অর্থ এখানে বিরোধ ও অস্বীকার করা। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্ম ও আবির্ভাবের পূর্বে আহলে-কিতাবরা তাঁর নবুয়তের ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করত। কেননা তাদের ঐশী গ্রন্থ তাওরাত ও ইঞ্জীল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নবুয়ত, তাঁর বিশেষ বিশেষ গুণাবলি ও তাঁর প্রতি কুরআন অবতরণ সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনা ছিল। তাই ইহুদি ও খ্রিস্টানদের মধ্যে এ ব্যাপারে কোনো বিরোধ ছিল না যে, শেষ জমানায় হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ﷺ আগমন করবেন, তাঁর প্রতি কুরআন নাজিল হবে এবং তাঁর অনুসরণ সবার জন্য অপরিহার্য হবে।

কুরআন পাকেও তাদের এই ঐকমত্যের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে :

وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا অর্থাৎ আহলে-কিতাবরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আবির্ভাবের পূর্বে তাঁর আগমনের অপেক্ষায় ছিল এবং যখনই মুশরিকদের সাথে তাদের মোকাবিলা হতো, তখনই তাঁর মধ্যস্থতায় আল্লাহ তা'আলার কাছে বিজয় কামনা করে দোয়া করত যে, শেষ নবীর বরকতে আমাদেরকে সাফল্য দান করা হোক। অথবা তাঁরা মুশরিকদেরকে বলত : তোমরা তোমাদের বিরুদ্ধে শক্তি পরীক্ষা করছ বটে, কিন্তু সত্বরই একজন রাসূল আসবেন, যিনি তোমাদেরকে পদানত করবেন। আমরা তাঁর সাথে থাকব, ফলে আমাদেরই বিজয় হবে।

সারকথা, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আগমনের পূর্বে আহলে-কিতাবরা সবাই তাঁর নবুয়ত সম্পর্কে অভিন্ন মত পোষণ করত কিন্তু যখন তিনি আগমন করলেন, তখন তারা অস্বীকার করতে লাগল। কুরআনের অন্য এক আয়াতে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে :

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوْا كَفَرُوْا بِهٖ অর্থাৎ তাদের কাছে যখন পরিচিত রাসূল সত্য ধর্ম অথবা কুরআন নিয়ে আগমন করল, তখন তাঁরা কুফর করতে লাগল। আলোচ্য আয়াতে এ বিষয়টি এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, আশ্চর্যের বিষয়, রাসূলের আগমন ও তাঁকে দেখার পূর্বে তো তাদের মধ্যে তাঁর সম্পর্কে কোনো মতবিরোধ ছিল না; সবাই তাঁর নবুয়ত সম্পর্কে একমত ছিল কিন্তু যখন সুস্পষ্ট প্রমাণ অর্থাৎ শেষনবী আগমন করলেন, তখন তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয়ে গেল। কেউ তো বিশ্বাস স্থাপন করে মু'মিন হলো এবং অনেকেই কাফের হয়ে গেল।

এ ব্যাপারটি কেবল আহলে-কিতাবদেরই বৈশিষ্ট্য ছিল, তাই আয়াতে তাদের কথাই বলা হয়েছে– মুশকিরদের উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু প্রথম ব্যাপারে উভয় দলই শরিক ছিল, তাই প্রথম আয়াতে উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করে لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِيْنَ বলা হয়েছে।

মা'আরিফুল কুরআনের তাফসীরের সার-সংক্ষেপে দ্বিতীয় ব্যাপারেও মুশরিক এবং আহলে-কিতাব উভয় সম্প্রদায়কে শামিল করে তাফসীর করা হয়েছে।

وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ অর্থাৎ আহলে-কিতাবদেরকে তাদের কিতাবে আদেশ করা হয়েছিল খাঁটি মনে ও একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করতে, নামাজ কায়েম করতে ও জাকাত দিতে। এরপর বলা হয়েছে, এটা কেবল তাদেরই বৈশিষ্ট্য নয়, প্রত্যেক সঠিক মিল্লাতের অথবা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ সমস্ত কিতাবের তরিকাও তাই। বলা বাহুল্য, قَيِّمَةٌ শব্দটি كُتُبٌ-এর বিশেষণ হলে এর উদ্দেশ্য কুরআনি বিধি-বিধান হবে এবং আয়াতের মতলব হবে এই যে, মোহাম্মদী শরিয়ত প্রদত্ত বিধি-বিধানও হুবহু তাই, যা তাদের কিতাব তাদেরকে পূর্বে দিয়েছিল। ভিন্ন বিধি-বিধান হলে অবশ্য তারা বিরোধিতার বাহানা পেত। কিন্তু এখন সে সুযোগ নেই।

رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ এ আয়াতে জান্নাতীদের প্রতি সর্ববৃহৎ নিয়ামত আল্লাহর সন্তুষ্টির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী (রা.) বর্ণিত রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আল্লাহ তা'আলা জান্নাতিদেরকে উদ্দেশ্য করে বলবেন : يَا اَهْلَ الْجَنَّةِ (হে জান্নাতিগণ)। তখন তারা জবাব দিবে لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّ فِيْ يَدَيْكَ হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা উপস্থিত এবং আপনার আনুগত্যের জন্য প্রস্তুত। সমস্ত কল্যাণ আপনারই হাতে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলবেন :

هَلْ رَضِيْتُمْ তোমরা কি সন্তুষ্ট? তারা জবাব দেবে, হে আমাদের পরওয়ারদিগার! এখনও সন্তুষ্ট না হওয়ার কি সম্ভাবনা? আপনি তো আমাদেরকে এত সব দিয়েছেন, যা অন্য কোনো সৃষ্টি পায়নি। আল্লাহ বলবেন, আমি তোমাদেরকে আরও উত্তম নিয়ামত দিচ্ছি। আমি তোমাদের প্রতি আমার সন্তুষ্টি নাজিল করছি। অতঃপর কখনও তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হব না। –[বুখারী, মুসলিম]

আলোচ্য আয়াতেও খবর দেওয়া হয়েছে যে, জান্নাতিরাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হবে। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর প্রতিটি আদেশ ও কর্মের প্রতি সন্তুষ্ট হওয়া ছাড়া কেউ জান্নাতে যেতেই পারে না। এমতাবস্থায় এখানে জান্নাতিদের সন্তুষ্টি উল্লেখ করার তাৎপর্য কি? জবাব এই যে, সন্তুষ্টির এক স্তর হলো প্রত্যেক আশা ও মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়া এবং কোনো কামনা অপূর্ণ না থাকা। এখানে সন্তুষ্টি বলে এ স্তরকেই বুঝানো হয়েছে। উদাহরণত সূরা দুহায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে: وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى অর্থাৎ সত্বরই আল্লাহ তা'আলা আপনাকে এমন বস্তু দান করবেন, যাতে আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। এখানে অর্থ চূড়ান্ত বাসনা পূর্ণ করা। এ কারণেই এই আয়াত নাজিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তা হলে আমি ততক্ষণ সন্তুষ্ট হব না, যতক্ষণ আমার একটি উম্মতও জাহান্নামে থাকবে। –[মাযহারী]

ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهٗ –সূরার উপসংহারে আল্লাহর ভয়কে সমস্ত ধর্মীয় উৎকর্ষ এবং পারলৌকিক নিয়ামতের ভিত্তি বলে অভিহিত করা হয়েছে। কোনো শত্রু, হিংস্র জন্তু অথবা ইতর প্রাণী দেখে যে ভয়ের সঞ্চার হয়, তাকে خَشْيَةٌ বলা হয় না; বরং কারও অসাধারণ মাহাত্ম্য ও প্রতাপ থেকে যে ভয়-ভীতির উৎপত্তি, তাকেই خَشْيَةٌ বলা হয়। এই ভয়ের প্রেক্ষিতে সর্বকাজে ও সর্বাবস্থায় সংশ্লিষ্ট সত্তার সন্তুষ্টি বিধানের চেষ্টা করা হয় এবং অসন্তুষ্টির সন্দেহ থেকেও আত্মরক্ষা করা হয়। এই ভীতিই মানুষকে কামিল ও প্রিয় বান্দায় পরিণত করে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

لَمْ يَكُنْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ نفي جحد بلم در فعل مستقبل معروف বাব نَصَرَ মাসদার كَوْنٌ মূলবর্ণ (ك - و - ن) জিনস اجوف واوى অর্থ– ছিল না।

مُنْفَكِّيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব إِنْفِعَالٌ মাসদার اِنْفِكَاكٌ মূলবর্ণ (ف - ك - ك) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– প্রত্যাবর্তনকারী। বিরত, পৃথক। মুক্ত।

تَأْتِيَ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার إِتيان মূলবর্ণ (أ - ت - ى) জিনস মুরাক্কাব مهموز فاء এবং ناقص يائى অর্থ– উপস্থিত হয়, আসে।

اَلْبَيِّنَةُ : শব্দটি একবচন; বহুবচনে بَيِّنَاتٌ অর্থ– খোলা দলিল, সুস্পষ্ট দলিলকে بَيِّنَةٌ বলা হয়। চাই তা যৌক্তিক প্রমাণ হোক বা জ্ঞানগত প্রমাণ হোক।

رَسُوْلٌ : পয়গাম্বর, নবী, প্রেরিত, দূত। رَسُوْلٌ শব্দটি رِسَالَةٌ থেকে নির্গত হয়েছে। শায়খ শামসুদ্দীন কুহেস্তানী লিখেছেন, فَعُوْلٌ মুবালাগার সীগাহ مُرْسَلٌ بِالْفَتْحِ - مَفْعَلٌ আর فعول এর ব্যবহার এভাবে কমই হয়ে থাকে।

يَتْلُوْا : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার تِلَاوَةٌ মূলবর্ণ (ت - ل - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– পাঠ করে শুনিয়ে দেয়।

صُحُفًا : صَحِيْفَةٌ -এর বহুবচন। অর্থ– কিতাবসমূহ। পাতাসমূহ। তবে এর বহুবচন খুব কম আসে। কেননা فَعِيْلَةٌ বহুবচন فُعُلٌ এর ওজনে আসলেও কদাচিৎ। যেমন– سَفِيْنَةٌ এবং سُفُنٌ আসে।

مُطَهَّرَةً : সীগাহ واحد مؤنث বহছ– اسم مفعول বাব تفعيل মাসদার تَطْهِيْرٌ মূলবর্ণ (ط - ه - ر) জিনস صحيح অর্থ– সকল প্রকার ময়লা, শারীরিক ও মানসিক অপবিত্রতা থেকে পাক হওয়া।

قَيِّمَةٌ : সিফাতের সীগাহ। মুয়ান্নাছ নাকেরাহ। সঠিক সত্য, ঠিক, ইহকাল ও পরকাল যিনি ঠিক করে। উদ্দেশ্য হলো পূর্ববর্তী আসমানী ছহীফা ও কিতাবসমূহ যথার্থ ও সঠিক থাকা এবং মানুষের জীবনকে পরিশুদ্ধকরণ। কুরআন মজিদ সব দিক থেকেই পূর্ণাঙ্গ একটি কিতাব।

تَفَرَّقَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفَعُّل মাসদার اَلتَّفَرُّقُ মূলবর্ণ (ف - ر - ق) জিনস صحيح অর্থ– বিভক্ত হয়ে গেল।

اُوْتُوا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব إِفْعَالٌ মাসদার إِيْتَاءٌ মূলবর্ণ (أ - ت - ى) জিনস মুরাক্কাব مهموز فاء এবং ناقص يائى অর্থ– প্রদান করা হয়েছিল। দেওয়া হয়েছে।

اُمِرُوا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব نصر মাসদার اَمْرٌ মূলবর্ণ (أ - م - ر) জিনস مهموز فاء অর্থ– তাদের প্রতি এই নির্দেশ ছিল।

مُخْلِصِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব إِفْعَالٌ মাসদার إِخْلَاصٌ মূলবর্ণ (خ - ل - ص) জিনস صحيح অর্থ– একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর আনুগত্য প্রকাশকারী।

حُنَفَاءَ : حنيف -এর বহুবচন। অর্থ– একনিষ্ঠ।

بَرِيَّةٌ : সৃজন। সৃষ্টিজীব। بَرِيَّةٌ শব্দটি فَعِيْلَةٌ -এর ওজনে মাফউলের অর্থে। بَرْءٌ থেকে নির্গত। অর্থ– অস্তিত্বহীনতা থেকে অস্তিত্বে আনা।

اَبَدًا : সর্বদা, অসীম ভবিষ্যৎকাল।

رَضُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلرِّضْوَانُ মূলবর্ণ (ر - ض - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তারা সন্তুষ্ট থাকবে।

خَشِىَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْخَشْىُ মূলবর্ণ (خ - ش - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– সে ভয় করে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ مُنْفَكِّيْنَ حَتّٰى تَاْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ : এখানে لَمْ يَكُنِ হলো ফে'লে নাকেস আর الَّذِيْنَ তার اسم ناقص আর كَفَرُوا বাক্যটি الَّذِيْنَ -এর সেলাহ হয়েছে। আর مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ টা উহ্য ফেলের সাথে متعلق হয়ে حال হয়েছে। আর مُنْفَكِّيْنَ টা خبر ناقص হয়েছে। আর حَتّٰى হলো হরফে জার। আর تَاْتِيَهُمْ ফে'ল যা حَتّٰى -এর পরে اَنْ উহ্য থাকায় منصوب হয়েছে। আর هُمْ হলো مفعول به আর الْبَيِّنَةُ হলো ফায়েল। অর্থাৎ সুস্পষ্ট দলিল। –[ই'রাবুল কুরআন ৮ম খণ্ড; পৃ. ৩৭৪]

سُوْرَةُ الزِّلْزَالِ مَدَنِيَّةٌ

সূরা যিলযাল

মদিনায় অবতীর্ণ; আয়াত– ৮, রুকূ'– ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি ।

অনুবাদ	আয়াত
১. যখন জমিনকে ভীষণ কম্পনে প্রকম্পিত করা হবে ।	إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ۝١
২. আর জমিন স্বীয় বোঝা [অর্থাৎ প্রোথিত ধন এবং মুরদাগণ]-কে বাইরে নিক্ষেপ করবে ।	وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ۝٢
৩. আর [এ অবস্থা দেখে কাফের] মানুষ বলবে, তার কী হলো [ভূ-কম্পন ও এবং গুপ্তধন কেন বের হলো]?	وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ۝٣
৪. সেদিন জমিন নিজের সমস্ত [ভালো মন্দ] খবর ব্যক্ত করতে আরম্ভ করবে ।	يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ۝٤
৫. এই কারণে যে, তার প্রতি আপনার প্রতিপালকের এই নির্দেশই হবে ।	بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحٰى لَهَا ۝٥
৬. সেদিন মানুষ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে [বিচারক্ষেত্র হতে] প্রত্যাবর্তন করবে । যাতে নিজেদের আমলসমূহ [অর্থাৎ তাদের ভালোমন্দ ফল] দেখতে পায় ।	يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا ۙ لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ ۝٦

শাব্দিক অনুবাদ :

১. إِذَا زُلْزِلَتِ যখন প্রকম্পিত করা হবে الْأَرْضُ জমিনকে زِلْزَالَهَا ভীষণ কম্পনে ।

২. وَأَخْرَجَتِ আর বাইরে নিক্ষেপ করবে الْأَرْضُ জমিন أَثْقَالَهَا স্বীয় বোঝাকে (প্রোথিত ধন এবং মুরদারগণ) ।

৩. وَقَالَ الْإِنْسَانُ, আর মানুষ বলবে مَا لَهَا -তার কি হলো?

৪. يَوْمَئِذٍ সেদিন জমিন تُحَدِّثُ ব্যক্ত করতে আরম্ভ করবে أَخْبَارَهَا নিজের সমস্ত খবর ।

৫. بِأَنَّ رَبَّكَ এই কারণে যে আপনার প্রতিপালকের أَوْحٰى لَهَا তার প্রতি এই নির্দেশই হবে ।

৬. يَوْمَئِذٍ সেদিন النَّاسُ মানুষ يَصْدُرُ প্রত্যাবর্তন করবে أَشْتَاتًا বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে لِيُرَوْا যাতে দেখতে পায় أَعْمَالَهُمْ নিজেদের আমলসমূহ ।

৭. অনন্তর যে ব্যক্তি [দুনিয়াতে] অণু পরিমাণ নেক কাজ করবে, সে তা দেখতে পাবে।

৮. আর যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ বদ কাজ করবে, সে তাও তথায় দেখতে পাবে।

শাব্দিক অনুবাদ :

৭. فَمَنْ يَعْمَلْ অনন্তর যে ব্যক্তি করবে مِثْقَالَ ذَرَّةٍ অণু পরিমাণ। خَيْرًا নেক কাজ يَرَهُ সে তা দেখতে পাবে।

৮. وَمَنْ يَعْمَلْ আর যে ব্যক্তি করবে مِثْقَالَ ذَرَّةٍ অণু পরিমাণ। شَرًّا বদ কাজ يَرَهُ সে তা তথায় দেখতে পাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : এ সূরার প্রথম আয়াতের زُلْزِلَتْ শব্দ হতে এর নামকরণ করা হয়েছে। এর শাব্দিক অর্থ : প্রকম্পিত। এ সূরাতে কিয়ামত হওয়ার সময় সমস্ত পৃথিবী প্রকম্পিত হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে ৮টি আয়াত, ৩৫টি বাক্য এবং ১০০টি অক্ষর রয়েছে।

সূরাটি অবতীর্ণ হওয়ার সময়কাল : এ সূরা নাজিলের স্থান ও সময়কাল নিয়ে তাফসীরকারদের মধ্যে মতবিরোধ বিদ্যমান। ইবনে মাসউদ, আতা, জারীর ও মুজাহিদ (র.) প্রমুখের মতে এটা মাক্কী সূরা। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতেও এরূপ একটি শক্তিশালী অভিমত পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে হযরত কাতাদাহ ও মুকাতিল (র.)-এর মতে এটা মাদানী সূরা; কিন্তু এর বাচন-ভঙ্গি ও বিষয়বস্তুর প্রতি লক্ষ্য করলে মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে বলেই প্রমাণ হয়।

সূরাটির বিষয়বস্তু ও মূলবক্তব্য : এ সূরাতে কিয়ামত ও মৃত্যু পরবর্তী জীবন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সর্বপ্রথম তিনটি বাক্যে বলা হয়েছে– মৃত্যুর পর দ্বিতীয় বারের জীবন কিভাবে হবে এবং কিভাবে মানুষের জন্য বিস্ময়ের উদ্রেককারী হবে? পরে দু'টি বাক্যে বলা হয়েছে এই যে, জমিনের উপর থেকে নিশ্চিন্তভাবে সকল প্রকার কাজ করেছে এবং এ নিষ্প্রাণ-নির্জীব জিনিস কোনো এক সময় তার কাজকর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দিবে, তা তার চিন্তায়ও কখনো আসেনি। অথচ তা-ই একদিন আল্লাহর নির্দেশে কথা বলে উঠবে এবং কোনো সময় কোথায় কি কাজ করে তাও বলে দিবে। সেদিন সকল মানুষ উত্থিত হবে এবং তাদের আমলের চুলচেরা হিসাব-নিকাশ হবে।

সূরাটির ফজিলত : হযরত আনাস ও ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যিলযালকে কুরআনের অর্ধেক, সূরা ইখলাসকে কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ এবং সূরা কাফিরূনকে এক-চতুর্থাংশ বলেছেন। –[মা'আরেফুল কুরআন]

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ .... اَلْاٰيَةَ.

শানে নুযূল : যখন সূরায়ে যিলযালের অষ্টম আয়াত নাজিল হয়, তখন মুসলমানরা চিন্তা করল যে, সামান্য গুনাহ করার দ্বারা যেমন কোনো ক্ষতি নেই তেমনি সামান্য ছওয়াবের দ্বারাও কোনো উপকার হবে না। যথা : মিথ্যা বলা, চুগলখুরী করা ইত্যাদির দ্বারা কোনো গুনাহ হয় না। তারা আরো মনে করতে ছিল যে, কেবল কবিরা গুনাহগুলোর ফলেই আল্লাহ পাক রাগান্বিত হন। সে প্রেক্ষিতেই এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। –[কানযুল নুকূল : ১০৯]

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا আয়াতে প্রথম শিংগা ফুঁৎকার পূর্বেকার ভূকম্পন বুঝানো হয়েছে, না দ্বিতীয় ফুৎকারের পরবর্তী ভূকম্পন বোঝানো হয়েছে, এ বিষয়ে অবশ্য মতভেদ আছে। প্রথম ফুৎকারের পূর্বেকার ভূকম্পন কিয়ামতের আলামতসমূহের মধ্যে গণ্য হয় এবং দ্বিতীয় ফুৎকারের পরবর্তী ভূকম্পনের পর মৃতরা জীবিত হয়ে কবর থেকে উত্থিত হবে। বিভিন্ন রেওয়ায়েত ও তাফসীরবিদগণের উক্তি এ ব্যাপারে বিভিন্ন রূপ যে, আলোচ্য আয়াতে কোন ভূকম্পন ব্যক্ত হয়েছে। তবে এ স্থলে দ্বিতীয় ভূকম্পন বুঝানোর সম্ভাবনাই প্রবল। কারণ এরপর কিয়ামতের অবস্থা তথা হিসাব-নিকাশের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। –[মাযহারী]

وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا এই ভূকম্পন সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : পৃথিবী তার কলিজার টুকরা বিশালকায় স্বর্ণখণ্ডের আকারে উদগীরণ করে দেবে। তখন যে ব্যক্তি ধনসম্পদের জন্য কাউকে হত্যা করেছিল সে তা দেখে বলবে, এর জন্যই কি আমি এতবড় অপরাধ করেছিলাম? যে ব্যক্তি অর্থের কারণে আত্মীয়দের সাথে সম্পর্কছেদ করেছিল, সে বলবে, এর জন্যই কি আমি এ কাণ্ড করেছিলাম? চুরির কারণে যার হাত কাটা হয়েছিল, সে বলবে, এর জন্যই কি আমি নিজের হাত হারিয়েছিলাম? অতঃপর কেউ এসব স্বর্ণখণ্ডের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করবে না। –[মুসলিম]

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَه আয়াতে خَيْرٌ বলে শরিয়তসম্মত সৎ কর্ম বুঝানো হয়েছে; যা ঈমানের সাথে সম্পাদিত হয়ে থাকে। কেননা ঈমান ব্যতীত কোনো সৎ কর্মই আল্লাহর কাছে সৎ কর্ম নয়। কুফর অবস্থায় কৃত সৎ কর্ম পরকালে ধর্তব্য হবে না যদিও দুনিয়াতে তার প্রতিদান দেওয়া হয়। তাই এ আয়াতকে এ বিষয়ের প্রমাণস্বরূপ পেশ করা হয় যে, যার মধ্যে অণু পরিমান ঈমান থাকবে, তাকে অবশেষে জাহান্নাম থেকে বের করে নেওয়া হবে। কেননা এ আয়াতের ওয়াদা অনুযায়ী প্রত্যেকের সৎ কর্মের ফল পরকালে পাওয়া জরুরি। কোনো সৎ কর্ম না থাকলেও স্বয়ং ঈমানই একটি বিরাট সৎকর্ম বলে বিবেচিত হবে। ফলে মু'মিন ব্যক্তি যত বড় গোনাহ্গারই হোক, চিরকাল জাহান্নামে থাকবে না। কিন্তু কাফের ব্যক্তি দুনিয়াতে কোনো সৎকর্ম করে থাকলে ঈমানের অভাবে তা পণ্ডশ্রম মাত্র। তাই পরকালে তার কোনো সৎকাজই থাকবে না।
وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَه জীবদ্দশায় তওবা করেনি-এখানে এমন অসৎ কর্ম বোঝানো হয়েছে। কেননা কুরআন ও হাদীসে অকাট্য প্রমাণ আছে যে, তওবা করলে গোনাহ মাফ হয়ে যায়। তবে যে গোনাহ থেকে তওবা করেনি, তা ছোট হোক কিংবা বড় হোক-পরকালে অবশ্যই সামনে আসবে। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আয়েশা (রা.)-কে বলেছিলেন, দেখ, এমন গোনাহ থেকেও আত্মরক্ষায় সচেষ্ট হও, যাকে ছোট ও তুচ্ছ মনে করা হয়। কেননা এর জন্যও আল্লাহর পক্ষ থেকে পাকড়াও করা হবে। –[নাসায়ী, ইবনে মাজা]
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন : কুরআনের এ আয়াতটি সর্বাধিক অটল ও ব্যাপক অর্থবোধক। হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ এ আয়াতকে اَلْفَاذَةُ الْجَامِعَةُ –অর্থাৎ একক, অনন্য ও সর্বব্যাপক বলে অবিহিত করেছেন।
হযরত আনাস ও ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ সূরা যিলযালকে কুরআনের অর্ধেক, সূরা ইখলাসকে কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ এবং সূরা কাফিরূনকে কুরআনের এক-চতুর্থাংশ বলেছেন। –[মাযহারী]

শব্দ বিশ্লেষণ :

زُلْزِلَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى مجهول বাব فَعْلَلَةٌ মাসদার زَلْزَلَةٌ মূলবর্ণ (ز - ل - ز - ل) জিনস مضاعف رباعى অর্থ– প্রকাম্পিত করা হবে।

اَثْقَالَهَا : ثِقْلٌ-এর বহুবচন। অর্থ– তার বোঝা, এখানে খাজানা ও ধনভাণ্ডার উদ্দেশ্য।

تُحَدِّثُ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَحْدِيْثٌ মূলবর্ণ (ح - د - ث) জিনস صحيح অর্থ– ব্যক্ত করতে আরম্ভ করবে।

يَصْدُرُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার صُدُرٌ মূলবর্ণ (ص - د - ر) জিনস صحيح অর্থ– প্রত্যাবর্তন করবে। বের হবে।

اَشْتَاتًا : আলাদা আলাদা, পৃথক পৃথক, اَشْتَاتٌ ও شَتٌّ -এর বহুবচন। যার অর্থ পুরনো, বিভিন্ন।

لِيُرَوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع مجهول منصوب بلام كى বাব فَتَحَ মাসদার رُؤْيَةٌ মূলবর্ণ (ر - أ - ى) জিনস মুরাক্কাব مهموز عين এবং ناقص يائى অর্থ– যাতে দেখতে পায়।

خَيْرًا : ভালো, উত্তম, নেকী, ভালো কাজ, মঙ্গল, যে জিনিস সকলের পছন্দ। বুদ্ধি, ন্যায়, দয়া, উপকারী জিনিস, খারাপের বিপরীত। خَيْرٌ দু'প্রকার। (১) خَيْر مُطْلَق যা সর্বাস্থায় সকলের নিকট পছন্দীয়। যেমন, জান্নাত। (২) দ্বিতীয় প্রকার خَيْرٌ নির্দিষ্ট নয়। কারো জন্য ভালো আবার কারো জন্য খারাপ। যেমন, সম্পদ কারো ক্ষেত্রে ভালো আবার কারো ক্ষেত্রে খারাপ।

مِثْقَالَ : একবচন। বহুবচন مَثَاقِيْلُ অর্থ– ভারি, সমান সমান। মাদ্দাহ ثِقْلٌ বাব كَرُمَ অর্থ– ভারী হওয়া। মাসদার ثِقَالٌ ও ثَقَالَةٌ বাব نَصَرَ ثَقَلَ الشَّيْئَ জিনিসটি উঠাল।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا : এটা পূর্বের উপর আতফ হয়েছে। আর اَخْرَجَتْ ফে'ল الْاَرْضُ হলো ফায়েল। আর اَثْقَالَهَا হলো مفعول به।

وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَالَهَا : এখানে واو টি আতেফা قَالَ ফে'ল। আর الْاِنْسَانُ হলো ফায়েল। আর مَا টা اسم استفهام যা رفع -এর স্থলে হয়ে মুবতাদা হয়েছে। আর لَهَا হলো তার খবর। –[ই'রাবুল কুরআন ৮ম খণ্ড; পৃ. ৩৮০]

سُوْرَةُ الْعٰدِيٰتِ مَكِّيَّةٌ

সূরা 'আদিয়াত

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত– ১১, রুকূ'– ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

অনুবাদ	আয়াত
১. শপথ ঊর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান অশ্বরাজির।	وَالْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا ﴿١﴾
২. অতঃপর যারা [পাথরের উপর] পদাঘাতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত করতে থাকে।	فَالْمُوْرِيٰتِ قَدْحًا ﴿٢﴾
৩. অনন্তর প্রভাতকালে অভিযান আরম্ভ করে।	فَالْمُغِيْرٰتِ صُبْحًا ﴿٣﴾
৪. অনন্তর তখন ধূলি উড়ায়।	فَاَثَرْنَ بِهٖ نَقْعًا ﴿٤﴾
৫. অতঃপর [শত্রু] দলের মধ্যে ঢুকে পড়ে।	فَوَسَطْنَ بِهٖ جَمْعًا ﴿٥﴾
৬. নিশ্চয় মানুষ [অর্থাৎ কাফেররা] স্বীয় প্রতিপালকের বড়ই অকৃতজ্ঞ।	اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ ﴿٦﴾
৭. আর এটা সে নিজেও অবহিত আছে।	وَاِنَّهٗ عَلٰى ذٰلِكَ لَشَهِيْدٌ ﴿٧﴾
৮. এবং সে ধন-সম্পদের মোহে অত্যন্ত মজবুত।	وَاِنَّهٗ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ ﴿٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. وَالْعٰدِيٰتِ শপথ অশ্বরাজির ضَبْحًا ঊর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান।

২. فَالْمُوْرِيٰتِ অতঃপর যারা অগ্নি স্ফুলিঙ্গ নির্গত করতে থাকে قَدْحًا পদাঘাতে।

৩. فَالْمُغِيْرٰتِ অনন্তর অভিযান আরম্ভ করে صُبْحًا প্রভাতকালে।

৪. فَاَثَرْنَ بِهٖ অনন্তর তখন উড়ায় نَقْعًا ধূলি।

৫. فَوَسَطْنَ بِهٖ অতঃপর ঢুকে পড়ে جَمْعًا (শত্রু) দলের মধ্যে।

৬. اِنَّ الْاِنْسَانَ নিশ্চয় মানুষ لِرَبِّهٖ স্বীয় প্রতিপালকের لَكَنُوْدٌ বড়ই অকৃতজ্ঞ।

৭. وَاِنَّهٗ عَلٰى ذٰلِكَ আর এটা সে নিজেও لَشَهِيْدٌ অবহিত আছে।

৮. وَاِنَّهٗ এবং সে لِحُبِّ الْخَيْرِ ধন-সম্পদের মোহে لَشَدِيْدٌ অত্যন্ত মজবুত।

৯. তার কি সে সময়টি জানা নেই, যখন জীবিত করা হবে সমাধিস্থ মুরদাদেরকে।	أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ ﴿٩﴾
১০. আর যা অন্তরসমূহের মধ্যে আছে তা প্রকাশ হয়ে যাবে।	وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ﴿١٠﴾
১১. নিঃসন্দেহে সেদিন তাদের প্রতিপালক তাদের অবস্থা সম্বন্ধে পূর্ণ অবহিত আছেন।	إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ ﴿١١﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৯. أَفَلَا يَعْلَمُ তার কি সে সময়টি জানা নেই إِذَا بُعْثِرَ যখন জীবিত করা হবে مَا فِي الْقُبُورِ সমাধিস্থ মুরদাদেরকে।

১০. وَحُصِّلَ আর তা প্রকাশ হয়ে যাবে مَا فِي الصُّدُورِ যা অন্তরসমূহে আছে।

১১. إِنَّ رَبَّهُمْ নিঃসন্দেহে তাদের প্রতিপালক بِهِمْ তাদের অবস্থা সম্বন্ধে يَوْمَئِذٍ সেদিন لَّخَبِيرٌ পূর্ণ অবহিত আছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : সূরার প্রথম العديات [আল-'আদিয়াত] শব্দটিকেই এর নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। এতে ১১টি আয়াত, ৪০টি বাক্য এবং ১৬৩টি অক্ষর রয়েছে।

সূরাটি অবতীর্ণ হওয়ার সময়কাল : এ সূরা মক্কী কি মাদানী, এ বিষয়ে মতাপার্থক্য রয়েছে।

ক. হযরত ইবনে মাসঊদ (রা.) জারীর, হাসান বসরী, ইকরিমা ও আতা (র.) এবং হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর এক মত অনুযায়ী এটা মাক্কী সূরা।

খ. হযরত আনাস (রা.), কাতাদাহ (র.) ও ইবনে আব্বাস (রা.)-এর অন্য মত অনুযায়ী এটা মাদানী সূরা। তবে বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করলে এটা মাক্কী সূরা হওয়াই প্রতীয়মান হয়।

সূরাটির বিষয়বস্তু ও মূলবক্তব্য : এ সূরাতে পরকাল অবিশ্বাসের পরিণাম যে কত ভয়াবহ ও মারাত্মক হতে পারে এবং মহা-বিচারের দিন মানুষের আমল সহ মনের গোপন উদ্দেশ্য ও নিয়তের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার-বিশ্লেষণ হবে, তা-ই তুলে ধরা হয়েছে।

এ আলোচনায় তদানীন্তন মরু আরবের মানুষের জুলুম, অত্যাচার ও অবিচার এবং মারামারি, কাটাকাটি ও হানাহানির একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। সেকালে মানুষ সামাজিক জীবনে যে চরম দুর্ভোগ পোহাত, এক গোত্র অপর গোত্রের উপর রাতের অন্ধকারে চড়াও হয়ে তাদের ধন-সম্পদ লুণ্ঠন, নারী ধর্ষণ এবং তাদেরকে ছিনিয়ে নিয়ে দাসী বানাত– এটা নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা ছিল। তখন মানব জীবনের কোনোই নিরাপত্তা ছিল না। পারস্পরিক হানাহানি, লাঠালাঠি, লড়াই, যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদি কার্যাবলি, পরকাল সম্পর্কে উদাসীনতা ও অবিশ্বাসেরই ফলশ্রুতি– তাই প্রকারান্তরে পঞ্চম আয়াত পর্যন্ত একটি দৃশ্যের পটভূমিকায় বলা হয়েছে। বলা হয়েছে– মানুষ আল্লাহ প্রদত্ত শক্তি ও ক্ষমতার অপচয় ঘটিয়ে তাঁর না-শোকরী করছে। ধন-সম্পদ ও বিষয়-সম্পত্তির লোভে অন্ধ হয়ে পড়ছে। তাদের জেনে রাখা উচিত ছিল যে, কবর হতে তাদেরকে পুনরায় উত্থিত করা হবে। আর তাদের যাবতীয় কাজ তাদের সম্মুখে উপস্থিত করে বিচারকার্য অনুষ্ঠিত হবে। শুধু কার্যগুলোর রেকর্ডই উপস্থিত করা হবে না; বরং কার্যের কারণ ও মনের গোপন উদ্দেশ্য ও নিয়ামতসমূহের বাস্তব রেকর্ড উপস্থিত করে তার চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণের পরই তাদের জন্য রায় ঘোষণা করা হবে। কারো প্রতি বিচারের বেলায় পক্ষপাতিত্ব ও জুলুমের আশ্রয় নেওয়া হবে না। সকলের প্রতিই ন্যায় ও ইনসাফের নীতি কার্যকর থাকবে। সুতরাং মানুষের উচিত পরকালের মহা বিচারদিনের ভয়াবহতার কথাটি নিজেদের হৃদয়ে জাগ্রত রাখা এবং বিশ্বাসের দাবি অনুযায়ী সামাজিক জীবনযাত্রা নির্বাহ করা। অন্যথা তাদের জীবনে কালো অমানিশা আসার ব্যাপারে কোনোই সন্দেহ নেই।

وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا [١] فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا .... وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ [١٠] إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ [١١]

শানে নুযূল-১ : বাযযার ও ইবনুল মুনযির প্রমুখ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, হযরত রাসূলে আকরাম ﷺ কোনো এক অভিযানে অশ্বারোহী প্রেরণ করেন। সে বাহিনী থেকে এক মাস পর্যন্ত কোনো প্রকারের খবরাখবর আসেনি। সেই নিখোঁজ বাহিনীর নিরাপদ অবস্থান এবং বিজয়ের সু-সংবাদ প্রদান করার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[রূহুল মা'আনী ২৭৪/৩০/১৫ ইবনে কাছীর ৫৪২/৪]

শানে নুযূল-২ : বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বনূ কেনানার প্রতি এক সারিয়া বা ক্ষুদ্র বাহিনী প্রেরণ করেন এবং মুনযির বিন আমর আনসারীকে তাদের হাকেম নিযুক্ত করে প্রেরণ করেন। সে বাহিনীর খবরা খবর রাসূলুল্লাহ ﷺ পর্যন্ত পৌছাতে এক মাস বিলম্ব হয়ে গেল, এতে মুনাফিকরা সুযোগের সদ্ব্যবহার করে বলতে লাগল যে, তারা নিহত হয়ে গিয়েছে। সুতরাং তাদের জবাবে তাদের নিরাপদ অবস্থান এবং তাদের সকল অভিযানের সু-সংবাদ দান করে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য সূরা নাজিল করেন। –[রূহুল মা'আনী ২৭৮/৩০/১৫]

হযরত ইবনে মাসঊদ, জাবের, হাসান বসরী, ইকরিমা ও আতা (রা.) প্রমুখের মতে সূরা আদিয়াত মক্কায় অবতীর্ণ হয় এবং হযরত ইবনে আব্বাস, আনাস (রা.) ইমাম মালিক ও কাতাদাহ (র.) প্রমুখের মতে মদীনায় অবতীর্ণ হয়। –[কুরতুবী]

এ সূরায় আল্লাহ তা'আলা সামরিক অশ্বের কতিপয় বিশেষ অবস্থা বর্ণনা করেছেন এবং তাদের শপথ করে বলেছেন যে, মানুষ তার পালনকর্তার প্রতি খুবই অকৃতজ্ঞ। একথা বার বার বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তার সৃষ্টির মধ্য থেকে বিভিন্ন বস্তুর শপথ করে বিশেষ ঘটনাবলি ও বিধানাবলি বর্ণনা করেন। এটা আল্লাহ তা'আলারই বৈশিষ্ট্য। মানুষের জন্য কোনো সৃষ্ট বস্তুর শপথ করা বৈধ নয়। শপথ করার লক্ষ্য নিজের বক্তব্যকে বাস্তব সম্মত ও নিশ্চিত প্রকাশ করা। কুরআন পাক যে বস্তুর শপথ করে কোনো বিষয় বর্ণনা করে, বর্ণিত বিষয় স্বপ্রমাণে সে বস্তুর গভীর প্রভাব থাকে। এমনকি, সে বস্তু যেন সে বিষয়ের পক্ষে সাক্ষ্যদান করে। এখানে সামরিক অশ্বের কঠোর কর্তব্য নিষ্ঠার উল্লেখ যেন মানুষের অকৃতজ্ঞতার সাক্ষ্যস্বরূপ করা হয়েছে। এর ব্যাখ্যা এই যে, অশ্ব বিশেষত সামরিক অশ্ব যুদ্ধক্ষেত্রে নিজের জীবন বিপন্ন করে মানুষের আদেশ ও ইঙ্গিতের অনুসারী হয়ে কত কঠোর খেদমতই না আনজাম দিয়ে থাকে। অথচ এসব অশ্ব মানুষ সৃষ্টি করেনি। তাদেরকে যে ঘাস-পানি মানুষ দেয়, তাও তার সৃজিত নয়। আল্লাহর সৃষ্টি করা জীবনোপকরণকে মানুষ তাদের কাছে পৌছে দেয় মাত্র। এখন অশ্বকে দেখুন, সে মানুষের এতটুকু অনুগ্রহকে কিভাবে চিনে এবং স্বীকার করে! তার সামান্য ইশারায় সে তার জীবনকে সাক্ষাৎ বিপদের মুখে ঠেলে দেয়, কঠোরতম কষ্ট সহ্য করে। পক্ষান্তরে মানুষের প্রতি লক্ষ্য করুন, আল্লাহ তা'আলা তাকে এক ফোঁটা তুচ্ছ বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছেন, বিভিন্ন কাজের শক্তি দিয়েছেন, বুদ্ধি ও চেতনা দান করেছেন, তার পানাহারের সামগ্রী সৃষ্টি করেছেন এবং সমস্ত প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সহজলভ্য করে তার কাছে পৌছে দিয়েছেন। কিন্তু সে এতসব উচ্চস্তরের অনুগ্রহেরও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না। এবার শব্দার্থের প্রতি লক্ষ্য করুন– عَادِيَاتِ শব্দটি عَدْوٌ থেকে উদ্ভূত। অর্থ দৌড়ানো। ضَبْحًا –ঘোড়ার দৌড় দেওয়ার সময় তাঁর বক্ষ থেকে নির্গত আওয়াজকে বলা হয়। مُورِيَاتِ শব্দটি اِيرَاءٌ থেকে উদ্ভূত। অর্থ অগ্নি নির্গত করা; যেমন চকমকি পাথর ঘষে অথবা দিয়াশলাই ঘাষা দিয়ে অগ্নি নির্গত করা হয়। قدح-এর অর্থ ক্ষুরাঘাত করা। লৌহজুতা পরিহিত অবস্থায় ঘোড়া যখন প্রস্তরময় মাটিতে ক্ষুরাঘাত করে দৌড় দেয় তখন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয় مُغِيرَاتِ শব্দটি اِغَارَةٌ থেকে উদ্ভূত। অর্থ হামলা করা, হানা দেওয়া। صُبْحًا আরবদের অভ্যাস হিসেবে প্রভাতকালের উল্লেখ করা হয়েছে। তারা বীরত্ববশত রাত্রির অন্ধকারে হানা দেওয়া দূষণীয় মনে করত। তাই তারা ভোর হওয়ার পর এ কাজ করত। اَثَرْنَ শব্দটি اِثَارَه থেকে উৎপন্ন। অর্থ ধূলি উড়ানো। نَقْعٌ ধূলিকে বলা হয়। অর্থাৎ অশ্বসমূহ যুদ্ধক্ষেত্রে এত দ্রুত ধাবমান হয় যে, তাদের ক্ষুর থেকে ধূলি উড়ে চতুর্দিক আচ্ছন্ন করে ফেলে। বিশেষত প্রভাতকালে ধূলি উড়া অধিক দ্রুতগামিতার ইঙ্গিত বহন করে। কারণ, স্বভাবত এটা ধূলি উত্থিত হওয়ার সময় নয়। ভীষণ দৌড় দ্বারাই ধূলি উড়তে পারে।

فَوَسَطْنَ بِهٖ جَمْعًا –অর্থাৎ এসব অশ্ব শত্রু দলের অভ্যন্তরে নির্ভয়ে ঢুকে পড়ে। كَنُودٌ হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন ; এর অর্থ সে ব্যক্তি, যে বিপদ স্মরণ রাখে এবং নিয়ামত ভুলে যায়।

আবূ বকর ওয়াসেতী (র.) বলেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর নিয়ামতসমূহকে গোনাহের কাজে ব্যয় করে, তাকে كَنُودٌ বলা হয়। তিরমিযীর মতে এর অর্থ, যে নিয়ামত দেখে কিন্তু নিয়ামতদাতাকে দেখে না। এসব উক্তির সারমর্ম নিয়ামতের নাশোকরী করা।

وَاِنَّهٗ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ - خَير -এর শাব্দিক অর্থ মঙ্গল। আরবে ধনসম্পদকেও خَيْر বলে ব্যক্ত করা হয়, যেন ধনসম্পদ মঙ্গলই মঙ্গল এবং উপকারই উপকার। প্রকৃতপক্ষে কোনো কোনো ধনসম্পদ মানুষকে হাজারো বিপদে জড়িত করে দেয়। পরকালে তো হারাম ধনস্পদের পরিণতি তা-ই হবে; দুনিয়াতেও তা মানুষের জন্য বিপদ হয়ে যায়। কিন্তু আরবের বাকপদ্ধতি অনুযায়ী এ আয়াতে ধনসম্পদকে خَيْر বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। যেমন, অন্য এক আয়াতে আছে اِنْ تَرَكَ خَيْرًا।

উপরিউক্ত আয়াতে অশ্বের শপথ করে মানুষ সম্পর্কে দু'টি কথা ব্যক্ত করা হয়েছে– এক. মানুষ অকৃতজ্ঞ, সে বিপদাপদ ও কষ্ট স্মরণ রাখে এবং নিয়ামত ও অনুগ্রহ ভুলে যায়। দুই. সে ধনসম্পদের লালসায় মত্ত। উভয় বিষয় শরিয়ত ও যুক্তির নিরিখে নিন্দনীয়। অকৃতজ্ঞতা যে নিন্দনীয়, তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। তবে ধনসম্পদ মানুষের প্রয়োজনাদির ভিত্তি। এর উপার্জন শরিয়তে কেবল হালালই নয় বরং প্রয়োজন মাফিক ফরজও বটে। সুতরাং ধনসম্পদের ভালোবাসা নিন্দনীয় হওয়ার এক কারণ তাতে এমনভাবে মত্ত হওয়া যে, আল্লাহর বিধি-বিধান থেকেও গাফিল হয়ে পড়া এবং হালাল ও হারামের পরওয়া না করা। দ্বিতীয় কারণ এই যে, ধনসম্পদ উপার্জন করা এবং প্রয়োজনমাফিক সঞ্চয় করা তো নিন্দনীয় নয়, বরং ফরজ। কিন্তু একে ভালোবাসা নিন্দনীয়। কেননা ভালোবাসার সম্পর্ক অন্তরের সাথে। সারকথা এই যে, ধনসম্পদ প্রয়োজনমাফিক অর্জন করা এবং তা দ্বারা উপকৃত হওয়া তো ফরজ ও প্রশংসনীয় কিন্তু অন্তরে তৎপ্রতি মহব্বত হওয়া নিন্দনীয়। উদাহরণত মানুষ প্রস্রাব পায়খানার প্রয়োজন মিটায়, এজন্য যত্নবান হয় কিন্তু অন্তরে এর প্রতি মহব্বত থাকে না। অসুস্থ অবস্থায় মানুষ ঔষধ সেবন করে, অপারেশন করায়, কিন্তু অন্তরে ঔষধ ও অপারেশনের প্রতি মহব্বত থাকে না; বরং অপারগ অবস্থায় এগুলো অবলম্বন করে। এমনিভাবে মু'মিনের এরূপ হওয়া দরকার যে, সে প্রয়োজনমাফিক অর্থোপার্জন করবে, তার হেফাজত করবে এবং প্রয়োজনের ক্ষেত্রে তাকে কাজেও লাগাবে কিন্তু অন্তরকে তার মহব্বতে মশগুল করবে না। মাওলানা রূমী অত্যন্ত সাবলীল ভঙ্গিতে বিষয়টি বর্ণনা করেছেন :

آب اندر زیر کشتی پشتی است * آب در کشتی ہلاک کشتی است

অর্থাৎ পানি যতক্ষণ নৌকার নীচে থাকে, ততক্ষণ নৌকার পক্ষে সহায়ক হয় কিন্তু এ পানিই যখন নৌকার অভ্যন্তরে চলে যায়, তখন নৌকাকে নিমজ্জিত করে দেয়। এমনিভাবে ধনসম্পদ যতক্ষণ নৌকারূপী অন্তরের আশেপাশে থাকে, ততক্ষণই তা উপকারী থাকে। কিন্তু যখন তা অন্তরের অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ করে, তখন অন্তরকে ধ্বংস করে দেয়। সূরার উপসংহারে মানুষের এ দু'টি ঘৃণ্য স্বভাবের কারণে পরকালীন শাস্তিবাণী শুনানো হয়েছে।

اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِى الْقُبُوْرِ অর্থাৎ মানুষ কি জানে না যে, কিয়ামতের দিন সব মৃতকে কবর থেকে জীবিত উত্থিত করা হবে এবং অন্তরের সকল ভেদ ফাঁস হয়ে যাবে? এটাও সবার জানা যে, আল্লাহ তা'আলা সব অবস্থা সম্পর্কেই অবহিত। অতএব তদনুযায়ী শাস্তি ও প্রতিদান দিবেন। কাজেই বুদ্ধিমানের কর্তব্য হলো অকৃতজ্ঞতা না করা এবং ধনসম্পদের লালসায় মত্ত না হওয়া।

জ্ঞাতব্য : আলোচ্য সূরায় মানুষ মাত্রেই দু'টি ঘৃণ্য স্বভাব বর্ণিত হয়েছে। অথচ মানুষের মধ্যে এমন অনেক নবী, ওলী ও সৎ কর্মপরায়ণ ব্যক্তি আছেন, যাঁরা এ ঘৃণ্য স্বভাবদ্বয় থেকে মুক্ত এবং আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা। তারা আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করার জন্য প্রস্তুত থাকেন এবং হারাম ধনসম্পদ থেকে বেঁচে থাকেন। তবে অধিকাংশ মানুষ যেহেতু এসব দোষে পতিত, তাই মানুষ মাত্রেই এই বদ-অভ্যাস বর্ণনা করা হয়েছে। এতে সবারই এরূপ হওয়া জরুরি হয় না। এ কারণেই কেউ কেউ আয়াতে মানুষ বলে কাফের মানুষ বুঝিয়েছেন। এর সার অর্থ হবে এই যে, এ ঘৃণ্য বিষয় প্রকৃতপক্ষে কাফেরদের স্বভাব। আল্লাহ না করুন, যদি কোনো মুসলমানের মধ্যেও এগুলো পাওয়া যায়, তবে অবিলম্বে তা দূর করতে সচেষ্ট হওয়া দরকার।

শব্দ বিশ্লেষণ :

اَلْعَادِيَاتُ : সীগাহ جمع مؤنث বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার اَلْعَدْوُ মূলবর্ণ (ع - د - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– ধাবমান অশ্বরাজি।

ضَبْحًا : মাসদার বাব فَتَحَ মূলবর্ণ (ض - ب - ح) জিনস صحيح অর্থ– হাঁপানো। ঘোড়ার দৌড়ানোর কারণে উর্ধ্ব শ্বাস ফেলাকে ضبح বলা হয়।

اَلْمُوْرِيَاتُ : সীগাহ جمع مؤنث বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِيْرَاءٌ মূলবর্ণ (و - ر - ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গতকারী।

قَدْحًا : অর্থ– চমকিত পাথরের আঘাত করে আগুন বের করা। পাথরের উপর পাথর বা লোহার আঘাত করে আগুন বের করা। قَدْحٌ- এর পরে فى আসলে অর্থ হবে টিপ্পনি কাটা (نَصَرَ) আকারের মধ্যে قَدْحًا- এর পরে কোনো صلـه আসেনি। তাই অর্থ হবে, ঘোড়ার নালযুক্ত পায়ের দ্বারা পাথরের জমিনে আঘাত করা।

اَلْمُغِيْرَاتُ : সীগাহ جمع مؤنث বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِغَارَةٌ মূলবর্ণ (غ - ى - ر) জিনস اجوف يائى অর্থ– অভিযান আরম্ভকারী।

نَقْعًا : ইসম, মানসুব। অর্থ– ধূলাবালু, মাটি, উট পাখির ডাক। পানি জমা হওয়ার সংকীর্ণ স্থান। কূপে আবদ্ধ পানি।

وَسَطْنَ : সীগাহ جمع مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার وَسْطٌ মূলবর্ণ (و - س - ط) জিনস مثال واوى অর্থ– ঢুকে পড়ে। প্রবেশ করল।

جَمْعًا : মাসদার। جَمْعٌ- এর বহুবচন। جُمُوْعٌ বাব فَتَحَ। মূলবর্ণ (ج - م - ع) জিনস صحيح অর্থ– একত্র হওয়া, দাঁড়ানো, জড়ো হওয়া। জামাত, দল, সৈন্য বাহিনী।

كَنُوْدٌ : সিফাতে মুশাব্বাহর সীগাহ। অর্থ– অকৃতজ্ঞ- পুরুষ হোক বা মহিলা হোক। কাফের। আল্লাহকে যে খারাপ বলে। একা ভক্ষণকারী। বখিল। এখানে প্রথম অর্থ উদ্দেশ্য। كَنِدٌ ও كَنَادٌ অকৃতজ্ঞ পুরুষ। মাসদার كُنُوْدٌ বাব نَصَرَ অকৃতজ্ঞ হওয়া।

بُعْثِرَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব فَعْلَلَةٌ মাসদার بَعْثَرَةٌ মূলবর্ণ (ب - ع - ث - ر) জিনস صحيح অর্থ– জীবিত করা হবে। উঠানো হবে।

حُصِّلَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব تفعيل মাসদার تَحْصِيْلٌ মূলবর্ণ (ح - ص - ل) জিনস صحيح অর্থ– প্রকাশ হয়ে যাবে। অর্জন করা হয়েছে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيْرٌ : এখানে اِنَّ হলো হরফে মুশাব্বাহবিল ফে'ল আর رَبَّهُمْ হলো اسم ان আর بِهِمْ টা لَخَبِيْرٌ- এর متعلق হয়েছে। আর يَوْمَئِذٍ টাও خَبِيْرٌ- এর সাথে ظرف متعلق হয়েছে। আর لَخَبِيْرٌ- এর لام হলো المزحلقة আর خَبِيْرٌ হলো خبر انَّ –[ই'রাবুল কুরআন ৮ম খণ্ড : পৃ. ৩৮৯]

سُوْرَةُ الْقَارِعَةِ مَكِّيَّةٌ

সূরা কারি'আ

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত– ১১, রুকূ'– ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. সে খট্খট্কারী বস্তু [কিয়ামত বা মহা প্রলয়]।	اَلْقَارِعَةُ ۝١
২. কি রকম সে খট্খট্কারী বস্তু [কিয়ামত বা মহা প্রলয়]?	مَا الْقَارِعَةُ ۝٢
৩. আর আপনার কি কিছু জানা আছে সে খটখটকারী বস্তু [কিয়ামত বা মহা প্রলয়] কিরূপ?	وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْقَارِعَةُ ۝٣
৪. যেদিন মানুষ বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের ন্যায় হয়ে যাবে।	يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ ۝٤
৫. আর পাহাড়সমূহ ধুনিত রঙ্গিন পশমের ন্যায় হয়ে [উড়ে] যাবে।	وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ ۝٥
৬. অনন্তর যার [ঈমানের] পাল্লা ভারি হবে [অর্থাৎ সে মুমিন]।	فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ ۝٦
৭. সে তো বাসনানুরূপ সুখে অবস্থান করবে।	فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۝٧
৮. আর যার [ঈমানের] পাল্লা হালকা হবে [অর্থাৎ, সে কাফের হয়]।	وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ ۝٨

শাব্দিক অনুবাদ :

১. اَلْقَارِعَةُ সে খটখটকারী বস্তু।

২. مَا الْقَارِعَةُ কি রকম সে খটখটকারী বস্তু।

৩. وَمَآ اَدْرٰىكَ আর আপনার কি কিছু জানা আছে مَا الْقَارِعَةُ সে খটখটকারী বস্তু কিরূপ?

৪. يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ যেদিন মানুষ হয়ে যাবে كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের ন্যায়।

৫. وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ আর পাহাড়সমূহ হয়ে যাবে كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ ধুনিত রঙ্গিন পশমের ন্যায়।

৬. فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ অনন্তর যার ভারি হবে مَوَازِيْنُهٗ (ঈমানের) পাল্লা।

৭. فَهُوَ সে তো অবস্থান করবে فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ বাসনানুরূপ সুখে।

৮. وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ আর যার হালকা হবে مَوَازِيْنُهٗ (ঈমানের) পাল্লা।

শাব্দিক অনুবাদ :

৯. فَأُمُّهُ তবে তার বাসস্থান হবে هَاوِيَةٌ হাবিয়া।

১০. وَمَا أَدْرَاكَ আর আপনার কি জানা আছে مَا هِيَهْ হাবিয়া কি।

১১. نَارٌ حَامِيَةٌ একটি জ্বলন্ত অগ্নি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : قَارِعَةٌ অর্থ– খটখটকারী, আঘাতকারী, বিধ্বস্তকারী, বিচূর্ণকারী, কিন্তু এখানে অর্থ হলো– কিয়ামত বা মহাপ্রলয়। অত্র সূরার প্রথম আয়াতেই সে মহা-প্রলয়ের আরবি শব্দটি উল্লিখিত হয়েছে। সে শব্দকে কেন্দ্র করে সূরার নাম اَلْقَارِعَةُ রাখা হয়েছে। মূলত এটা কেবল নাম-ই নয়; বরং এর বিষয়বস্তু ও মূলবক্তব্যের শিরোনামও তা। কেননা এতে মহাপ্রলয় সম্পর্কে বলা হয়েছে। এতে ১১টি আয়াত, ৩৩টি বাক্য এবং ১৫২টি অক্ষর রয়েছে।

অবতীর্ণ হওয়ার সময়কাল : এ সূরাটি মাক্কী। এর মক্কায় অবতীর্ণ হওয়া সম্পর্কে কোনো মতভেদ নেই। তার বিষয়বস্তু হতে বুঝা যায় যে, এটা মক্কায় প্রাথমিককালে অবতীর্ণ সূরাসমূহের অন্যতম।

সূরাটির বিয়বস্তু ও সারকথা : সূরার মূল বিষয়বস্তু হলো কিয়ামত অনুষ্ঠিত হওয়া ও পরকালে পুনরায় জীবিত হয়ে আল্লাহর দরবারে পার্থিব জীবনের কৃতকর্মসমূহের হিসাব দেওয়া এবং প্রতিদান গ্রহণের জন্য মানুষের উপস্থিত হওয়া। সূরার প্রথমেই মানুষের মন যেন আতঙ্কগ্রস্ত হয় এবং থরথর করে কেঁপে উঠে, এমন ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। আমাদের দেশীয় কথায় বাঘ! বাঘ! বলা হলে যেমন স্তম্ভিত হয়ে যায় এবং প্রাণভয়ে মানুষ কাঁপতে থাকে, তেমনি আল্লাহ তা'আলাও সূরার প্রথমে এমনি একটি শব্দ ব্যবহার করেছেন, যাতে সমস্ত মানুষ কেঁপে উঠে। অর্থাৎ মহাপ্রলয়। অতঃপর মহাপ্রলয় কি? তার প্রশ্ন রেখে গুণগত দিকটি তুলে ধরে মূল ব্যাপারটি হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করা হয়েছে। অর্থাৎ এ মহাপ্রলয় এমন ভয়াবহ ও বিভীষিকাময় হবে যে, মানুষ তা কল্পনাও করতে পারে না। সেদিন মানুষ পতঙ্গকুলের ন্যায় দিক-বিদিক ছুটাছুটি ও দৌড়াদৌড়ি করতে থাকবে। তাদের অবস্থা হবে তখন দিশাহারা ও পাগলপারা মানুষের ন্যায়। পাহাড়গুলো পশমের ন্যায় উড়তে থাকবে। এর দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করা যায় যে, সে মহাপ্রলয়ের আকার ও রূপটি হবে কত ভয়ঙ্কর ও ভয়াল! পরিশেষে মানবকুলের বিচার অনুষ্ঠানের জন্য হাশর প্রান্তরে আল্লাহর আদালত বসবে। সে আদালতে মানুষের কার্যাবলির বিচার-বিশ্লেষণ হয়ে তা পরিমাপ করা হবে। যাদের সৎকাজের পরিমাণ বেশি এবং ওজনের পাল্লা ভারি হবে, তাদের পরিণাম হবে শুভ। তারা লাভ করবে চিরস্থায়ী সন্তোষজনক জীবন। মহা সুখ-শান্তি ও আনন্দে তারা জীবন কাটাবে। আর যাদের অসৎ কাজের পরিমাণ বেশি ও পাল্লা ভারি হবে তাদের পরিণাম হবে খুব দুঃখজনক ও মর্মান্তিক। প্রজ্বলিত উত্তপ্ত অনল-গর্ত হবে তাদের স্থায়ী নিবাস। সেখানেই তারা অনাদি-অনন্ত চিরদুঃখ ও কষ্টজনক জীবন কালাতিপাত করতে থাকবে। এ সূরায় আমলের ওজন ও তার হালকা এবং ভারি হওয়ার প্রেক্ষিতে জাহান্নাম অথবা জান্নাত লাভের বিষয় আলোচিত হয়েছে। আমলের ওজন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সূরা আ'রাফের শুরুতে করা হয়েছে। সেখানে দেখে নেওয়া দরকার। সেখানে একথাও লিখিত হয়েছে যে, বিভিন্ন হাদীস ও আয়াতের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে জানা যায় আমলের ওজন সম্ভবত দু'বার হবে। একবার ওজন করে মু'মিন ও কাফেরের মধ্যে পার্থক্য বিধান করা হবে। মু'মিনের পাল্লা ভারি ও কাফেরের পাল্লা হালকা হবে। এরপর মু'মিনদের মধ্যে সৎ কর্ম ও অসৎ কর্মের পার্থক্য বিধানের জন্য হবে দ্বিতীয় ওজন। এ সূরায় বাহ্যত প্রথম ওজন বুঝানো হয়েছে, যাতে প্রত্যেক মু'মিনের পাল্লা ঈমানের কারণে ভারি হবে, তার কর্ম যেমনই হোক। আর প্রত্যেক কাফেরের পাল্লা ঈমানের অভাবে হালকা হবে, সে যদিও কিছু সৎ কর্ম করে থাকে। তাফসীরে

মাযহারীতে আছে, কুরআন পাকে সাধারণভাবে কাফের ও সৎকর্মপরায়ণ মু'মিনের শাস্তি ও প্রতিদান বর্ণনা করা হয়েছে। মু'মিনদের মধ্যে যারা সৎ ও অসৎ মিশ্র কর্ম করে, কুরআন পাকে সাধারণভাবে দান প্রদানের কোনো উল্লেখ করা হয়নি। এক্ষেত্রে একথা স্মর্তব্য যে, কিয়ামতে মানুষের আমল ওজন করা হবে-গণনা করা হবে না। আমলের ওজন ইখলাস তথা আন্তরিকতা ও সুন্নতের সাথে সামঞ্জস্যের কারণে বেড়ে যায়। যার আমল আন্তরিকতাপূর্ণ ও সুন্নতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, সংখ্যায় কম হলেও তার আমলের ওজন বেশি হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি সংখ্যায় তো নামাজ, রোজা, সদকা-খয়রাত, হজ-ওমরা অনেক করে কিন্তু আন্তরিকতা ও সুন্নতের সাথে সামঞ্জস্য কম, তার আমলের ওজন কম হবে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

اَلْقَارِعَةُ : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم فاعل বাব فَتَحَ মাসদার اَلْقَرْعُ মূলবর্ণ (ق - ر - ع) জিনস صحيح অর্থ– খট-খটকারী বস্তু। কিয়ামত।

مَآ اَدْرَاكَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব إِفْعَالٌ মাসদার إِدْرَاءٌ মূলবর্ণ (د - ر - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– আপনার কি কিছু জানা আছে।

اَلْفِرَاشِ : বহুবচন। একবচন فِرَاشَةٌ । অর্থ- পতঙ্গ, প্রজাপতি, ধূর্ত, ফন্দিবাজ, সল্পজ্ঞান সম্পন্ন লোক। এখানে প্রথমটি উদ্দেশ্য। আয়াতে فِرَاشٌ জিনস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই তার সিফাত একবচন নেয়া হয়েছে। اَلْمَبْثُوْثَةُ -এর মূল اَلْمَبْثُوْثُ বলা হয়েছে। যেরূপ اَلسَّحَابُ ; سَحَابَةٌ -এর বহুবচন। কিন্তু এটি ইসমে জিনস হয়।

اَلْعِهْنِ : অর্থ– রঙ্গিন পশম। লোগাতে عِهْنٌ অর্থ– রঙ্গিন পশম, যাতে নানা রকম রং থাকে। বহুবচন عهون আসে।

اَلْمَنْفُوْشِ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব نَصَرَ মাসদার نُفُوْشٌ মূলবর্ণ (ن - ف - ش) জিনস صحيح অর্থ– ধুনিত।

ثَقُلَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব كَرُمَ মাসদার ثِقْلٌ মূলবর্ণ (ث - ق - ل) জিনস صحيح অর্থ– ভারি হবে।

مَوَازِيْنُهٗ : ইসমে আলা বা ইসমে মাফউল। একবচন مِيْزَانٌ বা اَلْمَوْزُوْنُ অর্থ– পাল্লা, নেকীর ওজন।

خَفَّتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার خِفَّةٌ মূলবর্ণ (خ - ف - ف) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– হালকা হবে।

هَاوِيَةٌ : দোজখের একটি স্তরের নাম। বহুবচন : هوة অর্থ– গর্ত, নিম্নভূমি, আকাশ জমিনের মধ্যবর্তী অংশ।

حَامِيَةٌ : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم فاعل বাব سَمِعَ মাসদার حَمْىٌ মূলবর্ণ (ح - م - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– জ্বলন্ত। প্রজ্জ্বলিত। উত্তপ্ত।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَمَآ اَدْرٰكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ : এখানে واو টি আতেফা। আর مَا হলো اسم استفهام যা মুবতাদা হয়েছে। আর اَدْرٰكَ বাক্যটি خبر আর كَ হলো اَدْرٰى -এর মাফউলে বিহী। আর مَاهِيَة -এর ما হলো اسم استفهام যা মুবতাদা হয়েছে আর هِىَ হলো খবর। এর শেষের هاء টি سلت -এর জন্য হয়েছে। আর نَارٌ হলো উহ্য هِىَ মুবতাদার খবর। আর حَامِيَةٌ হলো نَارٌ -এর সিফত। –[ই'রাবুল কুরআন ৮ম খণ্ড : পৃ. ৩৯৪]

سُوْرَةُ التَّكَاثُرِ مَكِّيَّةٌ

সূরা তাকাছুর

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত– ৮, রুকূ'– ১

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ۝

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

অনুবাদ	আয়াত
১. প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা [পার্থিব সম্পদের উপর গর্বিত হওয়া] তোমাদেরকে [পরকাল হতে] ভুলিয়ে রাখে।	اَلۡهٰکُمُ التَّکَاثُرُ ۙ﴿۱﴾
২. এমন কি তোমরা কবরসমূহে উপনীত হও।	حَتّٰی زُرۡتُمُ الۡمَقَابِرَ ؕ﴿۲﴾
৩. [পার্থিব সম্পদ] কখনো [গর্বের বস্তু] নয়, শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে।	کَلَّا سَوۡفَ تَعۡلَمُوۡنَ ۙ﴿۳﴾
৪. আবার বলি [শুনে রাখ] এটা সঙ্গত নয়, তোমরা অচিরেই জানতে পারবে।	ثُمَّ کَلَّا سَوۡفَ تَعۡلَمُوۡنَ ؕ﴿۴﴾
৫. সাবধান! যদি [এ বিষয়] তোমরা নিশ্চিতরূপে অবগত হতে [যেমন মৃত্যুর পর হবে, তবে এরূপ দাম্ভিকতার মধ্যে পতিত থাকতে না।]	کَلَّا لَوۡ تَعۡلَمُوۡنَ عِلۡمَ الۡیَقِیۡنِ ؕ﴿۵﴾
৬. আল্লাহর কসম! তোমরা অবশ্যই দোজখ দেখবে।	لَتَرَوُنَّ الۡجَحِیۡمَ ۙ﴿۶﴾
৭. আবার [বলা হয়েছে] আল্লাহর কসম, নিশ্চয় তোমরা তা এমন দেখা দেখবে, যা স্বয়ং প্রত্যক্ষ বিশ্বাস।	ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَیۡنَ الۡیَقِیۡنِ ۙ﴿۷﴾
৮. অতঃপর তোমরা সেদিন সকলেই নিয়ামত [ভোগ্য বস্তুসমূহ] সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হবে।	ثُمَّ لَتُسۡـَٔلُنَّ یَوۡمَئِذٍ عَنِ النَّعِیۡمِ ٪﴿۸﴾ ع ٨ ٢٧

শাব্দিক অনুবাদ :

১. اَلْهٰكُمُ তোমাদেরকে (পরকাল হতে) ভুলিয়ে রাখে اَلتَّكَاثُرُ প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা (পার্থিব সম্পদের উপর গর্বিত হওয়া।)
২. حَتّٰى زُرْتُمُ এমনকি তোমরা উপনীত হও الْمَقَابِرَ কবরসমূহে।
৩. كَلَّا কখনো নয় سَوْفَ শীঘ্রই تَعْلَمُوْنَ তোমরা জানতে পারবে।
৪. ثُمَّ كَلَّا আবার বলি এটা সঙ্গত নয় سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ তোমরা অচিরেই জানতে পারবে।
৫. كَلَّا সাবধান لَوْ تَعْلَمُوْنَ যদি তোমরা অবগত হতে عِلْمَ الْيَقِيْنِ নিশ্চিতরূপে।
৬. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ আল্লাহর কসম! তোমরা অবশ্যই দোজখ দেখবে।
৭. ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا আবার আল্লাহর কসম নিশ্চয় তোমরা তা এমন দেখা দেখবে عَيْنَ الْيَقِيْنِ যা স্বয়ং প্রত্যক্ষ বিশ্বাস।
৮. ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ অতঃপর তোমরা সকলেই জিজ্ঞাসিত হবে يَوْمَئِذٍ সেদিন عَنِ النَّعِيْمِ নিয়ামত (ভোগ্য বস্তু) সম্বন্ধে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : সূরার প্রথম আয়াতের اَلتَّكَاثُرُ শব্দটিকে নামকরণের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে এতে ৮টি আয়াত, ২৮টি বাক্য এবং ১২০টি অক্ষর রয়েছে।

অবতীর্ণের সময়কাল : আবূ হাইয়ান ও শাওকীনী বলেন, সব তাফসীরকারকদের মতেই এ সূরাটি মাক্কী। ইমাম সুয়ূতী (র.) বলেন, সবচাইতে বেশি পরিচিত কথা হলো- এটা মাক্কী সূরা; কিন্তু কোনো কোনো হাদীসে এটা মাদানী বলে উল্লিখিত হয়েছে।

সূরাটির বিষয়বস্তু ও সারকথা : এ সূরার মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে দুনিয়া পূজা ও বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা করা এবং মানুষকে আখেরাতপন্থি ও পরকালমুখি করা। প্রথমেই বলা হয়েছে যে, তোমাদের জাগতিক জীবনে অধিক মাত্রায় উপায়-উপকরণ লাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষা এবং পারস্পরিক প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে নেশাগ্রস্ত করে ফেলেছে। তোমরা বেশি বেশি লাভ করা এবং অপরের তুলনায় নিজে বেশি সম্পদের অধিকারী হওয়াকেই জীবনের আসল উন্নতি ও যথার্থ সাফল্য ভেবে নিয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে তোমরা জীবনের আসল মূল্যবোধ, দর্শন ও দৃষ্টভঙ্গি হতে অনেক দূরে সরে পড়েছ। সেদিকে দৃষ্টিপাত করা ও মনোযোগ দেওয়ার কোনোই সুযোগ পাচ্ছে না এবং মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজনও অনুভব কর না। অথচ জাগতিক উপায়-উপকরণের তুলনায় এদিকে মনোযোগ দেওয়াই ছিল তোমদের আসল কর্তব্য। পরকালের হিসাব-নিকাশ এবং আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করার চিন্তা ভুলেও তোমাদের মনের কোণে জাগরিত হয় না। এরূপ অবস্থায় নিমজ্জিত হয়ে থাকলে পরিণতিতে জাহান্নাম যে তোমাদের অবলোকন করতে হবে তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। যেদিন চাক্ষুষ জাহান্নামকে অবলোকন করবে, সেদিনই তার আসল সত্যাসত্য সম্যক উপলব্ধি করতে পারবে।

সূরার সর্বশেষ আয়াতে বলা হয়েছে যে, তোমাদের জীবনে আল্লাহর অসংখ্য নিয়ামত ও অবদান বর্তমান। এ নিয়ামতসমূহ কোন পথে, কি নিয়মে ব্যবহার করলে, সে বিষয় তোমাদের মৃত্যুর পর অবশ্যই আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে। অতএব, সময় থাকতে তোমরা সাবধান হও, সতর্ক হও। পরকালমুখী গতি-চরিত্র গ্রহণ করো। এটাই তোমাদের জীবনে মহাসাফল্য এনে দিবে।

সূরাটির ফজিলত : নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদেরকে বলেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কি এমন নেই, যে প্রতিদিন কুরআনের এক হাজার আয়াত পাঠ করে? তাঁরা বললেন– কার সাধ্য আছে যে, প্রতিদিন এক হাজার আয়াত পাঠ করে? তখন তিনি ইরশাদ করেন, তোমাদের কেউ কি اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ পাঠ করতে পারে না? –[অর্থাৎ এ সূরা এক হাজার আয়াতের সমতুল্য]।

হযরত ওমর (রা.) হতে বর্ণিত হাদীসে এসেছে যে, রাতে এক হাজার আয়াত পাঠ করলে আল্লাহ তা'আলার দীদার নসীব হবে। সাহাবীগণ অপারগতা প্রকাশ করলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ পাঠ করে ইরশাদ করলেন, যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ করে বলছি, এ সূরাটি এক হাজার আয়াতের সমান। –[রূহুল মা'আনী]

اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ .... الْاٰيَة.

শানে নুযূল : ১. এই সূরা আনসারদের দু'টি গোত্র সম্পর্কে নাজিল হয়। যারা পরস্পর একে অপরের সাথে সম্পদের প্রাচুর্য ও শক্তি নিয়ে গর্ব করত। তারা একে অপরের খারাপ লোকদের বর্ণনা করে বলত যে, তোমাদের মাঝে অমুক অমুক ব্যক্তি রয়েছে যারা জঘন্যতম। প্রথমে তারা জীবিতদের নিয়ে এমন মন্দচারী করত অতঃপর মৃতুদের কথাও ব্যক্ত করত। এমনকি তারা কবরস্থানে যেয়ে একে অপরের খারাপ লোকদের কবরগুলো দেখিয়ে গাল-মন্দ করত। –[কানযুন নুকূল : ১১০]

২. অন্য রেওয়ায়েতে আছে হযরত আলী (রা.) বলেন, আমরা কবরের আজাবের ব্যাপারে সন্দেহে ছিলাম তখন উক্ত সূরাটি নাজিল হয়। –[সূত্র-তিরমিযি শরীফ : ২]

اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ – تَكَاثُرٌ শব্দটি كَثْرَةٌ থেকে উদ্ভূত। অর্থ প্রচুর ধনসম্পদ সঞ্চয় করা। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও হাসান বসরী (র.) এ তাফসীরই করেছেন। এ শব্দটি প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা অর্থেও ব্যবহৃত হয়। কাতাদাহ (র.) এ অর্থই করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার এ আয়াত তেলাওয়াত করে বললেন : এর অর্থ অবৈধ পন্থায় সম্পদ সংগ্রহ করা এবং আল্লাহর নির্ধারিত খাতে ব্যয় না করা। –[কুরতুবী]

حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ : এখানে করবসমূহে উপনীত হওয়ার– অর্থ মরে কবরে পৌছা। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেছেন : حَتّٰى يَاْتِيَكُمُ الْمَوْتُ –(ইবনে কাছীর) অতএব, আয়াতের মর্মার্থ এই যে, ধনসম্পদের প্রাচুর্য অথবা ধনসম্পদ, সন্তান-সন্ততি ও বংশ-গোত্রের বড়াই তোমাদেরকে গাফেল ও উদাসীন করে রাখে, নিজেদের পরিণতি ও পরকালের হিসাব-নিকাশের কোনো চিন্তা তোমরা করো না এবং এমনি অবস্থায় তোমাদের মৃত্যু এসে যায়। আর মৃত্যুর পর তোমরা আজাবে গ্রেফতার হও। একথা বাহ্যত সাধারণ মানুষকে বলা হয়েছে, যারা ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততির ভালোবাসায় অথবা অপরের সাথে বড়াই করায় এমন মত্ত হয়ে পড়ে যে, পরিণাম চিন্তা করার ফুরসতই পায় না।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে শিখখীর (রা.) বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পৌছে দেখলাম, তিনি اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ তেলাওয়াত করে বলেছেন :

يَقُوْلُ ابْنُ اٰدَمَ مَالِىْ مَالِىْ لَكَ مِنْ مَالِكَ اِلَّا مَا اَكَلْتَ فَاَفْنَيْتَ اَوْ لَبِسْتَ فَاَبْلَيْتَ اَوْتَصَدَّقْتَ فَاَمْضَيْتَ وَفِىْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ وَمَا سِوٰى ذٰلِكَ فَذَاهِبٌ وَتَارِكُهٗ لِلنَّاسِ.

মানুষ বলে, আমার ধন– আমার ধন অথচ তোমার অংশ তো ততটুকুই, যতটুকু তুমি খেয়ে শেষ করে ফেল অথবা পরিধান করে ছিন্ন করে দাও অথবা সদকা করে সম্মুখে পাঠিয়ে দাও। এছাড়া যা আছে, তা তোমার হাত থেকে চলে যাবে–তুমি অপরের জন্য তা ছেড়ে যাবে। –[ইবনে কাছীর, তিরমিযী, আহমদ]

হযরত আনাস (রা.) বর্ণিত এক রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :

لَوْ كَانَ لِاِبْنِ اٰدَمَ وَادِيًا مِنْ ذَهَبٍ لَاَحَبَّ اَنْ يَكُوْنَ لَهٗ وَادِيَانِ وَلَنْ يَمْلَاَ فَاهُ اِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ تَابَ.

আদম সন্তানের যদি স্বর্ণে পরিপূর্ণ একটি উপত্যক থাকে, তবে সে (তাতেই সন্তুষ্ট হবে না; বরং) দু'টি উপত্যকা কামনা করবে। তার মুখ তো (কবরের) মাটি ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা ভর্তি করা সম্ভব নয়। যে আল্লাহর দিকে রুজু করে, আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন। –[বুখারী]

হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) বলেন : আমরা সূরা তাকাছুর নাজিল হওয়া পর্যন্ত উপরিউক্ত হাদীসকে কুরআন মনে করতাম। মনে হয়– রাসূলুল্লাহ ﷺ اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ পাঠ করে তার ব্যাখ্যায় উপরিউক্ত উক্তিটি করেছিলেন। এতে কোনো সাহাবী তাঁর উক্তিকেও কুরআনের ভাষা মনে করলেন। পরে যখন সম্পূর্ণ সূরা সামনে আসে, তখন তাতে এসব বাক্য ছিল না। ফলে প্রকৃত অবস্থা ফুটে উঠে যে, এগুলো ছিল তাফসীরের বাক্য।

لَوْتَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ – لَوْ -এর জবাব এ স্থলে উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ لَمَا اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা যদি কিয়ামতের হিসাব-নিকাশে নিশ্চিত বিশ্বাসী হতে, তবে কখনো প্রাচুর্যের বড়াই করতে না এবং উদাসীন হতে না।

ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ -উপরে বলা হয়েছে عَيْنَ الْيَقِيْنِ -এর অর্থ সে প্রত্যয়, যা চাক্ষুষ দর্শন থেকে অর্জিত হয়। এটা বিশ্বাসের সর্বোচ্চ স্তর। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন : হযরত মূসা (আ.) যখন তূর পর্বতে অবস্থান করেছিলেন এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর সম্প্রদায় গোবৎসের পূজা করতে শুরু করছিল, তখন আল্লাহ তা'আলা তূর পর্বতেই তাঁকে অবহিত করেছিলেন যে, বনী ইসরাইলরা গোবৎসের পূজায় লিপ্ত হয়েছে। কিন্তু হযরত মূসা (আ.)-এর মধ্যে এর তেমন প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়নি, যেমন ফিরে আসার পর স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার ফলে দেখা দিয়েছিল। তিনি ক্রোধে আত্মহারা হয়ে তওরাতের তক্তিগুলো হাত থেকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। –[মাযহারী]

ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ –অর্থাৎ তোমরা সবাই কিয়ামতের দিন আল্লাহপ্রদত্ত নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে যে, সেগুলোর শোকর আদায় করেছ কি না এবং পাপ কাজে ব্যয় করেছ কি না? তন্মধ্যে কিছুসংখ্যক নিয়ামতের সুস্পষ্ট উল্লেখ কুরআনের অন্য আয়াতে এভাবে করা হয়েছে : اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰۤئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا এতে মানুষের শ্রবণশক্তি হৃদয় সম্পর্কিত লাখো নিয়ামত অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়, যেগুলো সে প্রতি মুহূর্তে ব্যবহার করে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : কিয়ামতের দিন মানুষকে সর্বপ্রথম তার স্বাস্থ্য সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। বলা হবে : আমি কি তোমাকে সুস্বাস্থ্য দেইনি, আমি কি তোমাকে ঠাণ্ডা পানি পান করতে দেইনি? –[তিরমিযী]

অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর আদায় না করা পর্যন্ত হাশরের মাঠে কেউ স্বস্থান ত্যাগ করতে পারবে না। **এক.** সে তার জীবনের দিনগুলো কি কি কাজে নিঃশেষ করেছে? **দুই.** সে তার যৌবনশক্তিকে কি কাজে ব্যয় করেছে? **তিন.** সে যে সম্পদ উপার্জন করেছিল তা বৈধ পন্থায়, না অবৈধ পন্থায় উপার্জন করেছে? **চার.** সে সেই ধনসম্পদ কোথায় কোথায় ব্যয় করেছে? **পাঁচ.** আল্লাহ প্রদত্ত ইল্‌ম অনুযায়ী সে কতটুকু আমল করেছে? –[বুখারী]

তাফসীরবিদ ইমাম মুজাহিদ (র.) বলেন : কিয়ামতের দিন এ ধরনের প্রশ্ন প্রত্যেক ভোগবিলাস সম্পর্কে করা হবে, তা পানাহার, পোশাক-পরিচ্ছদ, বাসস্থান সম্পর্কিত ভোগবিলাস হোক কিংবা সান্তান-সন্তুতি, শাসনক্ষমতা অথবা প্রভাব-প্রতিপত্তি সম্পর্কিত ভোগবিলাস হোক। কুরতুবী এ উক্তি উদ্ধৃত করে বলেন : এটা একান্ত যথার্থ যে, কোনো বিশেষ নিয়ামত সম্পর্কে এ প্রশ্ন করা হবে না।

শব্দ বিশ্লেষণ :

اَلْهٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِلْهَاءٌ মূলবর্ণ (ل - ه - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– ভুলিয়ে রাখে।

تَكَاثُرُ : ইসম ও মাসদার। অর্থ : প্রাচুর্য। উচ্চাকাঙ্ক্ষা। মান ও সম্মান মর্তবা, ধন ও জনের প্রাচুর্যের জন্য ঝগড়া করা। শব্দটি تفاعل-এর ওজনে।

زُرْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার زِيَارَةٌ মূলবর্ণ (ز - و - ر) জিনস اجوف واوى অর্থ– তোমরা উপনীত হও।

مَقَابِرَ : সীগাহ جمع منتهى الجموع। যরফে মাকান। একবচন مَقْبَرَةٌ ও مَقْبُرَةٌ অর্থ, কবরস্থান।

لَتَرَوُنَّ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার رُؤْيَةٌ মূলবর্ণ (ر - ء - ى) জিনস মুরাক্কাব مهموز عين এবং ناقص يائى অর্থ– অবশ্যই দোজখ দেখবে।

لَتُسْئَلُنَّ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ لام تاكيد بانون تاكيد ثقيله درفعل مستقبل مجهول বাব فَتَحَ মাসদার اَلسُّؤَالُ মূলবর্ণ (س - ء - ل) জিনস مهموز عين অর্থ– তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে।

نَعِيْمِ : ইসম। মারিফাহ। মাজরূর। অর্থ– নিয়ামত অর্থাৎ নিয়ামতের শুকরিয়াহ।

বাক্য বিশ্লেষণ :

اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ : এখানে اَلْهٰكُمُ হলো ফে'ল আর كم হলো مفعول به مقدم যা হয়েছে আর التَّكَاثُرُ হলো ফায়েল। আর حَتّٰى আতেফা বা হরফে জার। আর زُرْتُمْ হলো ফে'ল ও ফায়েল اَلْمَقَابِرَ হলো মাফউলে বিহী। –[ইরাবুল কুরআন ৮ম খণ্ড : পৃ. ৩৯৮]

سُورَةُ الْعَصْرِ مَكِّيَّةٌ

সূরা 'আস্‌র

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত– ৩, রুকূ'– ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. মহাকালের শপথ।	وَالْعَصْرِ ①
২. নিশ্চয় মানুষ অত্যন্ত ক্ষতির মধ্যে রয়েছে।	اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِیْ خُسْرٍ ②
৩. কিন্তু যারা ঈমান আনে এবং যারা নেক কাজ করে এবং একে অন্যকে সত্যের প্রতি উপদেশ দিতে থাকে এবং একে অন্যকে ধৈর্যের প্রতি উপদেশ দিতে থাকে [তারাই ক্ষতি হতে রক্ষা পাবে।]	اِلَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ③ ع ২৮

শাব্দিক অনুবাদ :

১. وَالْعَصْرِ মহাকালের শপথ।

২. اِنَّ الْاِنْسَانَ নিশ্চয় মানুষ لَفِیْ خُسْرٍ অত্যন্ত ক্ষতির মধ্যে রয়েছে।

৩. اِلَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا কিন্তু যারা ঈমান আনে وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ এবং যারা নেক কাজ করে وَتَوَاصَوْا এবং একে অন্যকে উপদেশ দিতে থাকে بِالْحَقِّ সত্যের প্রতি وَتَوَاصَوْا এবং একে অন্যকে উপদেশ দিতে থাকে بِالصَّبْرِ (সবরের) ধৈর্যের প্রতি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : সূরার প্রথম اَلْعَصْرِ শব্দকেই এর নামরূপে নির্ধারণ করা হয়েছে। এতে ৩টি আয়াত, ১৪টি বাক্য এবং ৬৮টি অক্ষর রয়েছে।

সূরাটির নাজিল হওয়ার সময়কাল : সূরাটি কখন নাজিল হয়েছে এ ব্যাপারে মতভেদ দেখা যায়।

১. হযরত মুজাহিদ, কাতাদাহ ও মুকাতিল (র.) প্রমুখের মতে, এ সূরাটি মদীনায় নাজিল হয়েছে।

২. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) সহ জমহুর মুফাসসিরগণের মতে, সূরাটি মক্কায় নাজিল হয়েছে। এর বিষয়বস্তু হতেও বুঝা যায় যে, সূরাটি মাক্কী জীবনের প্রথমিক পর্যায়ে নাজিল হয়েছে। কেননা এতে ঈমান ও আমলের মৌলিক কথার উল্লেখ করা হয়েছে।

সূরাটির বিষয়বস্তু ও সারকথা : সূরাটি অতিশয় ক্ষুদ্র, অথচ এতে বক্তব্য ও ভাবের মহাসমুদ্র লুক্কায়িত রয়েছে। আল্লাহ এ ক্ষুদ্রকায় বাক্য কয়টিতে মানব জীবনের আসল নীতি-আদর্শ ও কর্মময় ভূমিকা কি হওয়া উচিত তা তুলে ধরেছেন। এ সূরাটি ভাব ও মাহাত্ম্যের দিক দিয়ে এত ব্যাপক যে, গোটা ইসলামি জীবন চরিত্রটি একটি সংক্ষেপ অথচ বিরাট-বিশালকায় রূপ অংকন করা হয়েছে। এ জন্যই ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছেন– কোনো লোক এ সূরাটি সম্পর্কে গভীরভাবে

চিন্তা-গবেষণা করলে এটা-ই তার হেদায়েতের জন্য যথেষ্ট। মোটকথা, আল্লাহ এতে মানব জীবনে সাফল্য ও ব্যর্থতার চার দফা মূলনীতি উপস্থাপন করেছেন। ১. ঈমান ২. নেক আমল, ৩. সত্যের পারস্পরিক উপদেশ, ৪. ধৈর্যের পারস্পরিক নসিহত। এ চার দফা মূলনীতি হতে যারা সরে পড়বে তাদের ধ্বংস ইহকালে ও পরকালে অনিবার্য। সে ধ্বংস ও ক্ষতি হতে কেউই উদ্ধার পাবে না। আর তার ধারণা ও অনুসরণের মধ্যেই নিহিত উভয়কালের মুক্তি ও সাফল্য।

وَالْعَصْرِ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ .... الاية.

শানে নুযূল : গোলাহ বিন উসায়েদ ইসলাম পূর্ব সময়ে হযরত আবূ বকর (রা.)-এর কাছে এসে বসত। ইসলাম আসার পর যখন হযরত আবূ বকর (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন একদা সে এসে বলতে থাকে যে, হে আবূ বকর, তোমার কি হলো যে, তোমার ব্যবসা বাণিজ্যে মন্দা দেখা দিয়েছে। তুমি কোন ধ্যানে নিমগ্ন হলে যার ফলে তোমার দ্বীন ও দুনিয়া উভয়ই বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তুমি দেখছি একেবারে কপর্দক শূন্য হয়ে যাচ্ছ। হযরত আবূ বকর (রা.) তখন উত্তর দেন যে, হে নির্বোধ! যে ব্যক্তি আল্লাহ পাক ও তার রাসূলের গোলাম বনে যায় সে ক্ষতিগ্রস্ত নয়। বরং প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত তো সেই ব্যক্তি যে, আখেরাতের চিন্তা বাদ দিয়ে কেবল দুনিয়ার উন্নতির চিন্তায় মশগুল রয়েছে। আর সে জন্যেই তার সকল সময় ব্যয় করে দিচ্ছে। সে প্রেক্ষিতেই হযরত আবূ বকর (রা.)-এর শানে এই সূরা অবতীর্ণ হয়। –[তাফসীরে আজীজী : ২৭৪]

সূরা আসরের বিশেষ ফজিলত : হযরত ওবায়দুল্লাহ ইবনে হিসন (রা.) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণের মধ্যে দু'ব্যক্তি ছিল, তারা পরস্পর মিলে একজন অন্যজনকে সূরা আসর পাঠ করে না শুনানো পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হতেন না। –(তাবারানী) ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন : যদি মানুষ কেবল এ সূরাটি সম্পর্কেই চিন্তা করত, তবে এটাই তাদের জন্য যথেষ্ট ছিল। –[ইবনে কাছীর]

সূরা আসর কুরআন পাকের একটি সংক্ষিপ্ত সূরা, কিন্তু এমন অর্থপূর্ণ সূরা যে, ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর ভাষায় মানুষ এ সূরাটিকেই চিন্তা-ভাবনা সহকারে পাঠ করলে তাদের ইহকাল ও পরকালের সংশোধনের জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়। এ সূরায় আল্লাহ তা'আলা যুগের কসম করে বলেছেন যে, মানবজাতি অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত এবং এই ক্ষতির কবল থেকে কেবল তারাই মুক্ত, যারা চারটি বিষয় নিষ্ঠার সাথে পালন করে-ঈমান, সৎ কর্ম, অপরকে সত্যের উপদেশ এবং সবরের উপদেশ দেয়। দীন ও দুনিয়ার ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার এবং মহা উপকার লাভ করার চার বিষয় সম্বলিত এ ব্যবস্থাপত্রের প্রথম দু'টি বিষয় আত্মসংশোধন সম্পর্কিত এবং দ্বিতীয় দু'টি বিষয় মুসলমানদের হেদায়ত ও সংশোধন সম্পর্কিত।

প্রথম প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, এ বিষয়বস্তুর সাথে যুগের কি সম্পর্ক, যার কসম করা হয়েছে? কসম ও কসমের জবাবের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক থাকা বাঞ্ছনীয়। অধিকাংশ তাফসীরবিদ বলেন : মানুষের সব কর্ম, গতিবিধি, উঠাবসা ইত্যাদি সব যুগের মধ্যেই সংঘটিত হয়। সূরায় যে সব কর্মের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সেগুলোও এই যুগকালেরই দিবারাত্রিতে সংঘটিত হবে। এরই প্রেক্ষিতে যুগের শপথ করা হয়েছে।

মানবজাতির ক্ষতিগ্রস্ততায় যুগ ও কালের প্রভাব কি? চিন্তা করলে দেখা যায়, আয়ুষ্কালের সাল, মাস, সপ্তাহ, দিবারাত্র বরং ঘণ্টা ও মিনিটই মানুষের একমাত্র পুঁজি, যার সাহায্যে সে ইহকাল ও পরকালের বিরাট এবং বিস্ময়কর মুনাফাও অর্জন করতে পারে এবং ভ্রান্ত পথে চললে এটাই তার জন্য বিপজ্জনকও হয়ে যেতে পারে। জনৈক আলিম বলেন :

حَيَاتُكَ اَنْفَاسٌ تُعَدُّ فَكُلَّمَا = مَضٰى نَفَسٌ مِنْهَا انْتَقَصْتَ بِهٖ جُزْءًا

অর্থাৎ তোমার জীবন কতিপয় গুণাগুনতি শ্বাস-প্রশ্বাসের নাম। যখন একটি শ্বাস অতিবাহিত হয়ে যায়, তখন তোমার বয়সের একটি অংশ হ্রাস পায়।

আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মানুষকে তার আয়ুষ্কালের অমূল্য পুঁজি দিয়ে একটি ব্যবসায়ে নিয়োজিত করে দিয়েছেন, যাতে সে বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে এ পুঁজিকে খাঁটি লাভদায়ক কাজে লাগাতে পারে। যদি সে লাভদায়ক কাজে এ পুঁজিকে বিনিয়োগ করে, তবে মুনাফার কোনো অন্ত থাকে না। পক্ষান্তরে যদি সে এই পুঁজি কোনো ক্ষতিকর কাজে ব্যবহার করে, তবে মুনাফা দূরের কথা, পুঁজিই বিনষ্ট হয়ে যায়। অতঃপর কেবল মুনাফা ও পুঁজি বিনষ্ট হয়েই ব্যাপার শেষ হয়ে যায় না বরং তার উপর শত শত অপরাধের শাস্তি আরোপিত হয়। কেউ যদি এ পুঁজিকে লাভজনক অথবা ক্ষতিকর কোনো কাজেই ব্যবহার না করে, তবে এ ক্ষতি তো অবশ্যম্ভাবী যে, তার মুনাফা ও পুঁজি উভয়ই বিনষ্ট হলো। এটা নিছক কবিসুলভ কল্পনাই নয়, বরং এক হাদীসেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :

كُلُّ يَغْدُوْ فَبَائِعٌ نَفْسَهٗ فَمُعْتِقُهَا اَوْ مُوْبِقُهَا অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তি প্রাতঃকালে উঠে তার প্রাণের পুঁজি ব্যবসায়ে নিয়োজিত করে। অতঃপর কেউ এ পুঁজিকে লোকসান থেকে মুক্ত করে নেয় এবং কেউ ধ্বংস করে দেয়।

খোদ কুরআনও ঈমান এবং সৎ কর্মকে মানুষের ব্যবসারূপে ব্যক্ত করেছে। বলা হয়েছে : هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ আয়ুষ্কাল যখন পুঁজি আর মানুষ হলো ব্যবসায়ী, তখন সাধারণ অবস্থায় এই ব্যবসায়ীর ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া সুস্পষ্ট। কেননা এ বেচারীর পুঁজি কোনো অসাড় পুঁজি নয় যে কিছুদিন বেকারও রাখা যাবে; যাতে ভবিষ্যতে আবার কাজে লাগানো যায়। বরং এটা বহমান পুঁজি, যা প্রতিনিয়ত বয়ে চলেছে। এ পুঁজির ব্যবসায়ীকে অত্যন্ত চালাক ও সুচতুর হতে হবে। কারণ বহমান বস্তু থেকে মুনাফা অর্জন করা সহজ কথা নয়। এ কারণেই জনৈক বুযুর্গ বরফ বিক্রেতার দোকানে গিয়ে সূরা আসরের যথার্থ তাফসীর বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি দেখলেন, দোকানদার সামান্য উদাসীন হলেই তার পুঁজি পানি হয়ে বিনষ্ট হয়ে যাবে। এ কারণেই আয়াতে কালের শপথ করে মানুষের মনোযোগ আকৃষ্ট করা হয়েছে যে, সে যেন ক্ষতির কবল থেকে আত্মরক্ষার্থে বস্তু চতুষ্টয় সম্বলিত ব্যবস্থাপত্র ব্যবহারে সামান্যও গাফিল না হয়, বয়সের প্রতিটি মুহূর্তকে যেন সঠিকভাবে কাজে লাগায় এবং চার প্রকার কাজে নিজেকে সদা নিয়োজিত রাখে।

কালের শপথের আরও একটি সম্পর্ক এরূপ হতে পারে যে, যার শপথ করা হয়, সে একদিক দিয়ে সেই বিষয়ের সাক্ষী হয়ে থাকে। কালও এমন বিষয় যে, কেউ যদি এর ইতিহাস এবং এর জাতিসমূহের উত্থান-পতন সম্পর্কিত ঘটনাবলির প্রতি দৃষ্টিপাত করে, তবে সে অবশ্যই এ বিশ্বাসে উপনীত হবে যে, উপরিউক্ত চারটি কাজের মধ্যেই মানুষের সাফল্য সীমিত। যে এগুলোকে বিসর্জন দেয়, সে ক্ষতিগ্রস্ত। জগতের ইতিহাস এর সাক্ষী।

অতঃপর এই চারটি বিষয়ের ব্যাখ্যা লক্ষ্য করুন। ঈমান ও সৎ কর্ম-আত্মসংশোধন সম্পর্কিত এ দু'টি বিষয়ের ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। তবে সত্যের উপদেশ ও সবরের উপদেশ এ দু'টি বিষয়ের উদ্দেশ্য কি, তা অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য। تَوَاصِىْ শব্দটি وَصِيَّتٌ থেকে উদ্ভূত। কাউকে বলিষ্ঠ ভঙ্গিতে উপদেশ দেওয়া ও সৎ কাজের জোর তাকীদ করার নাম অসিয়ত। এ কারণেই মরণোন্মুখ ব্যক্তি পরবর্তীকালের জন্য যেসব নির্দেশ দেয়, তাকেও অসিয়ত বলা হয়।

উপরিউক্ত দু'রকম উপদেশ প্রকৃতপক্ষে এই অসিয়তেরই দু'টি অধ্যায়। প্রথম অধ্যায় সত্যের উপদেশ এবং দ্বিতীয় অধ্যায় সবরের উপদেশ। এখন এ দু'টি শব্দের কয়েক রকম অর্থ হতে পারে–এক. সত্যের অর্থ বিশুদ্ধ বিশ্বাস ও সৎ কর্মের সমষ্টি। আর সবরের অর্থ যাবতীয় গোনাহের কাজ থেকে বেঁচে থাকা। অতএব প্রথম শব্দের সারমর্ম হলো 'আমর বিল মারূফ' তথা সৎ কাজের আদেশ করা এবং দ্বিতীয় শব্দের সারমর্ম হলো 'নাহী আনিল মুনকার' তথা মন্দ কাজে নিষেধ করা। এখন সমষ্টির সারমর্ম এই দাঁড়ায় যে, নিজে যে ঈমান ও সৎ কর্ম অবলম্বন করেছে, অপরকেও তার উপদেশ দেওয়া। দুই. সত্যের অর্থ বিশুদ্ধ বিশ্বাস ও সবরের অর্থ সৎ কাজ করা এবং মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকা। কেননা সবরের আক্ষরিক অর্থ নিজেকে বাধা দেওয়া ও অনুবর্তী করা। এ অনুবর্তী করার মধ্যে সৎ কর্ম সম্পাদন এবং গোনাহ থেকে আত্মরক্ষা করা উভয়ই শামিল।

হাফেজ ইবনে তাইমিয়া (র.) বলেন : দু'টি বিষয় মানুষকে ঈমান ও সৎ কর্ম অবলম্বন করতে স্বভাবত বাধা দেয়-এক. সন্দেহ ও সংশয় অর্থাৎ ঈমান ও সৎ কর্মের ব্যাপারে মানুষের মনে কিছু সন্দেহ সৃষ্টি হয়ে যাওয়া, যদ্দরুন বিশ্বাসই বিঘ্নিত হয়ে যায়। বিশ্বাসে ত্রুটি ঢুকে পড়লে কর্ম ত্রুটিযুক্ত হওয়া স্বাভাবিক। দুই. খেয়ালখুশি, যা মানুষকে কোনো সময় সৎ কাজের প্রতি বিমুখ করে দেয় এবং কোনো সময় মন্দকাজে লিপ্ত করে দেয়; যদিও সে বিশ্বাসগতভাবে সৎ কাজ করা এবং মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকাকে জরুরি মনে করে। অতএব, আলোচ্য আয়াতে সত্যের উপদেশ বলে সন্দেহ দূর করা এবং সবরের উপদেশ বলে খেয়ালখুশি ত্যাগ করে সৎ কাজ অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া বুঝানো হয়েছে। সংক্ষেপে সত্যের উপদেশ দেওয়ার অর্থ মুসলমানদের শিক্ষাগত সংশোধন করা এবং সবরের উপদেশ দেওয়ার অর্থ মুসলমানদের কর্মগত সংশোধন করা।

মুক্তির জন্য নিজের কর্ম সংশোধিত হওয়াই যথেষ্ট নয়, অপরের চিন্তাও জরুরি : এ সূরায় মুসলমানদের প্রতি একটি বড় নির্দেশ এই যে, নিজেদের ধর্মকে কুরআন ও সুন্নাহর অনুসারী করে নেওয়া যতটুকু গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি, ততটুকুই জরুরি অন্য মুসলমানদেরকেও ঈমান ও সৎ কর্মের প্রতি আহ্বান করার সাধ্যমত চেষ্টা করা। নতুবা কেবল নিজেদের

আমল মুক্তির জন্য যথেষ্ট হবে না, বিশেষত আপন পরিবার-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের কুকর্ম থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখা আপন মুক্তির পথ বন্ধ করার নামান্তর, যদিও নিজে পুরোপুরি সৎকর্মপরায়ণ হয়। এ কারণেই কুরআন ও হাদীসে প্রত্যেক মুসলমানের প্রতি সাধ্যমতো সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ ফরজ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে সাধারণ মুসলমান এমনকি অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি পর্যন্ত উদাসীনতায় লিপ্ত রয়েছে। তারা নিজেদের আমলকেই যথেষ্ট মনে করে বসে আছে, সন্তান-সন্ততি কি করছে, সে দিকে ভ্রূক্ষেপও নেই। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে এই আয়াতের নির্দেশ অনুযায়ী আমল করার তাওফীক দান করুন। –[আমীন]

শব্দ বিশ্লেষণ :

عَصْرِ : অর্থ– সময়, যুগ। ইমাম রাগের (র.) লিখেন, عَصْرٌ ও عَصْر -এর অর্থ, জমানা। এর বহুবচন عُصُوْرٌ আসে।

اِنْسَانَ : অর্থ– মানুষ اِنْسَانٌ শব্দটি مذكر ও مؤنث উভয়ের জন্যই ব্যবহৃত হয়।

خُسْرِ : এটি মাসদার অর্থ– ক্ষতি, ধ্বংস, সর্বনাশ। خُسْرَانٌ ও خَسَارَةٌ ও এর মাসদার। এ তিন মাসদারের অর্থই ক্ষতি হওয়া অর্থাৎ মূলধন বা পুঁজি কমে যাওয়া এবং লোকসান হওয়া।

اٰمَنُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْمَانُ মূলবর্ণ (أ - م - ن) জিনস مهموز فاء অর্থ– তারা ঈমান এনেছে।

عَمِلُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْعَمَلُ মূলবর্ণ (ع - م - ل) জিনস صحيح অর্থ– তারা নেক কাজ করেছে।

تَوَاصَوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفَاعُلٌ মাসদার تَوَاصِىٌ মূলবর্ণ (و - ص - ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– তারা পরস্পর একে অন্যকে উপদেশ দেয়।

صَبْرِ : মাসদার। অর্থ– ধৈর্য, সহ্য, বিপদে স্থির থাকা। ইমাম রাগেব (র.) বর্ণনা করেন, صَبْر -এর অর্থ ধৈর্য, সহ্য, বিপদে স্থির থাকা, নিজের মনকে এমন জিনিসের থেকে রক্ষা করা যাতে বুদ্ধি ও শরিয়তের দাবি রয়েছে অথবা বিবেক ও শরিয়ত যেসব কথা ও কাজ থেকে বিরত রাখার দাবি করে, তার থেকে বিরত থাকাকে صَبْر বা ধৈর্য বলা হয়।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَالْعَصْرِ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ : এখানে واو টি হরফে কসম ও জার। আর اَلْعَصْرِ হলো مجرور; জার ও মাজরূর মিলে উহ্য ফে'লের সাথে متعلق আর اِنَّ الْاِنْسَانَ বাক্যটি جواب قسم -এর কোনো محل নেই। আর اِنَّ হলো حرف مشبه بالفعل আর الْاِنْسَانَ হলো اسم ان এবং لَفِىْ -এর লাম টি হলো المزحلقه এবং فِىْ আর خُسْرٍ হলো خبر اِنَّ –[ই'রাবুল কুরআন ৮ম খণ্ড; পৃ. ৪০২-৪০৩]

سُوْرَةُ الْهُمَزَةِ مَكِّيَّةٌ

সূরা হুমাযা

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত– ৯, রুকূ‘– ১

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

অনুবাদ	আয়াত
১. নিরতিশয় অনিষ্ট রয়েছে প্রত্যেক এমন ব্যক্তির জন্য, যে [কারো] অগোচরে নিন্দা করে এবং সাক্ষাতে ধিক্কার দেয়।	وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِ ۙ﴿١﴾
২. যে [লোভের আতিশয্যে] মাল জমা করে এবং তা বারবার গণনা করে।	الَّذِىْ جَمَعَ مَالًا وَّعَدَّدَهٗ ۙ﴿٢﴾
৩. সে মনে করে যে,তার ধন সম্পদ তার নিকট চিরকাল থাকবে।	يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهٗٓ اَخْلَدَهٗ ﴿٣﴾
৪. কখনো না, আল্লাহর কসম, সে এমন অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হবে যে, তাতে যা পতিত হয় তা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলে।	كَلَّا لَيُنْۢبَذَنَّ فِى الْحُطَمَةِ ﴿٤﴾
৫. আর আপনার কি জানা আছে, সেই চূর্ণ-বিচূর্ণকারী অগ্নি কিরূপ?	وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْحُطَمَةُ ﴿٥﴾
৬. এটা আল্লাহর অগ্নি, যা প্রজ্বলিত করা হয়েছে।	نَارُ اللهِ الْمُوْقَدَةُ ۙ﴿٦﴾
৭. যা [শরীরে লাগামাত্র] হৃৎপিণ্ড পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছবে।	الَّتِىْ تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْـِٕدَةِ ﴿٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. وَيْلٌ নিরতিশয় অনিষ্ট রয়েছে لِكُلِّ هُمَزَةٍ প্রত্যেক এমন ব্যক্তির জন্য যে (কারো) আগোচরে নিন্দা করে لُمَزَةِ এর সাক্ষাতে ধিক্কার দেয়।

২. الَّذِىْ جَمَعَ مَالًا যে মাল জমা করে وَعَدَّدَهٗ এবং তা বারবার গণনা করে।

৩. يَحْسَبُ সে মনে করে যে اَنَّ مَالَهٗٓ তার ধনসম্পদ اَخْلَدَهٗ তার নিকট চিরকাল থাকবে।

৪. كَلَّا কখনো না لَيُنْبَذَنَّ আল্লাহর কসম, সে এমন অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হবে যে فِى الْحُطَمَةِ তাতে যা পতিত হয় তা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলে।

৫. وَمَآ اَدْرٰىكَ আর আপনার কি জানা আছে مَا الْحُطَمَةُ সেই চূর্ণ-বিচূর্ণকারী আগ্নি কিরূপ?

৬. نَارُ اللهِ এটা আল্লাহর অগ্নি الْمُوْقَدَةُ যা প্রজ্বলিত করা হয়েছে।

৭. الَّتِىْ تَطَّلِعُ যা গিয়ে পৌঁছবে عَلَى الْاَفْئِدَةِ হৃৎপিণ্ড পর্যন্ত।

৮. তা তাদের উপর আবদ্ধ করে দেওয়া হবে।	
৯. সুদীর্ঘ স্তম্ভসমূহের মধ্যে [বেষ্টিত হবে]।	

শাব্দিক অনুবাদ :

৮. إِنَّهَا عَلَيْهِمْ তা তাদের উপর مُّؤْصَدَةٌ আবদ্ধ করে দেওয়া হবে।

৯. فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ সুদীর্ঘ স্তম্ভসমূহের মধ্যে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : সূরাটির প্রথম আয়াতের "هُمَزَةٍ" শব্দটিকেই এর নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। هُمَزَةٌ অর্থ– নিন্দুক। অত্র সূরায় নিন্দুকের ভয়াবহ পরিণতির উল্লেখে করা হয়েছে বিধায় নামকরণ স্বার্থক হয়েছে। এতে ৯টি আয়াত ও ১৬১টি অক্ষর রয়েছে।

সূরাটি অবতীর্ণ হওয়ার সময়কাল : মুফাসসিরগণ এ ব্যাপারে একমত যে, আলোচ্য সূরাটি মাক্কী। বিষয়বস্তু হতেও বুঝা যায় যে, সূরাটি মাক্কী জীবনের প্রথম দিকে নাজিল হয়েছে।

সূরাটির বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য : ইসলাম-পূর্ব যুগে জাহেলিয়াতের আরব সমাজের অর্থ পূজারী ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যে কতগুলো মারাত্মক ধরনের নৈতিক ত্রুটি ও দোষ বিদ্যমান ছিল। এ সূরায় তার-ই বীভৎসতা ব্যক্ত করে এর প্রতিবাদ করা হয়েছে। কেননা এর কারণে মানুষ মৃত্যু মুহূর্ত পর্যন্ত দুনিয়ার স্বার্থ, স্বাদ-আস্বাদ, আরাম-আয়েশ ও মান-মর্যাদা অত্যধিক অর্জন করার এবং প্রতিযোগিতায় অন্যদের তুলনায় বেশি দূর অগ্রসর হয়ে যাওয়ার চিন্তায় ও চেষ্টায় দিন-রাত তন্ময় হয়ে থাকে। সুতরাং তাদেরকে হুঁশিয়ার করে দেওয়া হয়েছে যে, এখানে তোমাদেরকে যে যে নিয়ামত দেওয়া হয়েছে তার প্রত্যেকটি সম্পর্কে তোমাদেরকে আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে। সম্পদ অসৎ পথে উপার্জন এবং তার যথেচ্ছা ব্যয়ের পরিণতি হবে অত্যন্ত ভয়াবহ, জাহান্নামই হবে এ সব লোকদের চির আবাস। তাদের ধন-সম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তি, সেদিন জাহান্নামের আগুন হতে তাদেরকে রক্ষা করতে পারবে না। দাহনকারী আগুন তাদেরকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ভস্ম করে ফেলবে। কাজেই যারা ধন-সম্পদের অহমিকায় পড়ে পরনিন্দায় ও মানুষকে কটাক্ষ করার পিছনে পড়ে রয়েছে, তাদের এখন হতেই সাবধান হওয়া উচিত। এ সব অহঙ্কারী নিন্দুক ধনীদের আবাসস্থল হবে হুতামাহ নামক দোজখ।

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ

শানে নুযূল : উমাইয়া ইবনে খালফ যখন হুজুর ﷺ-কে দেখত তখন তাকে ভর্ৎসনা ও তিরস্কার করত। এ পরিপ্রেক্ষিতে এই সূরাটি অবতীর্ণ হয়েছে। –[লুবাব উর্দু, কানযুন নুকূল : ১১]

এ সূরায় তিনটি জঘন্য গুনাহের শাস্তি ও তার তীব্রতা বর্ণিত হয়েছে। গুনাহ্ তিনটি হচ্ছে هَمْزٌ – لَمْزٌ ও جَمْعُ مَالٍ প্রথমোক্ত শব্দদ্বয় কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। অধিকাংশ তাফসীরকারকের মতে هَمْزٌ-এর অর্থ গীবত অর্থাৎ পশ্চাতে পরনিন্দা করা এবং لَمْزٌ-এর অর্থ সামনাসামনি দোষারোপ করা ও মন্দ বলা। এ দু'টি কাজই জঘন্য গুনাহ। পশ্চাতে পরনিন্দার শাস্তির কথা কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এর কারণ এরূপ হতে পারে যে, এ গুনাহে মশগুল হওয়ার পথে সামনে কোনো বাধা থাকে না। যে এতে মশগুল হয়, সে কেবল এগিয়েই চলে। ফলে গুনাহ বৃহৎ থেকে বৃহত্তর ও অধিকতর হতে থাকে। সম্মুখের নিন্দা এরূপ নয়। এতে প্রতিপক্ষও বাধা দিতে প্রস্তুত থাকে। ফলে গুনাহ দীর্ঘ হয় না। এছাড়া কারো পশ্চাতে নিন্দা করা এ কারণেও বড় অন্যায় যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি জানতেও পারে না যে, তার বিরুদ্ধে কি অভিযোগ উত্থাপন করা হচ্ছে। ফলে সে সাফাই পেশ করার সুযোগ পায় না।

একদিক দিয়ে لَمْزٌ তথা সম্মুখের নিন্দা গুরুতর। যার মুখোমুখি নিন্দা করা হয় তাকে অপমানিত ও লাঞ্ছিতও করা হয়। এর কষ্টও বেশি, ফলে শাস্তিও গুরুতর। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :

شِرَارُ عِبَادِ اللّٰهِ تَعَالَى الْمَشَّاءُوْنَ بِالنَّمِيْمَةِ الْمُفَرِّقُوْنَ بَيْنَ الْاَحِبَّةِ الْبَاغُوْنَ لِلْبُرَاءِ الْعَنَتَ

অর্থাৎ আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে নিকৃষ্টতম তারা, যারা পরোক্ষে নিন্দা করে, বন্ধুদের মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে এবং নিরপরাধ লোকদের দোষ খুঁজে ফিরে।

যেসব বদভ্যাসের কারণে আয়াতে শাস্তির কথা উচ্চারণ করা হয়েছে, তন্মধ্যে তৃতীয়টি হচ্ছে অর্থলিপ্সা। আয়াতে একে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে– অর্থলিপ্সার কারণে সে তা বার বার গণনা করে। অন্যান্য আয়াত ও হাদীস সাক্ষ্য দেয় যে, অর্থ সঞ্চয় করা সর্বাবস্থায় হারাম ও গুনাহ নয়। তাই এখানেও উদ্দেশ্য সেই সঞ্চয় হবে, যাতে জরুরি হক আদায় করা না হয় কিংবা গর্ব ও অহমিকা লক্ষ্য হয় কিংবা লালসার কারণে দীনের জরুরি কাজ বিঘ্নিত হয়।

تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ –অর্থাৎ জাহান্নামের এই অগ্নি হৃদয়কে পর্যন্ত গ্রাস করবে। প্রত্যেক অগ্নির এটাও বৈশিষ্ট্য। যা কিছু তাতে পতিত হয়, তার সকল অংশ জ্বলে পুড়ে ভস্ম হয়ে যায়। মানুষ তাতে নিক্ষিপ্ত হলে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসহ হৃদয়ও জ্বলে যাবে। এখানে জাহান্নামের অগ্নির এই বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করার কারণ এই যে, দুনিয়ার অগ্নি মানুষের দেহে লাগলে হৃদয় পর্যন্ত পৌছার আগেই মানুষের মৃত্যু হয়ে যায়। জাহান্নামে মৃত্যু নেই। কাজেই জীবিত অবস্থাতেই হৃদয় পর্যন্ত অগ্নি পৌছবে এবং হৃদয় দাহনের তীব্র যন্ত্রণা জীবদ্দশাতেই মানুষ অনুভব করবে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

وَيْلٌ : ইসম মারফু মাসদার। ধ্বংস, শাস্তি, জাহান্নামের একটি উপত্যকা, কঠিন, শাস্তি। وَيْل -এর বিভিন্ন অর্থ রয়েছে। যেমন আফসোস করা, খারাপের মধ্যে প্রবেশ করা, বিপদগ্রস্ত হওয়া। মাসদারী অর্থ হলো, আফসো, কঠিন। ধমকের ও ভয়ের শব্দ, শাস্তির শব্দ, জাহান্নামের একটি কূপের নাম। তিরস্কার ও ভর্ৎসনার শব্দ।

هُمَزَةٍ : মুবালাগার সীগাহ। বড় নিন্দুক, গীবতকারী, ছিদ্রান্বেষী।

لُمَزَةٍ : সিফাতের সীগাহ মুবালাগার অর্থে। নিন্দুক, পিছনে নিন্দাকারী।

عَدَّدَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার تَعْدِيْد মূলবর্ণ (ع - د - د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– তিনি গণনা করে রাখেন।

أَخْلَدَه : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব إِفْعَال মাসদার اَلْإِخْلَادُ মূলবর্ণ (خ - ل - د) জিনস صحيح অর্থ– চিরকাল থাকবে, সর্বদা থাকবে।

لَيُنْبَذَنَّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مستقبل مجهول درفعل لام تاكيد بانون تاكيد ثقيلة বাব ضَرَبَ মাসদার اَلنَّبْذُ মূলবর্ণ (ن - ب - ذ) জিনস صحيح অর্থ– সে অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হবে।

حُطَمَةِ : حَطْمٌ থেকে নির্গত। অর্থ– পিষ্টকারী। দোজখের একটাস্তরের নাম।

اَلْمُوْقَدَةُ : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم مفعول বাব إِفْعَالٌ মাসদার اَلْإِيْقَادُ মূলবর্ণ (و - ق - د) জিনস مثال واوى অর্থ– যা প্রজ্বলিত করা হয়েছে।

تَطَّلِعُ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার الاطلاع মূলবর্ণ (ط - ل - ع) জিনস صحيح অর্থ– সে পৌছবে।

اَفْئِدَةٌ : বহুবচন, একবচন فواد অর্থ– হৃৎপিণ্ড, দিল, অন্তর।

مُؤْصَدَةٌ : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم مفعول বাব إِفْعَالٌ মাসদার اَلْإِيْصَادُ মূলবর্ণ (ء - ص - د) জিনস مهموز فاء অর্থ– আবদ্ধ করে দেওয়া হবে।

عَمَدٍ : বহুবচন। একবচন, عماد অর্থ– দীর্ঘ স্তম্ভ। বড় স্তম্ভ। আল্লামা কাইয়ূমী লিখেন, عِمَادٌ হলো ঐ জিনিস, যার উপর নির্ভর করা হয়। ভরসা করা হয়। কিন্তু কামূসের মধ্যে عَمَادٌ -এর অর্থ উচ্চ ইমারত লিখা হয়েছে।

مُمَدَّدَةٍ : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم مفعول বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّمْدِيْدُ মূলবর্ণ (م - د - د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– সুদীর্ঘ, লম্বা, প্রসারিত।

বাক্য বিশ্লেষণ :

إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ - فِىْ عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ : এখানে اِنَّ টি হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল, هَا টি তার ইসম। عَلَيْهِمْ শব্দটি مُؤْصَدَةٌ এর সাথে متعلق এবং فِىْ عَمَدٍ টি مُؤْصَدَةٌ -এর সিফত। আর এটাই আবুল বাকাইয়ের মাযহাব। –[ই'রাবুল কুরআন, খ : ৮, পৃ. ৪১০]

سُورَةُ الْفِيلِ مَكِّيَّةٌ

সূরা ফীল

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত– ৫, রুকূ'– ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. আপনার কি জানা নেই যে, আপনার প্রভু হাতীওয়ালাদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন।

২. [কা'বা বিনষ্ট করার ব্যাপারে] তাদের চেষ্টা-তদবীরকে কি সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ করে দেননি?

৩. এবং তিনি তাদের উপর ঝাঁকে ঝাঁকে পক্ষীকুল প্রেরণ করলেন।

৪. যারা তাদের উপর কঙ্কর জাতীয় প্রস্তরসমূহ নিক্ষেপ করছিল।

৫. অনন্তর আল্লাহ তাদেরকে ভক্ষিত ভূষির ন্যায় [বিনষ্ট] করে দিলেন।

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحٰبِ الْفِيلِ ﴿١﴾
أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ﴿٢﴾
وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ﴿٣﴾
تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ ﴿٤﴾
فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ ﴿٥﴾
ع

শাব্দিক অনুবাদ :

১. أَلَمْ تَرَ আপনার কি জানা নেই যে كَيْفَ فَعَلَ কিরূপ ব্যবহর করেছেন رَبُّكَ আপনার প্রভু بِأَصْحٰبِ الْفِيلِ হাতীওয়ালাদের সাথে।

২. أَلَمْ يَجْعَلْ তিনি করে দেননি كَيْدَهُمْ তাদের চেষ্টাতদবীরকে فِي تَضْلِيلٍ সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ।

৩. وَأَرْسَلَ এবং তিনি প্রেরণ করলেন عَلَيْهِمْ তাদের উপর طَيْرًا أَبَابِيلَ ঝাঁকে ঝাঁকে পক্ষীকুল।

৪. تَرْمِيهِمْ যারা তাদের উপর নিক্ষেপ করছিল بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ কঙ্কর জাতীয় প্রস্তরসমূহ।

৫. فَجَعَلَهُمْ অনন্তর আল্লাহ তাদেরকে করে দিলেন كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ ভক্ষিত ভূষির ন্যায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে তাঁর প্রথম আয়াতের اَلْفِيْلُ শব্দ অবলম্বনে। اَصْحَابُ الْفِيْلِ অর্থ- হস্তির অধিপতি। এটা দ্বারা একটি হস্তিসজ্জিত সেনাবাহিনীর কথা বুঝানো হয়েছে এবং তার পরাজয় কিভাবে হয়েছিল গোটা সূরায় তা-ই স্থান পেয়েছে। এ কারণেই সূরাটির নাম যথাযথ হয়েছে। এতে ৫টি আয়াত, ২৩টি বাক্য এবং ৭৬টি অক্ষর রয়েছে।

অবতীর্ণের সময়কাল : তাফসীরকারকদের সর্বসম্মত মতে, এ সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ। সূরার ঐতিহাসিক পটভূমির প্রতি লক্ষ্য করলেই অনুমিত হয় যে, এটা মাক্কী জীবনে অবতীর্ণ প্রাথমিক সূরাসমূহের অন্যতম।

ঐতিহাসিক ঘটনা প্রবাহ : ঐতিহাসিক তথ্য দ্বারা প্রমাণিত যে, ইয়েমেনের ইহুদি শাসক যুনাওয়াস তথাকার খ্রিস্টানদের প্রতি চরম অত্যাচার ও নির্যাতন চালিয়ে তাদেরকে জ্বালিয়ে-ধ্বংসপ্রায় করে ফেলে। এতে পার্শ্ববর্তী আবিসিনিয়ার খ্রিস্টান শাসকগণ খুব ক্ষুব্ধ হয়। এরই প্রতিশোধে ৫২৫ খ্রিস্টাব্দে ইয়েমেনের উপর অভিযান চালিয়ে আবিসিনিয়ার শাসকগণ

ইয়েমেনের হিময়ারী সরকারের পতন ঘটায় এবং দেশটি দখল করে নেয়। এ অভিযানের প্রধান নায়ক ছিল এরিয়াত এবং তার সহকারী ছিল আবরাহা। পরবর্তীকালে তাদের মধ্যে মতবিরোধের কারণে যুদ্ধ বেঁধে যায়। আবরাহা এরিয়াতকে হত্যা করে ইয়েমেনের শাসনভার নিজ হাতে গ্রহণ করে। আবিসিনিয়া শাসকদের ইয়েমেন দখল করার পিছনে ধর্মীয় আবেগ-অনুভূতি কার্যকর থাকলেও রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থের কথাও তারা দৃষ্টির আড়ালে রাখেনি। এটাই ছিল তাদের মূল লক্ষ্য। ধর্মীয় প্রতিশোধ গ্রহণ ছিল একটি বাহানা মাত্র। আর সে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ হলো আরবের সাথে পূর্ব আফ্রিকা, ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার সাথে বাণিজ্যিক জলপথ ও স্থলপথের উপর নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। কেননা শত শত বছর ধরে আরবগণ এ পথে যাতায়াত করে প্রভূত মুনাফা লাভ করে আসছিল। বাস্তবেও তা-ই হয়েছিল। ইয়েমেন দখল করার পূর্বে লোহিত সাগরের বাণিজ্যিক পথটি তারা রোমানদের সহায়তায় দখল করে নিয়েছিল।

এখন লক্ষ্য হলো, শাতিল আরব হতে মিসর ও সিরিয়া গমনের স্থলপথ। পথটি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনাই ছিল ইয়েমেনের আবরাহা সরকারের মূল উদ্দেশ্য- কিন্তু এ উদ্দেশ্যকে গোপন রেখে আবরাহা নতুন এক ফন্দি করল। সে আরবদের আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মান-মর্যাদা বিলীন করার উদ্দেশ্যে এবং তাদের ধর্মীয় প্রভাব-প্রতিপত্তি বিনষ্ট করার লক্ষ্যে খ্রিস্টানদের জন্য ইয়েমেনের সানয়ায় একটি আন্তর্জাতিক মানের গীর্জা নির্মাণ করল এবং সেখানে হজের মৌসুমে দুনিয়ার সমস্ত লোককে জমায়েত হওয়ার আহ্বান জানাল। কিন্তু ইয়েমেনের খ্রিস্টান লোক ব্যতীত হজের মৌসুমে অন্য কোনো এলাকার লোকের সমাগম না দেখতে পেয়ে সে ভাবল, মক্কার ঘরই হচ্ছে এর অন্তরায়। মক্কার কা'বা ঘরকে ধ্বংস করা ব্যতীত সানয়ায় এ আন্তর্জাতিক মেলা অনুষ্ঠিত হতে পারে না। তাই সে সদর্পে ঘোষণা করল, আমি মক্কার হজ অনুষ্ঠান আগামী বৎসর হতে এ সানয়ায়ই করতে চাই। সুতরাং এ জন্য, আমার প্রথম কর্তব্য হবে-মক্কার কা'বা ঘরকে ধূলিসাৎ করে ফেলা। এ ঘোষণা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল এবং সেও প্রস্তুতি নিতে শুরু করে দিল। এ উদ্দেশ্যে সে ষাট হাজার দুর্ধর্ষ সেনার একটি বিরাট বাহিনী সাজাল। ঐ বাহিনীতে ১৩টি যুদ্ধ-হস্তিও ছিল। অতঃপর সে ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে মক্কা অভিমুখে যাত্রা করল।

আবরাহার বাহিনী কা'বা ধ্বংসের লক্ষ্যে দ্রুত এগিয়ে চলল। পথে দু'টি গোত্র তাদেরকে বাধা দিয়েছিল বটে, কিন্তু তারা এ বিশাল বাহিনীর শক্তির সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকতে না পেরে পরাজয় বরণ করল। আবরাহা বাহিনী তায়েফে উপনীত হলে তথাকার লোকেরা নিজেদের 'লাত মন্দির' ভেঙ্গে ফেলার আশঙ্কা করল। কিন্তু তারা এত বড় বিরাট শক্তির মোকাবিলায় দণ্ডায়মান থাকতে পারবে না, এ ধারণায় তাদের একটি প্রতিনিধিদল আবরাহার নিকট গিয়ে বলল– আপনার মূল লক্ষ্য হলো কা'বা-গৃহ। আপনি আমাদের লাত-মন্দির ধ্বংস করবেন না, আমরা আপনার মক্কায় পৌঁছার পথ প্রদর্শনের ভূমিকা পালন করব, আবরাহা এতে সম্মত হলো। আবূ রুগাল নামে এক ব্যক্তিকে তার পথ প্রদর্শক নিযুক্ত করল; কিন্তু আল-মুগাম্মাস নামক স্থানে পৌঁছলে- আবূ রুগাল মারা গেল।

সেখান হতে আবরাহা একটি অগ্রবর্তী দল পাঠাল। তারা তেহামা হতে কুরাইশদের অনেক পালিত পশু লুণ্ঠন করে নিয়ে আসল। তারা মহানবী ﷺ-এর দাদা আব্দুল মুত্তালিবেরও দুইশত উষ্ট্র লুট করে নিয়ে আসে।

আবরাহা বাহিনী আস-সিফাহ (আরাফাহ পর্বতমালার নিকটবর্তী স্থান) নামক স্থানে পৌঁছে কুরাইশদের নিকট দূত পাঠায়। দূত বলল, আমরা তোমাদের উপর আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে আসিনি, কা'বা ঘর ধ্বংস করাই আমাদের উদ্দেশ্য। তোমরা যুদ্ধের জন্য এগিয়ে না আসলে আমরা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করবো না। জবাবে কুরাইশ সরদার আব্দুল মুত্তালিব বললেন– তোমাদের সাথেও আমাদের যুদ্ধ করার কোনো ইচ্ছা নেই। কা'বা ঘরের যে মালিক, তিনি তাঁর ঘর রক্ষা করবেন। দূত বলল, তবে আপনি আমার সাথে আমাদের সেনাপতি আবরাহার নিকট চলুন। আব্দুল মুত্তালিব তার কথায় আবরাহার নিকট গেলেন। আব্দুল মুত্তালিব ছিলেন খুব সুশ্রী বলিষ্ঠ ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোক। আবরাহা তাকে দেখে খুবই প্রভাবিত হলো। সে নিজের আসন হতে উঠে এসে তার পাশে বসল। জিজ্ঞাসা করল, আপনি কি উদ্দেশ্যে এসেছেন? তিনি বললেন, আমার যেসব উট লুট করে আনা হয়েছে তা ফেরত দিন। আবরাহা বলল, আপনাকে দেখে আমি খুবই মুগ্ধ হয়েছিলাম। কিন্তু আপনার এ কথায় আমার দৃষ্টিতে আপনার কোনো মর্যাদা থাকল না। কেননা পিতৃ ধর্মের কেন্দ্রস্থল কা'বা ঘর রক্ষার জন্য আপনি কোনো কথাই বললেন না। তিনি বললেন, আমি তো কেবল আমার উটগুলোর মালিক, আর সেগুলো সম্পর্কেই আপনার নিকট আবেদন করতে এসেছি। এ ঘরের ব্যাপার আলাদা। এর একজন রব আছেন, তিনি নিজেই এর হেফাজত করবেন। আবরাহা বলল, সে আমার আঘাত হতে তা রক্ষা করতে পারবে না। আব্দুল মুত্তালিব বললেন, ঐ ব্যাপারের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। তা আপনি জানেন, আর তিনি [এ ঘরের মালিক] জানেন। এ কথা বলে তিনি আবরাহার নিকট হতে ফিরে আসলেন। পরে সে তাঁর উটগুলো ফিরিয়ে দিল। অবশ্য কোনো কোনো বর্ণনা হতে জানা যায়, আব্দুল মুত্তালিব আবরাহাকে বলেছেন, আপনি যা কিছু চান আমাদের নিকট হতে নিয়ে প্রত্যাবর্তন করুন। কিন্তু আবরাহা তাতে রাজি হলো না।

আব্দুল মুত্তালিব আবরাহার সেনানিবাস হতে ফিরে এসে কুরাইশদেরকে সাধারণ হত্যাকাণ্ড হতে বাঁচার জন্য বংশ-পরিবার নিয়ে পর্বতে আশ্রয় গ্রহণ করতে বললেন। পরে তিনি কুরাইশদের কতিপয় সর্দারকে সঙ্গে নিয়ে হারাম শরীফে উপস্থিত হন এবং কা'বার দরজার কড়া ধরে আল্লাহর নিকট দোয়া করেন, তিনি যেন তাঁর ঘর ও তাঁর সেবকদের হেফাজত করেন। সেদিন কোনো দেব-দেবির নিকট নয়; বরং একমাত্র আল্লাহর নিকটই তারা দোয়া করেছিলেন। ইবনে হিশাম তাঁর 'সীরাত' গ্রন্থে আব্দুল মুত্তালিবের নিম্নোদ্ধৃত কবিতা উল্লেখ করেছেন।

لَاهُمَّ اِنَّ الْعَبْدَ يَمْنَعُ * رِحْلَهُ فَامْنَعْ رِحَالَكَ
لَا يَغْلِبَنَّ صَلِيْبُهُمْ * وَمِحَالُهُمْ غَدًا وَمِحَالَكَ
اِنْ كُنْتَ تَارِكَهُمْ * وَقِبْلَتَنَا فَاَمْرٌ مَا بَدَا لَكَ

হে আল্লাহ! বান্দা নিজের ঘরের সংরক্ষণ করে,
আপনিও রক্ষা করুন আপনার নিজের ঘর।
কাল যেন তাদের ক্রুশ এবং চেষ্টা-যত্ন আপনার ব্যবস্থাপনার মোকাবিলায় জয়ী হতে না পারে।
আপনি যদি তাদেরকে এবং আমাদের কেবলা ঘরকে এমনিই ছেড়ে দিতে চান, তাহলে আপনার যা ইচ্ছা তা-ই করুন।
সুহাইলী 'রওজুল উনুফ' নামক গ্রন্থে এ পর্যায়ে নিম্নোক্ত কবিতাংশও উদ্ধৃত করেছেন–

وَانْصُرْنَا عَلٰى اٰلِ الصَّلِيْبِ * وَعَابِدِيْهِ الْيَوْمَ لَكَ

ক্রুশধারী ও তার পূজারীদের মোকাবিলায় আমি আপনাকে ছাড়া আর কারো নিকট কোনো আশা রখি না।
ইবনে জারীর আব্দুল মুত্তালিবের দোয়া প্রসঙ্গে পড়া নিম্নোক্ত ছত্র দু'টিরও উল্লেখ করেছেন।

يَا رَبِّ لَا اَرْجُوْ لَهُمْ سِوَاكَا * يَا رَبِّ فَامْنَعْ مِنْهُمْ حِمَاكَا
اِنَّ عَدُوَّ الْبَيْتِ مَنْ عَادَاكَا * اِمْنَعْهُمْ اَنْ يَخْرِبُوْا قِرَاكَا

"হে আমার প্রভু! তাদের মোকাবিলায় আমি তোমাকে ব্যতীত আর কারো নিকট কোনো কিছু আশা করি না। হে প্রভু! তুমি তোমার ঘরকে রক্ষা কর। এ ঘরের শত্রুগণ, তোমার শত্রু। তোমার জনবসতি তাদের আক্রমণ হতে মুক্ত রাখ।"

আব্দুল মুত্তালিব এ প্রার্থনা করার পর স্বীয় সম্প্রদায়ের সাথে পর্বতমালায় গিয়ে আশ্রয় নিলেন। পরদিন আবরাহার বাহিনী মুহাসসির (মিনা ও মুযদালিফার মধ্যবর্তী মুহাস্সার উপত্যকার নিকটবর্তী স্থান) নামক স্থান হতে কা'বা ঘর ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে বাহিনীর অগ্রে আবরাহার হস্তিটিকে পরিচালনা করল। কিঞ্চিৎ দূরে যাওয়ার পরই হস্তিটি বসে পড়ল, কোনো ক্রমেই অগ্রসর হতে চাইল না। মারপিট দেওয়া হলো, তবুও হাতিটি নড়ল না। মুখ ফিরিয়ে অন্যদিকে পরিচালনার চেষ্টা করা হলে সে দিকে চলল; কিন্তু যখনই কা'বা অভিমুখী হয়, তখনই হাতিটি বসে পড়ে। তারপর শুরু হলো আবরাহা বাহিনীর উপর আল্লাহর গজব নাজিলের পালা। লোহিত সাগরের দিক হতে ঝাঁকে ঝাঁকে অপরিচিত নতুন পক্ষীকুল এসে তাদের উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কঙ্কর বর্ষণ করতে লাগল। কঙ্করগুলো আকারে ক্ষুদ্র হলেও তার তেজস্ক্রিয়া ছিল খুব বেশি। যার দেহে পড়ত, তার দেহেই জালা-পোড়া সৃষ্টি হতো। সঙ্গে সঙ্গে বসন্ত গোটা দেখা দিত। যেখানে পড়ত সেখানে সরাসরি বিপরীত দিক দিয়ে বের হয়ে যেত। দৈহিক জ্বালা-পোড়া, বসন্ত গোটা উদগমন ও কঙ্কর বর্ষণে অতিষ্ঠ হয়ে বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাতে শুরু করল এবং সে স্থানেই অনেকে মৃত্যুবরণ করল। আর পথে পথেও অনেকে পড়ে রইল। আবরাহাও কঙ্কর আঘাতে জখম হয়ে কোনো মতে খাসয়াম অঞ্চলে গিয়ে পৌঁছে ছিল। অতঃপর সেখানেই তার মৃত্যু হয়। এটাই আসহাবুল ফীলের ধ্বংসের সংক্ষিপ্ত কাহিনী।

এ ঘটনা সমগ্র আরবদেশে ছড়িয়ে পড়ল। আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার বুকে স্বীয় অসীম কুদরতের যৎকিঞ্চিৎ নজির স্থাপন করলেন। মক্কার লোকগণ এ ঘটনায় আল্লাহর অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করল। আরবগণ এ ঘটনার পর হতে দশ বছর পর্যন্ত প্রতিমা পূজা ছেড়ে নিরঙ্কুশভাবে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করত। এ বছরটি আরবদের নিকট 'হস্তি বছর' নামে সুপরিচিত হয়ে গেল। আবরাহার হস্তিবাহিনীর ধ্বংস করার ঘটনাটি যে মাসে সংঘটিত হয়, তা ছিল মহররম মাস। মহানবী ﷺ-এর জন্মের দুই মাস পূর্বে। দুই মাস পরই ১২ই রবিউল আউয়াল কাবার প্রহরী ও বিশ্বমানবের মুক্তিদূত হযরত মুহাম্মদ মুজতবা আহমদ মুস্তফা ﷺ এ ধরার বুকে তাশরীফ আনেন।

হস্তিবাহিনীর ঘটনাটিকে নিয়ে সেকালের বহু বিখ্যাত কবিও অনেক কবিতা-চরণ লিখে ঘটনাটিকে অমর করে রেখেছেন। পক্ষীকুলের নিক্ষিপ্ত কঙ্করগুলোও নিজেদের নিকট স্মৃতি স্বরূপ রেখে ছিল। তাদের বিপুল রণসম্ভার ও খাদ্য সামগ্রী কুরাইশদের হস্তগত হলো। এ সূরা নাজিল হওয়া পর্যন্ত এ ঘটনার অনেক দর্শকই তখনো বর্তমান ছিল। মাত্র চল্লিশ

পঁয়তাল্লিশ বছরের ব্যবধান। ঘটনাটি আরবের লোকদের মুখেমুখেই লেগে ছিল। এ কারণেই এ সূরায় বিস্তারিত ঘটনা আলোচিত না হয়ে যেটুকু মক্কাবাসীদের সম্মুখে আলোচনার প্রয়োজন ছিল, তা-ই আলোচিত হয়েছে। অর্থাৎ তাদের শাস্তিদানের বিবরণটি। এ সূরা অবতীর্ণ করে আল্লাহ তা'আলা কুরাইশসহ সমগ্র দুনিয়ার মানুষকে ইসলামি দাওয়াত ও প্রতিষ্ঠা আন্দোলনের বিরোধিতা হতে বিরত থাকারই প্রকারান্তরে আহ্বান জানিয়েছেন। –[খাযেন, কাছীর, মু'আলিম, হোসাইনী]

সূরাটির সারকথা : সূরা আল-ফীলে সংক্ষিপ্তভাবে আবরাহার আক্রমণ এবং ধ্বংস আলোচিত হয়েছে। কেননা, মক্কার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলের নিকটই এ ঘটনা জানা ছিল। আরবের কোনো ব্যক্তিই এ সম্পর্কে অনবহিত ছিল না। সমগ্র আরববাসীদের ঐকান্তিক বিশ্বাস. ছিল যে, আবরাহার আক্রমণ হতে কা'বা ঘরের হেফাজতের কার্যটি কোনো দেব-দেবী কর্তৃক হয়নি। এটা নিরঙ্কুশভাবে আল্লাহরই অবদান। এ কারণেই একাধারে কয়েকটি বছর পর্যন্ত কুরাইশের লোকেরা এ ঘটনার দ্বারা এতই মুগ্ধ ও প্রভাবিত হয়েছিল যে, তারা এ সময় আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করেনি। এ ঘটনার উল্লেখ দ্বারা কুরাইশদের এবং সাধারণভাবে আরববাসীদের মনে চিন্তার খোরাক দেওয়া হয়েছে যে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ যে দীনের দাওয়াত দিচ্ছেন, তা অন্যান্য সব মা'বূদ পরিত্যাগ করার এবং একমাত্র লা-শরীক আল্লাহর বন্দেগি করার দাওয়াত ছাড়া আর কিছুই নয়। সাথে সাথে এ কথাও যেন বিশ্বাস করে যে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর এ সত্য দীনের দাওয়াতকে যদি তারা জোরপূর্বক দমন করতে চেষ্টা করে, তাহলে যে আল্লাহ তা'আলা হস্তিবাহিনীকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন, তারা সে আল্লাহর ক্রোধ ও রোষাগ্নিতে পড়ে চিরতরে ভস্ম হয়ে যেতে পারে।

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ .... اَلْاٰيَة.

শানে নুযূল : সেই হস্তী বাহিনী যারা আবরাহা বাদশাহের নেতৃত্বে পবিত্র কাবা ঘরকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য হাতি নিয়ে এসেছিল ও ক্ষুদ্র আবাবিল পাখির প্রস্তরাঘাতে যারা ধ্বংস হয়ে যায়। তাদের বর্ণনা ও স্মরণ করার জন্যই অত্র সূরাটি অবতীর্ণ হয়। উল্লেখ্য যে, এ পথভ্রষ্ট বাহিনীর পথ প্রদর্শক ছিল কুরাইশদের মধ্য থেকেই আবূ রুগাল নামক এক কুলাঙ্গার। এ সূরায় হস্তীবাহিনীর ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। তারা কা'বা গৃহকে ভূমিসাৎ করার উদ্দেশ্যে হস্তীবাহিনী নিয়ে মক্কায় অভিযান পরিচালনা করেছিল। আল্লাহ তা'আলা নগণ্য পক্ষীকুলের মাধ্যমে তাদের বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করে তাদের কুমতলবকে ধূলায় মিশ্রিত করে দেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্মের বছর এ ঘটনা ঘটেছিল : মক্কা মোকাররমায় খাতামুল আম্বিয়া ﷺ -এর জন্মের বছর হস্তীবাহিনীর ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। কতক রেওয়ায়েত দ্বারাও এটা সমর্থিত এবং এটাই প্রসিদ্ধ উক্তি। –(ইবনে কাছীর) হাদীসবিদগণ এ ঘটনাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এক প্রকার মু'জিযা রূপে আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু মো'জেযা নবুয়ত দাবির সাথে নবীর সমর্থনের প্রকাশ করা হয়। নবুয়ত দাবির পূর্বে বরং নবীর জন্মেরও পূর্বে আল্লাহ তা'আলা মাঝে মাঝে দুনিয়াতে এমন ঘটনা ও নিদর্শন প্রকাশ করেন, যা অলৌকিকতায় মো'জেযার অনুরূপ হয়ে থাকে। এ ধরনের নিদর্শনাবলিকে হাদীসবিদগণের পরিভাষায় 'ইরহাসাত' বলা হয়। 'রাহস' এর অর্থ ভিত্তি ও ভূমিকা। এসব নিদর্শন নবীর নবুয়ত প্রমাণের ভিত্তি ও ভূমিকা হয় বিধায় এগুলোকে 'ইরহাসাত' বলা হয়ে থাকে। নবী করীম ﷺ -এর নবুয়ত এমনকি, জন্মেরও পূর্বে এ ধরনের কয়েক প্রকার 'ইরহাসাত' প্রকাশ পেয়েছে। হস্তীবাহিনীকে আসমানি আজাব দ্বারা প্রতিহত করাও এসবের অন্যতম।

হস্তীবাহিনীর ঘটনা : এ সম্পর্কে হাদীসবিদ ও ইতিহাসবিদ ইবনে কাছীরের ভাষ্য এরূপ : আরবের ইয়েমেন প্রদেশ মুশরিক, 'হিমইয়ারী' রাজন্যবর্গের অধিকারভুক্ত ছিল। তাদের সর্বশেষ রাজা ছিলেন 'যু-নওয়াস'। সে সময় খ্রিস্টান সম্প্রদায়ই ছিল সত্য ধর্মাবলম্বী। রাজা 'যুনওয়াস' তাদের উপর অমানুষিক নির্যাতন চালিয়েছিলেন। তিনি একটি দীর্ঘ ও প্রশস্ত গর্ত খনন করে তা অগ্নিতে ভর্তি করে দেন। অতঃপর যত খ্রিস্টান পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে এক আল্লাহর ইবাদত করত, তাদেরকে সেই গর্তে নিক্ষেপ করে জ্বালিয়ে দেন। এরূপ নির্যাতিতদের সংখ্যা ছিল বিশ হাজারেরও কাছাকাছি। এই গর্তের কথাই সূরা বুরূজে 'আসহাবুল-উখদূদে'র নামে ব্যক্ত হয়েছে। তাদের মধ্যে দু'ব্যক্তি কোনোরূপে অত্যাচারীদের কবল থেকে পলায়ন করতে সক্ষম হয়। তারা সিরিয়ার রোমক শাসকের দরবারে যেয়ে খ্রিস্টানদের প্রতি রাজা-যুনওয়াসের লোমহর্ষক অত্যাচারের কাহিনী বিবৃত করল। রোমক শাসক ইয়েমেনের নিকটবর্তী আবিসিনিয়ার খ্রিস্টান সম্রাটের কাছে এর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য পত্র প্রেরণ করলেন। তিনি তাঁর বিরাট সৈন্যবাহিনী, দুই সেনানায়ক আরবাত ও আবরাহার নেতৃত্বে রাজা যুনওয়াসের মোকাবিলায় পাঠিয়ে দিলেন। আবিসিনিয়ার সেনাবাহিনী ইয়েমেনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং সমগ্র ইয়েমেনকে হিমইয়ারীদের কবল থেকে মুক্ত করল। রাজা যু-নওয়াস পলায়ন করলেন এবং সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়ে প্রাণ ত্যাগ করলেন। এভাবে আরবাত ও আবরাহার মাধ্যমে ইয়েমেন আবিসিনিয়া সম্রাটের করতলগত হলো। এরপর আরবাত ও আবরাহার মধ্যে ক্ষমতার লড়াই হলো এবং আরবাত নিহত হলো। আবিসিনিয়া সম্রাট বিজয়ী আবরাহাকে ইয়েমেনের শাসক নিযুক্ত করলেন।

ইয়েমেন অধিকার করার পর আবরাহার ইচ্ছা হলো যে, সে তথায় এমন একটি বিশাল সুরম্য গীর্জা নির্মাণ করবে, যার নযীর পৃথিবীতে নেই। এতে তার লক্ষ্য ছিল এই যে, ইয়েমেনের আরব বাসিন্দারা প্রতি বৎসর হজ করার জন্য মক্কায় গমন করে এবং বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করে। তারা এই গীর্জার মাহাত্ম্য ও জাঁকজমকে অভিভূত হয়ে বায়তুল্লাহর পরিবর্তে এই গীর্জায় আগমন করবে। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে সে একটি বিরাট সুরম্য গীর্জা নির্মাণ করল। নিচে দাঁড়িয়ে কেউ এই গীর্জার উচ্চতা পরিমাপ করতে পারত না। স্বর্ণ-রৌপ্য ও মূল্যবান হীরা-জহরত দ্বারা কারুকার্যখচিত এই গীর্জা নির্মাণ করার পর সে ঘোষণা করল : এখন থেকে ইয়েমেনের কোনো বাসিন্দা হজের জন্য কা'বাগৃহে যেতে পারবে না। এর পরিবর্তে তারা এই গীর্জায় ইবাদত করবে। আরবে যদিও পৌত্তলিকতার জোর বেশি ছিল কিন্তু দীনে ইবরাহীম এবং কা'বার মাহাত্ম্য ও মহব্বত তাদের অন্তরে গ্রথিত ছিল। তাই আদনান, কাহতান ও কুরাইশ উপজাতিসমূহের মধ্যে এই ঘোষণার ফলে ক্ষোভ ও অসন্তোষ তীব্রতর হয়ে উঠল। সে মতে তাদেরই কেউ রাত্রির অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে গীর্জায় প্রবেশ করে প্রস্রাব-পায়খানা করল। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে, তাদের এক যাযাবর গোত্র নিজেদের প্রয়োজনে গীর্জার সন্নিকটে অগ্নি প্রজ্বলিত করেছিল। সেই অগ্নি গীর্জায় লেগে যায় এবং গীর্জার প্রভূত ক্ষতি হয়।

আবরাহাকে সংবাদ দেওয়া হলো যে, জনৈক কুরাইশী এই দুষ্কর্ম করেছে। তখন সে ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে শপথ করল : আমি কুরাইশদের কা'বাগৃহ নিশ্চিহ্ন না করে ক্ষান্ত হব না। অতঃপর সে এর প্রস্তুতি শুরু করল এবং আবিসিনিয়ার সম্রাটের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করল। সম্রাট কেবল অনুমতিই দিলেন না বরং তার মাহমূদ নামক খ্যাতনামা হস্তীটিও আবরাহার সাহায্যার্থে পাঠিয়ে দিলেন। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, এই হস্তীটি এমন বিশালকায় ছিল যে, এর সমতুল্য সচরাচর দৃষ্টিগোচর হতো না। এছাড়া আরো আটটি হাতি এই বাহিনীর জন্য সম্রাটের পক্ষ থেকে প্রেরণ করা হলো। এতসব হাতি প্রেরণ করার উদ্দেশ্য ছিল কা'বাগৃহ ভূমিসাৎ করার কাজে হাতি ব্যবহার করা। পরিকল্পনা ছিল এই যে, কা'বাগৃহের স্তম্ভে লোহার মজবুত ও লম্বা শিকল বেঁধে দেওয়া হবে। অতঃপর সেসব শিকল হাতির গলায় বেঁধে হাঁকিয়ে দেওয়া হবে। ফলে সমগ্র কা'বাগৃহ (নাউযুবিল্লাহ) মাটিতে ধসে পড়বে।

আরবে এই আক্রমণের সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে সমগ্র আরব মোকাবিলার জন্য তৈরি হয়ে গেল। ইয়েমেনী আরবদের মধ্য থেকে যুনকর নামক এক ব্যক্তির নেতৃত্বে আরবরা আবরাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলো। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ছিল আবরাহার পরাজয় ও লাঞ্ছনা বিশ্ববাসীর জন্য একটা শিক্ষণীয় বিষয়রূপে তুলে ধরা। তাই আরবরা যুদ্ধে সফল হতে পারল না। আবরাহা তাদেরকে পরাজিত করে যুনকরকে বন্দি করল। অতঃপর সে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে 'খাস'আম' গোত্রের কাছে উপনীত হলে গোত্র সরদার নুফায়েল ইবনে হাবীব তার মোকাবিলায় অবতীর্ণ হলো। কিন্তু আবরাহার লশকর তাকেও পরাজিত ও বন্দি করল। আবরাহা নুফায়েলকে হত্যা না করে পথপ্রদর্শকের কাজে নিয়োজিত করল। অতঃপর এই সেনাবাহিনী তায়েফের নিকটবর্তী হলে তথাকার সাকীফ গোত্র আবরাহাকে বাধা দিল না। কারণ, তারা বিগত দু'টি যুদ্ধে আবরাহার বিজয় ও আরবদের পরাজয়ের ঘটনা সম্পর্কে জ্ঞাত ছিল। তারা আবরাহার সাথে সাক্ষাৎ করে এই মর্মে এক শান্তিচুক্তিও সম্পাদন করল যে, তারা আবরাহার সামনে প্রতিরোধ সৃষ্টি করবে না। যদি তায়েফে নির্মিত তাদের লাত নামক মূর্তির মন্দির অক্ষত থাকে। উপরন্তু তারা পথপ্রদর্শনের জন্য তাদের সরদার আবূ রুগালকেও আবরাহার সঙ্গে দিয়ে দেবে। আবরাহা এতে সম্মত হয়ে আবূ রুগালকে সাথে নিয়ে মক্কার অদূরে 'মাগমাস' নামক স্থানে পৌঁছে গেল। সেখানে কুরাইশ গোত্রের উট-চারণ ভূমি অবস্থিত ছিল। আবরাহা সর্বপ্রথম সেখানে হামলা চালিয়ে সমস্ত উট বন্দি করে নিয়ে এল। এতে রাসূলে কারীম ﷺ-এর পিতামহ আব্দুল মোত্তালিবেরও দুই শত উট ছিল। এখান থেকে আবরাহা বিশেষ দূত মারফত মক্কা শহরে কুরাইশ নেতাদের কাছে বলে পাঠাল যে, আমরা কুরাইশদের সাথে যুদ্ধ করতে চাই না। আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে কা'বাগৃহ ভূমিসাৎ করা। এ লক্ষ্য অর্জনে বাধা না দিলে কুরাইশদের কোনো ক্ষতি করা হবে না। বিশেষ দূত 'হানাতা' এই পয়গাম নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করলে সবাই তাকে প্রধান কুরাইশ নেতা আব্দুল মোত্তালিবের ঠিকানা বলে দিল। হানাতা তাঁর সাথে আলাপ-আলোচনা করে আবরাহার পয়গাম পৌঁছে দিল। ইবনে ইসহাক (র.)-এর বর্ণনা মতে আব্দুল মোত্তালিব প্রত্যুত্তরে বললেন : আমরাও আবরাহার মোকাবিলায় যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার ইচ্ছা রাখি না। মোকাবিলা করার যথেষ্ট শক্তিও আমাদের নেই। তবে একথা বলে দিচ্ছি যে, এটা আল্লাহর ঘর, তাঁর খলীল ইবরাহীম (আ.)-এর হাতে নির্মিত। আল্লাহ তা'আলা নিজেই এর সংরক্ষণের জিম্মাদার। আবরাহা আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চাইলে করুক এবং দেখুক আল্লাহ তা'আলা কি করেন। হানাতা বলল : তাহলে আপনি আমার সাথে চলুন। আমি আবরাহার সাথে আপনার পরিচয় করিয়ে দেব।

আবরাহা আব্দুল মোত্তালিবের সুদর্শন সৌম্য চেহারা দেখে সিংহাসন ছেড়ে নিচে উপবেশন করল এবং আব্দুল মোত্তালিবকে সাথে বসালো। অতঃপর দোভাষীর মাধ্যমে আগমনের উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করল। আব্দুল মোত্তালিব বললেন : আমার

প্রয়োজন এতটুকুই যে, আমার কিছু উট আপনার সৈন্যরা নিয়ে এসেছে। সেগুলো ছেড়ে দিন। আবরাহা বলল : আমি প্রথম যখন আপনাকে দেখলাম, তখন আমার মনে আপনার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মানবোধ জাগ্রত হয়েছিল। কিন্তু আপনার কথাবার্তা শুনে তা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে গেছে। আপনি আমার কাছে কেবল দুই শত উটের কথাই বলছেন। আপনি কি জানেন না যে, আমি আপনাদের কা'বা তথা আপনাদের দীন-ধর্মকে ভূমিসাৎ করতে এসেছি? আপনি এ সম্পর্কে কোনো কথাই বললেন না! আশ্চর্যের বিষয় বটে। আব্দুল মোত্তালিব জবাব দিলেন : উটের মালিক আমি, তাই উটের কথাই চিন্তা করেছি। আমি কা'বা গৃহের মালিক নই। এর মালিক একজন মহান সত্তা। তিনি জানেন তাঁর এ ঘরকে কিরূপে রক্ষা করতে হবে। আবরাহা বলল : আপনার আল্লাহ একে আমার হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না। আব্দুল মোত্তালিব বললেন : তাহলে আপনি যা ইচ্ছা করুন। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে, আব্দুল মোত্তালিবের সাথে আরো কয়েকজন কুরাইশ নেতা আবরাহার দরবারে গমন করেছিলেন। তাঁরা আবরাহার কাছে এই প্রস্তাব রাখলেন যে, আপনি আল্লাহর ঘরে হস্তক্ষেপ না করলে আমরা সমগ্র উপত্যকার এক তৃতীয়াংশ ফসল আপনাকে খেরাজ প্রদান করব। কিন্তু আবরাহা এ প্রস্তাব মানতে সম্মত হলো না। আব্দুল মোত্তালিব তাঁর উট নিয়ে শহরে ফিরে এলেন। অতঃপর তিনি বায়তুল্লাহর চৌকাঠ ধরে দোয়ায় মশগুল হলেন। কুরাইশ গোত্রের বহু লোকজন দোয়ায় তাঁর সাথে শরীক হলো। তারা বলল : হে আল্লাহ আবরাহার বিরাট বাহিনীর মোকাবিলা করার সাধ্য আমাদের কারো নেই। আপনিই আপনার ঘরের হেফাজতের ব্যবস্থা করুন। কাকুতি-মিনতি সহকারে দোয়া করার পর আব্দুল মোত্তালিব সঙ্গীদেরকে সাথে নিয়ে বিভিন্ন পাহাড়ে ছড়িয়ে পড়লেন। তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, আবরাহার বাহিনীর উপর আল্লাহর গজব পতিত হবে। প্রত্যুষে আবরাহা কা'বা ঘর আক্রমণের প্রস্তুতি নিল এবং মাহমূদ নামক প্রধান হস্তীটিকে অগ্রে চলার ব্যবস্থা গ্রহণ করল। বন্দি নুফায়েল ইবনে হাবীব সম্মুখে অগ্রসর হয়ে হস্তীর কান ধরে বিড় বিড় করে বলতে লাগল : তুই যেখান থেকে এসেছিস, সেখানেই নিরাপদে চলে যা; কেননা তুই এখন আল্লাহর সংরক্ষিত শহরে আছিস। অতঃপর সে হাতির কান ছেড়ে দিল। হাতি একথা শুনেই বসে পড়ল। চালকরা তাকে আপ্রাণ চেষ্টা সহকারে উঠাতে চাইল। কিন্তু সে আপন জায়গা থেকে একবিন্দুও সরল না। বড় বড় লৌহ শলাকা দ্বারা পিটানো হলো, নাকের ভিতরে লোহার শিক ঢুকিয়ে দেওয়া হলো কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। সে দণ্ডায়মান হলো না। তখন তারা তাকে ইয়েমেনের দিকে ফিরিয়ে দিতে চাইল। সে তৎক্ষণাৎ উঠে পড়ল। অতঃপর সিরিয়ার দিকে চালাতে চাইলে চলতে লাগল। এরপর পূর্ব দিকেও কিছুদূর চলল। এসব দিকে চালানোর পর আবার যখন মক্কার দিকে চালানো হলো, তখন পূর্ববৎ বসে পড়ল।

এখানে তো আল্লাহর কুদরতের এই লীলাখেলা চলছিলই; অপরদিকে সাগরের দিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে এক ধরনের পাখি সারিবদ্ধভাবে উড়ে আসতে দেখা গেল। এগুলোর প্রত্যেকটির কাছে ছোলা অথবা মসুরের সমান তিনটি করে কংকর ছিল; একটি চঞ্চুতে ও দু'টি দুই থাবায়। ওয়াকেদী (র.) বর্ণনা করেন : পাখিগুলো অদ্ভূত ধরনের ছিল, যা ইতঃপূর্বে কখনো দেখা যায়নি। দেখতে দেখতে সেগুলো আবরাহার বাহিনীর উপরিভাগ ছেয়ে ফেলল এবং বাহিনীর উপর কংকর নিক্ষেপ করতে লাগল। প্রত্যেকটি কংকর সেই কাজ করল, যা বন্দুকের গুলীতেও করতে পরে না। কংকর যে ব্যক্তির উপর পতিত হতো, তাকে এপার-ওপার ছিদ্র করে মাটিতে পুঁতে যেত। এই আজাব দেখে সব হাতি ছুটাছুটি করে পালিয়ে গেল। একটিমাত্র হাতি ময়দানে ছিল, যা কংকরের আঘাতে নিহত হলো। বাহিনীর সব মানুষই অকুস্থলে প্রাণ হারায়নি বরং তারা বিভিন্ন দিকে পলায়ন করল এবং পথিমধ্যে মাটিতে পড়ে পড়ে মৃত্যুমুখে পতিত হলো। আবরাহাকে কঠোর শাস্তি দেওয়া উদ্দেশ্য ছিল। তাই সে তাৎক্ষণিক মৃত্যুবরণ করেনি। কিন্তু তার দেহে মারাত্মক বিষ সংক্রমিত হয়েছিল। ফলে দেহের এক একটি গ্রন্থি পড়ে-গলে খসে পড়তে লাগল। এমতাবস্থায়ই সে ইয়েমেনে নীত হলো। রাজধানী 'সান'আয়' পৌছার পর তার সমস্ত শরির ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় সে মৃত্যুমুখে পতিত হলো। আবরাহার হস্তী মাহমূদের সাথে দু'জন চালক মক্কাতেই রয়ে গেল। তারা অন্ধ ও বিকলাঙ্গ হয়ে গিয়েছিল! মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র.) বর্ণনা করেন যে, হযরত আয়েশা (রা.) বলেছেন : আমি এই দু'জন চালককে অন্ধ ও বিকলাঙ্গ অবস্থায় দেখেছি। হযরত আয়েশা (রা.)-এর ভগিনী আসমা (রা.) বলেন : আমি এই বিকলাঙ্গ অন্ধদ্বয়কে ভিক্ষাবৃত্তি করতে দেখেছি। হস্তীবাহিনীর এই ঘটনা সম্পর্কেই আলোচ্য সূরায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে :

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ –এখানে أَلَمْ تَرَ 'আপনি কি দেখেননি' বলা হয়েছে অথচ এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্মের কিছুদিন পূর্বেকার ঘটনা। কাজেই দেখার কোনো প্রশ্নই উঠে না। কিন্তু যে ঘটনা এরূপ নিশ্চিত যে, তা ব্যাপকভাবে প্রত্যক্ষ করা হয়, সেই ঘটনার জ্ঞানকেও 'দেখা' বলে ব্যক্ত করা হয়। যেন এটা চাক্ষুষ ঘটনা। এক পর্যায়ে দেখাও প্রমাণিত আছে; যেমন পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত আয়েশা (রা.) ও হযরত আসমা (রা.) উভয়েই দু'জন হস্তীচালককে অন্ধ, বিকলাঙ্গ ও ভিক্ষুকরূপে দেখেছিলেন।

طَيْرًا اَبَابِيْلَ – اَبَابِيْلَ শব্দটি বহুবচন। অর্থ পাখির ঝাঁক-কোনো বিশেষ প্রাণীর নাম নয়। এই পাখি আকারে কবুতর অপেক্ষা সামান্য ছোট ছিল কিন্তু এ জাতীয় পাখি পূর্বে কখনো দেখা যায়নি। –[কুরতুবী]

بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ ভিজা মাটি আগুনে পুড়ে যে কংকর তৈরি হয়, সেই কংকরকে سِجِّيْلَ বলা হয়ে থকে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এই কংকরেরও নিজস্ব কোনো শক্তি ছিল না। কিন্তু আল্লাহর কুদরতে এগুলো বন্দুকের গুলী অপেক্ষা বেশি কাজ করেছিল।

فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُوْلٍ – عَصْفٌ-এর অর্থ ভূষি। ভূষি নিজেই ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন তৃণ। তদুপরি যদি কোনো জন্তু সেটিকে চর্বন করে, তবে এই তৃণও আর তৃণ থাকে না। কংকর নিক্ষিপ্ত হওয়ার ফলে আবরাহার সেনাবাহিনীর অবস্থা তদ্রূপই হয়েছিল।

হস্তী বাহিনীর এই অভূতপূর্ব ঘটনা সমগ্র আরবের অন্তরে কুরাইশদের মাহাত্ম্য আরো বাড়িয়ে দিল। এখন সবাই স্বীকার করতে লাগল যে, তারা বাস্তবিকই আল্লাহ ভক্ত। তাদের পক্ষ থেকে আল্লাহ স্বয়ং তাদের শত্রুকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। –[কুরতুবী]

এই মাহাত্ম্যের প্রভাবেই কুরাইশরা বাণিজ্য করার উদ্দেশ্য বিভিন্ন দেশে গমন করত এবং পথিমধ্যে কেউ তাদের কোনো ক্ষতি করত না। অথচ তখন সাধারণের জন্য দেশ সফর করা ছিল জীবন বিপন্ন করার নামান্তর। পরবর্তী সূরা কুরাইশে তাদের এই সফরের কথা উল্লেখ করে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করার দাওয়াত দেওয়া হয়েছে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

اَلْفِيْلِ : فِيْلٌ শব্দটি ইসমে জিনস। একবচন, বহুবচন فِيَلَةٌ ও اَفْيَالٌ অর্থ– হাতি।

تَضْلِيْلٍ : মাসদার, বাব تَفْعِيْل মূলবর্ণ (ض - ل - ل) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ।

اَرْسَلَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِرْسَالُ মূলবর্ণ (ر - س - ل) জিনস صحيح অর্থ– তিনি প্রেরণ করলেন।

اَبَابِيْلَ : ঝাঁকেঝাঁকে, দলেদলে। আবূ উবায়দা উল্লেখ করেন, খণ্ড-খণ্ড দলকে اَبَابِيْلُ বলা হয়। যেমন, আরবরা বলে جَاءَتِ الْخَيْلُ اَبَابِيْلَ هٰهُنَا وَهٰهُنَا "এদিক সেদিক থেকে আরোহীরা দলে দলে আসছে।" ফাররার বর্ণনা মতে যেরূপভাবে عَبَادِيْدُ ও شَمَاطِيْطُ-এর একবচন হয় না, এরূপভাবে اَبَابِيْلُ এরও একবচন হয় না। দ্বিতীয় মত হলো, এর একবচন আসে। আবূ জাফর এর উক্তিমতে اَبَابِيْلُ-এর একবচন اِبَالَةٌ।

سِجِّيْلٍ : এটি ফারসী শব্দ سنگ كل থেকে পরিবর্তিত আরবি রূপ, অর্থ– কুফার।

عَصْفٍ : ভূসি, শস্যের পাতা, দমকা হওয়া, প্রবল বাতাস। তাফসীরে কাবীরে এর কয়েকটি অর্থ উল্লেখ করা হয়েছে। ১. ভূসি যা আমাদের মহিষগুলো ভক্ষণ করে। ২. পুদিনা পাতা। ৩. ভক্ষণকৃত ফলের খোসা। ইমাম কুরতুবী (র.) তার তাফসীরে লিখেন, عَصْفٌ বহুবচন আর একবচন হলো عَصْفَةٌ، عُصَافَةٌ এবং عَصِيْفَةٌ

مَّأْكُوْلٍ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব نَصَرَ মাসদার اَلْاَكْلُ মূলবর্ণ (أ - ك - ل) জিনস مهموز فاء অর্থ- ভক্ষিত।

سُورَةُ قُرَيْشٍ مَكِّيَّةٌ
সূরা কুরাইশ

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত– ৪, রুকূ'– ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. যেহেতু কুরাইশগণ অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে।	لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ۝١
২. [অর্থাৎ] শীত ও গ্রীষ্মকালীন পর্যটনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। [অর্থাৎ তারা ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে শীত ও গ্রীষ্ম উভয়কালেই দেশ ভ্রমণ করে থাকত]।	اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ ۝٢
৩. অতএব, তাদের উচিত যেন তারা এই খানায়ে কা'বার মালিকের ইবাদত করে।	فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ ۝٣
৪. যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় আহার্য দান করেছেন, আর ভয়-ভীতি হতে তাদেরকে নিরাপত্তা দান করেছেন।	الَّذِيْٓ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ ۵ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ۝٤

শাব্দিক অনুবাদ :

১. لِاِيْلٰفِ যেহেতু অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে قُرَيْشٍ কুরাইশগণ।

২. اٖلٰفِهِمْ অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ শীত ও গ্রীষ্মকালীন পর্যটনে।

৩. فَلْيَعْبُدُوْا অতএব, তাদের উচিত তারা যেন ইবাদত করে رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ এই খানায়ে কা'বার মালিকের।

৪. الَّذِيْٓ اَطْعَمَهُمْ যিনি তাদেরকে আহার্য দান করেছেন مِّنْ جُوْعٍ ক্ষুধায় وَّاٰمَنَهُمْ আর তাদেরকে নিরাপত্তা দান করেছেন مِّنْ خَوْفٍ ভয় ভীতি হতে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : সূরার প্রথম আয়াতের قُرَيْش শব্দটি দ্বারা নামকরণ করা হয়েছে। এতে ৪টি আয়াত, ১৭টি বাক্য এবং ৭৩টি অক্ষর রয়েছে।

নাজিলের সময়কাল : এ সূরাটি কোথায় অবতীর্ণ হয়েছে এ বিষয়ে দু'টি অভিমত পাওয়া যায়। খুব কম সংখ্যক তাফসীরকার একে মাদানী সূরা বলে অভিহিত করেছেন। অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে এ সূরাটি মক্কায়ই অবতীর্ণ হয়। কারণ সূরার দু'নম্বর আয়াতে فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ দ্বারা মক্কায় অবতীর্ণ হওয়ার কথাই প্রমাণ হয়।

সূরাটির বিষয়বস্তু : এ সূরার মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের দাওয়াত দেওয়া।

মহানবী ﷺ -এর নবুয়ত প্রাপ্তির বহুকাল পূর্ব হতেই মক্কার কুরাইশ সম্প্রদায় নানা প্রকার সামাজিক কুসংস্কার ও অনৈসলামি আকীদায় বিশ্বাসী হয়ে পড়েছিল এবং আল্লাহ তা'আলাকে ছেড়ে নানা দেব-দেবীর পূজা-অর্চনায় লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। স্বয়ং কা'বা ঘরকেই এ শিরকের কেন্দ্রস্থলে পরিণত করেছিল। মহানবীর নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্ব হতেই কা'বা ঘরে

৩৬০টি প্রতিমা রাখা হয়েছিল; কিন্তু কুরাইশগণ এদেরকে আল্লাহ মানত না। এদের অসিলায় তারা আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করতে পারবে, এ আশায় তারা এদের পূজা করত। এদের নিকট অভাব-অভিযোগ ও প্রয়োজন পুরা করার প্রার্থনা করত। অথচ কুরাইশগণের সমগ্র আরবের উপর বংশীয় কৌলিন্য-আভিজাত্য, সম্মান-মর্যাদা, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও সুনাম যশ-লাভের একমাত্র কারণ ছিল কা'বা ঘর। কা'বা ঘরের কারণেই তারা আবরাহার আক্রমণ হতে রক্ষা পেয়েছিল। তাই আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি তাঁর বহুবিদ বদান্যতা ও অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে বলেছেন-হে কুরাইশগণ! তোমরা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছ, শীতকালীন ও গ্রীষ্মকালীন বাণিজ্যিক সফরে। তোমরা দেশ হতে দেশান্তরে নিরাপদে ও সম্মানের সাথে যাতায়াত করতে পারছ; এটা আল্লাহর ঘরের খেদমত ও সেবা করারই ফলশ্রুতি। সুতরাং তোমাদের উচিত দেব-দেবীর পূজা-অর্চনা পরিত্যাগ করে, এ ঘরের প্রতিপালকের ইবাদত-বন্দেগি করা; অভাব-অভিযোগ ও হাজত পূরণের জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা করা- তিনিই তো তোমাদের দুঃখ-দৈন্য দূর করে সুখী-সমৃদ্ধিশালী করেছেন এবং তোমাদের জন্য ভিতর-বাইর সর্বত্র এবং বাণিজ্যিক পথগুলোকে নিরাপদ করেছেন। তোমরা যেখানেই যাও, সেখানেই আল্লাহর ঘরের খাদেম বলে সম্মান পাচ্ছ। এমনকি আরবের দুর্বৃত্ত ও ডাকাত দলও তোমাদের ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করে না। তোমাদের প্রতি হামলা করে না, তোমরা আল্লাহর এ সব নিয়ামত কিরূপে বিস্মৃত হতে পার? তোমাদের উচিত, যে ঘরের দ্বারা লাভবান হচ্ছ সে ঘরের প্রতিপালকের ইবাদত করা। অন্যথা তোমাদের নিকট হতে এ নিয়ামত কেড়ে নেওয়া হবে। তখন তোমরা পদে পদে অপমান ও অপদস্থ হবে।

لِإِيْلٰفِ قُرَيْشٍ إِلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ.................... الاية.

শানে নুযূল : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ কুরাইশদের শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে সাতটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। যা না এর আগে না এর পরে কোনো সম্প্রদায় পেয়েছে বা পাবে। বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে ১. আমি কুরাইশ বংশে জন্ম গ্রহণ করেছি। ২. নবুয়ত রিসালাত তাদেরকেই একমাত্র দান করা হয়েছে। ৩. কা'বা শরীফের খেদমত তাদের উপর অর্পিত হয়েছে। ৪. হাজীদের পানি পানের দায়িত্ব তাদেরকে দেওয়া হয়েছে। ৫. আসহাবে ফীলের উপর আল্লাহ পাক তাদেরকে বিজয়ী করেছেন। ৬. দশ বছর যাবত কুরাইশগণ ছাড়া অন্য কেউ আল্লাহর ইবাদত করেনি। (অর্থাৎ নবুয়তের প্রথম দশ বছররের মাঝে কুরাইশ বংশ ছাড়া অন্য কেউ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেনি।) ৭. কুরাইশদের সম্পর্কে আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে একটি সূরা নাজিল করেছেন। উম্মে হানী বিনতে আবি তালেব বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, আমি কুরাইশ বংশে জন্ম গ্রহণ করেছি। এর স্থলে খেলাফত কুরাইশদের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকবে ও দশ বছর ইবাদত করেনি এর স্থলে সাত বছর ইবাদত করেনি। –[মুস্তাদরাকে হাকীম ২ : ৫৩৬]

এ ব্যাপারে সব তাফসীরকারকই একমত যে, অর্থ ও বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে এই সূরা সূরা-ফীলের সাথেই সম্পৃক্ত। সম্ভবত এ কারণেই কোনো কোনো মাসহাফে এ দু'টিকে একই সূরারূপে লিখা হয়েছিল। উভয় সূরার মাঝখানে বিসমিল্লাহ লিখিত ছিল না। কিন্তু হযরত উসমান (রা.) যখন তাঁর খেলাফতকালে কুরআনের সব মাসহাফ একত্র করে একটি কপিতে সংযোজিত করান এবং সকল সাহাবায়ে কেরামের তাতে ইজমা হয়, তখন তাতে এ দু'টি সূরাকে স্বতন্ত্র দু'টি সূরারূপে সন্নিবেশিত করা হয় এবং উভয়ের মাঝখানে বিসমিল্লাহ লিপিবদ্ধ করা হয়। হযরত উসমান (রা.)-এর তৈরি এ কপিকে 'ইমাম' বলা হয়।

لِإِيْلَافِ قُرَيْشٍ আরবি ব্যাকরণিক গঠনপ্রণালী অনুযায়ী حَرْف لَامْ -এর সম্পর্ক কোনো পূর্ববর্তী বিষয়বস্তুর সাথে হওয়া বিধেয়। আয়াতে উল্লিখিত لَامْ -এর সম্পর্ক কিসের সাথে, এ সম্পর্কে একাধিক উক্তি বর্ণিত রয়েছে। সূরা ফীলের সাথে অর্থগত সম্পর্কের কারণে কেউ কেউ বলেন যে, এখানে ঊহ্য বাক্য হচ্ছে اِنَّا اَهْلَكْنَا اَصْحَابَ الْفِيْلِ অর্থাৎ আমি হস্তীবাহিনীকে এজন্য ধ্বংস করেছি, যাতে কুরাইশদের শীত ও গ্রীষ্মকালীন দুই সফরের পথে কোনো বাধাবিপত্তি না থাকে এবং সবার অন্তরে তাদের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। কেউ কেউ বলেছেন যে, এখানে ঊহ্য বাক্য হচ্ছে اِعْجَبُوْا অর্থাৎ তোমরা কুরাইশদের ব্যাপারে আশ্চর্যবোধ কর তারা কিভাবে শীত ও গ্রীষ্মের সফর নিরাপদে নির্বিবাদে করে! কেউ কেউ বলেন : এই لَامْ -এর সম্পর্ক পরবর্তী বাক্য فَلْيَعْبُدُوْا -এর সাথে। অর্থাৎ এই নিয়ামতের ফলশ্রুতিতে কুরাইশদের কৃতজ্ঞ হওয়া ও আল্লাহর ইবাদতে আত্মনিয়োগ করা উচিত। সারকথা, এই সূরার বক্তব্য এই যে, কুরাইশরা যেহেতু শীতকালে ইয়েমেনের দিকে ও গ্রীষ্মকালে সিরিয়ার দিকে সফরে অভ্যস্ত ছিল এবং এ দু'টি সফরের উপরই তাদের জীবিকা

নির্ভরশীল ছিল এবং তারা ঐশ্বর্যশালীরূপে পরিচিত ছিল। তাই আল্লাহ তা'আলা তাদের শত্রু হস্তীবাহিনীকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়ে মানুষের অন্তরে তাদের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন। তারা যে কোনো দেশে গমন করে, সকলেই তাদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে।

সমগ্র আরবে কুরাইশদের শ্রেষ্ঠত্ব : এ সূরায় আরো ইঙ্গিত রয়েছে যে, আরবের গোত্রসমূহের মধ্যে কুরাইশগণ আল্লাহ তা'আলার সর্বাধিক প্রিয়। রাসূলে কারীম ﷺ বলেন : আল্লাহ তা'আলা হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর সন্তান-সন্ততির মধ্যে কেনানাকে কেনানার মধ্যে, কুরাইশকে কুরাইশের মধ্যে এবং বনী হাশিমকে বনী হাশিমের মধ্যে আমাকে মনোনীত করেছেন। অন্য এক হাদীসে তিনি বলেন : সব মানুষ কুরাইশের অনুগামী ভালো ও মন্দে। প্রথম হাদীসে উল্লিখিত মনোনয়নের কারণ সম্ভবত এই গোত্রসমূহের বিশেষ নৈপুণ্য ও প্রতিভা। মূর্খতাযুগেও তাদের কতক চরিত্র ও নৈপুণ্য অত্যন্ত উচ্চস্তরে ছিল। সত্য গ্রহণের যোগ্যতা তাদের মধ্যে পুরোপুরি ছিল। এ কারণে সাহাবায়ে কেরাম ও আল্লাহর ওলীগণের অধিকাংশই কুরাইশের মধ্য থেকে হয়েছেন। –[মাযহারী]

رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ : একথা সুবিদিত যে, মক্কা শহর যে স্থলে অবস্থিত, সেখানে কোনো চাষাবাদ হয় না, বাগবাগিচা নেই; যা থেকে ফলমূল পাওয়া যেতে পারে। এজন্যই কা'বার প্রতিষ্ঠাতা হযরত খলীলুল্লাহ (আ.) দোয়া করেছিলেন وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ অর্থাৎ হে আল্লাহ! এতে বসবাসকারীদেরকে ফলমূলের রিজিক দান করুন। আরো বলেছিলেন : يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ অর্থাৎ বাইরে থেকেও যেন এখানে ফলমূল আনার ব্যবস্থা হয়। তাই বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে সফর ও বিদেশ থেকে প্রয়োজনীয় জীবনোপকরণ সংগ্রহ করার উপরই মক্কাবাসীদের জীবিকা নির্ভরশীল ছিল। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন : মক্কাবাসীরা খুব দারিদ্র্য ও কষ্টে দিনাতিপাত করত। অবশেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রপিতামহ হাশিম কুরাইশকে ভিনদেশে যেয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে উদ্বুদ্ধ করেন। সিরিয়া ছিল ঠাণ্ডা দেশ। তাই গ্রীষ্মকালে তারা সিরিয়ায় সফর করত। পক্ষান্তরে ইয়েমেন গরম দেশ ছিল বিধায় তারা শীতকালে সেখানে বাণিজ্যিক সফর করত এবং মুনাফা অর্জন করত। বায়তুল্লাহর খাদেম হওয়ার কারণে সমগ্র আরবে তারা ছিল সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র। ফলে পথের বিপদাপদ থেকে তারা সম্পূর্ণ নিরাপদ ছিল। সরদার হাশিমের নিয়ম ছিল এই যে, ব্যবসায়ের সমস্ত মুনাফা তিনি কুরাইশের ধনী ও দরিদ্র সবার মধ্যে বন্টন করে দিতেন। ফলে তাদের দারিদ্র ও ধনীদের সমান গণ্য হতো। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মক্কাবাসীদের প্রতি এসব অনুগ্রহ ও নিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ : নিয়ামত উল্লেখ করার পর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য কুরাইশকে আদেশ করা হয়েছে যে, তোমরা এই গৃহের মালিকের ইবাদত কর। এই গৃহই যেহেতু তাদের সব শ্রেষ্ঠত্ব ও কল্যাণের উৎস ছিল, তাই বিশেষভাবে এই গৃহের মৌলিক গুণটি উল্লেখ করা হয়েছে।

الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ : সুখী জীবনের জন্য যা যা দরকার তা সমস্তই এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা কুরাইশকে এগুলো দান করেছিলেন। أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ বলে পানাহারের যাবতীয় সাজসরঞ্জাম বুঝানো হয়েছে এবং آمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ বাক্যে দস্যু শত্রুদের থেকে নিরাপত্তা এবং পরকালীন আজাব থেকে নিষ্কৃতি এ উভয় মর্মই বুঝানো হয়েছে।

ইবনে কাছীর বলেন : এ কারণেই যে ব্যক্তি এই আয়াতের নির্দেশ অনুযায়ী আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য উভয় জাহানে নিরাপদ ও শঙ্কামুক্ত থাকার ব্যবস্থা করে দেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ইবাদতের প্রতি বিমুখ হয় তার কাছ থেকে উভয় প্রকার শান্তি ও নিরাপত্তা ছিনিয়ে নেওয়া হয়। অন্য এক আয়াতে আছে :

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। এক জনপদের অধিবাসীরা সর্বপ্রকার বিপদাশঙ্কা থেকে মুক্ত হয়ে জীবন যাপন করত। তাদের কাছে সব জায়গা থেকে প্রচুর পরিমাণে জীবনোপকরণ আগমন করত। অতঃপর তারা আল্লাহর নিয়ামতসমূহের নাশোকরী করল এবং আল্লাহ তা'আলা তাদের কৃতকর্মের কারণে তাদেরকে ক্ষুধা ও ভয়ের স্বাদ আস্বাদন করালেন।

سُوْرَةُ الْمَاعُوْنِ مَكِّيَّةٌ
সূরা মা'উন

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত– ৭, রুকূ'– ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. আপনি কি সেই লোকটিকে দেখেছেন, যে প্রতিফল দিবসকে অবিশ্বাস করে।

২. অনন্তর সে তো ঐ ব্যক্তি, যে এতিমকে ধাক্কা দিয়ে তাড়ায়।

৩. এবং অভাবগ্রস্তকে আহার্য দানে উৎসাহ প্রদান করে না।

৪. অতএব, দুর্ভোগ ঐ সকল নামাজিদের জন্য।

৫. যারা স্বীয় নামাজ সম্পর্কে উদাসীন।

৬. [আর] যারা এরূপ যে, [যখন নামাজ পড়ে, তখন] লৌকিকতা প্রদর্শন করে [অর্থাৎ লোক দেখানো নামাজ পড়ে]।

৭. এবং গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় ছোট-খাটো সাহায্যদানে বিরত থাকে।

শাব্দিক অনুবাদ :

১. اَرَءَيْتَ আপনি কি সেই লোকটিকে দেখেছেন الَّذِىْ يُكَذِّبُ যে অবিশ্বাস করে بِالدِّيْنِ প্রতিফল দিবসকে।

২. فَذٰلِكَ الَّذِىْ অনন্তর সে তো ঐ ব্যক্তি يَدُعُّ الْيَتِيْمَ যে এতিমকে ধাক্কা দিয়ে তাড়ায়।

৩. وَلَا يَحُضُّ এবং উৎসাহ প্রদান করে না عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ অভাবগ্রস্তকে আহার্য দানে।

৪. فَوَيْلٌ অতএব, দুর্ভোগ لِّلْمُصَلِّيْنَ ঐ সকল নামাজিদের জন্য।

৫. الَّذِيْنَ هُمْ যারা عَنْ صَلَاتِهِمْ স্বীয় নামাজ সম্পর্কে سَاهُوْنَ উদাসীন।

৬. الَّذِيْنَ هُمْ যারা এরূপ যে يُرَآءُوْنَ লৌকিকতা প্রদর্শন করে।

৭. وَيَمْنَعُوْنَ এবং বিরত থাকে الْمَاعُوْنَ গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় ছোট-খাটো সাহায্যদানে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : সূরাটির শেষ আয়াতের শেষ শব্দ "اَلْمَاعُوْنَ" (আল-মাউন)-কে এর নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। এতে ৭টি আয়াত, ২টি বাক্য এবং ১১১টি অক্ষর রয়েছে।

সূরাটি নাজিল হওয়ার সময়-কাল : আলোচ্য সূরা 'আল-মাউন' মাক্কী না মাদানী এ ব্যাপারে মুফাসসিরগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

১. ইবনে জুবাইর, আতা ও জাবিরসহ সাহাবা ও তাবেয়ীগণের একটি দলের মতে, আলোচ্য সূরা 'আল-মাউন' মাক্কী। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতেও অনুরূপ এক বর্ণনা রয়েছে।

২. হযরত কাতাদাহ ও যাহহাকসহ সাহাবী ও তাবেয়ীগণের অপর এক দলের মতে, এ সূরাটি মাদানী। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতেও অনুরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে।

কিন্তু আলোচ্য সূরায় নামাজে গাফিলতি করা ও লোক দোখানো (আমল ও নামাজ)-এর কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে। স্পষ্টতই তা দ্বারা মুনাফিকদের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর মুনাফিকদের আবির্ভাব হয়েছে মদিনায়। কাজেই এ হতে বুঝা যায় যে, সূরাটি মদিনায় নাজিল হওয়ার মতটিই অধিকতর গ্রহণযোগ্য।

বিষয়বস্তু ও সারকথা : এ সূরায় আল্লাহ তা'আলা পরকালে অবিশ্বাসী লোকদের চরিত্র কতদূর নিম্ন পর্যায়ে নেমে যায়, তার একটি চিত্র অংকন করেছেন। সর্বপ্রথমেই বলা হয়েছে– পরকাল বা দীন ইসলামে যারা বিশ্বাসী হয় না; বরং অস্বীকার করে, তাদের সম্পর্কে তোমরা কিছু জান কি? তাদের সামাজিক চরিত্র লেনদেন কতখানি নিম্নস্তরের হীন ও নীচ হতে পারে, তা শোন। তাদের প্রথম চরিত্র হলো এতিমদের হক ও অধিকারকে তারা নস্যাৎ করে। তাদের ধন-সম্পদ ও বিষয়- সম্পত্তিকে আত্মসাৎ করে তা হতে তাদেরকে বেদখল করে। তারা তা চাইতে এলে গলা ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয়। আর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো– নিজেরা তাদের খাদ্য দেওয়া তো দূরের কথা, অপরকেও খাদ্য দিতে এবং সাহায্য-সহানুভূতি করতে বলে না। তারা পার্থিব সুযোগ-সুবিধা ও স্বার্থ আদায়ের জন্য কুফরিকে গোপন রেখে নামাজি সেজে জামাতে শামিল হয় এবং প্রমাণ করতে চেষ্টা করে যে, আমরা মুসলমান। রাষ্ট্রীয় যাবতীয় সুযোগ-সুবিধায় আমাদের অধিকার রয়েছে। এ সব মুনাফিক নামাজিদের প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত। তারা নামাজের ক্ষেত্রে খুবই উদাসীন। নামাজের গুরুত্বকে উপলব্ধি করে নামাজ পড়ে না। নামাজের প্রতি প্রকারান্তরে অবজ্ঞা দেখায়। কেবল নামাজই নয়-সমস্ত কাজকর্মই লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে করে থাকে। এমনকি সামাজিক জীবনে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রীও অন্যকে ধার দিতে চায় না। তারা কত স্বার্থপর ও আত্মপূজারী হয় যে, অপরের জন্য কিঞ্চিৎ কষ্ট করা এবং সাধারণ একটু স্বার্থ বিসর্জন দেওয়াকেও পছন্দ করতে পারে না। এটাই হলো পরকাল ও দীন ইসলাম অস্বীকারকারীদের জীবন চরিত্রের যৎকিঞ্চিৎ রূপ।

اَرَءَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ .... اَلْاٰيَةَ.

শানে নুযূল : এ আয়াতটি কাফের সর্দার আবূ জাহেলের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। আবূ জাহল এমন দুরাচার লোক ছিল যে, মানুষ যখন মৃত্যু শয্যায় কাতর অবস্থায় নিপতিত হতো, তখন সে তার কাছে উপস্থিত হয়ে বলত, তুমি তোমার সন্তানাদির জন্য কোনো চিন্তা করো না। আমিই তার দেখা শুনা করব। এভাবে তাকে মিথ্যা আশ্বাস দেওয়ার মাধ্যমে তার অর্থ সম্পদ নিজের করায়ত্বে নিয়ে নিত। অতঃপর তার পরবর্তী ওয়ারিশদেরকে গলাধাক্কিয়ে বের করে দিত। তাতে এতিম অসহায় সন্তানরা নিদারুন কষ্ট উপভোগ করত। ঘটনাক্রমে এমন একজন এতিম যার ধন সম্পদ সব আবূ জাহলের কাছে রক্ষিত ছিল সে হুজুর ﷺ-এর কাছে এসে তাঁর দুর্ভোগের ব্যাপারেও নালিশ জানাল। তখন নবী করীম ﷺ আবূ জাহলের বাড়িতে যেয়ে এতিমের মাল ফেরত দেওয়ার কথা বলেন। কিন্তু আবূ জাহল প্রথমত তা দিতে অস্বীকার করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে তা দিতে বাধ্য হয়। –[আসবাবে নুযূল : ৪০৩]

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ .... اَلْاٰيَةَ.

শানে নুযূল : এ আয়াতটি মুনাফিকদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। তারা মুসলমানদের সামনে তাদেরকে দেখানোর জন্য নামাজ আদায় করত; কিন্তু একাকী অবস্থায় নামাজ পড়ত না। আর মুসলমানদেরকে কোনো জিনিস ধার দিতেও অস্বীকার করত। এ সূরায় কাফের ও মুনাফিকদের কতিপয় দুষ্কর্ম উল্লেখ করে তজ্জন্য জাহান্নামের শাস্তি বর্ণনা করা হয়েছে। মু'মিন ব্যক্তি বিচার দিবস অস্বীকার করে না। সুতরাং কোনো মু'মিন যদি এসব দুষ্কর্ম করে, তবে তা শরিয়ত মতে কঠোর গুনাহ ও নিন্দনীয় অপরাধ হলেও বর্ণিত শাস্তির বিধান তার জন্য প্রযোজ্য নয়। এ কারণেই প্রথমে এমন ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যে বিচার দিবস তথা কিয়ামত অস্বীকার করে। এতে অবশ্যই ইঙ্গিত আছে যে, বর্ণিত দুষ্কর্ম কোনো মু'মিন ব্যক্তি দ্বারা সংঘটিত হওয়া প্রায় অসম্ভব। এটা কোনো অবিশ্বাসী কাফেরই করতে পারে। বর্ণিত দুষ্কর্ম এই : এতিমের সাথে দুর্ব্যবহার, সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও মিসকীনকে খাদ্য না দেওয়া এবং অপরকেও দিতে উৎসাহ না দেওয়া, লোক দেখানো নামাজ পড়া এবং জাকাত না দেওয়া। এসব কর্ম এমনিতেও নিন্দনীয় এবং কঠোর গুনাহ। আর যদি কুফর ও মিথ্যারোপের ফলশ্রুতিতে কেউ এসব কর্ম করে, তবে তার শাস্তি চিরকাল দোজখে বাস। এ সূরায় ويل (দুর্ভোগ) শব্দের মাধ্যমে তা ব্যক্ত করা হয়েছে।

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَاءُوْنَ এটা মুনাফিকদের অবস্থা। তারা লোক দেখানোর জন্য এবং মুসলমানিত্বের দাবি প্রমাণ করার জন্য নামাজ পড়ে। কিন্তু নামাজ যে ফরজ, এ বিষয়ে তারা বিশ্বাসী নয়। ফলে সময়ের প্রতিও লক্ষ্য রাখে না এবং আসল নামাজেরও খেয়াল রাখে না। লোক দেখানোর জায়গা হলে পড়ে নেয়, নতুবা ছেড়ে দেয়। আসল নামাজের প্রতিই ভ্রুক্ষেপ না করা মুনাফিকদের অভ্যাস এবং عَنْ صَلَاتِهِمْ শব্দের আসল অর্থও তাই। নামাজের মধ্যে কিছু ভুল-ভ্রান্তি হয়ে যাওয়া, যা থেকে কোনো মুসলমান, এমনকি রাসূলে কারীম ﷺ ও মুক্ত ছিলেন না-তা এখানে বুঝানো হয়নি। কেননা, এজন্য জাহান্নামের শাস্তি হতে পারে না। এটা উদ্দেশ্য হলে عَنْ صَلَاتِهِمْ -এর পরিবর্তে فِىْ صَلَاتِهِمْ বলা হতো। সহীহ হাদীসসমূহে প্রমাণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জীবনেও একাধিকবার নামাজের মধ্যে ভুলচুক হয়ে গিয়েছিল।

وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ – مَاعُوْنَ শব্দের আসল অর্থ যৎকিঞ্চিৎ ও তুচ্ছ বস্তু। এমন ব্যবহার্য বস্তুসমূহকেও مَاعُوْنَ বলা হয়, যা স্বভাবত একে অপরকে ধার দেয় এবং যেগুলোর পারস্পরিক লেনদেন সাধারণ মানবতারূপে গণ্য হয়; যথা কুড়াল, কোদাল অথবা রান্না-বান্নার পাত্র। প্রয়োজনে এসব জিনিস প্রতিবেশীর কাছ থেকে চেয়ে নেওয়া দুষণীয় মনে করা হয় না। কেউ এগুলো দিতে অস্বীকৃত হলে তাকে বড় কৃপণ ও নীচ মনে করা হয়। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে مَاعُوْنَ বলে জাকাত বুঝানো হয়েছে। জাকাতকে مَاعُوْنَ বলার কারণ এই যে, জাকাত পরিমাণে আসল অর্থের তুলনায় খুবই কম-অর্থাৎ চল্লিশ ভাগের এক ভাগ হয়ে থাকে। হযরত আলী (রা.) ও ইবনে ওমর (রা.) এবং হাসান বসরী, কাতাদাহ ও যাহহাক (র.) প্রমুখ অধিকাংশ তাফসীরবিদ এখানে এ তাফসীরই করেছেন। –(মাযহারী) বলাবাহুল্য, বর্ণিত শাস্তি ফরজ কাজ তরক করার কারণেই হতে পারে। ব্যবহার্য জিনিসপত্র অপরকে দেওয়া খুব ছওয়াবের কাজ এবং মানবতার দিক দিয়ে জরুরি কিন্তু ফরজ ও ওয়াজিব নয়, যা না দিলে জাহান্নামের শাস্তি হতে পারে। কোনো কোনো হাদীসে مَاعُوْنَ -এর তাফসীর ব্যবহার্য জিনিস দ্বারা করা হয়েছে। এর মর্মার্থ তাদের চরম নীচতাকে ফুটিয়ে তোলা যে, তারা জাকাত কি দিবে? ব্যবহার্য জিনিস দেওয়ার মধ্যে কোনো খরচ নেই– এতেও তারা কৃপণতা করে। অতএব শাস্তির বিধান কেবল ব্যবহার্য জিনিস না দেওয়ার কারণে নয় বরং ফরজ জাকাত না দেওয়াসহ চরম কৃপণতার কারণে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

أَرَأَيْتَ : أَ টি প্রশ্নবোধক। رَأَيْتَ সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব فتح মাসদার اَلرُّؤْيَةُ মূলবর্ণ (ر - أ - ى) জিনস مركب (ناقص يائى ও مهموز عين) অর্থ– আপনি কী দেখেছেন?

يُكَذِّبُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّكْذِيْبُ মূলবর্ণ (ك - ذ - ب) জিনস صحيح অর্থ- সে অবিশ্বাস করে।

اَلدِّيْنِ : কিয়ামতের দিন। কোনো কোনো মুফাসসিরের মতে ইসলাম ধর্ম।

يَدُعُّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلدَّعُّ মূলবর্ণ (د - ع - ع) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– যে ধাক্কা দিয়ে তাড়ায়।

لَا يَحُضُّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع منفى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْحَضُّ মূলবর্ণ (ح - ض - ض) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- উৎসাহ প্রদান করে না।

سَاهُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার اَلسَّهْوُ মূলবর্ণ (س - ه - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– ভুলে থাকে, অসতর্ক, উদাসীন।

يُرَاؤُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব مُفَاعَلَة মাসদার اَلْمُرَاءَاةُ মূলবর্ণ (ر - أ - ى) জিনস مركب (ناقص يائى ও مهموز عين) অর্থ– লৌকিকতা প্রদর্শন করে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ : এখানে واو টি حرف عطف এবং لا টি لا نافية; يَحُضُّ শব্দটি فعل مضارع মারফূ' عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ বাক্যটি مرفوع তার فاعل টি উহ্য। যার উহ্য রূপ হলো هُوَ অর্থাৎ اَلَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ এবং عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ বাক্যটি يَحُضُّ -এর সাথে متعلق; –[ই'রাবুল কুরআন, খ : ৮, পৃ : ৪২৩]

سُورَةُ الْكَوْثَرِ مَكِّيَّةٌ

সূরা কাওছার

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত- ৩, রুকূ'- ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. নিশ্চয় আমি আপনাকে [হাউজে] কাওছার দান করেছি।	إِنَّآ أَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ﴿١﴾
২. অতএব আপনি [এই নিয়ামতসমূহের শুকরিয়াস্বরূপ] স্বীয় প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে নামাজ পড়ুন, আর [আল্লাহর নামে] কুরবানি করুন।	فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴿٢﴾
৩. নিঃসন্দেহে আপনার দুশমনই নির্বংশ [নিশ্চিহ্ন হবে]।	إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ﴿٣﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. إِنَّآ أَعْطَيْنٰكَ নিশ্চয় আমি আপনাকে দান করেছি الْكَوْثَرَ কাওছার।

২. فَصَلِّ অতএব আপনি নামাজ পড়ুন لِرَبِّكَ স্বীয় প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে وَانْحَرْ, আর কুরবানি করুন।

৩. إِنَّ شَانِئَكَ নিঃসন্দেহে আপনার দুশমনই هُوَ الْأَبْتَرُ নির্বংশ [নিশ্চিহ্ন] হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : আলোচ্য সূরার শুরুতে اَلْكَوْثَرُ শব্দ হতে তার নামকরণ করা হয়েছে سُوْرَةُ الْكَوْثَرِ। আর অত্র সূরায় حَوْض كَوْثَر সম্বন্ধে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই এ সূরার নাম سُوْرَةُ الْكَوْثَرِ রাখা হয়েছে। এতে ৩টি আয়াত, ১০টি বাক্য এবং ৪২টি অক্ষর রয়েছে।

অবতীর্ণ হওয়ার সময়কাল : হযরত আয়েশা (রা.) হতে সূরাটি মাক্কী বলে বর্ণিত হয়েছে। বেশির ভাগ মুফাসসিরদের মত এটাই। হযরত ইকরিমা, মুজাহিদ ও কাতাদাহ (র.) একে মাদানী বলেছেন। ইমাম সুয়ূতি (র.) একে সঠিক মত বলে উল্লেখ করেছেন। কেননা, হাদীসে আছে, নবী করীম ﷺ বলেন, 'এই মাত্র আমার প্রতি একটি সূরা নাজিল হয়েছে। পরে তিনি বিসমিল্লাহ বলে সূরা কাওছার পাঠ করলেন।' এ হাদীসটি হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। আর তিনি ছিলেন মদিনায়। তিনি বলেন- এ সূরাটি আমাদের উপস্থিতিতে নাজিল হয়েছে।

বিষয়বস্তু ও সারকথা : এ সূরাটি নাজিলের ঐতিহাসিক পটভূমি কি ছিল, তা সম্মুখে শানে নুযূলের আলোচনায় আমরা সামান্য উল্লেখ করেছি। অতি সংক্ষিপ্ত তিনটি আয়াতে তিনটি বক্তব্য রাখা হয়েছে। প্রথম আয়াতে নবী করীম ﷺ-এর প্রতি ইহকাল-পরকাল ব্যাপী আল্লাহ তা'আলার অজস্র নিয়ামত, প্রাচুর্য যশ-খ্যাতি, সুনাম ইত্যাদির প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে– আমি আপনাকে ব্যাপক প্রাচুর্য ও নিয়ামত দান করেছি, যার কোনো সীমারেখা নেই। দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ তা'আলা নবী করীম ﷺ-কে জীবনের সব কাজকর্ম বিশ্ব পালনকর্তার উদ্দেশ্যে করার জন্য হেদায়েত করে বলেছেন– আপনি নামাজ ও কুরআনকে একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবেদিত করুন। তৃতীয় আয়াতে ইসলামের শত্রুগণ চিরতরে

নির্মূল হওয়ার এবং উত্তরোত্তর ইসলাম ও মহানবীর শক্তি-সামর্থ্য বৃদ্ধি হয়ে পৃথিবীর সর্বত্র তাঁর আদর্শ ছড়িয়ে পড়ার ইঙ্গিত দিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। বলা হয়েছে– আপনি শিকড় কাটা ও নির্বংশ নন; বরং আপনার শত্রুরাই এ জগতের পাতা হতে চিরতরে মুছে যাবে। কোথাও তাদের নাম-ধাম ও বংশের পরিচয় খুঁজে পাওয়া যাবে না। পক্ষান্তরে আপনার পুত্র-সন্তান না থাকলেও আপনার যশ-খ্যাতি, সুনাম, বংশ পৃথিবীর বুকে চিরগৌরবময় হয়ে থাকবে। মানুষ আপনাকে মাথার তাজতুল্য স্মরণ করবে। এমনকি আপনার সঙ্গীগণের সাথে সম্পর্ক থাকাকেও গৌরব ও পরকালের নাজাতের বিষয় মনে করবে।

শানে নুযূল : মুহাম্মদ ইবনে আলী, ইবনে হোসাইন থেকে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তির পুত্রসন্তান মারা যায়, আরবে তাকে أَبْتَرْ নির্বংশ বলা হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পুত্র কাসেম অথবা ইবরাহীম যখন শৈশবেই মারা গেল, তখন কাফেররা তাঁকে নির্বংশ বলে গালি দিতে লাগল। তাদের মধ্যে কাফের 'আস ইবনে ওয়ায়েলের' নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তার সামনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোনো আলোচনা হলে সে বলত : আরে তাঁর কথা বাদ দাও। সে তো কোনো চিন্তারই বিষয় নয়। কারণ, সে নির্বংশ। তাঁর মৃত্যু হয়ে গেলে তাঁর নাম উচ্চারণ করারও কেউ থাকবে না। এর পরিপ্রেক্ষিতে সূরা কাউছার অবতীর্ণ হয়। –[ইবনে কাছীর, মাযহারী]

কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, ইহুদি কা'ব ইবনে আশরাফ একবার মক্কায় আগমন করলে কুরাইশরা তার কাছে যেয়ে বলল : আপনি কি সেই যুবককে দেখেন না, যে নিজকে ধর্মের দিক দিয়ে সর্বোত্তম বলে দাবি করে? অথচ আমরা হাজীদের সেবা করি, বায়তুল্লাহর হেফাজত করি এবং মানুষকে পানি পান করাই। কা'ব একথা শুনে বলল : আপনারাই তদপেক্ষা উত্তম। এর পরিপ্রেক্ষিতে সূরা কাউছার অবতীর্ণ হয়। –[মাযহারী]

সারকথা, পুত্রসন্তান না থাকার কারণে কাফেররা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি দোষারোপ করত অথবা অন্যান্য কারণে তাঁর প্রতি ধৃষ্টতা প্রদর্শন করত। এরই প্রেক্ষাপটে সূরা কাউছার অবতীর্ণ হয়। এতে দোষারোপের জবাব দেওয়া হয়েছে যে, শুধু পুত্রসন্তান না থাকার কারণে যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নির্বংশ বলে, তারা তাঁর প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে বে-খবর। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বংশগত সন্তান-সন্ততিও কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে যদিও তা কন্যাসন্তানের তরফ থেকে হয় অনন্তর নবীর আধ্যাত্মিক সন্তান অর্থাৎ উম্মত তো এত অধিকসংখ্যক হবে যে, পূর্ববর্তী সকল নবীর উম্মতের সমষ্টি অপেক্ষাও বেশি হবে। এছাড়া এ সূরায় রাসূলুল্লাহ ﷺ যে আল্লাহর কাছে প্রিয় ও সম্মানিত তাও তৃতীয় আয়াতে বিবৃত হয়েছে। এতে কা'ব ইবনে আশরাফ-এর উক্তি খণ্ডিত হয়ে যায়।

اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ –হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন : 'কাউছার' সেই অজস্র কল্যাণ যা আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দান করেছেন। কাউছার জান্নাতের একটি প্রস্রবণের নাম। এ উক্তি সম্পর্কে সায়ীদ ইবনে জুবায়ের (রা.)-কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন : একথাও ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উক্তির পরিপন্থি নয়। কাউছার নামক প্রস্রবণটিও এই অজস্র কল্যাণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। তাই মুজাহিদ, কাউছারের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন : এটা উভয় জাহানের অফুরন্ত কল্যাণ। এতে জান্নাতের বিশেষ কাউছার প্রস্রবণও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

হাউজে কাউছার : হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত :

بَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ اَظْهُرِنَا فِى الْمَسْجِدِ اذَا اُغْفِىَ اغْفَاءَةً ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَهُ مُتَبَسِّمًا - قُلْنَا مَا اَضْحَكَكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ لَقَدْ اُنْزِلَتْ عَلَىَّ انِفًا سُوْرَةٌ فَقَرَاَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ الخ ثُمَّ قَالَ اَتَدْرُوْنَ مَا الْكَوْثَرُ قُلْنَا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ فَاِنَّهُ نَهْرٌ وَعَدَنِيْهِ رَبِّىْ عَزَّوَجَلَّ عَلَيْهِ خَيْرٌ كَثِيْرٌ وَهُوَ حَوْضٌ تَرِدُ عَلَيْهِ اُمَّتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اٰنِيَتُهُ عَدَدُ نُجُوْمِ السَّمَاءِ فَيَخْتَلِجُ الْعَبْدُ مِنْهُمْ فَاَقُوْلُ رَبِّ اِنَّهُ مِنْ اُمَّتِىْ فَيَقُوْلُ اِنَّكَ لَا تَدْرِىْ مَا اَحْدَثَ بَعْدَكَ.

অর্থাৎ, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদে আমাদের সামনে উপস্থিত ছিলেন। হঠাৎ তাঁর মধ্যে এক প্রকার নিদ্রা অথবা অচেতনতার ভাব দেখা দিল। অতঃপর তিনি হাসি মুখে মস্তক উত্তোলন করলেন। আমরা জিজ্ঞেস করলাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার হাসির কারণ কি? তিনি বললেন : এই মুহূর্তে আমার নিকট একটি সূরা অবতীর্ণ হয়েছে। অতঃপর তিনি বিসমিল্লাহ সহ সূরা কাউছার পাঠ করলেন এবং বললেন : তোমরা জান, কাউছার কি? আমরা বললাম : আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভালো জানেন। তিনি বললেন : এটা জান্নাতের একটি নহর। আমার পালনকর্তা আমাকে এটা দিবেন বলে

ওয়াদা করেছেন। এতে অজস্র কল্যাণ আছে এবং এই হাউজে কিয়ামতের দিন আমার উম্মত পানি পান করতে যাবে। এর পানি পান করার পাত্র সংখ্যায় আকাশের তারকাসম হবে। তখন কতক লোককে ফেরেশতাগণ হাউজ থেকে হটিয়ে দিবে। আমি বলব : পরওয়ারদিগার! সে তো আমার উম্মত। আল্লাহ তা'আলা বলবেন : আপনি জানেন না, আপনার পরে সে কি নতুন মতপথ অবলম্বন করেছিল।-(বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসায়ী) উপরিউক্ত রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করার পর ইবনে কাছীর লিখেন :

وَقَدْ وَرَدَ فِىْ صِفَةِ الْحَوْضِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّهٗ يُشْخَبُ فِيْهِ مِيْزَابَانِ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ نَهْرِ الْكَوْثَرِ وَ اِنَّ اٰنِيَتَهٗ عَدَدُ نُجُوْمِ السَّمَاءِ.

অর্থাৎ, হাউজ সম্পর্কে হাদীসে আছে যে, তাতে দু'টি পরনালা আকাশ থেকে পতিত হবে, যা কাউছার নহরের পানি দ্বারা হাউজকে ভর্তি করে দেবে। এর পাত্র সংখ্যায় আকাশের তারকাসম হবে।

এ হাদীস দ্বারা সূরা কাউছার অবতরণের হেতু এবং কাউছার শব্দের তাফসীর (অজস্র কল্যাণ) জানা গেল। আরো জানা গেল যে, এই অজস্র কল্যাণের মধ্যে হাউজে কাউছারও শামিল আছে, যা কিয়ামতের দিন উম্মতে মুহাম্মদীর পিপাসা নিবারণ করবে।

এ হাদীস আরো ফুটিয়ে তুলেছে যে, আসল কাউছার প্রস্রবণটি জান্নাতে অবস্থিত এবং হাউজে কাউছার থাকবে হাশরের ময়দানে। দু'টি পরনালার সাহায্যে এতে কাউছার প্রস্রবণের পানি আনা হবে। কোনো কোনো রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, উম্মতে মুহাম্মদী জান্নাতে দাখিল হওয়ার পূর্বে হাউজে কাউছারের পানি পান করবে। এটা উপরিউক্ত রেওয়ায়েতের সাথে সামঞ্জস্যশীল। যারা পরবর্তীকালে ইসলাম ত্যাগ করেছিল কিংবা পূর্ব থেকেই মুসলমান নয়-মুনাফিক ছিল, তাদেরকেই হাউজে কাউছার থেকে হটিয়ে দেওয়া হবে।

সহীহ হাদীসসমূহে হাউজে কাউছারের পানির স্বচ্ছতা মিষ্টতা এবং কিনারাসমূহ মণি-মানিক্য দ্বারা কারুকার্যখচিত হওয়া সম্পর্কে এমন বর্ণনা আছে, যার তুলনা দুনিয়ার কোনো বস্তু দ্বারা সম্ভবপর নয়।

উপরের বর্ণনা অনুযায়ী এই সূরা যদি কাফেরদের দোষারোপের জবাবে অবতীর্ন হয়ে থাকে, তবে এ সূরায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে হাউজে কাউছারসহ কাউছার দান করার কথা বলে দোষারোপকারীদের অপপ্রচার খণ্ডন করা হয়েছে যে, তাঁর বংশধর কেবল ইহকাল পর্যন্তই চালু থাকবে না বরং তাঁর আধ্যাত্মিক সন্তানদের সম্পর্ক হাশরের ময়দানেও অনুভূত হবে। সেখানে তারা সংখ্যায়ও সকল উম্মত অপেক্ষা বেশি হবে এবং তাদের সম্মান আপ্যায়নও সর্বাপেক্ষা বেশি হবে।

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ - نَحْر –শব্দের অর্থ উট কোরবানি করা। এর মজযুম পদ্ধতি হাত-পা বেঁধে কণ্ঠনালীতে বর্শা অথবা ছুরিকা দিয়ে আঘাত করা এবং রক্ত বের করে দেওয়া। গরু-ছাগল ইত্যাদির কোরবানির পদ্ধতি জবাই করা। অর্থাৎ জন্তুকে শুইয়ে কণ্ঠনালীতে ছুরিকাঘাত করা। আরবে সাধারণত উট কোরবানি করা হতো। তাই কোরবানি বুঝাবার জন্য এখানে نَحْر শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। মাঝে মাঝে এ শব্দটি যে কোনো কোরবানির অর্থেও ব্যবহৃত হয়। সূরার প্রথম আয়াতে কাফেরদের মিথ্যা ধারণার বিপরীতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে কাউছার অর্থাৎ ইহকাল ও পরকালের প্রত্যেক কল্যাণ তাও অজস্র পরিমাণে দেওয়ার সুসংবাদ শুনানোর পর এর কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তাঁকে দু'টি বিষয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে– নামাজ ও কোরবানি। নামাজ শারীরিক ইবাদতসমূহের মধ্যে সর্ববৃহৎ ইবাদত এবং কোরবানি আর্থিক ইবাদতসমূহের মধ্যে বিশেষ স্বাতন্ত্র্য ও গুরুত্বের অধিকারী। কেননা, আল্লাহর নামে কোরবানি করা প্রতিমা পূজারীদের রীতিনীতির বিরুদ্ধে একটি জিহাদ বটে। তারা প্রতিমাদের নামে কোরবানি করত। এ কারণেই অন্য এক আয়াতেও নামাজের সাথে কোরবানির উল্লেখ আছে– اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ –আলোচ্য আয়াতে- وَانْحَرْ -এর অর্থ যে কোরবানি, একথা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), আতা, মুজাহিদ, হাসান বসরী (রা.) প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে। কোনো কোনো তাফসীরবিদ এর অর্থ নামাজে বুকে হাত বাঁধা করেছেন বলে যে রেওয়ায়েত প্রচলিত আছে, ইবনে কাছীর সেই রেওয়ায়েতকে মুনকার তথা অগ্রহণযোগ্য বলেছেন।

اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ - شَانِئٌ -এর অর্থ শত্রুতাপোষণকারী, দোষারোপকারী। যেসব কাফের রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে নির্বংশ বলে দোষারোপ করত, এ আয়াত তাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। আয়াতে অধিকাংশ রেওয়ায়েত মতে 'আস ইবনে ওয়ায়েল, কোনো কোনো রেওয়ায়েত মতে ওকবা এবং কোনো কোনো রেওয়ায়েত মতে কা'ব ইবনে আশরাফকে

বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে কাউছার অর্থাৎ অজস্র কল্যাণ দান করেছেন। এর মধ্যে সন্তান-সন্ততির প্রাচুর্যও দাখিল। তাঁর বংশগত সন্তান-সন্ততিও কম নয়। এছাড়া পয়গম্বর উম্মতের পিতা এবং উম্মত তাঁর আধ্যাত্মিক সন্তান। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উম্মত পূর্ববর্তী সকল পয়গম্বরের উম্মত অপেক্ষা অধিক হবে। সুতরাং একদিকে শত্রুদের উক্তি নস্যাৎ করে দেওয়া হয়েছে এবং অপরদিকে আরো বলা হয়েছে যে, যারা আপনাকে নির্বংশ বলে প্রকৃতপক্ষে তারাই নির্বংশ।

চিন্তা করুন, রাসূলে কারীম ﷺ -এর স্মৃতিকে আল্লাহ তা'আলা কিরূপ মাহাত্ম্য ও উচ্চমর্যাদা দান করেছেন। তাঁর আমল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত বিশ্বের কোণে কোণে তাঁর নাম দৈনিক পাঁচবার করে আল্লাহর নামের সাথে মসজিদের মিনারে উচ্চারিত হয়। পরকালে তিনি সর্বাপেক্ষা বড় সুপারিশকারীর মর্যাদা লাভ করেছেন। এর বিপরীতে বিশ্বের ইতিহাসকে জিজ্ঞাসা করুন, আস ইবনে ওয়ায়েল, ওকবা ও কা'ব ইবনে আশরাফের সন্তান-সন্ততিরা কোথায় এবং তাদের পরিবারের কি হলো? স্বয়ং তাদের নামও ইসলামি বর্ণনা দ্বারা আয়াতসমূহের তাফসীর প্রসঙ্গে সংরক্ষিত হয়ে গেছে। নতুবা আজ দুনিয়াতে তাদের নাম মুখে নেওয়ার কেউ আছে কি? فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ।

শব্দ বিশ্লেষণ :

أَعْطَيْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَال মাসদর اَلْإِعْطَاءُ মূলবর্ণ (ع - ط - و) জিনস ناقص واوى অর্থ– আমি দান করেছি।

اَلْكَوْثَرَ : খুব বেশি। অভিধানবিদরা বলেন, كَوْثَر শব্দটি كَثْرَةٌ থেকে নির্গত। যেমন, نَوْفَل শব্দটি نَفْل থেকে। যা সংখ্যায় অনেক আর মর্যাদা শ্রেষ্ঠ হয়, আরবরা তাকে كَوْثَر বলে।

মুফাসসিরীনে কেরাম كَوْثَر শব্দের বিভিন্ন অর্থ উদ্দেশ্য নিয়েছেন। যথা–

(১) কাউছার জান্নাতের একটি নহরের নাম। যার পানি দুধের চেয়েও বেশি সাদা এবং মধুর চেয়েও অতি মিষ্ট।

(২) একটি হাউজের নাম, যেটিকে আল্লাহ তা'আলা হুজুর ﷺ -কে বিশেষভাবে দান করেছেন। যার থেকে কিয়ামতের দিন তিনি তার উম্মতদেরকে পানি পান করাবেন। একথা হযরত আনাস (রাযি.) থেকে মরফূরূপে মুসলিম শরীফে উদ্ধৃত হয়েছে।

(৩) কুরআন মাজীদ। (৪) মহান নবুয়ত। (৫) মাকামে মাহমূদ। (৬) অনন্ত অফুরন্ত কল্যাণ। সায়িদ বিন যুবাইর, ইবনে আব্বাস। মুজামুল কুরআনের লেখক ইবনে আব্বাস (রাযি.)-এর কওলকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

فَصَلِّ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّصْلِيَةُ মূলবর্ণ (ص - ل - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- আপনি নামাজ পড়ুন।

اِنْحَرْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব فَتَحَ মাসদর اَلنَّحْرُ মূলবর্ণ (ن - ح - ر) জিনস صحيح অর্থ– কুরবানি করুন।

شَانِئٌ : একবচন, বহুবচন شُنَاءٌ অর্থ– বিদ্বেষ পোষণকারী।

اَبْتَرُ : সিফাতে মুশাব্বাহ। অর্থ- লেজকাটা, নিঃসন্তান, বিকলাঙ্গ, ত্রুটিপূর্ণ। بَتْر থেকে নির্গত হয়েছে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ -এখানে বাক্যটি مستأنفة مؤكدة; ان টি حرف مشبه بالفعل এবং شَانِئَكَ তার اسم আর اَبْتَرُ অথবা ضمير فصل আর ابتر টি هُوَ -এর خبر এবং বাক্যটি اِنَّ -এর خبر অথবা هُوَ টি দ্বিতীয় مبتدأ আর টি اِنَّ -এর خبر; –[ই'রাবুল কুরআন, খ.৮. পৃ : ৪৭২]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. আপনি [এই কাফেরদেরকে] বলে দিন যে, হে কাফেরগণ!	قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ۝١
২. না আমি তোমাদের উপাস্যদের উপাসনা করি।	لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۝٢
৩. আর না তোমরা আমার মা'বূদের উপাসনা কর।	وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ۝٣
৪. আর না [ভবিষ্যতেও] আমি তোমাদের উপাস্যদের উপাসনা করব [অর্থাৎ আমি একত্ববাদী হয়ে শিরিক করব না]।	وَلَآ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ۝٤
৫. আর না তোমরা [মুশরিক অবস্থায়] আমার মা'বূদের উপাসনা করবে।	وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ۝٥
৬. তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম আর আমার জন্য আমার ধর্ম।	لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ۝٦

শাব্দিক অনুবাদ :

১. قُلْ আপনি বলে দিন যে يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ হে কাফেরগণ।
২. لَآ اَعْبُدُ না আমি উপাসনা করি مَا تَعْبُدُوْنَ তোমাদের উপাস্যদের।
৩. وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ আর না তোমরা উপাসনা কর مَآ اَعْبُدُ আমার মা'বূদের।
৪. وَلَآ اَنَا عَابِدٌ আর না আমি উপাসনা করব مَّا عَبَدْتُّمْ তোমাদের উপাস্যদের।
৫. وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ আর না তোমরা উপাসনা করবে مَآ اَعْبُدُ আমার মা'বূদের।
৬. لَكُمْ دِيْنُكُمْ তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম وَلِيَ دِيْنِ আর আমার জন্য আমার ধর্ম।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : অত্র সূরার প্রথম বাক্যের শব্দ اَلْكَافِرُوْنَ হতে সূরাটির নামকরণ করা হয়েছে– سُوْرَةُ الْكَافِرُوْنَ –[সূরাতুল কাফিরূন]

অত্র সূরায় বিশেষভাবে কাফেরদের প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে এবং তাদের সাথে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুসলমানদের সকল আচরণের ক্ষেত্রে ভিন্নরূপ অবস্থা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে। এ কারণেই এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে সূরাতুল কাফিরূন। এতে ৬টি আয়াত, ২৬টি বাক্য এবং ৭৪টি অক্ষর রয়েছে।

নাজিল হওয়ার সময়কাল : হযরত ইবনে মাসউদ (রা.), হযরত ইকরামাহ (রা.) এবং হাসন বসরী (র.) বলেন, এ সূরাটি মাক্কী, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রা.) বলেন, এ সূরাটি মদিনায় অবতীর্ণ।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস এবং হযরত কাতাদাহ (রা.) হতে দু'টি মত উদ্ধৃত হয়েছে। একটি মতানুযায়ী তা মাক্কী এবং অপর একটি মতানুযায়ী মাদানী। কিন্তু অধিকাংশ মুফাস্‌সিরদের মতে, তা মাক্কী সূরা। আর এর বিষয়বস্তু হতেও তা মাক্কী বলে স্পষ্ট হয়ে উঠে।

মূলবক্তব্য : এক কথায় এর মূল বক্তব্য হলো, তাওহীদের শিক্ষা এবং মুশরিকদের বিরুদ্ধাচরণ ঘোষণা। অর্থাৎ কাফেরদের ধর্মমত, তাদের পূজা-উপাসনা এবং তাদের উপাস্য দেব-দেবী হতে মুসলমানগণ সম্পূর্ণরূপে যে নিঃসম্পর্ক এ কথাটি অত্র সূরা দ্বারা জানিয়ে দেওয়া-ই আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য। আর এ সূরা দ্বারা এ কথাও জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে, কাফের অথবা মুশরিকদের সাথে মুসলমানরা যেন সর্বদা অনমনীয়তার পরিচয় দিয়ে থাকে। কুফরি ও দীন পূর্ণমাত্রায় পরস্পর বিরোধী, আর এ দু'টির মধ্যে কোনো একটি দিকও যে পরস্পরের সাথে হওয়ার মতো নেই, এ কথাটিও তাদেরকে সম্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া উদ্দেশ্য। বর্তমান সূরাটি এ বিষয়ের জন্য পরিপূরক।

কাজেই একে বিভিন্ন ধর্মের মাঝে সমঝোতা সৃষ্টির ফর্মূলা পেশকারী সূরা মনে করার কোনো প্রশ্নই হবে না। আর কুফর যেখানে যেরূপ অবস্থায়ই থাকুক না কেন মুসলমানদেরকে তা হতে নিজেদের কথা ও কাজের মাধ্যমে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীনতা ও বর্জনের ঘোষণা করতে হবে।

দীনের ব্যাপারে মুসলমানরা যে কাফেরদের সাথে কোনো প্রকার সন্ধি-সমঝোতার আচরণ গ্রহণ করতে পারে না। তা কোনোরূপ খাতির-উদারতা ও সংকোচ-কুণ্ঠা ব্যতিরেকেই স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিতে হবে। আর আগুন ও পানির ন্যায় ইসলাম ও কুফরি দু'টি বিপরীতমুখি আদর্শ। কেননা ইসলাম হলো আল্লাহ প্রদত্ত একত্ববাদের ধর্ম, আর কুফরি মানব রচিত মানব মন গড়ানীতি, ইসলামের পরিপন্থি। মুসলমানদের উপাস্য একমাত্র আল্লাহ। আর কাফেরদের উপাস্য তারা ধার্য করেছিল ৩৬০টি মূর্তিকে। অতএব, মুসলমান ও অমুসলমানদের নীতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। –[আশরাফী]

সূরাটির ফজিলত : অত্র সূরার বহু ফজিলত রয়েছে–

১. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন– سُوْرَةُ الْكَافِرُوْنَ পবিত্র কুরআনের এক-চতুর্থাংশের সমান মর্যাদাশীল সূরা। –[তিরমিযী]
২. শিরক হতে পরিত্রাণ দানকারী হিসেবে এ সূরাটি প্রসিদ্ধ। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট হযরত নওফাল (রা.) আরজ করেন হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন একটি বিষয় শিখিয়ে দিন– যা আমি শয্যাগমনকালে রাত্রিতে পড়তে পারি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, সূরা কাফিরূন পড়ো, কেননা তা শিরক হতে পবিত্রতা ঘোষণা করে। –[তিরমিযী, আবূ দাউদ, দারেমী]

হযরত আয়েশা (রা.)-এর বর্ণিত রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : ফজরের সুন্নত নামাজে পাঠ করার জন্য দু'টি সূরা উত্তম-সূরা কাফিরূন ও সূরা এখলাস। –(মাযহারী) তাফসীরে ইবনে কাছীরে কয়েকজন সাহাবী থেকে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ফজরের সুন্নত এবং মাগরিবের পরবর্তী সুন্নতে এ দু'টি সূরা অধিক পরিমাণে পাঠ করতে শুনেছেন। জনৈক সাহাবী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আরজ করলেন : আমাকে নিদ্রার পূর্বে পাঠ করার জন্য কোনো দোয়া বলে দিন। তিনি সূরা কাফিরূন পাঠ করতে আদেশ দিলেন এবং বললেন, এটা শিরক থেকে মুক্তিপত্র। হযরত জুবায়ের ইবনে মুত'ইম (রা.) বলেন : একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন : তুমি কি চাও যে, সফরে গেলে সঙ্গীদের চেয়ে অধিক সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে থাক এবং তোমার আসবাবপত্র বেশি হয়? আমি জবাব দিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ আমি অবশ্যই এরূপ চাই। তিনি বললেন : কুরআনের শেষ দিককার পাঁচটি সূরা-সূরা কাফিরূন, নছর, ইখলাস, ফালাক ও নাস পাঠ কর এবং প্রত্যেক সূরা বিস্‌মিল্লাহ বলে শুরু কর ও বিস্‌মিল্লাহ বলে শেষ কর। হযরত জুবায়ের (রা.) বলেন, ইতঃপূর্বে আমার অবস্থা ছিল এই যে, সফরে আমার পাথেয় কম এবং সঙ্গীদের তুলনায় আমি দুর্দশাগ্রস্ত হতাম। কিন্তু যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই শিক্ষা অনুসরণ করলাম, তখন থেকে আমি সফরে সর্বাধিক স্বাচ্ছন্দ্যশীল হয়ে থাকি। হযরত আলী (রা.) বর্ণনা করেন : একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বিচ্ছু দংশন করলে তিনি পানির সাথে লবণ মিশ্রিত করলেন এবং সূরা কাফিরূন, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করতে করতে ক্ষতস্থানে পানি লাগালেন। –[মাযহারী]

শানে নুযূল : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, ওলীদ ইবনে মুগীরা, আস ইবনে ওয়ায়েল, আসওয়াদ ইবনে আব্দুল মোত্তালিব ও উমাইয়া ইবনে খলফ একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বলল : আসুন, আমরা পরস্পরে এই শান্তিচুক্তি করি যে, এক বছর আপনি আমাদের উপাস্যদের ইবাদত করবেন এবং এক বছর আমরা আপনার উপাস্যের

ইবাদত করব। –(কুরতুবী) তিবরানীর রেওয়ায়েতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, কাফেররা প্রথমে পারস্পরিক শান্তির স্বার্থে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সামনে এই প্রস্তাব রাখল যে, আমরা আপনাকে বিপুল পরিমাণে ধনৈশ্বর্য দেব, ফলে আপনি মক্কার সর্বাধিক ধনাঢ্য ব্যক্তি হয়ে যাবেন। আপনি যে মহিলাকে ইচ্ছা বিবাহ করতে পারবেন। বিনিময়ে আপনি শুধু আমাদের উপাস্যদেরকে মন্দ বলবেন না। যাদি আপনি এটাও মেনে না নেন, তবে এক বছর আমরা আপনার উপাস্যের ইবাদত করব এবং এক বছর আপনি আমাদের উপাস্যদের ইবাদত করবেন। –[মাযহারী]

আবূ সালেহ -এর রেওয়ায়েতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন : মক্কার কাফেররা পারস্পরিক শান্তির লক্ষ্যে এই প্রস্তাব দিল যে, আপনি আমাদের কোনো কোনো প্রতিমার গায়ে কেবল হাত লাগিয়ে দিন, আমরা আপনাকে সত্য বলব। এর পরিপ্রেক্ষিতে হযরত জিবরাঈল (আ.) সূরা কাফিরূন নিয়ে আগমন করলেন। এতে কাফেরদের ক্রিয়াকর্মের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ এবং আল্লাহর অকৃত্রিম ইবাদতের আদেশ আছে।

শানে নুযূলে উল্লিখিত একাধিক ঘটনার মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই। সবগুলো ঘটনাই সংঘটিত হতে পারে এবং সবগুলোর জবাবেই সূরাটি অবতীর্ণ হতে পারে। এধরনের শান্তিচুক্তিতে বাধা দেওয়া জবাবের মূল লক্ষ্য।

لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ –এ সূরায় কয়েকটি বাক্য পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হওয়ায় স্বভাবত প্রশ্ন দেখা দিতে পারে। এ ধরনের আপত্তি দূর করার জন্য বুখারী অনেক তাফসীরবিদ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একই বাক্য একবার বর্তমান কালের জন্য এবং একবার ভবিষ্যৎ কালের জন্য উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ আমি এক্ষণে কার্যত তোমাদের উপাস্যদের ইবাদত করি না এবং তোমরাও আমার উপাস্যের ইবাদত করো না এবং ভবিষ্যতেও এরূপ হতে পারে না। তাফসীরের সার-সংক্ষেপে এই তাফসীরই অবলম্বিত হয়েছে। কিন্তু বুখারীর তাফসীরে لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ –আয়াতের অর্থ এই বর্ণিত হয়েছে যে, শান্তি চুক্তির প্রস্তাবিত পদ্ধতি গ্রহণের যোগ্য নয়। আমি আমার ধর্মের উপর কায়েম আছি এবং তোমরা তোমাদের ধর্মের উপর কায়েম আছ। অতএব এর পরিণতি কি হবে। বয়ানুল কুরআনে এখানে دِيْن অর্থ ধর্ম নয়-প্রতিদান করা হয়েছে।

ইবনে কাছীর এখানে অন্য একটি তাফসীর অবলম্বন করেছেন। তিনি এক জায়গায় مَا -কে مَوْصُوْل ধরেছেন এবং অন্য জায়গায় مَصْدَرِيَّة ধরেছেন। ফলে প্রথম জায়গায় لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُوْنَ مَا أَعْبُدُ –আয়াতের অর্থ এই যে, তোমরা যেসব উপাস্যের ইবাদত কর, আমি তাদের ইবাদত করি না এবং আমি যে উপাস্যের ইবাদত করি তোমরা তার ইবাদত করো না। দ্বিতীয় জায়গায় وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُوْنَ مَا أَعْبُدُ –আয়াতের অর্থ এই যে, আমার ও তেমাদের ইবাদতের পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন। আমি তোমাদের মতো ইবাদত করতে পারি না এবং বিশ্বাস স্থাপন না করা পর্যন্ত তোমরাও আমার ইবাদত করতে পার না। এভাবে প্রথম জায়গায় উপাস্যদের বিভিন্নতা এবং দ্বিতীয় জায়গায় ইবাদত-পদ্ধতির বিভিন্নতা বিধৃত হয়েছে। সার কথা এই যে, তোমাদের মধ্যে ও আমার মধ্যে উপাস্যের ক্ষেত্রেও অভিন্নতা নেই এবং ইবাদত পদ্ধতির ক্ষেত্রেও নেই। এভাবে পুনঃ পুনঃ উল্লেখের আপত্তি দূর হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও মুসলমানদের ইবাদত-পদ্ধিতি তাই, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে বলে দেওয়া হয়েছে। আর মুশরিকদের ইবাদত-পদ্ধতি হলো নিজেদের মনগড়া।

ইবনে কাছীর (র.) এই তাফসীরের পক্ষে বক্তব্য রাখতে যেয়ে বলেন : 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' কলেমার অর্থও তাই হয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। ইবাদত-পদ্ধিতি তাই গ্রহণযোগ্য, যা মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মাধ্যমে আমাদের কাছে পৌঁছেছে।

لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ এর তাফসীর প্রসঙ্গে ইবনে কাছীর (র.) বলেন : এ বাক্যটি তেমনি যেমন অন্য আয়াতে আছে : لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ -এর সারমর্ম এই যে, আরো এক আয়াতে فَإِنْ كَذَّبُوْكَ فَقُلْ لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ইবনে কাছীর دين শব্দকে ধর্মের ক্রিয়াকর্মের অর্থে নিয়েছেন এবং উদ্দেশ্য তাই যা বয়ানুল কুরআনে আছে যে, প্রত্যেককে নিজ নিজ কর্মের প্রতিদান ও শাস্তি ভোগ করতে হবে।

কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন, স্থান বিশেষে সব পুনরুল্লেখ আপত্তিকর নয়। অনেক স্থলে পুনরুল্লেখ ভাষার অলংকাররূপে গণ্য হয়। যেমন– إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا আয়াতে তাই হয়েছে। এখানে পুনরুল্লেখের এক উদ্দেশ্য বিষয়বস্তুর তাকীদ করা এবং দ্বিতীয় উদ্দেশ্য একাধিক বাক্যে খণ্ডন করা। কারণ, তারা শান্তি চুক্তির প্রস্তাবও একাধিকবার করেছেন। –[ইবনে কাছীর]

কাফেরদের সাথে শান্তি চুক্তির কতক প্রকার বৈধ ও কতক প্রকার অবৈধ : আলোচ্য সূরায় কাফেরদের প্রস্তাবিত শান্তি চুক্তির কতক প্রকার সম্পূর্ণ খণ্ডন করে সম্পর্কচ্ছেদ ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু স্বয়ং কুরআন পাকে একথাও আছে যে, فَاِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا –অর্থাৎ কাফেররা সন্ধি করতে চাইলে তোমরাও সন্ধি কর। মদিনায় হিজরত করার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ ও ইহুদিদের সাথে শান্তি সম্পাদন করেছিলেন। তাই কোনো কোনো তাফসীরবিদ সূরা কাফিরূনকে মনসূখ ও রহিত সাব্যস্ত করেছেন এবং এর বড় কারণ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ আয়াতখানি, কেননা, এটা বাহ্যত জিহাদের আদেশের বিপরীত। কিন্তু শুদ্ধ কথা এই যে, لَكُمْ دِيْنُكُمْ -এর অর্থ এরূপ নয় যে, কুফর করার অনুমতি অথবা কুফরে বহাল থাকার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে বরং এর সারমর্ম হলো 'যেমন কর্ম তেমন ফল'। অতএব অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে সূরাটি রহিত নয়। যে ধরনের শান্তি চুক্তি নিষিদ্ধ করার জন্য সূরাটি অবতীর্ণ হয়েছিল, তা সে সময়েও নিষিদ্ধ ছিল এবং আজও নিষিদ্ধ রয়েছে। فَاِنْ جَنَحُوْا আয়াত দ্বারা এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চুক্তি দ্বারা সে শান্তি চুক্তির অনুমতি বা বৈধতা জানা যায়, তা সে সময় যেমন বৈধ ছিল, আজও তেমনি বৈধ আছে। বৈধতা ও অবৈধতার আসল কারণ হচ্ছে স্থান-কাল পাত্র এবং সন্ধির শর্তাবলি। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ফয়সালা দিতে যেয়ে বলেছেন : اِلَّا صُلْحًا اَحَلَّ حَرَامًا اَوْحَرَّمَ حَلَالًا অর্থাৎ সেই সন্ধি অবৈধ, যা কোনো হারামকে হালাল অথবা হালালকে হারাম করে। এখন চিন্তা করুন, কাফেরদের প্রস্তাবিত চুক্তি মেনে নিলে শিরক করা জরুরি হয়ে পড়ে। কাজেই সূরা কাফিরূন এ ধরনের সন্ধি নিষিদ্ধ করেছে। পক্ষান্তরে ইহুদিদের সাথে সম্পাদিত চুক্তিতে ইসলামের মূলনীতি বিরুদ্ধ কোনো বিষয় ছিল না। উদারতা, সদ্ব্যবহার ও শান্তিঅন্বেষায় ইসলামের সাথে কোনো ধর্মের তুলনা হয় না। কিন্তু শান্তি চুক্তি মানবিক অধিকারের ব্যাপারে হয়ে থাকে–আল্লাহর আইন ও ধর্মের মূলনীতিতে কোনো প্রকার দর কাষাকষির অবকাশ নেই।

শব্দ বিশ্লেষণ :

قُلْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْقَوْلُ মূলবর্ণ (ق - و - ل) জিনস اجوف واوى অর্থ– আপনি বলে দিন।

اَلْكٰفِرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার اَلْكُفْرُ মূলবর্ণ (ك - ف - ر) জিনস صَحِيْح অর্থ– কাফেরগণ।

لَا اَعْبُدُ : সীগাহ واحد متكلم বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْعِبَادَةُ মূলবর্ণ (ع - ب - د) জিনস صحيح অর্থ– না আমি উপাসনা করি।

تَعْبُدُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْعِبَادَةُ মূলবর্ণ (ع - ب - د) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা উপাসনা কর।

عَبَدْتُّمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْعِبَادَةُ মূলবর্ণ (ع - ب - د) জিনস صحيح অর্থ– তোমরা উপাসনা করেছ।

دِيْنِ : ইসম, মাসদার। একবচন, বহুবচন اديان অর্থ– ধর্ম, প্রতিফল।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ- এখানে واو টি عاطفة এবং لا টি نافيه আর اَنْتُمْ টি مبتدأ এবং عَابِدُوْنَ তার خبر; مَا টি اسم موصول আর বাক্যটি صلة অথবা مَا টি مصدرية ; [ই'রাবুল কুরআন, খ : ৮, পৃ : ৪৩১]

سُوْرَةُ النَّصْرِ مَكِّيَّةٌ

সূরা নাস্‌র

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত– ৩, রুকূ'– ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. যখন আল্লাহর সাহায্য এবং [মক্কা] বিজয় এসে পৌঁছবে।	إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ①
২. আর আপনি লোকদেরকে আল্লাহর ধর্মে [অর্থাৎ ইসলামে] দলে দলে প্রবেশ করতে দেখতে পাবেন।	وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ أَفْوَاجًا ②
৩. তখন স্বীয় প্রতিপালকের তাসবীহ ও তাহমীদ পাঠ করুন, আর তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তিনি অতিশয় তওবা কবুলকারী।	فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ③

শাব্দিক অনুবাদ :

১. اِذَا جَآءَ যখন এসে পৌঁছবে نَصْرُ اللّٰهِ আল্লাহর সাহায্য وَالْفَتْحُ এবং বিজয়।

২. وَرَاَيْتَ النَّاسَ আর আপনি দেখতে পাবেন লোকদেরকে يَدْخُلُوْنَ প্রবেশ করতে فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ আল্লাহর ধর্মে اَفْوَاجًا দলে দলে।

৩. فَسَبِّحْ তখন তাসবীহ পাঠ করুন بِحَمْدِ ও তাহমীদ رَبِّكَ স্বীয় প্রতিপালকের وَاسْتَغْفِرْهُ আর তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন اِنَّهٗ নিশ্চয় তিনি كَانَ تَوَّابًا অতিশয় তওবা কবুলকারী।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : উক্ত সূরার প্রথম আয়াত হতেই তার নামকরণ করা হয়েছে। আর দলে দলে যখন মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছিল তখন তাতে ইসলামের শক্তি ও সাহায্য যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি হচ্ছিল। এ সূরায় সে সম্পর্কেই আলোচনা করা হয়েছে। এ কারণে এ সূরার নাম দেওয়া হয়েছে سُوْرَةُ النَّصْرِ। আর অত্র সূরাকে (سُوْرَةُ التَّوْدِيْعِ) বিদায় সূরাও বলা হয়। কেননা তাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিদায় সম্পর্কীয় ইঙ্গিতও রয়েছে। এতে ৩টি আয়াত, ২৭টি বাক্য এবং ৭৭টি অক্ষর রয়েছে।

সূরাটি নাজিল হওয়ার সময়কাল : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে, এরপর আর কোনো সূরা নাজিল হয়নি; অর্থাৎ এটাই সর্বশেষ সূরা। –[মুসলিম, নাসায়ী, তাবারানী]

হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর মতে, এ সূরাটি বিদায় হজ কালে আইয়্যামে তাশরীকের মাঝামাঝি সময়ে 'মিনা' নামক স্থানে অবতীর্ণ হয়েছে। এরপর হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উষ্ট্রীর পৃষ্ঠে সওয়ার হয়ে বিদায় হজের ভাষণ দেন। –[তিরমিযী, বায়হাকী]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এ সূরাটি যখন নাজিল হয় তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, আমাকে আমার ইন্তেকালের সংবাদ দেওয়া হয়েছে। আমার আয়ুষ্কাল ফুরিয়ে এসেছে। –[আহমদ]

উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে হাবীবাহ (রা.) বলেন, এ সূরাটি যখন নাজিল হয় তখন হুযূর ﷺ বলেন, এ বছর আমার ইন্তেকাল হবে। এ কথা শুনে হযরত ফাতিমা (রা.) কেঁদে উঠেন। হযরত মুহাম্মদ ﷺ তখন বলেন, আমার বংশধরগণের মধ্যে সর্বপ্রথম তুমিই আমার সাথে সাক্ষাৎ করবে। এ কথা শুনে হযরত ফাতিমা (রা.) হেসে উঠলেন। –[ইবনে আবী হাতেম, ইবনে মারদুবিয়াহ]

সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা রয়েছে যে, সূরা আন-নাসর কুরআনের সর্বশেষ অবতীর্ণ সূরা। অর্থাৎ এরপর কুরআনের পরিপূর্ণ কোনো সূরা নাজিল হয়নি।

হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর মতে, এরপর اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ الخ আয়াতটি নাজিল হয়।

অতঃপর হুযূর ﷺ মাত্র ৮০ দিন জীবিত ছিলেন। এর মধ্যে আয়াতে كَلَالَة নাজিল হয়। তখন হুযূর ﷺ -এর বয়স মাত্র ৫০ দিন বাকি ছিল।

অতঃপর لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ الخ নাজিল হয়, তখন হুযূর ﷺ-এর বয়স মাত্র ৩৫ দিন বাকি ছিল। অতঃপর وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ الخ নাজিল হয়, তারপর হুযূর ﷺ-এর হায়াত ২১/৭ দিন বাকি ছিল।

তবে اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ الخ সূরাটি فَتْحِ مَكَّه-এর পূর্বে কি পরে নাজিল হয় এ মর্মে রূহুল মা'আনী গ্রন্থে বাহরে মুহীত হতে একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করা হয়। তাতে বর্ণিত রয়েছে, এটা খায়বার হতে ফেরার পথে নাজিল হয়। আর খায়বারের যুদ্ধ فَتْحِ مَكَّه- এর পূর্বে হয়েছিল। এটা স্বতঃসিদ্ধ কথা।

বিষয়বস্তু ও সারকথা : এ সূরার মূলবক্তব্য হচ্ছে, আরবের বুকে ইসলাম একটি অপ্রতিহত শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার এবং আরব হতে পৌত্তলিকতা নির্বাসিত হওয়ার শুভ সংকেত দান এবং নবী করীম ﷺ-এর বিদায়কাল ঘনিয়ে আসার পূর্বাভাস। সুতরাং বলা হয়েছে যে, আল্লাহর মদদ ও বিজয় যখন সমাগত হবে, তখন দিকে দিকে তোমরা লক্ষ্য করবে ইসলামের জয়জয়কার অবস্থা, দেখতে পাবে যে, দলে দলে ও গোত্রে গোত্রে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করছে। চুপে চুপে ইসলাম গ্রহণের দিন শেষ হয়েছে। এখন ইসলাম আল্লাহর মদদে পুষ্ট হয়ে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়বে এবং সত্যের প্রতিষ্ঠা ও অসত্যের বিদায় হবে। এটা ছিল মুসলমানদের জন্য একটি ভবিষ্যত বাণী। সর্বশেষে নবী করীম ﷺ-কে আল্লাহর হামদ ও গুণগানসহ তাসবীহ পাঠের এবং ইস্তেগফার করার নির্দেশ দিয়ে প্রকারান্তরে এ কথা বলা হয়েছে– ইসলাম আরবের বুকে সমস্ত বাতিল ধর্ম ও মতাদর্শের উপর একটি বিজয়ী শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত। ইসলামের এ বিজয় ডংকা পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে। সুতরাং নবীর দায়িত্ব শেষ হয়েছে। এখন তাঁর বিদায়ের দিন সমাগত। অতএব হে নবী! আপনার দ্বারা আল্লাহ যে এ মহৎ কাজ করালেন আপনি এ জন্য আল্লাহর প্রশংসায় তাসবীহ পাঠ করুন এবং বিনীত মস্তকে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকুন। এখানে উল্লেখ্য যে, আমাদের দৃষ্টিতে নবী করীম ﷺ-এর ভুল-ত্রুটি বা দায়িত্ব পালনে গাফেলতি হয়নি; বরং আল্লাহর দৃষ্টিতে বান্দা সর্বদাই অপরাধী। বান্দা কোনো সময়ই নিজেকে আল্লাহর নিকট নির্দোষ বলতে পারে না। এ দৃষ্টিকোণ থেকে শুকরিয়া আদায় ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং অতিশয় বিনয় প্রকাশের জন্যই ইস্তেগফার করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ .... الْاٰيَة.

শানে নুযূল : মক্কা বিজয়ের দিন যখন নবী করীম ﷺ বিশাল বাহিনীসহ মক্কায় প্রবেশ করেন। তখন হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ (রা.)-কে মক্কার নিম্নবর্তী এলাকায় কিছু সৈন্যসহ প্রেরণ করেন। তাদের সাথে কুরাইশরা যুদ্ধে লিপ্ত হয় ও পরাজিত হয়। তখন হযরত খালেদ (রা.) তাদেরকে অস্ত্র ফেলে দেওয়ার নির্দেশ দেন। তখন তারা ইসলাম গ্রহণ করে নেয়। তখন আল্লাহ পাক অত্র সূরা নাজিল করেন। –[সূত্র : কানযুন নুকূল : ১১০]

একাধিক হাদীস ও সাহাবীর উক্তিতে আছে যে, এ সূরায় রাসূলে কারীম ﷺ-এর ওফাত নিকটবর্তী হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত আছে। বলা হয়েছে যে, আপনার দুনিয়াতে অবস্থান করার উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে গেছে। অতএব আপনি তাসবীহ ও ইস্তেগফারে মনোনিবেশ করুন। হযরত মুকাতিল (র.)-এর রেওয়ায়েতে আছে, রাসূল ﷺ সাহাবীদের এক সামাবেশে সূরাটি তেলাওয়াত করলে সবাই আনন্দিত হলেন যে, এতে মক্কা বিজয়ের সুসংবাদ আছে। কিন্তু হযরত আব্বাস (রা.) ক্রন্দন করতে লাগলেন। তাঁকে ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, এতে আপনার ওফাতের সংবাদ লুক্কায়িত আছে। অতঃপর রাসূল ﷺ ও এর সত্যতা স্বীকার করলেন।

হরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও এরূপই রেওয়ায়েত করেছেন। তাতে আরো আছে যে, হযরত ওমর (রা.) একথা শুনে বলেন, এ সূরার মর্ম থেকে আমিও তাই বুঝি। –[সূত্র : কুরতুবী]

এ সূরাটি সর্বসম্মতিক্রমে মদিনায় অবতীর্ণ এবং এর অপর নাম সূরা 'তাওদী'। 'তাওদী' শব্দের অর্থ বিদায় করা। এ সূরায় রাসূলে কারীম ﷺ-এর ওফাত নিকটবর্তী হওয়ার ইঙ্গিত আছে বিধায় এর নাম 'তাওদী' হয়েছে।

কুরআন পাকের সর্বশেষ সূরা ও সর্বশেষ আয়াত : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, সূরা নসর কুরআনের সর্বশেষ সূরা। অর্থাৎ এরপর কোনো সম্পূর্ণ সূরা অবতীর্ণ হয়নি। কতক রেওয়ায়েতে কোনো কোনো আয়াত নাজিল হওয়ার যে কথা আছে, তা এর পরিপন্থি নয়। সূরা ফাতেহাকে এই অর্থেই কুরআনের সর্বপ্রথম সূরা বলা হয়। অর্থাৎ সম্পূর্ণ সূরা রূপে সূরা ফাতেহাই সর্বপ্রথম নাজিল হয়েছে। সুতরাং সূরা আ'লাক, মুদ্দাছছির ইত্যাদির কোনো কোনো আয়াত পূর্বে নাজিল হলেও তা এর পরিপন্থি নয়।

হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন : সূরা নসর বিদায় হজে অবতীর্ণ হয়েছে। এরপর اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ আয়াত অবতীর্ণ হয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ মাত্র আশি দিন জীবিত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হায়াতের যখন মাত্র পঞ্চাশ দিন বাকি ছিল, তখন কালালার আয়াত অবতীর্ণ হয়। অতঃপর পঁয়ত্রিশ দিন বাকি থাকার সময় لَقَدْ جَاۤءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ الخ –আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং একুশ দিন বাকি থাকার সময় اِتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ الخ আয়াত অবতীর্ণ হয়। –[কুরতুবী]

এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে, প্রথম আয়াতে বিজয় বলে মক্কা বিজয় বুঝানো হয়েছে, তবে সূরাটি মক্কা বিজয়ের পূর্বে নাজিল হয়েছে, না পরে, এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। اذ جاء ভাষাদৃষ্টে পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে বলে বাহ্যত মনে হয়। রূহুল মা'আনীতে এর অনুকূলে একটি রেওয়ায়েতও বর্ণিত আছে, যাতে বলা হয়েছে যে, খায়বার যুদ্ধ থেকে ফিরার পথে এ সূরাটি অবতীর্ণ হয়। খায়বার বিজয় যে মক্কা বিজয়ের পূর্বে হয়েছে তা সর্বজনবিদিত। রূহুল মা'আনীতে হযরত কাতাদাহ (রা.)-এর উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, এই সূরা অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'বছর জীবিত ছিলেন। যেসব রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, সূরাটি মক্কা বিজয়ের দিন অথবা বিদায় হজে নাজিল হয়েছে, সেগুলোর মর্মার্থ এরূপ হতে পারে যে, এস্থলে রাসূলুল্লাহ ﷺ সূরাটি পাঠ করে থাকবেন। ফলে সবাই ধারণা করেছে যে, এটা এক্ষুণি নাজিল হয়েছে।

একাধিক হাদীস ও সাহাবীর উক্তিতে আছে যে, এ সূরায় রাসূলে কারীম ﷺ-এর ওফাত নিকটবর্তী হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত আছে। বলা হয়েছে, আপনার দুনিয়াতে অবস্থান করার উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে গেছে। অতএব, আপনি তাসবীহ ও ইস্তেগফারে মনোনিবেশ করুন। মুকাতিল (র.)-এর রেওয়ায়েতে আছে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কেরামের এক সামাবেশে সূরাটি তেলাওয়াত করলে সবাই আনন্দিত হলেন যে, এতে মক্কা বিজয়ের সুসংবাদ আছে। কিন্তু হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) সূরাটি শুনে ক্রন্দন করতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন : এতে আপনার ওফাতের সংবাদ লুক্কায়িত আছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ ও এর সত্যতা স্বীকার করলেন। বুখারী হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে তাই রেওয়ায়েত করেছেন। তাতে আরো আছে যে, হযরত ওমর (রা.) একথা শুনে বললেন : এ সূরার মর্ম থেকে আমিও তাই বুঝি। –[কুরতুবী]

وَرَاَيْتَ النَّاسَ মক্কা বিজয়ের পূর্বে এমন লোকদের সংখ্যাও প্রচুর ছিল, যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রিসালত ও ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত বিশ্বাসের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল। কিন্তু কুরাইশদের ভয়ে অথবা কোনো ইতস্ততার কারণে তারা ইসলাম গ্রহণ করা থেকে বিরত ছিল। মক্কা বিজয় তাদের সেই বাধা দূর করে দেয়। সেমতে তারা দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করতে শুরু করে। ইয়েমেন থেকে সাত'শ ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে পথিমধ্যে আজান দিতে দিতে ও কুরআন পাঠ করতে করতে মদিনায় উপস্থিত হয়। সাধারণ আরবরাও এমনিভাবে দলে দলে ইসলামে দাখিল হয়।

মৃত্যু নিকটবর্তী মনে হলে বেশি পরিমাণে তাসবীহ ও ইস্তেগফার করা উচিত : فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ –হযরত আয়েশা (রা.) বলেন : এ সূরা নাজিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেক নামাজের পর এই দোয়া পাঠ করতেন : سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ –[বুখারী]

হযরত উম্মে সালমা (রা.) বলেন : এ সূরা নাজিল হওয়ার পর তিনি উঠাবসা, চলাফেরা তথা সর্বাবস্থায় এই দোয়া পাঠ করতেন : سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ তিনি বলতেন : আমাকে এর আদেশ করা হয়েছে। অতঃপর প্রমাণস্বরূপ সূরাটি তেলাওয়াত করতেন।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন : এ সূরা নাজিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ আপ্রাণ চেষ্টা সহকারে ইবাদতে মনোনিবেশ করেন। ফলে তাঁর পদযুগল ফুলে যায়। –[কুরতুবী]

শব্দ বিশ্লেষণ :

جَاءَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْمَجِيْئُ মূলবর্ণ (ج - ى - ء) জিনস মুরাক্কাব (اجوف يائى ও مهموز لام) অর্থ– এসে পৌঁছবে।

نَصْرُ : মাসদার। বাব نَصَرَ মূলবর্ণ (ن - ص - ر) জিনস صحيح অর্থ– সাহায্য।

اَلْفَتْحُ : মাসদার। বাব فَتَحَ মূলবর্ণ (ف - ت - ح) জিনস صحيح অর্থ– বিজয়।

رَأَيْتَ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلرُّؤْيَةُ মূলবর্ণ (ر - أ - ى) জিনস মুরাক্কাব (مهموز عين ও ناقص يائى) অর্থ– আপনি দেখতে পান।

يَدْخُلُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلدُّخُوْلُ মূলবর্ণ (د - خ - ل) জিনস صحيح অর্থ– তারা প্রবেশ করবে।

اَفْوَاجًا : বহুবচন, একবচন فَوْجٌ অর্থ– দলে দলে।

سَبِّحْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّسْبِيْحُ মূলবর্ণ (س - ب - ح) জিনস صحيح অর্থ– তাসবীহ পাঠ করুন।

اِسْتَغْفِرْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِغْفَارُ মূলবর্ণ (غ - ف - ر) জিনস صحيح অর্থ- ক্ষমা প্রার্থনা কর।

تَوَّابًا : মুবালাগার সীগাহ। অর্থ– অতিশয় তওবা কবুল কারী।

বাক্য বিশ্লেষণ :

وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا : এখানে واو টি عاطفة এবং رَأَيْتَ النَّاسَ টি فعل ماضى، فعل فاعل ও مفعول به ؛ الرؤية টি بصرية হতে পারে। তখন يَدْخُلُوْنَ বাক্যটি حالية হবে। আর الرؤية টি علمية ও হতে পারে। তখন বাক্যটি رَأَيْتَ -এর দ্বিতীয় مفعول به হবে। فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ বাক্যটি يَدْخُلُوْنَ -এর সাথে متعلق এবং يَدْخُلُوْنَ -এর واو থেকে اَفْوَاجًا টি حال হয়েছে। আর اَفْوَاجًا শব্দটি فَوْجٌ (واو টি ساكن)-এর বহুবচন।

–[ই'রাবুল কুরআন, খ : ৮, পৃ. ৪৩৫-৩৬]

سُوْرَةُ اللَّهَبِ مَكِّيَّةٌ

সূরা লাহাব

মক্কায় অবতীর্ণ; আয়াত– ৫, রুকূ'– ১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

অনুবাদ	আয়াত
১. আবূ লাহাবের হস্তদ্বয় ধ্বংস হোক এবং সে নিজেও ধ্বংস হোক।	تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ۝١
২. না তার ধন-সম্পদ তার কোনো কাজে এসেছে, আর না তার উপার্জন।	مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ ۝٢
৩. অচিরেই সে এক শিখাবিশিষ্ট অগ্নিতে প্রবেশ করবে।	سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۝٣
৪. [সে নিজেও] এবং তার স্ত্রীও, যে কাষ্ঠ বহন করে আনে।	وَّامْرَاَتُهٗ ؕ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۝٤
৫. [এবং দোজখে] তার গলায় একটি রশি হবে– খুব পাকানো।	فِىْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ۝٥

শাব্দিক অনুবাদ :

১. تَبَّتْ ধ্বংস হোক يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ আবূ লাহাবের হস্তদ্বয় وَّتَبَّ এবং সে নিজেও ধ্বংস হোক।

২. مَآ اَغْنٰى عَنْهُ না তার কোনো কাজে এসেছে مَالُهٗ তার ধন-সম্পদ وَمَا كَسَبَ আর না তার উপার্জন।

৩. سَيَصْلٰى অচিরেই সে প্রবেশ করবে। نَارًا অগ্নিতে ذَاتَ لَهَبٍ এক শিখাবিশিষ্ট।

৪. وَّامْرَاَتُهٗ এবং তার স্ত্রীও حَمَّالَةَ الْحَطَبِ যে কাষ্ঠ বহন করে আনে।

৫. فِىْ جِيْدِهَا তার গলায় হবে حَبْلٌ একটি রশি مِّنْ مَّسَدٍ খুব পকানো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : এ সূরার নাম আবী-লাহাব। সূরার প্রথম আয়াতের শব্দ تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ হতে নামকরণ করা হয়েছে। আর আবূ লাহাব-এর কার্যকলাপ সম্বন্ধে অত্র সূরায় বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়েছে। অতএব, এটাকে সূরা আবী-লাহাব নামকরণ করা স্বার্থক হয়েছে। এতে ৫টি আয়াত, ২৩টি বাক্য আবং ৭৭টি অক্ষর রয়েছে।

অবতীর্ণের সময়কাল : উক্ত সূরাটি যে মাক্কী এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই এবং মতভেদও নেই। তবে মাক্কী জীবনের বিভিন্ন সময়ের মধ্যে তা ঠিক কোন অধ্যায়ে নাজিল হয়েছে– এ কথাটি সঠিকভাবে বলা যায় না। তবে নবী করীম ﷺ এবং তাঁর ইসলামি দাওয়াত ও আন্দোলনের ব্যাপারে আবূ লাহাবের যে ভূমিকা ছিল, সে দৃষ্টিতে অনুমান করা যায় যে, যে সময়ে নবী করীম ﷺ-এর বিরোধিতা ও শত্রুতায় সে সীমালঙ্ঘন করেছিল এবং তার আচরণ ইসলামের অগ্রগতির পথে একটা বিরাট প্রতিবন্ধকতায় পরিণত হয়েছিল, ঠিক সে সময়েই এ সূরাটি নাজিল হয়েছে।

আর এটাও সম্ভব যে, কুরাইশের লোকেরা যখন নবী করীম ﷺ এবং তাঁর গোটা বংশ পরিবারের সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে তাদেরকে শি'আবে আবী তালিবে অবরুদ্ধ করেছিল এবং আবূ লাহাবই কেবল এমন ব্যক্তি ছিল, যে নিজের বংশ পরিবারের লোকদের সংস্পর্শ পরিহার করে দুশমনদের পক্ষ সমর্থন করেছিল, এ সূরাটি সে সময় নাজিল হয়েছিল।

সূরাটির বিষয়বস্তু : ইসলামের কোনো শত্রুর নাম উল্লেখ করে কুরআন মাজীদে কোনো আয়াত বা সূরা অবতীর্ণ হয়নি। কেবল এ সূরাটিকেই ব্যতিক্রম দেখা যায়। এ সূরাটি আবূ লাহাব এবং তার স্ত্রীকে উপলক্ষ করে অবতীর্ণ হয়েছে। এর কারণ হলো যে, আবূ লাহাব ইসলামের শত্রুতায় আত্মীয়তার সম্পর্কও ছিন্ন করতে কুণ্ঠিত হয়নি। অথচ নবী করীম ﷺ তার শত্রুতার জবাবে কোনো দিনই কিছু বলেননি; বরং তার অত্যাচার-নিপীড়ন নীরবেই সহ্য করে আত্মীয়তার সম্পর্কের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছেন। কিন্তু তার হীনতা-নীচতা, বিদ্বেষপরায়ণতা ও শত্রুতা যখন সীমা ছাড়িয়ে গেল, তখনই আল্লাহ তা'আলা তার এবং তার স্ত্রীর ভয়াবহ পরিণামের কথা উল্লেখ করে এ সূরাটি অবতীর্ণ করেন। বলা হয়েছে– আবূ লাহাব সর্বাঙ্গীনভাবে তার স্ত্রীসহ ধ্বংস হোক, চরমভাবে তার বিনাশ ঘটুক। তার বিপুল ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি, ইহকাল ও পরকাল কোথাও উপকারে আসবে না। সে তার কর্মের বিনিময়ে অবশ্যই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। তার সেই স্ত্রীও, যে মহানবী ﷺ-কে কষ্ট দেওয়ার জন্য কাঁটাযুক্ত ডাল বহন করে তাঁর দুয়ারে ফেলে রাখে। পরকালে তার গলায় শৃঙ্খলের হাসুলী পড়িয়ে দেওয়া হবে। এ সূরা অবতীর্ণের পরও তারা ঈমান আনল না; বরং মহানবীর বিরোধিতায় অন্ধ হয়ে গেল এবং বকাবকি ও আবোল-তাবোল বলতে লাগল। তার কথার কোনো মূল্য নেই। তাই আস্তে আস্তে মহানবীর দিকেই মানুষের মন আকৃষ্ট হতে লাগল।

আবূ লাহাবের আসল নাম ছিল আব্দুল ওয্যা। সে ছিল আব্দুল মোত্তালিবের অন্যতম সন্তান। গৌঢ়বর্ণের কারণে তার ডাক নাম হয়ে যায় আবূ লাহাব। কুরআনপাক তার আসল নাম বর্জন করেছে। কারণ, সেটা মুশরিকসুলভ। এছাড়া আবূ লাহাব ডাক নামের মধ্যে জাহান্নামের সাথে বেশ মিলও রয়েছে। সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কট্টর শত্রু ও ইসলামের ঘোর বিরোধী ছিল, সে নানাভাবে রাসূল ﷺ -কে কষ্ট দেওয়ার প্রয়াস পেত। তিনি যখন মানুষকে ঈমানের দাওয়াত দিতেন, তখন সে সাথে সাথে যেয়ে তাঁকে মিথ্যাবাদী বলে প্রচার করত। –[ইবনে কাছীর]

শানে নুযূল : বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আছে : وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ আয়াতখানি অবতীর্ণ হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাফা পর্বতে আরোহণ করে কুরাইশ গোত্রের উদ্দেশ্যে يَا صَبَاحَاه বলে অথবা আবদে মানাফ ও আব্দুল মোত্তালিব ইত্যাদি নাম সহকারে ডাক দিলেন। (এভাবে ডাক দেওয়া তখন আরবে বিপদাশঙ্কার লক্ষণ রূপে বিবেচিত হতো)। ডাক শুনে কুরাইশ গোত্র পর্বতের পাদদেশে একত্রিত হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : যদি আমি বলি যে, একটি শত্রুদল ক্রমশই এগিয়ে আসছে এবং সকাল বিকাল যে কোনো সময় তোমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, তবে তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করবে কি? সবাই একবাক্যে বলে উঠল : হ্যাঁ, অবশ্যই বিশ্বাস করব। অতঃপর তিনি বললেন : আমি (শিরক ও কুফরের কারণে আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত) এক ভীষণ আজাব সম্পর্কে তোমাদেরকে সতর্ক করছি। একথা শুনে আবূ লাহাব বলল : تَبًّا لَكَ اَلِهٰذَا جَمَعْتَنَا –ধ্বংস হও তুমি, এজন্যই কি আমাদেরকে একত্র করেছ? অতঃপর সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে পাথর মারতে উদ্যত হলো। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সূরা লাহাব অবতীর্ণ হয়।

تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ – يَدٌ শব্দের আসল অর্থ হাত। মানুষের সব কাজে হাতের প্রভাবই বেশি, তাই কোনো ব্যক্তির সত্তাকে হাত বলেই ব্যক্ত করে দেওয়া হয়; যেমন কুরআনে بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ বলা হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, আবূ লাহাব একদিন বলতে লাগল : মুহাম্মদ বলে যে, মৃত্যুর পর অমুক অমুক কাজ হবে। এরপর সে তার হাতের দিকে ইশারা করে বলল : এই হাতে সেগুলোর মধ্য থেকে একটিও আসেনি। অতঃপর সে তার হাতকে লক্ষ্য করে বলল : تَبًّا لَكُمَا مَا اَرٰى فِيْكُمَا شَيْئًا مِمَّا قَالَ مُحَمَّدٌ –অর্থাৎ তোমরা ধ্বংস হও; মুহাম্মদ যেসব বিষয় সংঘটিত হওয়ার কথা বলে আমি সেগুলোর মধ্যে একটিও তোমাদের মধ্যে দেখি না। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কুরআন আবূ লাহাবের হস্তদ্বয় ধ্বংস হোক বলেছে।

تَبَابٌ-এর অর্থ ধ্বংস ও বরবাদ হওয়া। আয়াতে বদ-দোয়ার অর্থে تَبَّتْ বলা হয়েছে। অর্থাৎ আবূ লাহাব ধ্বংস হোক। দ্বিতীয় বাক্যে وَتَبَّ-এ বদদোয়া কবুল হওয়ার খবর দেওয়া হয়েছে যে, আবূ লাহাব ধ্বংস হয়ে গেছে। মুসলমানদের ক্রোধ দমনের উদ্দেশ্যে বদদোয়ার বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ, আবূ লাহাব যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে تَبًّا বলেছিল,

তখন মুসলমানদের আন্তরিক ইচ্ছা ছিল যে, তারা তাদের জন্য বদ-দোয়া করবে। আল্লাহ তা'আলা যেন তাদের মনের কথা নিজেই বলে দিলেন। সাথে সাথে এ খবরও দিয়ে দিলেন যে, এ বদ-দোয়ার ফলে সে ধ্বংসও হয়ে গেছে। আবূ লাহাবের ধ্বংসপ্রাপ্তির এই পূর্ব সংবাদের প্রভাবে বদর যুদ্ধের সাত দিন পর তার গলায় প্লেগের ফোঁড়া দেখা দেয়। সংক্রমণের ভয়ে পরিবারের লোকেরা তাকে বিজন জয়গায় ছেড়ে আসে। শেষ পর্যন্ত এই অসহায় অবস্থায়ই তার মৃত্যু ঘটে। তিন দিন পর্যন্ত তার মৃতদেহ কেউ স্পর্শ করেনি। পঁচতে শুরু করলে চাকর-বাকরদের দ্বারা মাটিতে পুঁতে ফেলা হয়। –[বয়ানুল কুরআন]

مَا اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ –তাফসীরের সার-সংক্ষেপে مَا كَسَبَ -এর অর্থ করা হয়েছে ধনসম্পদ দ্বারা অর্জিত মুনাফা ইত্যাদি। এর অর্থ সন্তান-সন্ততিও হতে পারে। কেননা সন্তান-সন্ততিকেও মানুষের উপার্জন বলা হয়। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন : اِنَّ اَطْيَبَ مَا اَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهٖ وَاِنَّ وَلَدَهٗ مِنْ كَسْبِهٖ –অর্থাৎ মানুষ যা খায়, তন্মধ্যে তার উপার্জিত বস্তুই সর্বাধিক হালাল ও পবিত্র এবং তার সন্তান-সন্ততিও তার উপার্জিত বস্তুর মধ্যে দাখিল। অর্থাৎ সন্তানের উপার্জন খাওয়াও নিজের উপার্জন খাওয়ারই নামান্তর। (কুরতুবী) একারণে কয়েকজন তাফসীরবিদ এস্থলে مَا كَسَبَ -এর অর্থ করেছেন সন্তান-সন্ততি। আল্লাহ তা'আলা আবূ লাহাবকে যেমন দিয়েছিলেন আগাধ ধনসম্পদ, তেমনি দিয়েছিলেন অনেক সন্তান-সন্ততি। অকৃতজ্ঞতার কারণে এদু'টি বস্তুই তার গর্ব, অহমিকা ও শাস্তির কারণ হয়ে যায়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন স্বগোত্রকে আল্লাহর আজাব সম্পর্কে সতর্ক করেন তখন আবূ লাহাব একথাও বলেছিল, আমার এই ভ্রাতুষ্পুত্রের কথা যদি সত্যই হয়ে যায়, তবে আমার কাছে ঢের অর্থবল ও লোকবল আছে। আমি এগুলোর বিনিময়ে আত্মরক্ষা করব। এর প্রেক্ষাপটে আলোচ্য আয়াতখানি অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ আল্লাহর আজাব যখন তাকে পাকড়াও করল, তখন ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তার কোনো কাজে আসল না। অতঃপর পরকালের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে।

سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ অর্থাৎ কিয়ামতে অথবা মৃত্যুর পর কবরেই সে এক লেলিহান অগ্নিতে প্রবেশ করবে। তার নামের সাথে মিল রেখে অগ্নির বিশেষণ ذَاتَ لَهَبٍ বলার মধ্যে বিশেষ অলংকার রয়েছে।

وَامْرَاَتُهٗ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ আবূ লাহাবের ন্যায় তার স্ত্রীও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন ছিল। সে এ ব্যাপারে তার স্বামীকে সাহায্য করত। সে ছিল আবূ সুফিয়ানের ভগিনী ও হরব ইবনে উমাইয়ার কন্যা। তাকে উম্মে-জামীল বলা হতো। আয়াতে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, এই হতভাগীনিও তার স্বামীর সাথে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। তার অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে حَمَّالَةَ الْحَطَبِ বলা হয়েছে। এর শাব্দিক অর্থ শুষ্ককাঠ বহনকারিনী। আরবের বাক-পদ্ধতিতে পশ্চাতে নিন্দাকারীকে حَمَّالَةَ (খড়িবাহক) বলা হতো। শুষ্ক কাঠ একত্র করে যেমন কেউ অগ্নি সংযোগের ব্যবস্থা করে, পরোক্ষে নিন্দাকার্যটিও তেমনি। এর মাধ্যমে সে ব্যক্তিবর্গ ও পরিবারের মধ্যে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামকে কষ্ট দেওয়ার জন্য আবূ লাহাব পত্নী পরোক্ষে নিন্দাকার্যের সাথেও জড়িত ছিল। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ইকরিমা ও মুজাহিদ (র.) প্রমুখ তাফসীরবিদ এখানে حَمَّالَةَ الْحَطَبِ -এর এ তাফসীরই করেছেন। অপরপক্ষে ইবনে যায়েদ ও যাহহাক (র.) প্রমুখ তাফসীরবিদ একে আক্ষরিক অর্থেই রেখেছেন এবং কারণ এই বর্ণনা করেছেন যে, এই নারী বন থেকে কণ্টকযুক্ত লাকড়ি চয়ন করে আনত এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কষ্ট দেওয়ার জন্য তাঁর পথে বিছিয়ে রাখত। তার এই নীচ ও হীন কাণ্ডকে কুরআন حَمَّالَةَ الْحَطَبِ বলে ব্যক্ত করেছে। –(কুরতুবী, ইবনে কাছীর) কেউ কেউ বলেন যে, তার এই অবস্থাটি জাহান্নামে হবে। সে জাহান্নামে যাক্কুম ইত্যাদি বৃক্ষ থেকে লাকড়ি এনে জাহান্নামে তার স্বামীর উপর নিক্ষেপ করবে, যাতে অগ্নি আরো প্রজ্বলিত হয়ে উঠে, যেমন দুনিয়াতেও সে স্বামীকে সাহায্য করে তার কুফর ও জুলুম বাড়িয়ে দিত। –[ইবনে কাছীর]

পরোক্ষে নিন্দাকার্য মহাপাপ : রাসূলে করীম ﷺ বলেন : জান্নাতে পরোক্ষে নিন্দাকারী প্রবেশ করবে না। ফুযায়েল ইবনে আয়ায (র.) বলেন : তিনটি কাজ মানুষের সমস্ত সৎকর্ম বরবাদ করে দেয়, রোজাদারের রোজা এবং অজুওয়ালার অজু নষ্ট করে দেয়–গীবত, পরোক্ষে নিন্দা এবং মিথ্যা ভাষণ। আতা ইবনে সায়েব (র.) বলেন : আমি হযরত শা'বী (র.)-এর কাছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই হাদীস বর্ণনা করলাম : لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَافِكُ دَمٍ وَلَا مَشَّاءٌ بِنَمِيْمَةٍ وَلَا تَاجِرٌ يُرْبِىْ অর্থাৎ তিন প্রকার লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে না–অন্যায় হত্যাকারী, যে এখানের কথা সেখানে নিয়ে যায় এবং যে ব্যবসায়ী সুদের কারবার করে। অতঃপর আমি আশ্চর্যান্বিত হয়ে শা'বীকে জিজ্ঞেস করলাম : হাদীসে কথা চালনাকারীকে হত্যাকারী ও সুদখোরের সমতুল্য কিরূপে করা হলো? তিনি বললেন : হ্যাঁ, কথা চালনা করা এমন গুরুতর কাজ যে, এর কারণে অন্যায় হত্যা ও মাল ছিনতাইও হয়ে যায়। –[কুরতুবী]

فِيْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ - مَسَدٌ শব্দটি সীন-এর উপর সাকিনযোগে ধাতু। অর্থ রশি পাকানো, রশি মজবুত করা এবং সীন-এর উপর যবরযোগে সর্বপ্রকার মজবুত রশিকে বলা হয়।-(কামূস) কেউ কেউ আরবের অভ্যাস অনুযায়ী এর অনুবাদ করেছেন খর্জুরের রশি। কিন্তু ব্যাপক অর্থের দিক দিয়ে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) অনুবাদ করেছেন লোহার তার পাকানো মোটা দড়ি। জাহান্নামে তার গলায় লোহার তার পাকানো বেড়ী পরানো হবে। হযরত মুজাহিদ (র.) ও তাই তাফসীর করেছেন। -[মাযহারী]

হযরত শা'বী, মুকালিত (র.) প্রমুখ তাফসীরবিদ একেও দুনিয়ার অবস্থা ধরে নিয়ে অর্থ করেছেন খর্জুরের রশি। তাঁরা বলেন : আবূ লাহাব ও তার স্ত্রী ধনাঢ্য এবং গোত্রের সরদার রূপে গণ্য হতো। কিন্তু তার স্ত্রী হীনমন্যতা ও কৃপণতার কারণে বন থেকে কাঠ সংগ্রহ করে বোঝা তৈরি করত এবং বোঝার রশি তার গলায় বেঁধে রাখত, যাতে বোঝা মাথা থেকে পড়ে না যায়। একদিন সে মথায় বোঝা এবং গালায় দড়ি বাঁধা অবস্থায় ক্লান্ত-অবসন্ন হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। ফলে স্বাসরুদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যায়। এ তাফসীর অনুযায়ী এটা হবে তার অশুভ পরিণতি ও নীচতার বর্ণনা-(মাযহারী) কিন্তু আবূ লাহাবের পরিবারের পক্ষে বিশেষত তার স্ত্রীর পক্ষে এরূপ করা সুদূর পরাহত ছিল। তাই অধিকাংশ তাফসীরবিদ প্রথম তাফসীরই পছন্দ করেনে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

تَبَّتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلتَّبَابُ মূলবর্ণ (ت - ب - ب) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– ধ্বংস হোক, ভেঙ্গে যাক।

اَبِىْ لَهَبٍ : কুনিয়ত আবূ উতবাহ। নাম আব্দুল উজ্জাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব। রাসূল ﷺ -এর আপন চাচা, সে রাসূল ﷺ -এর উপর অনেক অত্যাচার করেছে।

تَبَّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلتَّبَابُ মূলবর্ণ (ت - ب - ب) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– ধ্বংশ হোক, সে বিনষ্ট হোক।

مَا اَغْنٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى منفى معروف বাব اِفْعَال মাসদার اَلْاِغْنَاءُ মূলবর্ণ (غ - ن - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– না তার কোনা কাজে এসেছে।

كَسَبَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْكَسْبُ মূলবর্ণ (ك - س - ب) জিনস صحيح অর্থ– সে উপার্জন করেছে।

سَيَصْلٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلصُّلِىُّ মূলবর্ণ (ص - ل - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– অচিরেই সে প্রবেশ করবে।

لَهَبٍ : মাসদার। অর্থ- অগ্নি প্রজ্জলিত হওয়া। ধোঁয়া ও ধূলাবালিকেও لَهَبٌ বলা হয়। আব্দুল উয্‌যা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব খুব সুন্দর মানুষ ছিল। আগুনের মতো তার শরীরের রং চমকাত। তাই তাকে এ উপাধি দেওয়া হয়েছে। বাব فَتَحَ।

حَمَّالَةَ : মুবালাগার সীগাহ, মাসদার اَلْحَمْلُ বাব ضَرَبَ মূলবর্ণ (ح - م - ل) জিনস صحيح অর্থ– যে কাষ্ঠ বহন করে আনে, কাষ্ঠ বহনকারিণী, বোঝা বহনকারিণী।

جِيْدِهَا : তার গ্রীবা, গর্দান। جِيْد -এর বহুবচন جُيُوْدٌ ও اَجْيَادٌ আসে।

مَسَدٍ : ইসম। মাসদার اَلْمَسَدُ বাব ضَرَبَ অর্থ– খুব পাকানো, রশি পাকানো, কষ্টে ফেলা। খেজুর গাছের ছাল দ্বারা পাকনো রশি।

বাক্য বিশ্লেষণ :

سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ : এখানে س টি حرف استقبال আর يَصْلٰى টি فعل مضارع এবং তার فاعل হচ্ছে هُوَ অর্থাৎ اَبُوْ لَهَبٍ ؛ نَارًا শব্দটি مفعول به এবং ذَاتَ لَهَبٍ শব্দটি نَارًا -এর সিফত। -[ই'রাবুল কুরআন , খ : ৮ পৃ. ৪৪১]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১.	আপনি [তাদেরকে] বলে দিন যে, তিনি অর্থাৎ আল্লাহ এক।
২.	আল্লাহ অমুখাপেক্ষী।
৩.	তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাকেও জন্ম দেওয়া হয়নি।
৪.	আর তাঁর সমতুল্যও কেউ নেই।

শাব্দিক অনুবাদ :

১. قُلْ আপনি বলে দিন যে هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ তিনি অর্থাৎ আল্লাহ এক।
২. اَللّٰهُ আল্লাহ الصَّمَدُ অমুখাপেক্ষী।
৩. لَمْ يَلِدْ তিনি কাউকে জন্ম দেননি وَلَمْ يُوْلَدْ এবং তাকে ও জন্ম দেওয়া হয়নি।
৪. وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ আর নেই তার। كُفُوًا সমতুল্য اَحَدٌ কেউ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরাটির নামকরণের কারণ : কুরআন মাজীদে সমস্ত সূরাসমূহের নামই সূরা হতে চয়নকৃত একটি শব্দ দ্বারা নামকরণ করা হয়েছে; কিন্তু এ সূরাটি এর ব্যতিক্রম। সূরার কোনো শব্দ দ্বারা এর নামকরণ করা হয়নি; বরং সূরার মূলবক্তব্য ও ভাবধারা হতে এটার নামকরণ করা হয়েছে, 'আল-ইখলাস'। এর অর্থ হলো– নির্ভেজাল, নিরঙ্কুশ, একনিষ্ঠতা। কেননা এ সূরায় আল্লাহর একত্ববাদ ও অন্যান্য তাওহীদের কথা বিবৃত হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহর সত্তা, গুণ ও ক্ষমতায় অন্য কোনো বস্তুর সংমিশ্রণ ও ভেজাল নেই। তাঁর ক্ষেত্রে কোনো কিছু মিশ্রিত হয়নি। তিনি নিরেট নির্ভেজাল খালেস একক সত্তা। কেউ কেউ তার নাম রেখেছেন-সূরাতুল আসাস বা মৌল সূরা। অর্থাৎ ইসলামি জীবন-বিধানটি আল্লাহ কেন্দ্রিক ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাসের উপর স্থাপিত। সে আল্লাহর মূল ও আসল পরিচয়টি এখানে তুলে ধরা হয়েছে। এ কারণে তাকে সূরাতুল আসাস বলা হয়। আবার কেউ কেউ সূরাটির প্রথম আয়াত দ্বারা তার নামকরণ করেছেন– سُوْرَةُ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ। এতে ৪টি আয়াত, ১৫টি বাক্য এবং ৪৭টি অক্ষর রয়েছে।

সূরাটি নাজিল হওয়ার সময়কাল : এ সূরাটি মাক্কী কিংবা মাদানী এ বিষয়ে মতিবিরোধ রয়েছে।

১. অনেকের মতে, তা মাক্কী। যেমন, হযরত ইবনে মাসঊদ (রা.) বলেন– কুরাইশগণ নবী করীম ﷺ -কে বলল- আপনার রব-এর বংশতালিকা বলুন, তখন এ সূরাটি অবতীর্ণ হয়। এ মতের সাথে উবাই ইবনে কা'বও একমত।

২. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, ইহুদিদের একদল লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দরবারে উপস্থিত হলো, তাদের মধ্যে কা'ব ইবনে আশরাফ, হুয়াই ইবনে আখতাবও ছিল। তারা বলল– হে মুহাম্মদ! আপনার সে রব কি রকম

যিনি আপনাকে পাঠিয়েছেন। তখন আল্লাহ তা'আলা এ সূরাটি নাজিল করেন। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, এ সূরাটি মাদানী। তবে উভয় ধরনের হাদীসকে একত্র করলে বুঝা যায় যে, প্রথমে তা মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছিল, তারপর একই প্রশ্ন ইহুদিরা মদিনাতে করলে একই সূরা পাঠ করে শুনিয়ে দেওয়া হয়।

মূলবক্তব্য : সূরাটির মূলবক্তব্য হলো, এক কথায় একত্ববাদ। রাসূলে কারীম ﷺ যখন একত্ববাদের দাওয়াত দিচ্ছিলেন তখন দেব-দেবী ও মূর্তিপূজকে জগৎ পরিপূর্ণ ছিল। মূর্তি পূজকরা কাষ্ঠ, পাথর, স্বর্ণ-রৌপ্য প্রভৃতি দ্বারা দেব-দেবীর আকার আকৃতি বানাত এবং সেগুলো পূজা করত। এগুলোই ছিল তাদের খোদা। তাদের খোদাগণের দেহ ছিল এবং সেগুলোর যথারীতি বংশ মর্যাদার ধারা ছিল। কোনো দেবতা স্ত্রীহারা ছিল না, আর কোনো দেবী স্বামীহারা ছিল না, তাদের পানাহারের প্রয়োজন ছিল। তাদের পূজারীগণ তাদের জন্য এগুলো ব্যবস্থা করে দিত। তখন মুশরিকদের অনেকেই বিশ্বাস করত যে, আল্লাহ তা'আলারও মানবাকৃতি আছে, তিনিও সে আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করেন।

তখনকার খ্রিস্টানরা এক খোদাকে বিশ্বাস করত, কিন্তু সে খোদার একজন পুত্র তো অবশ্যই থাকতে হতো, আর সে পুত্রের মাতাও থাকতে হতো এবং শ্বশুর শাশুড়িও ছিল।

অনুরূপভাবে ইহুদিগণেরও এক খোদা এবং তার পুত্র, স্ত্রী ইত্যাদি থাকতে হতো। মোটকথা, সে খোদা মানবীয় গুণাবলির উর্ধ্বে ছিল না এবং তাদের সে খোদা ভ্রমণ করত, মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করত। কখনো বা যে কোনো সৃষ্টির সাথে লড়াই কুস্তি করত। এ সব অবস্থার বাইরে ছিল অগ্নিপূজক, তারকাপূজক অর্থাৎ মাজূসী, সাবী।

আর ইহুদিগণ হযরত ওযায়ের (আ.)-কে আল্লাহর পুত্র বলত এবং নাসারাগণ হযরত ঈসা (আ.)-কে আল্লাহর পুত্র ও মরিয়ম (আ.)-কে আল্লাহর স্ত্রী বলত।

তাদের এ সকল অশ্লীল ধারণা উৎখাত করার জন্য আল্লাহ তা'আলা স্বীয় একত্ববাদের পরিচয় দান করেন এবং হযরত মুহাম্মদ ﷺ-কে একথা ঘোষণা করে দেওয়ার জন্য বলেন যে, আল্লাহ এক, তিনি কোনো মানুষ বা অন্যান্য সৃষ্টিকুলের সাথে অতুলনীয় অসামঞ্জস্যশীল এবং নিরাকার। তিনি কারো সন্তান নন এবং তাঁরও কোনো সন্তান নেই, আর এরূপ ধারণা করা অশোভনীয়। তিনি স্বনির্ভর, কারো উপর নির্ভর করা নিষ্প্রয়োজন। তিনিই সকলের চেয়ে অতুলনীয়ভাবে মহান। অশেষ ক্ষমতাবান। তাঁর সমতুল্য কেউই নেই। তাঁর বংশ ও বংশধারা নেই। তাই সকলেরই তাঁর একত্ববাদের উপর ঈমান আনয়ন করা আবশ্যক।

সূরাটির ফজিলত : এ সূরাটির ফজিলত অনেক–

১. এ সূরাটি যদি কেউ একবার শুদ্ধ করে তেলাওয়াত করে, তবে ১০ পারা কুরআনের ছওয়াব পাওয়া যাবে। যেমন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা বললেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কি এক রাতে (অর্থাৎ শোবার সময়) এক-তৃতীয়াংশ কুরআন পড়তে পারবে? সাহাবীগণ আরজ করলেন, এটা কেমন করে সম্ভব? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন– قُلْ هُوَ اللّٰهُ ثُلُثُ الْقُرْاٰنِ কুলহুওয়াল্লাহু কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ। –[বুখারী ও মুসলিম]

ইমাম আহমদ (র.) হযরত উকবাহ ইবনে আমির (রা.) হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমি তোমাদেরকে এমন তিনটি সূরাহ শুনাচ্ছি, যা তাওরাত, যাবূর, ইঞ্জিল ও কুরআন সব কিতাবেই নাজিল হয়েছে এবং বলেন, রাতে قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ এবং قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ - قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ না পড়ে শুবে না। হযরত উকবা ইবনে আমির (রা.) বলেন, আমি তখন থেকে আর এ সূরাগুলো পড়া ব্যতীত শুই না। –[ইবনে কাছীর]

২. কোনো একজন সাহাবী আরজ করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি সূরা কুলহুওয়াল্লাহটি পড়তে ভালোবাসি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করলেন, তোমার এ ভালোবাসাই তোমাকে বেহেশতে প্রবেশ করাবে। –[তিরমিযী] ইবনে কাছীর ইমাম আহমদ ও হযরত আনাস (রা.) থেকে এরূপ বর্ণনা করেন।

৩. রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেন, যে ব্যক্তি قُلْ هُوَ اللّٰهُ সূরাহ প্রতিদিন একশতবার পাঠ করবে, তবে তার পঞ্চাশ বছরের গুনাহ মাফ হয়ে যায়। অবশ্য ঋণের দায় থেকে মুক্ত হবে না। –[তিরমিযী ও দারেমী]

৪. রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি নিদ্রাগমনের শয্যায় ডান হয়ে ১০০ বার قُلْ هُوَ اللّٰهُ সূরা তেলাওয়াত করবে, আল্লাহ তাকে তার ডান দিক দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে নির্দেশ দিবেন। –[তিরমিযী]

৫. হযরত আবূ হুরায়রাহ (রা.) রেওয়ায়েত করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে قُلْ هُوَ اللّٰهُ সূরা পড়তে শুনে বললেন, ওয়াজিব হয়েছে! তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কি ওয়াজিব হয়েছে? হুযূর ﷺ বলেন, জান্নাত। –[ইবনে কাছীর, তিরমিযী, নাসায়ী]

৬. রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেন, যে ব্যক্তি দশবার এ সূরা তেলাওয়াত করবে তার জন্য বেহেশতে একটি মহল এবং যে ব্যক্তি বিশবার পড়বে তার জন্য দু'টি, আর ত্রিশবার পড়লে তিনটি মহল তৈরি হবে। –[দারেমী]

৭. প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যায় খাঁটি মনে অন্তত একবার করে তেলাওয়াত করলে ঈমানের দুর্বলতা থেকে মুক্তি পাবে এবং শিরক থেকে রক্ষা পাবে।

৮. খাঁটি মনে দুইশতবার করে তেলাওয়াত করলে একশত বছরের গুনাহ মাফ হয়ে যায়।
৯. তিনবার পাঠ করলে এক খতম কুরআন তেলাওয়াতের ছওয়াব পাওয়া যায়।
১০. এক হাজার বার পড়ে দোয়া করলে যে কোনো সৎ মনোবাসনা পূর্ণ হবে এবং বিপদ হতে মুক্তি পাওয়া যায়।
১১. কবরস্থানে গিয়ে পড়লে মুর্দাদের কবর আজাব মাফ হয়। যে কোনো রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে পড়ে দম করলে সে আরোগ্য হয়।
১২. হযরত আনাস (রা.) বলেন, জনৈক আনসার ব্যক্তি কোবা মসজিদে নামাজ পড়ালেন। প্রত্যেক রাকাতে প্রথমে [ফাতিহার পর] সূরা ইখলাস পড়া তার নিয়ম ছিল। পরে অপর কোনো সূরা পাঠ করতেন। লোকেরা তাতে আপত্তি জানিয়ে বলল– তুমি এটা কি করছ, قُلْ هُوَ اللّٰهُ সূরা পাঠের পর তাকে যথেষ্ট মনে না করে তার সাথে অন্য সূরা মিলিয়ে পাঠ করছ, এটা ঠিক নয়। হয় এ সূরাটি পড়ো অথবা তাকে বাদ দিয়ে অন্য সূরা পড়ো। তখন সে বলল, আমি তা ত্যাগ করতে পারি না। তোমরা চাইলে নামাজ পড়াবো, না হয় ইমামতি ছেড়ে দিবো; কিন্তু লোকগণ তার পরবর্তী অন্য কাউকে ইমাম বানাতে পছন্দ করল না। শেষ পর্যন্ত নবী করীম ﷺ -এর সমীপে ব্যাপারটি পেশ করা হলো। তিনি সে লোককে জিজ্ঞাসা করলেন– তোমার সাথীগণ যা চায়, তা মানতে তুমি অপারগণ কেন? তখন সে বলল– আমি এ সূরাটি খুব ভালোবাসি। তখন নবী করীম ﷺ বললেন– এ সূরার প্রতি তোমার অগাধ ভালোবাসাই তোমাকে জান্নাতী বানাবে। –[বুখারী]

এ ছাড়াও আরো অসংখ্য ফজিলতের কথা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

তা'বীর : বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি স্বপ্নে এ সূরা পাঠ করতে দেখবে আল্লাহ তা'আলা তাকে তাওহীদের প্রতি ঈমান নসীব করবেন। তার পরিবারবর্গের সংখ্যা কম হবে। সে অধিক পরিমাণে আল্লাহর জিকির করবে এবং তার দোয়া কবুল করা হবে। –[নূরুল কুরআন]

শানে নুযূল : তিরমিযী, হাকেম প্রমুখের রেওয়ায়েতে আছে মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আল্লাহ তা'আলার বংশ পরিচয় জিজ্ঞেস করেছিল, যার জবাবে এই সূরা নাজিল হয়। অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে যে, মদিনার ইহুদিরা এ প্রশ্ন করেছিল। এ কারণে যাহহাক (র.) প্রমুখ তাফসীরবিদের মতে সূরাটি মদিনায় অবতীর্ণ। –[কুরতুবী]

কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে, মুশরিকরা আরো প্রশ্ন করেছিল-আল্লাহ তা'আলা কিসের তৈরি, স্বর্ণ-রৌপ্য অথবা অন্য কিছুর? এর জবাবে সূরাটি অবতীর্ণ হয়েছে।

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ –'বলুন' কথার মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রিসালাতের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। এতে আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষকে পথ প্রদর্শনের আদেশ রয়েছে। 'আল্লাহ' শব্দটি এমন এক সত্তার নাম, যিনি চিরকাল থেকে আছেন এবং চিরকাল থাকবেন। তিনি সর্বগুণের আধার ও সর্বদোষ থেকে পবিত্র। اَحَدٌ - وَاحِدٌ ও উভয়ের অর্থ এক। কিন্তু اَحَدٌ শব্দের অর্থে এটাও শামিল যে, তিনি কোনো এক অথবা একাধিক উপাদান দ্বারা তৈরি নন, তাঁর মধ্যে একাধিকত্বের কোনো সম্ভাবনা নেই এবং তিনি কারো তুল্য নন। এটা তাদের সেই প্রশ্নের জবাব, যাতে বলা হয়েছিল আল্লাহ কিসের তৈরি? এই সংক্ষিপ্ত বাক্যে সত্তা ও গুণাবলি সম্পর্কিত সকল আলোচনা এসে গেছে এবং قُلْ শব্দের মধ্যে নবুয়তের কথা এসে গেছে। অথচ এসব আলোচনা বিরাটকায় পুস্তকে লিপিবদ্ধ করা হয়।

اَللّٰهُ الصَّمَدُ - صَمَدٌ শব্দের অর্থ সম্পর্কে তাফসীরবিদগণের অনেক উক্তি আছে। তিবরানী এসব উক্তি উদ্ধৃত করে বলেন : এগুলো সবই নির্ভুল। এতে আমাদের পালনকর্তার গুণাবলিই ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু صَمَدٌ -এর আসল অর্থ সেই সত্তা, যার কাছে মানুষ আপন অভাব ও প্রয়োজন পেশ করে এবং যার সমান মহান কেউ নয়। সার কথা এই যে, সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী, তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। –[ইবনে কাছীর]

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ –যারা আল্লাহ তা'আলার বংশ পরিচয় জিজ্ঞেস করেছিল, এটা তাদের জবাব। সন্তান প্রজনন সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য–স্রষ্টার নয়। অতএব, তিনি কারো সন্তান নন এবং তাঁর কোনো সন্তান নেই।

وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ –অর্থাৎ কেউ তাঁর সমতুল্য নয় এবং আকার-আকৃতিতে তাঁর সাথে সামঞ্জস্য রাখে না।

সূরা ইখলাসে তাওহীদ শিরকের পূর্ণ বিরোধিতা আছে : দুনিয়াতে তাওহীদ অস্বীকারকারী মুশরিকদের বিভিন্ন প্রকার বিদ্যমান আছে : সূরা ইখলাস সর্বপ্রকার মুশরিকসুলভ ধারণা খণ্ডন করে পূর্ণ তাওহীদের সবক দিয়েছে। তাওহীদ বিরোধীদের একদল স্বয়ং আল্লাহর অস্তিত্বই অস্বীকার করে না, কেউ অস্তিত্ব স্বীকার করে, কিন্তু তাঁকে চিরন্তন মানে না এবং কেউ উভয় বিষয় মানে, কিন্তু গুণাবলির পূর্ণতা অস্বীকার করে। কেউ কেউ সবই মানে, কিন্তু ইবাদতে অন্যকে শরীক করে। اَللّٰهُ اَحَدٌ বাক্যে সব ভ্রান্ত ধারণার খণ্ডন হয়ে গেছে। কতক লোক ইবাদতেও শরীক করে না, কিন্তু অন্যকে অভাব বরণকারী ও কার্যনির্বাহী মনে করে। صَمَدٌ শব্দে এই ধারণা বাতিল করা হয়েছে। যারা আল্লাহর সন্তান আছে বলে বিশ্বাস করে, তাদেরকে لَمْ يَلِدْ বলে জবাব দেওয়া হয়েছে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

قُلْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْقَوْلُ মূলবর্ণ (ق - و - ل) জিনস اجوف واوى অর্থ- আপনি বলে দিন।

اَحَدٌ : একবচন, বহুবচন احاد অর্থ– এক, একক, প্রথম।

اَلصَّمَدُ : অমুখাপেক্ষি, প্রয়োজনমুক্ত, অভাবমুক্ত। উল্লেখ্য যে, মুফাসসিরগণের নিকট صَمَدٌ -এর অর্থ, নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। ইবনে আব্বাস মুজাহিদ, হাসান, সায়িদ, ইবনে যুবাইর প্রমুখ বলেন, صَمَدٌ হলো যার পেট নেই। শা'বী (র.) বলেন, যে পাহানার করে না। আব্দুল আলিয়া হযরত উবাই বিন কা'ব (রা.) থেকে বর্ণিত, اَلصَّمَدُ -এর পরবর্তী বাক্যই তার ব্যাখ্যা। অর্থাৎ اَلَّذِىْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ অর্থাৎ صَمَدٌ হলো যে কাউকে জন্ম দেয়নি এবং নিজেও কারো থেকে জন্ম নেয়ননি। কারণ, যে জন্ম নেয়, সে অবশ্যই মারা যাবে এবং সে উত্তরাধিকারী হয়। অন্য লোকও তার থেকে মিরাস পায়। হযরত ইকরামা ও হযরত আলী (রা.)-এর উক্তি হলো, যার উপরে আর কেউ নেই। মোল্লা আলী কারী (র.) اَلْحِرْزُ الثَّمِيْنُ شَرْحُ الْحِصْنِ الْحَصِيْنِ -এর মধ্যে সকল অর্থের সারমর্ম বর্ণনা করেছেন–

وَحَاصِلُهُ الْغَنِىُّ الْمُغْنِىْ الَّذِىْ لَا يَحْتَاجُ اِلٰى شَيْئٍ وَيَحْتَاجُ اِلَيْهِ كُلُّ اَحَدٍ

মূলকথা, সামাদ হলো, যে কোনো জিনিসের দিকে মুহতাজ নয় কিন্তু তার দিকে প্রত্যেকেই মুহতাজ হয়।

لَمْ يَلِدْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ نفى حجد بلم درفعل مستقبل معروف বাব ضَرَبَ মাসদার الولادة মূলবর্ণ (و - ل - د) জিনস مثال واوى অর্থ- তিনি কাউকে জন্ম দেননি।

لَمْ يُوْلَدْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ نفى جحد بلم درفعل مستقبل مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْوِلَادَةُ মূলবর্ণ (و - ل - د) জিনস مثال واوى অর্থ– তাকে ও জন্ম দেওয়া হয়নি।

كُفُوًا : ইসম। لَمْ يَكُنْ -এর খবর বা এটি لَمْ يَكُنْ -এর খবরে লাহু আর كُفُوًا হাল হওয়ার কারণে যবর হয়েছে। তখন বাক্যটির মূল দাঁড়াবে– لَمْ يَكُنْ لَهُ اَحَدٌ كُفُوًا আর কায়দা আছে, নাকেরা ইসম অগ্রবর্তী করা হলে তার মানসূবকে হালের উপর অগ্রবর্তী করতে হবে। অর্থ– সমতুল্য, সমান। বরাবর।

বাক্য বিশ্লেষণ :

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ : এখানে قُلْ শব্দটি فعل امر তার فاعل টি উহ্য। উহ্য রূপ হচ্ছে اَنْتَ يَامُحَمَّدُ; هُوَ টি ضمير الشان আর اللّٰهُ শব্দটি مبتدأ এবং اَحَدٌ শব্দটি خبر;

اَللّٰهُ الصَّمَدُ এখানে اَللّٰهُ শব্দটি مبتدأ এবং اَلصَّمَدُ শব্দটি خبر; لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ এখানে لم টি حرف نفى আর يلد শব্দটি فعل مضارع مجزوم بلم; واو টি حرف عطف এবং لم টি حرف نفى আর يُوْلَدْ শব্দটি فعل مضارع مجزوم بلم

وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ এখানে واو টি حرف عطف এবং لَمْ টি حرف نفى আর يَكُنْ শব্দটি مضارع مجزوم بلم; لَهُ শব্দটি جارمجرور যা كُفُوًا -এর متعلق مقدم আর كُفُوًا টি اَحَدٌ -এর حال এবং اَحَدٌ শব্দটি ذوالحال

-[ই'রাবুল কুরআন, খ. ৮. পৃ. ৪৪৬]

سُوْرَةُ الْفَلَقِ مَدَنِيَّةٌ

সূরা ফালাক

মদিনায় অবতীর্ণ; আয়াত– ৫, রুকূ'– ১

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

অনুবাদ	আয়াত
১. আপনি বলুন যে, আমি প্রভাতের স্রষ্টার আশ্রয় গ্রহণ করছি।	قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴿١﴾
২. তাঁর সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর অপকারিতা হতে।	مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿٢﴾
৩. আর অন্ধকার রাত্রির অপকারিতা হতে যখন [তা] এসে উপস্থিত হয়।	وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ﴿٣﴾
৪. আর [জাদু তাগার] গ্রন্থিসমূহের উপর পড়ে পড়ে ফুৎকারকারিণীদের অপকারিতা হতে।	وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ ﴿٤﴾
৫. আর হিংসা পোষণকারীর অপকারিতা হতে যখন সে হিংসা করতে থাকে।	وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ﴿٥﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১. قُلْ আপনি বলুন যে اَعُوْذُ আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি بِرَبِّ الْفَلَقِ প্রভাতের স্রষ্টার।

২. مِنْ شَرِّ আপকারিতা হতে مَا خَلَقَ তাঁর সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর।

৩. وَمِنْ شَرِّ আর আপকারিতা হতে غَاسِقٍ অন্ধকার রাত্রির اِذَا وَقَبَ যখন (তা) এসে উপস্থিত হয়।

৪. وَمِنْ شَرِّ আর অপকরিতা হতে النَّفّٰثٰتِ পড়ে পড়ে ফুৎকার কারিণীদের فِى الْعُقَدِ গ্রন্থিসমূহের উপর।

৫. وَمِنْ شَرِّ আর অপকারিতা হতে حَاسِدٍ হিংসা পোষণকারীর اِذَا حَسَدَ যখন সে হিংসা করতে থাকে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿١﴾	১. আপনি বলুন যে, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি মানবকুলের প্রতিপালকের।
مَلِكِ النَّاسِ ﴿٢﴾	২. মানববৃন্দের অধিপতির।
اِلٰهِ النَّاسِ ﴿٣﴾	৩. সমস্ত মানবের মা'বূদের।
مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۥ الْخَنَّاسِ ﴿٤﴾	৪. কুপ্ররোচনা প্রদানকারী, পশ্চাদপসরণকারীর [অর্থাৎ শয়তানের] অপকারিতা হতে।
الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ ﴿٥﴾	৫. যে মানবমণ্ডলীর অন্তরসমূহে কুপ্ররোচনা প্রদান করে।
مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴿٦﴾	৬. চাই সে জিন হোক অথবা মানব হোক [অর্থাৎ মানব ও জিন উভয় শ্রেণির শয়তান হতে আশ্রয় নিচ্ছি]।

শাব্দিক অনুবাদ :

১. قُلْ আপনি বলুন যে اَعُوْذُ আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি بِرَبِّ النَّاسِ মানবকুলের প্রতিপালকের।

২. مَلِكِ النَّاسِ মানববৃন্দের অধিপতির।

৩. اِلٰهِ النَّاسِ সমস্ত মানবের মা'বূদের।

৪. مِنْ شَرِّ আপকারিতা হতে الْوَسْوَاسِ কুপ্ররোচনা প্রদানকারী الْخَنَّاسِ পশ্চাদপসরণকারীর (শয়তানের)

৫. الَّذِىْ يُوَسْوِسُ যে কুপ্ররোচনা প্রদান করে فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ মানবমণ্ডলীর অন্তরসমূহে।

৬. مِنَ الْجِنَّةِ চাই সে জিন হোক وَالنَّاسِ অথবা মানব হোক।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরা দুটির নামকরণের কারণ : সূরা আল-ফালাক্বের নামটি গ্রহণ করা হয়েছে সূরার প্রথম আয়াতের اَلْفَلَقْ শব্দ হতে। اَلْفَلَقْ শব্দের অর্থ হচ্ছে– বিদীর্ণ হওয়া। তা দ্বারা রাতের আঁধার ভেদ করে ঊষার উদয় হওয়ার কথা বুঝানো হয়েছে। আর সূরা আন-নাস -এর নামকরণ করা হয়েছে সূরার প্রথম আয়াতের 'আন-নাস' শব্দ দ্বারা। এর অর্থ হলো মানবকুল। কতিপয় তাফসীরকার এ সূরা দু'টিকে سُوْرَةُ الْمُعَوِّذَتَيْنِ নাম রেখেছেন। এ সূরা দু'টি পাঠ করে আল্লাহর নিকট সর্বপ্রকার অনিষ্টতা হতে পানাহ চাওয়া হয়।

সূরা আল-ফালাক্বে রয়েছে ৫টি আয়াত, ২৩টি বাক্য এবং ৬৯টি অক্ষর।
আর সূরা আন-নাসে রয়েছে ৬টি আয়াত, ২০টি বাক্য এবং ৭৯টি অক্ষর।

নাজিলের সময়কাল : এ সূরা দু'টি অবতীর্ণ হওয়ার স্থান ও সময়কাল নির্ধারণে তাফসীরকারদের মধ্যে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। এক দলের অভিমত হলো, এটা মক্কা শরীফেই অবতীর্ণ হয়। হযরত হাসান বসরী, ইকরামা, আতা ও জাবির ইবনে যায়েদ (রা.) এ মতের সমর্থক। তাঁদের মতে, যখন মহানবী ﷺ চতুর্দিক দিয়ে শত্রু দ্বারা পরিবেষ্টিত হন এবং বৈরীদল তাঁর জীবন প্রদীপ নিভিয়ে ফেলার জঘন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়, তখন তা অবতীর্ণ হয়। সূরা আল-ফালাক্বের 'রাতের অন্ধকারে অনিষ্টতা' কথাটি এ দিকেরই ইঙ্গিত বহন করে বলে অনুমিত হয়।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যোবাইর ও কাতাদাহ (রা.)-এর মতে, সূরা দু'টি মাদানী সূরার অন্তর্ভুক্ত। মদিনাবাসী ইহুদি লাবীদ ইবনে আসেম জাদুমন্ত্র দ্বারা মহানবী ﷺ -এর জীবন নাশের হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় এবং জাদুর প্রভাব মহানবী ﷺ-এর পবিত্র বদনমণ্ডলের উপর নিপতিত হয়। এ ঘটনার প্রেক্ষাপটে মদিনাতে অবস্থানকালে উক্ত সূরা দু'টি অবতীর্ণ হয়। ইবনে সা'দ ওয়াকেদীর সূত্রে বলেছেন– মহানবী ﷺ-এর জাদুগ্রস্ত হওয়ার ঘটনা ৭ম হিজরি সনের। এ সূত্র ধরে সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা (র.) সূরা দু'টিকে মাদানী বলে মনে করেন। তবে সূরা দু'টি স্পষ্টত মক্কায় অবতীর্ণ বলে যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তা জোরালো বলে মনে হয়। পরে মদিনাতে মুনাফিক, ইহুদি ও মুশরিকদের বিরোধিতা ও ষড়যন্ত্র যখন প্রবল হয়ে উঠে, তখন নবী করীম ﷺ তা পাঠ করার নির্দেশপ্রাপ্ত হন সুতরাং শুধুমাত্র জাদু সংক্রান্ত ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট করে দেওয়া সমীচীন নয়।

সূরা দু'টির বিষয়বস্তু : নবী করীম ﷺ-এর নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বে সমগ্র পৃথিবী, বিশেষ করে আরবের সমাজ ব্যবস্থা বাতিল শক্তি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হতো। মানবিকতার সম্মানজনক অবস্থান থেকে মানবজাতি পাশবিকতার নিম্নস্তরে উপনীত হয়ে পড়েছিল। আল্লাহর সর্বাভৌমত্ব ও নিরঙ্কুশ আধিপত্যকে তারা একেবারেই ভুলে গিয়েছিল। আল্লাহর আসনে সমাসীন করেছিল নানা প্রকৃতির মূর্তি, পাথর, চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদি কল্পিত দেবতাদের। পুরোহিত শ্রেণি নানা ভেলকীবাজির দ্বারা স্বার্থসিদ্ধি লাভ করত। এক কথায় সমাজে মানবিক মূল্যবোধ, নৈতিক ও চারিত্রিক বলিষ্ঠতার চরম অবক্ষয় দেখা দিয়েছিল। এমনি নৈরাজ্যকর পরিবেশে হযরত মুহাম্মদ ﷺ তাওহীদের বাণী প্রচারে আত্মনিয়োগ করলেন। প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার পরিপন্থি আদর্শ প্রচার করতে গিয়ে তিনি অসহনীয় যন্ত্রণা ও অবর্ণনীয় নির্যাতনের সম্মুখীন হলেন। দৈহিক নির্যাতন, মানসিক অশান্তি ও পারিবারিক উৎপীড়ন দ্বারাও যখন তাঁর বৈপ্লবিক প্রচারণাকে স্তব্ধ করা গেল না, তখন দুনিয়ার কোল থেকে চিরতরে অপসারিত করে দেওয়ার ঝঘন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে আল্লাহদ্রোহী শক্তি কার্পণ্য করেনি। এ সংকটজনক পরিস্থিতিতে মহানবী ﷺ আল্লাহর নির্দেশ প্রাপ্ত হলেন, দুঃখ-দৈন্য, রোগ-শোক ও ভয়-ভীতিতে তথা সর্বপ্রকার অনিষ্ট ও ক্ষয়-ক্ষতি হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা ও তাঁর শরণাপন্ন হওয়ার নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে– হে নবী! আপনি বলুন, ঊষা উদয়ের পরিচালক সর্বশক্তিমান সত্তার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি, সৃষ্টিকুলের সর্বপ্রকার অনিষ্ট হতে; গাঢ় তমসার রজনীর অনিষ্ট ও ক্ষতি হতে -যখন তা আচ্ছন্ন হয়ে যায়............।

সৃষ্টিকুলের যাবতীয় অনিষ্ট ও ক্ষয়-ক্ষতি হতে পরিত্রাণ লাভের জন্য মহানবী ﷺ প্রত্যহ এ সূরাদ্বয় পাঠ করতেন। মুসলিম জননী হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলেন– 'রাসূলে কারীম ﷺ রাত্রিকালে বিছানায় শয়নকালে দু'হাত একত্রিত করে সূরা আল-ইখলাস, আল-ফালাক্ব ও আন-নাস পাঠ করে দু'হাতের তালুতে ফুঁক দিতেন এবং সমস্ত শরীর মুছে নিতেন। হাতদ্বয় দ্বারা মোছার কাজটি মাথা হতে আরম্ভ করতেন এবং দেহের সম্মুখভাগ তিনবার মুছে ফেলতেন।'

এ সূরাদ্বয়ের আলোকে ইসলামে ঝাড়-ফুঁকের স্থান রয়েছে বলে অনুমিত হয়। অবশ্য ঝাড়-ফুঁকের বৈধতা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ না থাকলেও তা সঠিকভাবে আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতার ক্ষেত্রে অলাভজনক। কেননা বিভিন্ন সূত্রের অনেক হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে, 'যে লোক দাগানোর চিকিৎসা করাল এবং ঝাড়-ফুঁক করাল সে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল হতে বিছিন্ন হয়ে গেল।'–[তিরমিযী]

পরিশেষে বলা যায় যে, সৃষ্টিকুলের অনিষ্টকারিতা থেকে অব্যাহতি লাভ, আত্মরক্ষা ও একমাত্র আল্লাহকে নিরঙ্কুশ ক্ষমতাবান বলে স্বীকৃতি দেওয়া এবং ঝাড়–ফুঁককেই কেবল আরোগ্য লাভের মাধ্যম কল্পনা করা ইত্যাদি হচ্ছে আলোচ্য সূরাদ্বয়ের বিষয়বস্তু ও মূলকথা।

এ সূরা দুটি কুরআনের অংশ : শুধু হযরত ইবনে মাসঊদ (রা.) উক্ত সূরাদ্বয়কে কুরআনের সূরা হিসেবে মানতেন না। তাঁর নিকট রক্ষিত 'মাসহাফ' হতে তিনি নাকি এ সূরাদ্বয়কে মুছে ফেলেছেন। তিনি প্রায়ই বলতেন– 'কুরআনের অংশ নয় এমন সব জিনিস কুরআনের সাথে মিশাইও না। এ সূরাদ্বয় কুরআনে শামিল নয়। এটা তো নবী করীম ﷺ -এর প্রতি আল্লাহর দেওয়া একটি হুকুম মাত্র। তা দ্বারা আশ্রয় প্রার্থনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে মাত্র।'

ইবনে মাসউদ (রা.)-এর উক্ত অভিমতের জবাবে ওলামায়ে কেরাম বলেন–

১ তিনি তাঁর মাসহাফে সূরাদ্বয় শুধু উল্লেখ করেননি।

২. নবী করীম ﷺ যে এ সূরাদ্বয়কে কুরআনে শমিল করার অনুমতি দিয়েছেন, সে কথা হযরত ইবনে মাসঊদ (রা.) জানতে পারেননি।

৩. এটা তাঁর নিছক ব্যক্তিগত অভিমত। এ মত অন্য কারো নয়। অন্য কোনো সাহাবীও তাঁর এ মতকে সমর্থন করেননি।

৪. হযরত ওসমান (রা.) সমস্ত সাহাবীর সম্পূর্ণ ঐকমত্যের ভিত্তিতে কুরআন মাজীদের যে অনুলিপি তৈরি করিয়েছেন, তাতে উক্ত সূরাদ্বয় শমিল ছিল।

৫. নবী করীম ﷺ উক্ত সূরাদ্বয় নামাজে পড়েছিলেন বলে সহীহ হাদীস পাওয়া যায়।

মুসনাদে আহমদ গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর উপর একজন ইহুদি লাবীদ ইবনুল আসিম কর্তৃক একদা জাদু করা হয়েছিল। এর প্রভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ খুবই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এ বিষয়টি হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে হুযূর ﷺ-কে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আর জাদু যে বস্তুর মাধ্যমে করা হয়েছিল তা ছিল হুযূর ﷺ-এর চিরুনির একটি টুকরা এবং মাথা মুবারকের এক গাছি চুল সংযোজনে বনূ জুরাইজের যী আরওয়ান নামক একটি কূপের তলায় পাথর চাপা দিয়ে পুরুষ খেজুর গাছের ছড়ার আবরণে রাখা হয়েছিল।

অতঃপর হযরত মুহাম্মদ ﷺ লোক পাঠিয়ে ঐ সকল জাদুর বস্তুগুলো নিয়ে আসলেন এবং সূরা আন-নাস ও আল-ফালাক্বের এক একটি আয়াত পড়লেন এবং একটি গিরাহ খুলে ফেললেন, অতঃপর তিনি সুস্থ হয়ে গেলেন।

সহীহ বুখারী শরীফে হযরত আয়েশা (রা.) হতে এরূপ বর্ণনা রয়েছে যে, হুযূর ﷺ-এর উপর একজন ইহুদি লাবীদ ইবনুল আসিম জাদু করল, তাতে হুযূর ﷺ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অতঃপর একদা তিনি হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর নিকট বললেন যে, হে আয়েশা! আমার অসুস্থতা কি, তা আল্লাহ তা'আলা আমাকে অবগত করিয়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ আমি স্বপ্নে দেখতে পেয়েছি, আমার নিকট দু'জন (ফেরেশতা) লোক মানুষের আকৃতিতে এসেছেন। একজন আমার শিহরে বসল, অপরজন পায়ের দিকে বসল। মাথার দিকের ব্যক্তি পায়ের দিকস্থ ব্যক্তিকে প্রশ্ন করল যে, এ মহামানবের অসুস্থতা কি? অপরজন বললেন, তাঁকে জাদু করা হয়েছে। আবার প্রশ্ন করলেন, কে তাঁকে জাদু করেছে? বললেন, লবীদ ইবনে আসম যে ইহুদিদের সাহায্যকারী মুনাফিক ছিল। আবার পশ্ন করলেন কিসের মধ্যে করা হয়েছে? বললেন, একটি চিরুনি ও দাঁতের মধ্যে। অতঃপর প্রশ্ন করলেন তা কোথায় রাখা হয়েছে? বললেন, তা খেজুরের ঐ গেলাপে রাখা হয়েছে যাতে খেজুর হয়। আর তা بِئْرِ ذَرْوَانَ-এর তলায় একটি পাথরের নিচে চাপা দেওয়া অবস্থায় রয়েছে। হুযূর ﷺ স্বয়ং সে কূপে গমন করে তা বের করে আনলেন। অতঃপর হযরত আয়েশা (রা.) প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কেন তা প্রকাশ করেননি যে, অমুক ইহুদি এ বেয়াদবি করেছে? হুযূর ﷺ বললেন, আমাকে আল্লাহ শেফা দান করেছেন, আর কারো কষ্ট দেওয়া আমার পছন্দ নয়।

ইমাম ছা'লাবী (র.)-এর বর্ণনায় বলা হয়েছে, হুযূর ﷺ-এর খেদমতে একটি ছেলে ছিল, এক ইহুদি তাকে ফুসলিয়ে তার মাধ্যমে হুযূর ﷺ-এর দাঁত মোবারক ও চিরুনি মোবারক অর্জন করে এবং একটি দাঁতের সুতায় ১১টি গিরা সংযোগ করে জাদু করল। প্রত্যেকটি গিরায় একটি সুঁই লাগাল এবং চিরুনির সাথে এগুলো সংযোগ করে একত্রে খেজুর ফলের গেলাপে পাথরের নিচে চাপা দিয়ে রাখে। আল্লাহ তা'আলা سُوْرَةُ مُعَوِّذَتَيْنِ নাজিল করেছেন এবং এতে ১১টি আয়াত রয়েছে। এক এক আয়াত পড়ে হুযূর ﷺ এক একটি গিরা খুলেন এবং সুস্থতা অর্জন করেন।

জাদুর বাস্তবতা : জাদুর বাস্তবতার ব্যাপারে মতবিরোধ দেখা যায়– কারো কারো মতে, এর কোনো ভিত্তি নেই। এটা নিছক কুসংস্কার মাত্র। আবার কারো মতে, এর বাস্তবতা রয়েছে।

প্রথম দলের মতে– জাদুর কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। কাজেই তাকে বাস্তব মনে করা যেতে পারে না। কিন্তু দুনিয়ার এমন বহু জিনিস আছে যা বাস্তব অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণেই শুধু আসে; কিন্তু তা কিভাবে সংঘটিত হয় তার কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। বস্তুত যার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না তার অস্তিত্বকেই অস্বীকার করতে হবে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এমন কোনো কথা নেই। জাদু মূলত একটা মনস্তত্বিক প্রক্রিয়া। তা মন হতে সংক্রমিত হয়ে দেহকে প্রভাবিত করতে পারে, যেমন দৈহিক প্রভাব সংক্রমিত হয়ে মনকে প্রভাবিত করে। ভয় একটা মনস্তাত্বিক জিনিস; কিন্তু তা দেহে সংক্রমিত হয়ে দেহে লোমহর্ষণ ঘটে। সমস্ত শরীর কাঁপতে শুরু করে। জাদুর দ্বারা আসল ব্যাপারে পরিবির্তন ঘটে না বটে, কিন্তু তার কারণে মানুষের মন ও ইন্দ্রিয় প্রভাবিত হয়। তখন আসল ব্যাপারই পরিবর্তিত হয়ে গেছে বলে অনুভূত হয়। তবে এ কথা নিঃসন্দেহ যে, বন্দুকের গুলী ও বিমান হতে নিক্ষিপ্ত বোমার মতো জাদুর কার্যকারিতা আল্লাহর অনুমতি ছাড়া অসম্ভব; কিন্তু হাজার হাজার বছর ধরে যা মানুষের অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণে ধরা

পড়েছে তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করা নিছক হঠকারিতা বৈ কিছুই নয়। এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট প্রমাণ আছে। যেমন– ফিরআউনের যুগে যখন হযরত মূসা (আ.)-কে পাঠানো হয়েছিল, তখন হযরত মূসা (আ.)-এর নবুয়তের সত্যতা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে তারা জাদুকরদেরকে জামায়েত করেছে বলে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা দিয়েছেন–

فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ - وَقِيْلَ لِلنَّاسِ هَلْ اَنْتُمْ مُّجْتَمِعُوْنَ - لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ اِنْ كَانُوْا هُمُ الْغَالِبِيْنَ - فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوْا لِفِرْعَوْنَ اَئِنَّ لَنَا لَاَجْرًا اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِيْنَ .... الخ (اَيْضًا) سَحَرُوْا اَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوْهُمْ وَجَاؤُوْا بِسِحْرٍ عَظِيْمٍ - وَاَوْحَيْنَا اِلٰى مُوْسٰى اَنْ اَلْقِ عَصَاكَ فَاِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُوْنَ - فَاُلْقِيَ السَّحَرَةُ سٰجِدِيْنَ - قَالُوْا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

উভয় সূরার ফজিলত : হযরত উকবা ইবনে আমির (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, আমাকে নবী করীম ﷺ আদেশ দিয়েছেন আমি যেন প্রত্যেক নামাজের পর সূরা আল-ফালাক্ব ও সূরা আন-নাস পাঠ করি। –[তিরমিযী]

* হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হাবীব (রা.) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, তুমি প্রত্যেক সকাল-সন্ধ্যা সূরা আল-ইখলাস, সূরা আল-ফালাক্ব এবং সূরা আন-নাস তিনবার করে পাঠ করবে, তাহলে সব বিষয়ে তোমার জন্য যথেষ্ট হবে। –[তিরমিযী]

* হযরত আবূ হুরায়রা ও আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনাা করেন যে, নবী করীম ﷺ জিন ও ইনসানের দৃষ্টির ক্ষতি হতে পানাহ চেয়ে আল্লাহর নিকট দোয়া করতেন। যখন সূরা আল-ফালাক্ব ও আন-নাস নাজিল হয়। তখন তিনি এ দু'টি সূরা পাঠ করতে শুরু করলেন, আর অন্যান্য দোয়া পাঠ হতে বিরত থাকলেন।

* হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিছানায় বিশ্রাম করার সময় সূরা আল-ইখলাস, আল-ফালাক্ব ও আন-নাস পাঠ করে উভয় হাতে ফুঁক দিতেন। অতঃপর হাত দ্বারা চেহারা মোবারক এবং শরীরে যেখানে হাত যায় সেখানে মাসাহ করতেন। আমি যদি কষ্ট অনুভব করতাম, তবে আমাকেও এ আমল করার আদেশ প্রদান করতেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

* হযরত আয়েশা (রা.) আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কষ্ট অনুভব করতেন তখন তিনি সূরা আল-ফালাক্ব ও আন-নাস পাঠ করে দম করতেন। যখন তাঁর ব্যথা বেড়ে যেত তখন আমি নিজেই এই সূরাদ্বয় পাঠ করতাম এবং তাঁর হাত দিয়ে মাসেহ করিয়ে নিতাম।

* হযরত আয়েশা (রা.) আরো বলেন, যে রোগে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তেকাল হয়, সে সময়ও তিনি সূরা আল-ফালাক্ব ও আন-নাস পাঠ করে নিজের উপর ফুঁক দিয়ে ছিলেন। কিন্তু যখন অসুস্থতা বেড়ে গেল তখন আমি ফুঁক দিতাম এবং তাঁর চেহারা মোবারক মুছে দিতাম। –[নুরুল কুরআন]

সূরা ফালাক ও পরবর্তী সূরা নাস একই সাথে একই ঘটনায় অবতীর্ণ হয়েছে। হাফেজ ইবনে কাইয়ুম (র.) উভয় সূরার তাফসীর একত্রে লিখেছেন। তাতে বলেছেন যে, এ সূরাদ্বয়ের উপকারিতা ও কল্যাণ অপরিসীম এবং মানুষের জন্য এ দুটি সূরার প্রয়োজন অত্যাধিক। বদনজর এবং সমস্ত দৈহিক ও আত্মিক অনিষ্ট দূর করায় এ সূরাদ্বয়ের কার্যকারিতা অনেক। সত্যি বলতে কি মানুষের জন্য শ্বাস-প্রশ্বাস, পানাহার ও পোশাক-পরিচ্ছেদ যতটুকু প্রয়োজনীয়, এ সূরাদ্বয় তার চেয়ে বেশি প্রয়োজনীয়। মুসনদে আহমদে বর্ণিত আছে, জনৈক ইহুদি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপর জাদু করেছিল। ফলে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। হযরত জিবরাঈল (আ.) আগমন করে সংবাদ দিলেন যে, জনৈক ইহুদি জাদু করেছে এবং যে জিনিসে জাদু করা হয়েছে, তা অমুক কূপের মধ্যে আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ লোক পাঠিয়ে সেই জিনিস কূপ থেকে উদ্ধার করে আনলেন। তাতে কয়েকটি গ্রন্থি ছিল। তিনি গ্রন্থিগুলো খুলে দেওয়ার সাথে সাথে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে শয্যা ত্যাগ করেন। জিবরাঈল ইহুদীর নাম বলে দিয়েছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে চিনতেন। কিন্তু ব্যক্তিগত ব্যাপারে কারো কাছ থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার অভ্যাস তাঁর কোনো দিনই ছিল না। তাই আজীবন এই ইহুদীকে কিছু বলেন নি এবং তার উপস্থিতিতে মুখমণ্ডলে কোনোরূপ অভিযোগের চিহ্নও প্রকাশ করেন নি। কপটবিশ্বাসী হওয়ার কারণে ইহুদি রীতিমত দরবারে হাজির হতো। সহীহ বুখারীতে হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপর জনৈক ইহুদী জাদু করলে তার প্রভাবে তিনি মাঝে মাঝে দিশেহারা হয়ে পড়তেন এবং যে কাজটি করেন নি, তাও করেছেন বলে অনুভব করতেন। একদিন তিনি হযরত আয়েশা (রা.)-কে বললেন, আমার রোগটা কি আল্লহ তা'আলা তা আমাকে বলে দিয়েছেন। (স্বপ্নে) দু'ব্যক্তি আমার কাছে আসল এবং একজন শিয়রের কাছেও অন্যজন পায়ের কাছে বসে গেল। শিয়রের কাছে উপবিষ্ট ব্যক্তি অন্যজনকে বলল, তাঁর অসুখটা কি? অন্যজন বলল : ইনি জাদুগ্রস্ত। প্রথম ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, কে জাদু করল? উত্তর হলো, ইহুদিদের মিত্র মুনাফিক লবীদ ইবনে আ'সাম জাদু করেছে। আবার প্রশ্ন হলো, কি বস্তুতে জাদু করেছে? উত্তর

হলো, একটি চিরুনীতে। আবার প্রশ্ন হলো, চিরুনীটি কোথায়? উত্তর হলো, খেজুর ফলের আবরণীতে 'বরযরওয়ান' কূপের একটি পাথরের নিচে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সে কূপে গেলেন এবং বললেন, স্বপ্নে আমাকে এই কূপই দেখানো হয়েছে। অতঃপর চিরুনীটি সেখান থেকে বের করে আনলেন। হযরত আয়েশা (রা.) বললেন, আপনি ঘোষণা করলেন না কেন (যে, অমুক ব্যক্তি আমার উপর জাদু করেছে)? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন আল্লাহ তা'আলা আমাকে রোগ মুক্ত করেছেন। আমি কারো জন্য কষ্টের কারণ হতে চাই না। (উদ্দেশ্য, একথা ঘোষণা করলে মুসলমানরা তাকে হত্যা করত অথবা কষ্ট দিত)। মুসনাদে আহমদের রেওয়ায়েতে আছে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অসুখ ছয় মাস স্থায়ী হয়েছিল। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আরো আছে যে, কতক সাহাবায়ে কেরাম জানতে পেরেছিলেন যে, এ দুষ্কর্মের হোতা লবীদ ইবনে আ'সাম। তাঁরা একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এসে আরজ করলেন, আমরা এই পাপিষ্ঠকে হত্যা করব না কেন? তিনি তাঁদেরকে সেই উত্তর দিলেন, যা হযরত আয়েশা (রা.)-কে দিয়েছিলেন। ইমাম সা'লাবী (র.)-এর রেওয়ায়েতে আছে জনৈক বালক রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাজকর্ম করত। ইহুদি তার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর চিরুনী হস্তগত করতে সক্ষম হয়। অতঃপর একটি তাঁতের তাতের এগারটি গ্রন্থি লাগিয়ে প্রত্যেক গ্রন্থিতে একটি করে সুঁই সংযুক্ত করে। চিরুনীসহ সেই তার খেজুর ফলের আবরণীতে রেখে অতঃপর একটি কূপের প্রস্তর খণ্ডের নিচে রেখে দেওয়া হয়। আল্লাহ তা'আলা এগার আয়াতবিশিষ্ট এ দু'টি সূরা নাজিল করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেক গ্রন্থিতে এক আয়াত পাঠ করে তা খুলতে লাগলেন। গ্রন্থি খোলা সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথে তিনি অনুভব করলেন যেন একটি বোঝা নিজের উপর থেকে সরে গেছে। -[ইবনে কাছীর]

জাদুগ্রস্ত হওয়া নবুয়তের পরিপন্থী নয় : যারা জাদুর স্বরূপ সম্পর্কে অবগত নয়, তারা বিস্মিত হয় যে, আল্লাহর রাসূলের উপর জাদু কিরূপে ক্রিয়াশীল হতে পারে! জাদুর স্বরূপ ও তার বিশদ বিবরণ সূরা বাকারায় বর্ণিত হয়েছে। এখানে এতটুকু জানা জরুরি যে, জাদুর ক্রিয়াও অগ্নি, পানি ইত্যাদি স্বাভাবিক কারণাদির ক্রিয়ার ন্যায়। অগ্নি দাহন করে অথবা উত্তপ্ত করে, পানি ঠাণ্ডা করে এবং কোনো কানো কারনের পরিপ্রেক্ষিতে জ্বর আসে! এগুলো সবই স্বাভাবিক ব্যাপার। পয়গম্বরগণ এগুলোর উর্ধ্বে নন। জাদুর প্রতিক্রিয়াও এমনি ধরণের একটি ব্যাপার। কাজেই তাঁদের জাদুগ্রস্ত হওয়া অবান্তর নয়।

সূরা ফালাক ও সূরা নাস-এর ফজিলত : প্রত্যেক মু'মিনের বিশ্বাস এই যে, ইহকাল ও পরকালের সমস্ত লাভ-লোকসান আল্লাহ তা'আলার করায়ত্ত। তাঁর ইচ্ছা ব্যতিরেকে কেউ কারো অণু পরিমাণ লাভ অথবা লোকসান করতে পারে না। অতএব, ইহকাল ও পরকালের সমস্ত বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকার একমাত্র উপায় হচ্ছে নিজেকে আল্লাহর আশ্রয়ে দিয়ে দেওয়া এবং কাজেকর্মে নিজেকে তাঁর আশ্রয়ে যাওয়ার যোগ্য করতে সচেষ্ট হওয়া। সূরা ফালাকে ইহলৌকিক বিপদাপদ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়ার শিক্ষা আছে এবং সূরা নাসে পারলৌকিক বিপাদপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে। নির্ভরযোগ্য হাদীসসূহে উভয় সূরার অনেক ফজিলত ও বরকত বর্ণিত আছে। সহীহ মুসলিমে ওকবা ইবনে আমের (রা.)-এর বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমরা লক্ষ্য করেছ কি, অদ্য রাত্রিতে আল্লাহ তা'আলা আমার প্রতি এমন আয়াত নাজিল করেছেন, যার সতুল্য আয়াত দেখা যায় না অর্থাৎ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ও الْفَلَقِ আয়াতসমূহ। অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে তওরাত, ইঞ্জিল, জাবুর এবং কুরআনেও অনুরূপ কোনো সূরা নেই। এক সফরে রাসূলুল্লাহ ﷺ ওকবা ইবনে আমের (রা.)-কে সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করালেন, অতঃপর মাগরিবের নামাজে এ সূরাদ্বয়ই তিলাওয়াত করে বললেন : এই সূরাদ্বয় নিদ্রা যাওয়ার সময় এবং নিদ্রা থেকে গাত্রোত্থানের সময়ও পাঠ কর। অন্য হাদীসে তিনি প্রত্যেক নামাজের পর সূরাদ্বয় পাঠ করার আদেশ করেছেন। –[আবূ দাউদ, নাসায়ী]

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো রোগে আক্রান্ত হলে এই সূরাদ্বয় পাঠ করে হাতে ফুঁদিয়ে সর্বাঙ্গে বুলিয়ে দিতেন। ইন্তেকালের পূর্বে যখন তাঁর রোগযন্ত্রণা বৃদ্ধি পায়, তখন আমি এই সূরাদ্বয় পাঠ করে তাঁর হাতে ফুঁক দিতাম। অতঃপর তিনি নিজে তা সর্বাঙ্গে বুলিয়ে নিতেন। আমার হাত তাঁর পবিত্র হাতের বিকল্প হতে পারত না। তাই আমি এরূপ করতাম। -[ইবনে কাছীর]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হাবীব (রা.) বর্ণনা করেন, এক রাত্রিতে বৃষ্টি ও ভীষণ অন্ধকার ছিল। আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে খুঁজতে বের হলাম। যখন তাঁকে পেলাম, তখন প্রথমেই তিনি বললেন, বল। আমি আরজ করলাম, কি বলব? তিনি বললেন, সূরা ইখলাছ ও কুল আউযু সূরাদ্বয়। সকাল-সন্ধ্যায় এগুলো তিনবার পাঠ করলে তুমি প্রত্যেক কষ্ট থেকে নিরাপদ থাকবে। -[মাযহারী]

সার কথা এই যে, যাবতীয় বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম এই সূরাদ্বয়ের আমল করতেন। অতঃপর আয়াতসমূহের তাফসীর দেখু :

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ - فَلَقٌ -এর শাব্দিক অর্থ বিদীর্ণ হওয়া। এখানে উদ্দেশ্য নিশি শেষে ভোর হওয়া। অন্য এক আয়াতে আল্লাহর গুণ فَالِقُ الْاِصْبَاحِ বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে আল্লাহর সমস্ত গুণের মধ্য থেকে একে অবলম্বন করার রহস্য এই

হতে পারে যে, রাত্রির অন্ধকার প্রায়ই অনিষ্ট ও বিপদাপদের কারণ হয়ে থাকে এবং ভোরের আলো সেই বিপদাপদের আশংকা দূর করে দেয়। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, যে তাঁর কাছে আশ্রয় চাইবে, তিনি তার সকল মসিবত দূর করে দিবেন। -[মাযহারী]

مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ আল্লামা ইবনে কাইয়ূম (র.) লিখেন– شَرّ শব্দটি দু'প্রকার বিষয়বস্তুকে শামিল করে এক, প্রত্যক্ষ অনিষ্ট ও বিপদ, যাদ্বারা মানুষ সরাসরি কষ্ট পায়, দুই. যা মুসীবত ও বিপদাপদের কারণ হয়ে থাকে; যেমন কুফর ও শিরক। কুরআন ও হাদীসে যেসব বস্তু থেকে আশ্রয় চাওয়ার কথা আছে, সেগুলো এই প্রকারদ্বয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সেগুলো হয় নিজেই বিপদ, না হয় কোনো বিপদের কারণ।

আয়াতের ভাষায় সমগ্র সৃষ্টির অনিষ্টই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কাজেই আশ্রয় গ্রহণের জন্য এ বাক্যটিই যথেষ্ট ছিল কিন্তু এস্থলে আরো তিনটি বিষয় আলাদা করে উল্লেখ করা হয়েছে, যা প্রায়ই বিপদ ও মুসীবতের কারণ হয়ে থাকে। প্রথমে বলা হয়ছে : وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ - غَسَقٌ শব্দের অর্থ অন্ধকারাচ্ছন্ন হওয়া। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হাসান ও মুজাহিদ (র.) غَاسِقٍ এর অর্থ নিয়েছেন রাত্রি। وُقُوْبٌ -এর অর্থ অন্ধকার পূর্ণরূপে বৃদ্ধি পাওয়া। আয়াতের অর্থ এই যে, আমি আল্লাহর আশ্রয় চাই রাত্রি থেকে যখন তার অন্ধকার গভীর হয়। রাত্রিবেলায় জিন, শয়তান, ইতরপ্রাণী কীটপতঙ্গ ও চোর-ডাকাত বিচরণ করে এবং শত্রুরা আক্রমণ করে। জাদুর ক্রিয়াও রাত্রিতে বেশি হয়। তাই বিশেষভাবে রাত্রি থেকে আশ্রয় চাওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় বিষয় এই :

وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ - نَفَثٌ -এর অর্থ ফুঁ দেওয়া। عُقَدٌ শব্দটি عُقْدَةٌ -এর বহুবচন। অর্থ গ্রন্থি। যারা জাদু করে, তারা ডোর ইত্যাদিতে গিঁরা লাগিয়ে তাতে জাদুর মন্ত্র পড়ে ফুঁ দেয়। এখানে نفاثات স্ত্রীলিঙ্গ ব্যবহার করা হয়েছে। এটা نُفُوس -এরও বিশেষণ হতে পারে যাতে পুরুষ ও নারী উভয়ই দাখিল আছে। বাহ্যত এটা নারীর বিশেষণ। জাদুর কাজ সাধারণত নারীরাই করে এবং জন্মগতভাবে এর সাথে তাদের সম্পর্কও বেশি। এছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপর জাদুর ঘটনার প্রেক্ষাপটে সূরাদ্বয় অবতীর্ণ হয়েছে। সেই ঘটনায় ওলীদের কন্যারাই পিতার আদেশে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপর জাদু করেছিল। জাদু থেকে আশ্রয় চাওয়ার কারণ এটাও হতে পারে যে, এর অনিষ্ট সর্বাধিক। কারণ, মানুষ জাদুর কথা জানতে পারে না। অজ্ঞতার কারণে তা দূর করতে সচেষ্ট হয় না। রোগ মনে করে চিকিৎসা করতে থাকে। ফলে কষ্ট বেড়ে যায়।

তৃতীয় বিষয় হচ্ছে وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ অর্থাৎ হিংসুক ও হিংসা। হিংসার কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপর জাদু করা হয়েছিল। ইহুদি ও মুনাফিকরা মুসলমানদের উন্নতি দেখে হিংসার অনলে দগ্ধ হত। তারা সম্মুখ যুদ্ধে জয়লাভ করতে না পেরে জাদুর মাধ্যমে হিংসার দাবানল নির্বাপিত করার প্রয়াস পায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি হিংসা পোষণকারীর সংখ্যা জগতে অনেক। এ কারণেও বিশেষভাবে হিংসা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে।

حَسَدٌ শব্দের অর্থ কারো নিয়ামত ও সুখ দেখে দগ্ধ হওয়া তাঁর অবসান কামনা করা। এই হিংসা হারাম ও মহাপাপ। এটাই আকাশে করা সর্বপ্রথম গুনাহ এবং এটাই পৃথিবীতে করা সর্বপ্রথম গুনাহ। আকাশে ইবলীস আদম (আ.)-এর প্রতি এবং পৃথিবীতে আদমপুত্র কাবীল তদীয় ভ্রাতা হাবীলের প্রতি হিংসা করেছে। -[কুরতুবী]

حَسَدٌ তথা হিংসার কাছাকাছি হচ্ছে غبط তথা ঈর্ষা। এর সারমর্ম হচ্ছে কারো নিয়ামত ও সুখ দেখে নিজের জন্যও তদ্রূপ নিয়ামত ও সুখ কামনা করা। এটা জায়েজ বরং উত্তম।

এখানে তিনটি বিষয় থেকে বিশেষ আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে। কিন্তু প্রথম ও তৃতীয় বিষয়ের সাথে বাড়তি কথা যুক্ত করা হয়েছে غَاسِق- -এর সাথে اِذَا وَقَبَ এবং حَاسِد- -এর সাথে اِذَا حَسَدَ সংযুক্ত করা হয়েছে। দ্বিতীয় বিষয় نَفّٰثٰت- এর সাথে কোনো কিছু সংযুক্ত কর হয়নি। কারণ এই যে, জাদুর ক্ষতি ব্যাপক। কিন্তু রাত্রির ক্ষতি ব্যাপক নয় এবং রাত্রি যখন গভীর হয়, তখনই ক্ষতির আশংকা দেখা দেয়। এমনি ভাবে হিংসুক ব্যক্তি যে পর্যন্ত প্রতিপক্ষকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে প্রবৃত্ত না হয়, সেই পর্যন্ত হিংসার ক্ষতি তার নিজের মধ্যেই সীমিত থাকে। তবে সে যদি হিংসায় উত্তেজিত হয়ে প্রতিপক্ষের ক্ষতিসাধনে সচেষ্ট হয়, তবেই প্রতিপক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই প্রথম ও তৃতীয় বিষয়ের সাথে বাড়তি কথাগুলো সংযুক্ত করা হয়েছে।

সূরা ফালাকে জাগতিক বিপদাপদ থেকে আশ্রয় প্রার্থনার শিক্ষা রয়েছে। আলোচ্য সূরা নাসে পারলৌকিক আপদ ও মুসীবত থেকে আশ্রয় প্রার্থনার প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে। যেহেতু পরকালীন ক্ষতি গুরুতর, তাই এর প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে কুরআনে পাক সমাপ্ত করা হয়েছে।

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ এখানে نَاسٌ- -এর দিকে এবং পূর্ববর্তী সূরায় فَلَقٌ- -এর দিকে رَبٌّ- -এর সম্বন্ধ করা হয়েছে। কারণ এই যে, পূর্ববর্তী সূরায় বাহ্যিক ও দৈহিক বিপদাপদ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা উদ্দেশ্য এবং সেটা মানুষের মধ্যে সীমিত নয়। জন্তু-জানোয়ারও দৈহিক বিপদাপদ এবং মুসীবতে পতিত হয়। কিন্তু এ সূরায় শয়তানী কুমন্ত্রণা থেকে আশ্রয় প্রার্থনার কথা বলা হয়েছে। এটা মানুষের মধ্যে সীমিত এবং জিন জাতিও প্রসঙ্গত শামিল আছে। তাই এখানে رَبٌّ শব্দের সম্বন্ধ نَاسٌ- -এর দিকে করা হয়েছে। –[বায়যাভী]

مَلِكِ النَّاسِ –মানুষের অধিপতি, اِلٰهِ النَّاسِ –মানুষের মা'বূদ। এদু'টি গুণ সংযুক্ত করার কারণ এই যে, رَبِّ শব্দটি কোনো বিশেষ বস্তুর দিকে সম্বন্ধ হলে আল্লাহ ব্যতীত অপরের জন্যও ব্যবহৃত হয়; যথা رَبُّ الدَّارِ গৃহের মালিক। প্রত্যেক মালিকই অধিপতি হয় না। তাই مَلِكِ النَّاسِ বলা হয়েছে। অতঃপর প্রত্যেক অধিপতিই মা'বূদ হয় না। তাই اِلٰهِ النَّاسِ বলতে হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ মালিক, অধিপতি, মা'বূদ সবই। এই তিনটি গুণ একত্র করার রহস্য এই যে, এগুলোর মধ্যে প্রত্যেকটি গুণ হেফাজত ও সংরক্ষণ দাবি করে। কেননা, প্রত্যেক মালিক তার মালিকানাধীন বস্তুর, প্রত্যেক রাজা তার প্রজার এবং প্রত্যেক উপাস্য তার উপাসকদের হেফাজত করে। এই গুণত্রয় একমাত্র আল্লাহ তা'আলার মধ্যে একত্রিত আছে। তিনি ব্যতীত কেউ এই গুণত্রয়ের সমষ্টি নন। তাই আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় সর্বাধিক বড় আশ্রয়। হে আল্লাহ, আপনিই এসব গুণের আধার এবং আমরা কেবল আপনার কাছেই আশ্রয় প্রার্থনা করি–এভাবে দোয়া করলে তা কবূল হওয়ার নিকটবর্তী হবে। এখানে প্রথমে رَبِّ النَّاسِ বলার পর ব্যাকরণিক নীতি অনুযায়ী সর্বনাম ব্যবহার করে مَلِكِهِمْ ও اِلٰهِهِمْ বলাই সঙ্গত ছিল। কিন্তু দোয়া ও প্রশংসার স্থল হওয়ার কারণে একই শব্দকে বার বার উল্লেখ করাই উত্তম বিবেচিত হয়েছে। কেউ কেউ نَاسٌ শব্দটি বার বার উল্লেখ করার ব্যাপারে একটি রসালতত্ত্ব ও বর্ণনা করেছেন। তাঁরা বলেন : এ সূরায় نَاسٌ শব্দটি পাঁচবার উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম نَاسٌ বলে অল্পবয়স্ক বালক-বালিকা বুঝানো হয়েছে। একারণেই এর আগে رَبِّ অর্থাৎ পালনকর্তা শব্দ আনা হয়েছে। কেননা অল্পবয়স্ক বালক-বালিকারাই প্রতিপালনের অধিক মুখাপেক্ষী। দ্বিতীয় نَاسٌ দ্বারা যুবক শ্রেণী বুঝানো হয়েছে। مَلِكٌ (রাজা, শাসক) শব্দ এর ইঙ্গিত বহন করে। কেননা, শাসন যুবকদের জন্য উপযুক্ত। তৃতীয় نَاسٌ বলে সংসারত্যাগী, ইবাদতে মশগুল বুড়ো শ্রেণীকে বুঝানো হয়েছে। ইবাদতের অর্থ বাহী ইলাহ শব্দ তাদের জন্য উপযুক্ত। চতুর্থ نَاسٌ বলে আল্লাহর সৎকর্মপরায়ণ বান্দা বুঝানো হয়েছে। وَسْوَسَه শব্দ এর ইঙ্গিত বহন করে। কেননা, শয়তান সৎকর্মপরায়ণদের শত্রু। তাদের অন্তরে কুমন্ত্রণা সৃষ্টি করাই তার কাজ। পঞ্চম نَاسٌ বলে দুষ্কৃতকারী লোক বুঝানো হয়েছে। কেননা, তাদের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে।

مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ –যে বিষয় থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা উদ্দেশ্য অত্র আয়াতে সেই বিষয় বর্ণিত হয়েছে। وَسْوَاسٌ শব্দটি ধাতু। এর অর্থ কুমন্ত্রণা। এখানে অতিরঞ্জনের নিয়মে শয়তানকেই কুমন্ত্রণা বলে দেওয়া হয়েছে; সে যেন আপাদমস্তক কুমন্ত্রণা। আওয়াজহীন গোপন বাক্যের মাধ্যমে শয়তান মানুষকে তার আনুগত্যের আহ্বান করে। মানুষ এই বাক্যের অর্থ অনুভব করে কিন্তু কোনো আওয়াজ শুনে না। শয়তানের এরূপ আহ্বানকে কুমন্ত্রণা বলা হয়।–(কুরতুবী) خَنَّاسٌ শব্দটি خُنُسٌ থেকে উৎপন্ন। অর্থ পশ্চাতে সরে যাওয়া। মানুষ আল্লাহর নাম উচ্চারণ করলে পিছনে সরে যাওয়াই শয়তানের অভ্যাস। মানুষ গাফিল হলে শয়তান আবার অগ্রসর হয়। অতঃপর হুঁশিয়ার হয়ে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করলে শয়তান আবার পশ্চাতে সরে যায়। এ কার্যধারাই অবিরাম অব্যাহত থাকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : প্রত্যেক মানুষের অন্তরে দু'টি গৃহ আছে। একটিতে ফেরেশতা ও অপরটিতে শয়তান বাস করে। (ফেরেশতা সৎ কাজে এবং শয়তান অসৎ কাজে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে)। মানুষ যখন আল্লাহর জিকির করে, তখন শয়তান পিছনে সরে যায় এবং যখন জিকিরে থাকে না, তখন তর চঞ্চু মানুষের অন্তরে স্থাপন করে কুমন্ত্রণা দিতে থাকে। –[মাযহারী]

مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ অর্থাৎ কুমন্ত্রণাদাতা জিনের মধ্য থেকেও হয় এবং মানুষের মধ্য থেকেও হয়। অতএব সারমর্ম এই দাঁড়াল যে, আল্লাহ তা'আলা রাসূলকে তাঁর আশ্রয় প্রার্থনার শিক্ষা দিয়েছেন জিন শয়তানের অনিষ্ট থেকে এবং মানুষ শয়তানের অনিষ্ট থেকে। এখন জিন শয়তানের কুমন্ত্রণা বুঝতে অসুবিধা হয় না; কারণ তারা অলক্ষ্যে থেকে মানুষের অন্তরে কোনো কথা রাখতে পারে। কিন্তু মানুষ শয়তান প্রকাশ্যে সামনে এসে কথা বলে। এটা কুমন্ত্রণা কিরূপে হলো? জবাব এই যে, মানুষ শয়তানও কারো সামনে এমন কথা বলে, যা থেকে সেই ব্যক্তির মনে কোনো ব্যাপার সম্পর্কে সন্দেহ ও সংশয় মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। এই সন্দেহ ও সংশয়ের বিষয় সে পরিষ্কার বলে না। শায়খ ইযযুদ্দীন (র.) তদীয় গ্রন্থে বলেন : মানুষ শয়তানের অনিষ্ট বলে নফসের (মনের) কুমন্ত্রণা বুঝানো হয়েছে। কেননা, জিন শয়তান যেমন মানুষের অন্তরে কু-কাজের আগ্রহ সৃষ্টি করে তেমনি স্বয়ং মানুষের নফসও মন্দ কাজেরই আদেশ করে। একারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন নফসের অনিষ্ট থেকেও আশ্রয় প্রার্থনা শিক্ষা দিয়েছেন। হাদীসে আছে اَللّٰهُمَّ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِىْ وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهٖ অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি আপনার আশ্রয় চাই, আমার নফসের অনিষ্ট থেকে, শয়তানের অনিষ্ট থেকে এবং তাঁর শিরক থেকেও।

শয়তানী কুমন্ত্রণা থেকে আশ্রয় প্রার্থনার গুরুত্ব অপরিসীম : ইবনে কাছীর (র.) বলেন : এ সূরার শিক্ষা এই যে, পালনকর্তা, অধিপতি, মা'বূদ–আল্লাহ তা'আলার এই গুণত্রয় উল্লেখ করে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা না করা মানুষের উচিত। কেননা প্রত্যেক মানুষের সাথে একটি করে শয়তান লেগে আছে। সে প্রতি পদক্ষেপে মানুষকে ধ্বংস ও বরবাদ করার চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকে। প্রথমে তাকে পাপ কাজের প্রতি উৎসাহিত করে এবং নানা প্রলোভন দিয়ে পাপ কাজের দিকে

নিয়ে যায়। এতে সফল না হলে মানুষের সৎকর্ম ও ইবাদত বিনষ্ট করার জন্য রিয়া, নাম-যশ, গর্ব ও অহংকার অন্তরে সৃষ্টি করে দেয়। বিদ্বান লোকদের অন্তরে সত্য বিশ্বাস সম্পর্কে সংশয় সৃষ্টির চেষ্টা করে। অতএব, শয়তানের অনিষ্ট থেকে সে-ই বাঁচতে পারে যাকে আল্লাহ বাঁচিয়ে রাখেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যার উপর তার সঙ্গী শয়তান চড়াও হয়ে না আছে। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার সাথেও এই সঙ্গী আছে কি? উত্তর হলো? হ্যাঁ, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা শয়তানের মোকাবিলায় আমাকে সাহায্য করেন। এর ফলশ্রুতিতে শয়তান আমাকে সদুপদেশ ব্যতীত কিছু বলে না।

হযরত আনাস (রা.)-এর হাদীসে আছে, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদে এতেকাফরত ছিলেন। এক রাত্রিতে উম্মুল মু'মিনীন হযরত সফিয়্যা (রা.) তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য মসজিদে যান। ফেরার সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাথে রওয়ানা হলেন। গলিপথে চলার সময় দু'জন আনসারী সাহাবী সামনে পড়লে রাসূলুল্লাহ ﷺ আওয়াজ দিলেন, তোমরা আস। আমার সাথে আমার সহধর্মিনী সফিয়্যা বিনতে-হুয়াই (রা.) রয়েছেন। সাহাবীদ্বয় সম্ভ্রমে আরজ করলেন : সোবহানাল্লাহ ইয়া রাসূলাল্লাহ, (অর্থাৎ আপনি মনে করেছেন যে, আমরা কোনো কুধারণা করব)। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : নিশ্চয়। কারণ, শয়তান মানুষের রক্তের সাথে তার শিরা-উপশিরায় প্রভাব বিস্তার করে। আমি আশঙ্কা করলাম যে, শয়তান তোমাদের অন্তরে আমার সম্পর্কে কুধারণা সৃষ্টি করতে পারে। তাই আমি বলে দিয়েছি যে, আমার সাথে কোনো বেগানা নারী নেই।

নিজে মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকা যেমন জরুরি, তেমনি অন্য মুসলমানকে নিজের ব্যাপারে কুধারণা করার সুযোগ দেওয়াও দুরস্ত নয়। মানুষের মনে কুধারণা সৃষ্টি হয়– এ ধরনের আচরণ থেকে বেঁচে থাকা উচিত। এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে গেলে পরিষ্কার কথার মাধ্যমে অপবাদের সুযোগ বন্ধ করে দেওয়া সঙ্গত। সারকথা এই যে, উপরিউক্ত হাদীস প্রমাণ করেছে যে, শয়তানী কুমন্ত্রণা অত্যধিক বিপজ্জনক ব্যাপার। আল্লাহর আশ্রয় ব্যতীত এ থেকে আত্মরক্ষা করা সহজ নয়। এখানে যে কুমন্ত্রণা থেকে সতর্ক করা হয়েছে, এটা সেই কুমন্ত্রণা, যাতে মানুষ স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে মশগুল হয়। অনিচ্ছাকৃত কুমন্ত্রণা ও কল্পনা, যা অন্তরে আসে এবং চলে যায়– সেটা ক্ষতিকর নয় এবং তজ্জন্য কোনো গুনাহ হয় না।

সূরা ফালাক ও সূরা নাস -এর আশ্রয় প্রার্থনার মধ্যে একটি পার্থক্য : সূরা ফালাকে যার আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে (অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার), তার মাত্র একটি বিশেষণ رَبِّ الْفَلَقِ উল্লেখ করা হয়েছে এবং যেসব বিষয় থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে, সেগুলো অনেক বর্ণিত হয়েছে। সেগুলো প্রথমে مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ বাক্যে সংক্ষেপে এবং পরে তিনটি বিশেষ বিপদের কথা আলাদা উল্লেখ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে সূরা নাসে যে বিষয় থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে, তা তো মাত্র একটি; অর্থাৎ কুমন্ত্রণা এবং যার আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে, তার তিনটি বিশেষণ উল্লেখ করে দোয়া করা হয়েছে। এ থেকে জানা যায় যে, শয়তানের অনিষ্ট সর্ববৃহৎ অনিষ্ট; প্রথমত এ কারণে যে, অন্য আপদ-বিপদের প্রতিক্রিয়া মানুষের দেহ ও পার্থিব বিষয়াদিতে প্রতিফলিত হয়, কিন্তু শয়তানের অনিষ্ট মানুষের ইহকাল ও পরকাল উভয়কে বিশেষত পরকালকে বরবাদ করে দেয়। তাই এ ক্ষতি গুরুতর। দ্বিতীয়ত দুনিয়ার আপদ-বিপদের কিছু না কিছু বৈষয়িক প্রতিকারও মানুষের করায়ত্ত আছে এবং তা করা হয়ে থাকে, কিন্তু শয়তানের মোকাবিলা করার কোনো বৈষয়িক কৌশল মানুষের সাধ্যাতীত ব্যাপার। সে মানুষকে দেখে, কিন্তু মানুষ তাকে দেখে না। সুতরাং এর প্রতিকার একমাত্র আল্লাহর জিকির ও তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করা।

মানুষের শত্রু মানুষও এবং শয়তানও। এই শত্রুদ্বয়ের আলাদা আলাদা প্রতিকার : মানুষের শত্রু মানুষও এবং শয়তানও। আল্লাহ তা'আলা মানুষ শত্রুকে প্রথমে সচ্চরিত্র, উদার ব্যবহার, প্রতিশোধ বর্জন ও সবরের মাধ্যমে বশ করার শিক্ষা দিয়েছেন। যদি, সে এতে বিরত না হয়, তবে তার সাথে জিহাদ ও যুদ্ধ করার আদেশ দান করেছেন। কিন্তু শয়তান শত্রুর মোকাবিলা কেবল আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনার মাধ্যমে করার শিক্ষা দিয়েছেন। ইবনে কাছীর তাঁর তাফসীরের ভূমিকায় তিনটি আয়াত উল্লেখ করেছেন। এসব আয়াতে মানুষের উপরিউক্ত শত্রুদ্বয়ের উল্লেখ করার পর মানুষ শত্রুর প্রতিরক্ষায় সচ্চরিত্রতা, প্রতিশোধ বর্জন ও সদয় ব্যবহার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এবং শয়তান শত্রুর প্রতিরক্ষায় কেবল আশ্রয় প্রার্থনার সবক দেওয়া হয়েছে। ইবনে কাছীর (র.) বলেন : সমগ্র কুরআনে এই বিষয়বস্তুর মাত্র তিনটি আয়াতই বিদ্যমান আছে। সূরা আ'রাফের এক আয়াতে প্রথমে বলা হয়েছে : خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ -এর অর্থ এই যে, ক্ষমা ও মার্জনা, সৎ কাজের আদেশ এবং তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে মানুষ শত্রুর মোকাবিলা করা। এ আয়াতেই অতঃপর বলা হয়েছে :

وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ اِنَّهٗ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ –এতে শয়তান শত্রুর মোকাবিলা করার কৌশল শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। যার সারকথা আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় প্রর্থনা করা। দ্বিতীয় সূরা 'কাদ আফলাহাল মু'মিনূনে' প্রথমে মানুষ শত্রুর মোকাবিলার প্রতিকার বর্ণনা করেছেন : اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ অর্থাৎ মন্দকে ভালো দ্বারা প্রতিহত কর। অতঃপর শয়তান শত্রুর মোকাবিলার জন্য বলেছেন : وَقُلْ رَّبِّ اَعُوْذُبِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيٰطِيْنِ وَاَعُوْذُبِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنِ অর্থাৎ হে আমার পালনকর্তা, আমি আপনার আশ্রয় চাই শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে এবং তাদের আমার কাছে আসা থেকে। তৃতীয় আয়াত সূরা হা-মীম সেজদায় প্রথমে মানুষ শত্রুকে প্রতিহত করা জন্য বলার হয়েছে : اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ অর্থাৎ তুমি মন্দকে ভালো দ্বারা প্রতিহত কর। এরূপ করলে দেখবে যে, তোমার শত্রু তোমার বন্ধুতে পরিণত হবে। এ আয়াতেই পরবর্তী অংশে শয়তান শত্রুর মোকাবিলার জন্য বলা হয়েছে : وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ এটা প্রায় সূরা আ'রাফেরই অনুরূপ আয়াত। এর সারমর্ম এই যে, শয়তান শত্রুর মোকাবিলা আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা ছাড়া কিছুই নয়। উপরিউক্ত তিনটি আয়াতেই মানুষ শত্রুর প্রতিকার ক্ষমা, মার্জনা ও সচ্চরিত্রতা বর্ণিত হয়েছে। কেননা, ক্ষমা ও অনুগ্রহের কাছে নতিস্বীকার করাই মানুষের স্বভাব। আর যে নরপিচশ মানুষের প্রকৃতিগত যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে, তার প্রতিকার জিহাদ ও যুদ্ধ ব্যক্ত হয়েছে। কেননা, সে প্রকাশ্য শত্রু, প্রকাশ্য হাতিয়ার নিয়ে সামনে আসে। তার শক্তির মোকাবিলা শক্তি দ্বারা করা সম্ভব। কিন্তু অভিশপ্ত শয়তান স্বভাবগত দুষ্ট। অনুগ্রহ, ক্ষমা, মার্জনা তার বেলায় সুফলপ্রসূ নয়। যুদ্ধ ও জিহাদের মাধ্যমে তার বাহ্যিক মোকাবিলাও সম্ভবপর নয়। এই উভয় প্রকার নরম ও গরম কৌশল কেবল মানুষ শত্রুর মোকাবিলায় প্রযোজ্য–শয়তানের মোকাবিলায় নয়। তাই এর প্রতিকার কেবল আল্লাহর আশ্রয়ে আসা এবং তাঁর জিকিরে মশগুল হয়ে যাওয়া। সমগ্র কুরআনে তাই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এবং এই বিষয়বস্তুর উপরই কুরআন খতম করা হয়েছে।

পরিণতির বিচারে উভয় শত্রুর মোকাবিলার বিস্তর ব্যবধান রয়েছে : উপরে কুরআনী শিক্ষায় প্রথমে অনুগ্রহ ও সবর দ্বারা মানুষ শত্রুর প্রতিরক্ষা বর্ণিত হয়েছে। এতে সফল না হলে জিহাদ ও যুদ্ধ দ্বারা প্রতিরক্ষা করতে বলা হয়েছে। উভয় অবস্থায় মোকাবিলাকারী মু'মিন কামিয়াবী থেকে বঞ্চিত নয়। সম্পূর্ণ অকৃতকার্যতা মু'মিনের জন্য সম্ভবপর নয়। শত্রুর মোকাবিলায় বিজয়ী হলে তো তার কামিয়াবী সুস্পষ্টই, পক্ষান্তরে যদি সে পরাজিত হয় অথবা নিহত হয়, তবে পরকালের সাওয়াব ও শাহাদতের ফজিলত দুনিয়ার কামিয়াবী অপেক্ষাও বেশি পাবে। সারকথা, মানুষ শত্রুর মোকাবিলায় হেরে যাওয়াও মু'মিনের জন্য ক্ষতির কথা নয়। কিন্তু শয়তানের খোশামোদ ও তাকে সন্তুষ্ট করা এবং গুনাহ তার মোকাবিলায় হেরে যাওয়া পরকালকে বরবাদ করারই নামান্তর। এ কারণেই শয়তান শত্রুর প্রতিরক্ষার জন্য আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় নেওয়াই একমাত্র প্রতিকার। তাঁর শরণের সামনে শয়তানের প্রত্যেকটি কলাকৌশল মাকড়সার জালের ন্যায় দুর্বল।

শয়তানী চক্রান্ত ক্ষণভঙ্গুর : উপরিউক্ত বর্ণনা থেকে এরূপ ধারণা করা উচিত নয় যে, তাহলে শয়তানের শক্তিই বৃহৎ। তার মোকাবিলা সুকঠিন। এহেন ধারণা দূর করার জন্য আল্লাহ তা'আলা বলেন :

اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيْفًا নিশ্চয় শয়তানের চক্রান্ত দুর্বল। সূরা নাহলে কুরআন পাঠ করার সময় আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করার আদেশ রয়েছে। সেখানে একথাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, ঈমানদার আল্লাহর উপর ভরসাকারী অর্থাৎ আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনাকারীর উপর শয়তানের কোনো জোর চলে না। বলা হয়েছে :

فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ – اِنَّهٗ لَيْسَ لَهٗ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ – اِنَّمَا سُلْطَانُهٗ عَلَى الَّذِيْنَ يَتَوَلَّوْنَهٗ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِهٖ مُشْرِكُوْنَ.

অর্থাৎ তুমি যখন কুরআন পাঠ কর, তখন বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা কর। যারা মু'মিন ও আল্লাহর উপর ভরসা করে, তাদের উপর শয়তানের জোর চলে না। তার জোর তো কেবল তাদের উপরই চলে যারা তাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে ও তাকে অংশীদার মনে করে।

কুরআনের সূচনা ও সমাপ্তির মিল : আল্লাহ তা'আলা সূরা ফাতেহার মাধ্যমে কুরআন পাক শুরু করেছেন, যার সারমর্ম আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করার পর তাঁর সাহায্য ও সরলপথে চলার তাওফীক প্রার্থনা করা। আল্লাহ তা'আলার সাহায্য ও সরলপথের মধ্যেই মানুষের যাবতীয় ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কামিয়াবী নিহিত আছে। কিন্তু এ দু'টি বিষয় অর্জনে এবং অর্জনের পর তা ব্যবহারে প্রতি পদক্ষেপে অভিশপ্ত শয়তানের চক্রান্ত ও কুমন্ত্রণার জাল বিছানো থাকে। তাই এ জাল ছিন্ন করার কার্যকর পন্থা আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ দ্বারা কুরআন পাক সমাপ্ত করা হয়েছে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

قُلْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদর اَلْقَوْلُ মূলবর্ণ (ق - و - ل) জিনস اجوف واوى অর্থ- আপনি বলুন।

اَعُوْذُ : সীগাহ واحد متكلم বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْعَوْذُ মূলবর্ণ (ع - و - ذ) জিনস اجوف واوى অর্থ- আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি।

رَبِّ : মাসদার। অর্থ– প্রতি পালক, মালিক, রব, প্রভু।

اَلْفَلَقِ : ইসমে ফে'ল। অর্থ– প্রভাত, উষা।

شَرِّ : একবচন, বহুবচন شرور অর্থ– অপকারিতা, যার দ্বারা সকলে কষ্ট পায়।

خَلَقَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْخَلْقُ মূলবর্ণ (خ - ل - ق) জিনস صحيح অর্থ– তিনি সৃষ্টি করেছেন।

غَاسِقٍ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْغَسْقُ মূলবর্ণ (غ - س - ق) জিনস صحيح অর্থ– অন্ধকার রাত।

وَقَبَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْوَقْبُ মূলবর্ণ (و - ق - ب) জিনস مثال واوى অর্থ– অদৃশ্য হয়ে যাবে।

اَلنَّفّٰثٰتِ : সীগাহ جمع مؤنث বহছ اسم مبالغه বাব نَصَرَ মাসদার اَلنَّفْثُ মূলবর্ণ (ن - ف - ث) জিনস صحيح অর্থ- পড়ে পড়ে ফুৎকার কারিণী।

اَلْعُقَدِ : ইসমে জমা, বহুবচন, একবচন عقدة অর্থ– গ্রন্থি সমূহ, গিরা। আয়াতে وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ এখানে عُقَدُ দ্বারা উদ্দেশ্য গিরা। জাদু কারীরা চুলের বেনীতে জাদু মন্ত্র পড়ে ফুঁক দিয়ে পরে তা লাগিয়ে দেয়। তাই জাদুকারীদেরকে معقد বলা হয়।

حَاسِدٍ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ ও نَصَرَ মাসদার اَلْحَسَدُ মূলবর্ণ (ح - س - د) জিনস صحيح অর্থ– হিংসা পোষণকারী।

حَسَدَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ ও نَصَرَ মাসদার اَلْحَسَدُ মূলবর্ণ (ح - س - د) জিনস صحيح অর্থ– সে হিংসা করে।

مَلِكِ : সিফাতের সীগাহ। অর্থ- বাদশাহ, রাজা, অধিপতি, মহাবিচারক।

اِلٰهِ : فعال -এর ওযনে, ইসমে মাফঊলের অর্থে। উপাস্য, প্রত্যেক কওমের নিকট উপাসনার যোগ্য যে হবে, তাকেই ইলাহ বলা হয়। চাই সে সত্য মা'বূদ হোক বা বাতিল হোক।

اَلْوَسْوَاسِ : মাসদার। বাব فَعْلَلَةٌ কখনো কখনো وَسْوَسَةٌ ও মাসদার হিসেবে আসে। অর্থ– কুপ্ররোচনা প্রদানকারী।

خَنَّاسِ : মুবালাগার সিগাহ। فَعَّالٌ -এর ওযনে। মাসদার اَلْخَنْسُ মূলবর্ণ (خ - ن - س) জিনস صحيح অর্থ– পশ্চাদ পসরণকারী, শয়তান।

يُوَسْوِسُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব فَعْلَلَةٌ মাসদার اَلْوَسْوَسَةُ মূলবর্ণ (و - س - و - س) জিনস মুরাক্কাব (لفيف مفروق ও مضاعف رباعى) অর্থ– প্ররোচনা প্রদান করে, মন্ত্রণাদেয়।

اَلْجِنَّةِ : ইসমে জমা। বহুবচন, একবচন, جِنِّىٌّ। অর্থ– জিন, জিনের দল।

اَلنَّاسِ : ইসমে জমা বা বহুবচন। অর্থ– লোক, মানুষ। কিছু লোকের মতে اَلنَّاسُ মূলতঃ اُنَاسٌ ছিল। উহ্য همزة -এর পরিবর্তে ال দেওয়া হয়েছে। তাই ال টি হামযাসহ আসে না এবং اَلْاُنَاسُ বলা হবে না। (বায়যাবী) পুরুষ, মহিলা, বাচ্চা, বড়, ভালো, খারাপ, মুসলমান, কাফের সকলের ক্ষেত্রেই শব্দটিকে প্রয়োগ করা হয়। সম্মানিত, জ্ঞানীও উদ্দেশ্য হয় অর্থাৎ ঐ ব্যক্তি যে মনুষ্যত্বের সকল গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যবলিতে পরিপূর্ণ। আর অভিধান বিদগণ বলেন, ناس -কে- نَاسَ – يَنُوسُ نَوْسًا থেকে নেওয়া হয়েছে। যার অর্থ হলো, ব্যাকুল হওয়া, অন্দোলিত হওয়া। জনৈক ইয়েমেনী যুবরাজের চুলের গুচ্ছ বা বেনি ঝুলে থাকত, তাই তাকে ذو نواس বলা শুরু হয়। এমতাবস্থায় نَاسْ -এর তাসগীর হবে نُوَيْسٌ আর واو টি মৌলিক বলে স্বীকৃত হবে।

বাক্য বিশ্লেষণ :

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّمَاخَلَقَ এখানে قُلْ শব্দটি فعل امر এবং তার فاعل টি উহ্য। যার উহ্য রূপ হচ্ছে اَنْتَ; اَعُوْذُ বাক্যটি قول -এর مقول; اَعُوْذُ শব্দটি فعل مضارع مرفوع তার فاعل টি উহ্য। যার উহ্য রূপ হচ্ছে انا; بِرَبِّ الْفَلَقِ বাক্যটি اَعُوْذُ -এর সাথে متعلق; من شر বাক্যটি اَعُوْذُ -এর সাথে متعلق আর ما টি اسم موصول مضاف اليه আর خَلَقَ শব্দটি صلة এবং তার عائد টি উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ خَلَقَهٗ; ما টি مصدرية হওয়ার সম্ভাবনা ও রয়েছে।

وَمِنْ شَرِّغَاسِقٍ اذا وَقَبَ এ বাক্যটি পূর্বের বাক্যের উপর عطف হয়েছে। اذا টি ظرفية আর وَقَبَ শব্দটি جر -এর স্থানে পতিত হয়েছে তার দিকে اِذَا টি اضافت হওয়ার কারণে। وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ এ বাক্যটি ও পূর্বের বাক্যের উপর عطف হয়েছে। فِى الْعُقَدِ টি نَفّٰثٰتِ -এর সাথে متعلق হয়েছে।

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَاحَسَدَ এ বাক্যটি ও পূর্বের বাক্যের উপর عطف হয়েছে।

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ . مَلِكِ النَّاسِ . اِلٰهِ النَّاسِ -এখানে قُلْ শব্দটি فعل امر তার فاعل টি উহ্য। যার উহ্য রূপ হচ্ছে اَنْتَ; اَعُوْذُ বাক্যটি قول -এর مقول; اَعُوْذُ শব্দটি فعل مضارع مرفوع তার فاعل টি ضمير যার উহ্যরূপ হলো انا; بِرَبِّ النَّاسِ বাক্যটি اَعُوْذُ -এর সাথে متعلق হয়েছে। مَلِكِ النَّاسِ ও اِلٰهِ النَّاسِ দুটি بدل অথবা صفت অথবা عطف بيان;

مِنْ شَرِّالْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ এখানে مِنْ شَرِّ টি جارومجرور হয়ে اَعُوْذُ -এর সাথে متعلق হয়েছে। اَلْوَاسِ টি مضاف اليه আর الخناس টি صفت হয়েছে।

اَلَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِالنَّاسِ এখানে اَلَّذِىْ টি وَاسْوَاسْ -এর صفت আর يُوَسْوِسُ শব্দটি فعل مضارع; فِى صُدُوْرِ النَّا টি جار ومجرور হয়ে يُوَسْوِسُ -এর সাথে متعلق হয়েছে।

مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ এ বাক্যটির দু'টি সম্ভাব না রয়েছে– ১. يُوَسْوِسُ -এর بيان হবে, আর তখন مِنْ টি بيانية হবে। ২. পৃথক বাক্য হবে। আর তখন من টি حرف جر হবে এবং يُوَسْوِسُ -এর সাথে متعلق হবে। অর্থাৎ– يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِهِمْ مِنْ جِهَةِ الْجِنَّةِ وَمِنْ جِهَةِ النَّاسِ –[ই'রাবুল কুরআন, খ : ৮ পৃ. ৪৫৩ ও ৪৫৬]

সমাপ্ত

تفسير انوار القرآن
ইসলামিয়া কুতুবখানা
৩০/৩২ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
www.islamiakutubkhana.net